পূরবী বসু

আমার এ দেহখানি

নারীর কথা : গল্পে ও রচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এ দেহখানি

নারীর কথা : গল্পে ও রচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূরবী বসু

আমার এ দেহখানি

নারীর কথা : গল্পে ও রচনায়

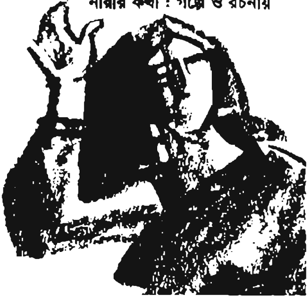

বেঙ্গল
পাবলিকেশন্স

বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ॥ প্রকাশক : আবুল খায়ের, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স
লিমিটেড, বেঙ্গল সেন্টার, প্লট ২, সিভিল এভিয়েশন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড,
খিলক্ষেত, ঢাকা ১২২৯, বাংলাদেশ। ফোন : + [৮৮০ ২] ৮৯০১১৮০, ৮৯০১১৮৫
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক ॥ প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রণ : এম কে প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৮৯/১ তেজগাঁও, ঢাকা ১২০৮

মূল্য : ৬৫০ টাকা

ISBN-978-984-90471-1-7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মমতাজ, হাবিবা, ইসমত, সাবিনা,
স্বপন, অরূপ, মঞ্জুর, তপন,
এমদাদ, সহদেব, তুষার, মিলন,
শওকত, জগলুল, মুনীর, মুজিবর,
আবু আলী, আজিজ, অজয়, শামসের
আমার প্রাক্তন সহকর্মীবৃন্দ,
যাঁদের সাহচর্য ও সহযোগিতা
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় নব্বুই-এর দশকটিকে
আরো অর্থবহ, আরো উপভোগ্য করে তুলেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকার বদলে

পূরবী বসু বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী লেখক। বিপন্ন এই সময়ের তিনি প্রতিবাদী ও মনোগ্রাহী রূপকার। নারীদের চিন্তাচেতনা, প্রতিবাদ, নারীত্বের বেদনা ও মানসভুবন তাঁর রচনায় বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়। পুরুষশাসিত সমাজের নানা অসংগতির তিনি রূপকার। পরিবার ও সমাজে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও নারীদের মানসযাত্রা যে কত অদম্য ও প্রত্যয়দীপ্ত তাঁর লেখায় তা বিধৃত হয়েছে। পূরবীর মতো এত যত্ন ও পরিশ্রম করে আর কেউ এই ভুবন নিয়ে এ-কর্মে ব্যাপৃত আছেন বলে আমার জানা নেই।

আমার এ দেহখানি গ্রন্থে নারী-ভুবনের প্রেম-অপ্রেম, বিতৃষ্ণা, নির্বেদ, দেহ, যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, বঞ্চনা ও শোষণ নানা মাত্রা নিয়ে, মমত্ববোধ নিয়ে উঠে এসেছে। পুরুষ-আধিপত্য নারীর বিকাশ ও ভাবনাকে কতভাবে যে ব্যাহত করে তা তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আর নারীর দেহ সম্পর্কে তাঁর মানবিক বিশ্লেষণ যে কত হৃদয়গ্রাহী ও নবীন মাত্রায় উজ্জ্বল, তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। সবকিছু ছাপিয়ে এক প্রতিবাদী অনুষঙ্গও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ-গ্রন্থটি অন্যদিক দিয়েও ব্যতিক্রমী। নারীর জীবনভাবনা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে প্রবন্ধ ও গল্প রয়েছে এই গ্রন্থে। পাঠক আশা করি এই গল্পগুচ্ছ ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখকের মনোভঙ্গি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ ধরতে সক্ষম হবেন।

আমরা পূরবী বসুর এই গ্রন্থ প্রকাশ করে আনন্দিত বোধ করছি। কেননা এ-ধরনের বই বাংলা ভাষায় খুব বেশি নেই।

আবুল হাসনাত
নির্বাহী পরিচালক
বেঙ্গল পাবলিকেশন্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

পুরুষ ও পুরুষতন্ত্র যে দুটি প্রধান অস্ত্রের মাধ্যমে নারীকে শোষণ ও অবদমন করে থাকে, তার একটি ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বিধৃত নারী-নির্মাণ ও নারীর বিরুদ্ধে আরোপিত যাবতীয় অনুশাসন-বিধিনিষেধ; আরেকটি, সাহিত্যকলায়, বিশেষত প্রচলিত লোকসংস্কৃতিতে, বর্ণিত নারীর রূপ, প্রকৃতি ও ভূমিকা। বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই মানবিক অনুভূতি ও গুণাবলির দিক দিয়ে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা যদিও সম্ভব হয় না, নারীর শরীর (তাকে যত নান্দনিক বিশেষণেই বিশেষিত করা হোক না কেন) ও শারীরিক বিভাজনকেই দায়ী করা হয় সকল অধস্তনতার ভিত্তি হিসেবে। যে নারীদেহ প্রাণিকুলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, যে নারীদেহ সন্তানের শ্রেষ্ঠ (উপযুক্ত খাদ্যকণা, সঠিক মিষ্টত্ব ও উষ্ণতাসহ) খাদ্য উৎপাদন করে নিজেরই শরীরের অভ্যন্তর থেকে, যে নারীদেহ ভালোবাসায় সিক্ত হলে পুরুষকে ও নিজেকে অপার আনন্দ দিতে সক্ষম, সেই বৈচিত্র্যময়, সদা পরিবর্তনশীল নারীদেহের ওপরেই আসে সবচেয়ে বড় আঘাত, বৈষম্যজনিত অবহেলা আর অত্যাচার। স্তনের বিকাশ, রজস্বলতা, অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থা, প্রসবকাল, স্তন্যদান, সন্তান লালন-পালন, রজঃনিবৃত্তি — নারীদেহে একের পর এক নতুন নতুন জৈবিক সংযোজন ঘটে চলে ও সেইসঙ্গে পরিবর্তন আসতে থাকে, যা ক্রমাগত নারীকে পর্দার আড়ালে নিয়ে যায় — অন্তঃপুরবাসিনী করে তোলে — পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রীতি অনুযায়ী।

প্রায় প্রতিটি ধর্মেই যাবতীয় শক্তির আধার হিসেবে পুরুষকেই কৃতিত্ব দেওয়া হয়। পুরুষ থেকেই বা পুরুষের পরেই নারীর জন্ম বা শক্তিধারণ। যেমন আদমের বুকের বক্র হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছিলেন বিবি হাওয়া। বেগম রোকেয়া তাঁর *মতিচূর* গ্রন্থে এক ইংরেজ লেখকের প্রাচ্য পুরাণকাহিনির ভাবানুবাদ করে লিখেছিলেন, তৃস্তা নামক দেবী পুরুষ তৈরি করতে করতেই মানুষ বানাবার সকল মালমসলা শেষ করে ফেলেন। ফলে নারী তৈরি করতে এসে তিনি দেখেন কোনো ঘন বা শক্ত পদার্থই অবশিষ্ট নেই। বাধ্য হয়ে তিনি প্রকৃতি থেকে ২১টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকরণ সংগ্রহ করেন, যা মিশ্রিত করে নারী-নির্মাণ করেন। সেই ২১টি উপাদান হচ্ছে — 'চন্দ্রের গোলত্ব, কুসুমের সৌকুমার্য, কিশলয়ের লঘুত্ব, হরিণের কটাক্ষ, সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য, কুয়াশার অশ্রু, সমীরণের চাঞ্চল্য, শশকের ভীরুতা, ময়ূরের বৃথা গর্ব, তালচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা, হীরকের কাঠিন্য, মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ, ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা, অনলের উত্তাপ, তুষারের শৈত্য, ঘুঘুর ললিত স্বর, নীলকণ্ঠের কিচিরমিচির।' নারী নিয়ে, বিশেষ করে নারীদেহ, নারীর রূপ নিয়ে শাস্ত্রীয় পণ্ডিত থেকে শুরু করে প্রাচীন, মধ্যযুগ, এমনকি আধুনিক যুগের পুরুষ সাহিত্যিকরা অনর্গল কাব্যময় অতিশয়োক্তি করেন। 'নারীর ত্বক-লাবণ্য-চোখ-ঠোঁট-কেশ-গ্রীবা-স্তন-যোনি-বাহু, এমনকি গোপন রোমরাজিও কবির মানসলোকে 'স্বর্গীয়' উপঢৌকন হয়ে উঠেছে।' (সাদ কামালী : *নারীপুরাতনীর সৃষ্টিপুরাণ*)। একইরকমভাবে তার সুগঠিত পয়োধর, তার কুসুম-পেলব ওষ্ঠদ্বয়, তার বঙ্কিম ও মাংসল উরু, তার উজ্জ্বল ও শুভ্র দন্তপাটি, তার গভীর রহস্যেঘেরা দীর্ঘ কুন্তল, নরম ও মসৃণ ত্বক, হরিণ-চঞ্চল নয়ন পুরুষকে, পুরুষ-কবিকে উন্মনা করে। এই সকল সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ তাকে বাসনার সামগ্রী করে তোলে প্রায় প্রতিটি পুরুষ রচিত সাহিত্যেই। নারীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, যুক্তির তীব্রতা, তার পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তার স্বার্থত্যাগ, সহমর্মিতা, সবচেয়ে বড় কথা তারও যে আয়ত্তে রয়েছে সৃজনশীলতা, শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সাধ্যের প্রায় বাইরে গিয়ে যে সে অর্জন করেছে বিদ্যাশিক্ষা, রয়েছে নিজেকে প্রকাশ করার অদম্য বাসনা, তার সৃষ্টির মাধুর্য ও ক্ষমতা, শানিত মেধা, মনন, নতুন কিছু তৈরির আকাঙ্ক্ষা, তা খুব কমই লিপিবদ্ধ হয় পুরুষ সাহিত্যে। তাই দেখা যায়, মহিষাসুরবিনাশী, অপার শক্তির আধার নারীদেবী যে দুর্গা, সেও নির্মিত হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ পুরুষ দেবতার মিলিত তেজের দ্বারা। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ধ্বংস করে দিতে উদ্যত মহিষাসুরকে বধ করার জন্যে যে সর্বশক্তিধর দেবী দুর্গাকে সৃষ্টি করা হলো, তার নির্মাণে ও তাকে রণসাজে সজ্জিত করতে, তার বিবিধ অস্ত্রায়নের মূলে ছিলেন পুরুষ দেবতারাই। তাঁরা প্রত্যেকে স্ব স্ব অস্ত্র দুর্গার হাতে তুলে দিলেন বলেই না বলীয়ান হয়েছিলেন দুর্গা। ফলে শাস্ত্রীয় বচন ও পুরুষ সাহিত্যের মোদ্দা কথা হলো, পুরুষই প্রধান। সে-ই প্রত্যক্ষ। নারী অপ্রধানই নয় কেবল, পরোক্ষও বটে। নারী অনুচর, পুরুষের অধীনস্থ সেবক কেবল। নারীর এই অবনমিত রূপ দেখেই অভ্যস্ত পুরুষবাদী সমাজ।

আমরা সকলেই অবগত যে, পুরুষের প্রধান তিনটি জৈবিক বাসনা পূরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার নিমিত্তই হচ্ছে নারী : নারী পুরুষের খেয়ালখুশিমতো তার যৌনসুখ মেটায়, বিনা বেতনে প্রতিদিন মনোহর খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করে এবং সন্দেহাতীতভাবে একমাত্র তারই বিশুদ্ধ শুক্রাণু নিজ শরীরে গ্রহণ করে নিজের জীবকোষের সঙ্গে মিলিয়ে সৃষ্টি করে ভ্রূণ, তারপর ভ্রূণ থেকে পূর্ণ একটি মনুষ্য সন্তান। পরবর্তী প্রজন্ম। সন্তান প্রসবের পর তার খাদ্যসহ লালন-পালনেও নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারপরেও পুরুষের কাছে নারী অবনমিত, অবদমিত।

সারাজীবন ধরে পুরুষের হাতে, সমাজের কাছে শৃঙ্খলিত নারী। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পদে পদে বাধানিষেধ আর বন্ধ দরজার মুখোমুখি হতে হতে বেড়ে ওঠা নারীর জীবনে কখনো কখনো নেমে আসে গভীর অন্ধকার। সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ও অমানবিক সেসব ঘটনা — প্রচণ্ড তীব্র সেই ঝড়ঝাপ্টা। একাকিত্ব, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম, বিশ্রামের ও নিভৃতির অভাবের মতো মনোজাগতিক ও সূক্ষ্ম অস্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও কোনো কোনো নারীশরীরের ওপর এসে পড়ে সরাসরি নারকীয় আক্রমণ — যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'রকমেরই হতে পারে। ঘটে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের মতো অপরাধ। পারিবারিক ও সামাজিক বাধা, শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও নারীর শারীরিক পেশিশক্তির অপেক্ষাকৃত কমজোরের প্রতি সম্যক উপলব্ধি ও সচেতনতা এবং ন্যায়ের শাসনের সুদূরপরাহত অবস্থা সমাজের দানবদের প্ররোচিত করে নারীর ওপর জুলুম চালিয়ে যেতে, আর নারীকে প্রায়শই তা উদ্বুদ্ধ করে মুখ বুঁজে সব সয়ে যাবার জন্যে। পরিশেষে, আজকের সামাজিক বাস্তবতা আক্রমণকারীকে যেমন প্রলুব্ধ করে নির্ভয়ে নারীর ওপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে, পূর্ণ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও আক্রমিত নারীটিকে তেমনি ভ্রান্ত সামাজিক মূল্যবোধ কখনো কখনো আত্মহত্যায় প্রণোদিত করে, অথবা বাকি জীবন হীনমন্যতার শিকার করে ফেলে।

তবে প্রবল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয়ে নারীর অর্জিত কিছু অধিকার, যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে ও জীবিকায় অংশগ্রহণের অধিকার, নিজের ইচ্ছায় সন্তানধারণের অধিকার, প্রযুক্তির সাফল্যে যৌনতাকে প্রজনন থেকে বিচ্ছিন্ন করার অধিকার, পরিবেশ ও প্রকৃতির সুরক্ষা ও অপচয়রোধে নিজের ইতিবাচক ভূমিকা বজায় রেখে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে অবস্থানগ্রহণ, নারীকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। নিজের জৈবিক ভূমিকা অস্বীকার না করেও বাইরের জগতের সকল ক্ষেত্রে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল বিচরণ নারীকে আজ দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছে। ব্যক্তি নারী আজ যেমন নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, শখ-আহ্লাদ, নিভৃতি-আনন্দ, জীবনের লক্ষ্যধার্য, কর্মতৎপরতা, সৃজনশীলতা ও মননের চর্চার ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে — গোষ্ঠীগতভাবেও তেমনি তাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন দেশ শাসনে, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবায়, শিক্ষায়, বৈষম্যবিরোধী ও মানবতাবাদী আন্দোলনসহ জীবনের প্রতিটি স্তরে — প্রতিটি কর্মে।

নারীজীবনের এই সকল বিভিন্ন ও জরুরি অনুষঙ্গ নিয়ে আমি অজস্র গল্প যেমন লিখেছি, এসবের ভিত্তি বা মৌলিক কারণ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং যথাসম্ভব যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেছি। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের *কালি ও কলম* সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আবুল হাসনাতের আগ্রহে তাই এমন করেই এই পাণ্ডুলিপি তৈরি করলাম, যেখানে এই সব ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নারী বিষয়ের, বিশেষত তার জৈবিক ভূমিকার ওপর, আমার গল্প ও প্রবন্ধ দু'রকম রচনাই রয়েছে। সূচিপত্রে প্রবন্ধকে গল্প থেকে আলাদা করার জন্যে প্রবন্ধের শিরোনাম বাঁকা হরফে লেখা হয়েছে। গল্পের শিরোনাম লেখা হয়েছে পাণ্ডুলিপির সাধারণ হরফেই।

এই সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে আমি আবুল হাসনাত ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

পূরবী বসু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

নারী হয়ে ওঠা : প্রতিবন্ধকতা ১৫
পুরুষ ও প্রকৃতি : নারীর দুই চিরন্তন প্রতিপক্ষ ১৫
চতুর্দশী ২৬
বারে বারে ফিরে ফিরে ৩৫

ঋতুমতী কন্যা ৪৭
রজস্বলা নারী ৪৭
নীলা ফুলবানুরা ৫১

প্রযুক্তির বলি নারী ৫৯
মানুষ বানাবার মেশিন : প্রযুক্তি ও জরায়ু নিয়ে ব্যবসা ৫৯
নারীদেহে অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক অস্ত্রোপচার ৭১
হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের খোঁজে ৭৮
সে আসে আনন্দে ৮৫

জুটি বাঁধার রহস্য ৯৬
যুগলবন্দির ইতিকথা ৯৬
তার ফেরা-না-ফেরা ১০২
স্বয়ম্বরা ১১১

নারী, যৌবন, যৌনতা ১১৪
অফুরন্ত যৌবনের সন্ধানে ১১৪
একের ভেতর পাঁচ ১২০

নারী নির্যাতন : দেহে-মনে ১২৭
সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার নারী ১২৭
একটি বেগুনি টিউলিপ ১৩৪

ধর্ষণ ১৪৬
বিচার চাই ধর্ষণের, ধর্ষিতার নয় ১৪৬
ময়না-কোকিলারা ১৫৪
অরাতির রাত্রি ১৫৯
জোছনা করেছে আড়ি ১৬৭

মাতৃত্ব ১৭২
মা হওয়া কি মুখের কথা? ১৭২
সৃষ্টির রহস্য : নারী ও পুরুষ ১৮০
ধরিত্রী ১৮৫
জনকজননী ১৯০
সবাই তাকে পাগল বলে ১৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ব-ইচ্ছায় জন্মদান ২০৬
পিল ২০৬
আরো কয়েকটি পিল ২২০
গর্ভপাত : নারীর ব্যক্তিগত ও একক সিদ্ধান্ত ২৩৩
সন্ধ্যায় ভোরের শিশির ২৩৮

যুক্তিহীন, বন্ধনহীন, ব্যতিক্রমী প্রেম ২৫৫
ভালোবাসার রসায়ন ২৫৫
মাতৃতর্পণ ২৭০
কলসী ভরে না তবু ২৭৬
অপরাধ ২৮০

নারীর মৌলিক অধিকার ২৮৩
পরিবারে নারী অধিকার : চার মৌলিক উপাদান ২৮৩
অরন্ধন ২৯৭
সালেহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ৩০২

'ভালো মেয়ে', 'মন্দ মেয়ে' ৩১২
মন্দ মেয়ের সম্ভ্রম ৩১২
বস্ত্রহরণ ৩২০

নারীর নিজস্ব ভুবন ৩২৭
নারী ও ঘর ৩২৭
নিজের জন্যে সময় ৩৩৩
নিভৃতে একাকিত্বে নারী ৩৪২
দিনরাত্রির ছায়াঘর ৩৪৮

নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুতা ৩৬৪
নারীতে-নারীতে সখ্য : প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে ৩৬৪
ভালোবাসার রং নীল, ভালোবাসার রং গোলাপি ৩৭৭

নারী ও পরিবেশ ৩৯৮
পরিবেশ, প্রকৃতি ও নারী ৩৯৮
একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত ৪০১

নারীর আত্মহত্যা ৪০৮
আত্মহনন সমস্যার সমাধান নয় ৪০৮
অবশেষে মুখোশবিহীন ৪১২
স্বপন করেছি বপন বাতাসে ৪১৬

বেলাশেষে নারী ৪২৮
রজঃনিবৃত্তি ৪২৮
শারীরিক ৪৩১
মায়ের পত্র ৪৪০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী হয়ে ওঠা : প্রতিবন্ধকতা

পুরুষ ও প্রকৃতি : নারীর দুই চিরন্তন প্রতিপক্ষ

নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বড় বাধা কেবল পুরুষ বা পুরুষতন্ত্র নয়। প্রকৃতি নিজেই নারীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে। প্রকৃতির এই অসম বিভাজন — এই চরম বৈষম্যের প্রতিফলন নারীর শরীর ও তার জীবনচক্র। চতুর পুরুষ এই দৃশ্যত শারীরিক বিভাজনকে পুঁজি করেই নানারকম নারী অবদমনের হাতিয়ার তৈরি করেছে — যেমন সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসনের নাগপাশ, পারিবারিক বিধিনিষেধ ও মূল্যবোধ, ইত্যাদি। ফলে পুরুষতন্ত্র থেকে মুক্তি আন্দোলনের সময় এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আরো একটি মহাপরাক্রমী শক্তির বিরুদ্ধেও প্রতিনিয়ত লড়তে হবে নারীকে। শুধু মানুষের তৈরি বাধানিষেধ, বৈষম্য, অনাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয়, প্রকৃতিদত্ত ও জন্মগতভাবে প্রাপ্ত নারীর শরীরের জন্যেও দ্বিগুণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধ করে যেতে হবে।

বিবর্তনবাদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রাণীর শরীরে অতি ধীরে একরকম রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তন ঘটে, যা আস্তে আস্তে তাকে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার ও বংশরক্ষা করার সামর্থ্য জোগায়। ফলে কয়েক কোটি বছর পর ধর্ষণ, প্রহার, খুন, অনাহারের মতো বৈষম্য বা অত্যাচারের প্রতিরোধে নারীর শরীর ঠিক কী রকম চেহারা নেবে আমরা জানি না। তবে আজকে নারীর দেহের যে গড়ন বা জীবনচক্র, তা দেখে মনে হয়, একমাত্র 'আদর্শ পরিবেশ' ছাড়া পুরুষ ও সমাজের কাছে নারী সমঅধিকার বা মর্যাদা আশা করতে পারে না। এখন দেখা যাক, বর্তমান পরিস্থিতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতি কেমন করে নারীর বিরুদ্ধে পুরুষকে তার স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে, যা পদে পদে নারীকে অবদমনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

পরিবারে একটি কন্যাসন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, সেই ঘটনাটি প্রাথমিকভাবে কোনো কোনো সংসারে যতই আশাভঙ্গ বা নিরানন্দ সৃষ্টি করুক না কেন, আস্তে আস্তে তা সামলে উঠে প্রায় প্রতি পরিবারই কন্যাটিকে পুত্রসন্তানের মতোই আদর-যত্ন, স্নেহে লালন করতে থাকে। ফলে জীবনের প্রথম দশকটিতে কন্যাশিশুটিকে বিশেষ তেমন বাধানিষেধ বা বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয় না। নয়-দশ বছর বয়স পর্যন্ত একটি মেয়েশিশু আর ছেলেশিশুর চলাফেরা, আচরণের মধ্যে পারিবারিক বাধা বা নিষেধে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না, যদিও কিছু প্রান্তিক ও দুস্থ পরিবারে খাদ্যবণ্টন, স্বাস্থ্যসেবা ও সংসারের কাজকর্ম বণ্টনের ব্যাপারে কিছুটা বিভাজন ও বৈষম্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু গোল বাধে মেয়েটির শরীরে যখন থেকে কন্যাসুলভ বিভিন্ন সমাহার বিকশিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ যখন থেকেই তার স্তনের আবির্ভাব ঘটে, নিতম্ব ভারী হতে শুরু করে, হাতে, পায়ে, গলায়, মুখমণ্ডলে হাল্কা, মসৃণ, পেলব মেদের স্তর জমতে থাকে নরম ত্বকের ঠিক নিচের ভাঁজে, যা তাকে দৃশ্যত মোহনীয় করে তুলতে শুরু করে, তখনই তার হাতে-পায়ে বেড়ি বেঁধে দেয় পরিবার। ফলে প্রকৃতি এখানে নারীর যৌনতাকে বহিরঙ্গে প্রতিস্থাপন করে পুরুষ ও সমাজকে সাহায্য করে নারীকে ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে। পোশাক-আশাকে, ঘোমটায় সর্বাঙ্গ ঢেকেঢুকে ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে অথবা আনত নয়নে পথ চলতে নারীকে তখন বাধ্য করে পুরুষ।

এটা সত্য, নারীকে অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে দিয়ে পুরুষ তার পিতৃত্বের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু বিবাহের অনেক আগে, সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা পুরোপুরি অর্জনের আগে থেকেই যে ঘরবন্দি করে রাখা হয় মেয়েদের তার বড় কারণ মেয়েদের যৌন অনুষঙ্গের বহিরঙ্গে উপস্থিতি। স্তন ও নিতম্ব যদি বহিরঙ্গে স্থান না পেত, কার্যত এমন দৃশ্যমান ও লোভনীয় না হয়ে উঠত, নারীকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ করে রাখার জন্যে, পোশাক-আশাকে তাকে ঢেকেঢুকে রাখার ব্যাপারে আরো জোরালো যুক্তি খুঁজতে আরো হন্যে হয়ে বেড়াতে হতো পুরুষকে। শিশ্ন ও যোনির মতো স্তন ও নিতম্বও শরীরের এমন স্থানে অনায়াসে জায়গা পেতে পারত, যা সরাসরি দৃষ্টিগোচর নয়।

স্তন ও নিতম্বের পর নারী শরীরে এসে যোগ দেয় আরো একটি অবদমনের হাতিয়ার। মাসিক। নারীকে স্বতন্ত্র করে রাখা বা দেখা এবং তার চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপের ব্যাপারে এর চেয়ে বড় ভূমিকা আর কোনো কিছু নিয়েছে কি না সন্দেহ। মাসিকের সময় বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা ও নিষেধাজ্ঞা মেয়েদের অধস্তন অবস্থা নির্ধারণে ও তাদের নিজেদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মোট কথা, যে মুহূর্তে নারী প্রজননক্ষমতার অধিকারী হতে শুরু করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বাহ্যিক এই সব পরিবর্তন এমন করে বিকশিত হতে থাকে যে, পুরুষ তাকে অন্তঃপুরে রেখে শুধু যৌনানন্দ ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে।

প্রাণীর কাছে প্রকৃতির একটিই প্রত্যাশা — প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। সেই প্রত্যাশা পূরণ যত সহজে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটবে ততই মঙ্গল — প্রকৃতির জন্যে। নারীর সম্ভ্রম বা আত্মপ্রত্যয় নয়, পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবেই বরাবর নারীকে দেখে এসেছে প্রকৃতি।

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপারে নারীর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে এক অসম বোঝা। নারীর দৈহিক গঠন, বিশেষ করে তার প্রজনন কাঠামো ও কার্যকলাপ নারী অবদমনের মূল হাতিয়ার। প্রকৃতি যদি নারীর প্রতি সদয় হতো, সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে নারীকে পুরুষের সমান করে দেখত, তাহলে নারীর যৌনতাকে, তার শরীরের বিকাশকে এমনভাবে উপস্থাপন করত না। মাসিক ও তার ব্যবস্থাপনার ঝক্কি-ঝামেলা ও ভয়, উন্নয়নশীল দেশে মেয়েদের স্কুল কামাই ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার একটি প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে বেশকিছু বড়-বড় গবেষণায়।

শরীরে হরমোনের যে ওঠানামার জন্যে প্রতিমাসে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুর নির্গমন ঘটে এবং পরবর্তীকালে মাসিকের আবির্ভাব হয়, জৈবিক কারণে সেই চক্র বজায় রেখেও প্রকৃতি এই বাহ্যিক রক্তপাতের ব্যাপারটায় নারীকে ছাড় দিতে পারত। প্রতিমাসে তার জরায়ুর পর্দা ছিঁড়ে বহিরঙ্গে রক্তক্ষরণের কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? অন্যান্য সমস্ত প্রাণিকুলে এই প্রক্রিয়া তাহলে জরুরি নয় কেন? আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব, প্রাকৃতিকভাবে অথবা প্রযুক্তির মাধ্যমে সংখ্যায় কমবেশি মাসিক হওয়া অথবা পুরোপুরি মাসিকের নিবৃত্তির সঙ্গে নারীস্বাস্থ্যের যোগাযোগ কতখানি, আদৌ কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, থাকলে এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ-ব্যাপারে কী এবং কতটুকু জানা গেছে।

প্রকৃতি আরো যেভাবে নারী অবদমনের সুযোগ করে দেয় পুরুষকে তা হলো নারীর যৌন অঙ্গের গঠন ও কার্যপ্রণালি। নারীর প্রধান যৌনাঙ্গ যদি এমন না হতো, যে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছুই যায় আসে না, তার প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুরুষ তার জৈবিক বাসনা ও যৌনলিপ্সা চাপিয়ে দিতে পারে নারীর ওপর, তাহলে ধর্ষণ নামক জগৎজুড়ে প্রচণ্ড কুৎসিত অপরাধটি — নারীজীবনের এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতাটি ঘটার সুযোগ হতো না। প্রকৃতি এমনভাবেই নারীর যৌনাঙ্গ তৈরি করেছে, যাতে পুরুষের ইচ্ছার কাছে নারীকে সহজেই সমর্পিত হতে হয়, এতে করে মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকার বা আত্মসম্মান যতটাই লুণ্ঠিত হোক না কেন, প্রকৃতির নিয়মে — সৃষ্টির ধারাবাহিকতা, ঠিকই রক্ষা পায় — পরিতৃপ্তি পায় পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা ও যৌন অনাচার। অথচ উলটোটি অর্থাৎ নারীকে দিয়ে পুরুষের ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাৎকারের ঘটনা প্রায় কোথাও শোনা যায় না, যার অন্যতম কারণ পুরুষের যৌনাঙ্গের প্রকৃতি ও কার্যাবলি। পুরুষের নিজের ইচ্ছা ছাড়া নারী তাকে যৌনক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না। এখানেও প্রকৃতি পুরুষকে অধিকতর আধিপত্য দিয়েছে, সন্দেহ নেই। এ ছাড়া প্রকৃতি পুরুষকে দিয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি গায়ের জোর, শক্তিশালী মাংসপেশি, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণে পুরুষ এই প্রকৃতিদত্ত উপহারের অপব্যবহার করে।

এছাড়া প্রধানত যেভাবে প্রকৃতি নারী অবদমনের সুযোগ করে দেয়, তা হলো সন্তান ধারণ, প্রসব, সন্তান প্রতিপালন ও দুগ্ধদানের মতো জৈবিক ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে। সন্তান উৎপাদন, প্রতিপালন ও দুগ্ধদানের জন্যে পেশাজীবী নারীকে তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি সংকুচিত করতে হয়, অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পেশা বেছে নিতে হয়, কাজে উন্নতির ব্যাপারে স্বার্থত্যাগ করতে হয়, কখনো-কখনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও জীবিকাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করে ঘরবন্দি হতে হয়। শরীরে ভ্রূণের আকারে জন্ম নেওয়া সন্তান যখন নিজের রক্তে, মাংসে, পুষ্টিতে শরীরের ভেতর দীর্ঘ ন'মাস ধরে তিলতিল করে বেড়ে ওঠে, তারপর প্রবল প্রসব-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে স্বপ্নের মতো আবির্ভূত হয় একদিন, যার মুখে তুলে দেওয়ার মতো আদর্শ খাদ্যও যখন নিজের শরীর থেকেই নিঃসৃত হয় নারীর, তখন সেই সন্তানের সঙ্গে তার যে স্থায়ী বন্ধন রচিত হয়, তা আর কোনো জাগতিক সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। একটি নারী যখন সন্তানসম্ভবা হয়, অথবা সন্তান প্রসব করে কিংবা দুগ্ধদান করে, তার শরীরে হরমোনের প্রচণ্ড ওঠানামা ঘটে। এস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন হরমোন, যা নারীর যৌন অনুষঙ্গ ও আকাঙ্ক্ষা বিকশিত করে, নারীর যৌনতাকে পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলে, যে দুটি হরমোন প্রধানত নারীত্বের হরমোন বলে সুপরিচিত, সেগুলো ছাড়াও গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর শরীরে অন্য হরমোনগুলো যেমন অক্সিটসিন, ভ্যাসোপ্রেসিন, প্রোল্যাকটিনের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। এই শেষোক্ত হরমোনগুলো প্রসবে সহযোগিতা করে, স্নেহে আর্দ্র করে, দুগ্ধবতী করে নারীকে। ফলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সন্তান যদিও পিতামাতার যৌথ সৃষ্টি এবং সন্তানের জন্মে মাতা-পিতা উভয়েই বাৎসল্যবোধে প্লাবিত হয়, নারী যেমন নিজ শরীরে সন্তানকে ধারণ করে এবং নানা ধরনের জৈবিক ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে সন্তানকে নিজের দেহে আশ্রয় দিয়ে বড় করে তোলে, দুগ্ধদান করে, তাতে সন্তানের সঙ্গে মায়ের যে অটুট ও জৈবিক সম্পর্ক রচিত হয়, পিতার সঙ্গে ঠিক তেমনটি ঘটে না। গর্ভবতী স্ত্রী ও শিশুসন্তানের সান্নিধ্যে পিতার শরীরেও স্নেহশীলতার হরমোন কিছুটা প্লাবিত হয়, কিন্তু নারীশরীরে কিছু-কিছু হরমোনের প্রচণ্ড প্রস্রবণ ও প্রবল তোলপাড়ের তুলনায় তা সামান্যই। ফলে পিতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে — মূলত পারস্পরিক সান্নিধ্যে — পারিবারিক ও সামাজিক অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেমন করে গড়ে ওঠে, সেভাবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর বিরুদ্ধে প্রকৃতির আরেক অবদমনের নজির নারীজীবনে রজঃনিবৃত্তি। নারীকে যে প্রকৃতি পুরুষ আর সমাজের মতোই শুধু পরবর্তী প্রজন্মের স্রষ্টা হিসেবেই দেখে এসেছে, এর বেশি কিছু নয়, তার বড় প্রমাণ যখন একটি নারীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পায়, তখন রজঃনিবৃত্তির মাধ্যমে নারী হরমোনগুলোর এতটাই ঘাটতি শুরু হয় নারী শরীরে যে, তার যৌনকাঙ্ক্ষা লোপ পায় অথবা প্রচণ্ডভাবে স্তিমিত হয়ে আসে। তার শারীরিক বিভিন্ন অস্বাচ্ছন্দ্য, উপসর্গ তীব্রভাবে দেখা দেয় — যেমন হঠাৎ শরীরে প্রচণ্ড গরমের দমক লাগা, যৌনাঙ্গ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ঝিমঝিম করা, সমস্ত অস্থিগ্রন্থিতে ব্যথা, হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, স্তনের ও জরায়ুর ক্যান্সারের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাওয়া। এসবই প্রমাণ করে, প্রকৃতির কাছে নারীজীবনের প্রয়োজনীয়তা তখন প্রায় শেষ। কেননা সন্তান জন্ম ও প্রতিপালনের মৌলিক দায়িত্ব সমাপ্ত করে ফেলেছে নারী। এখন সে ইহলোক পরিত্যাগ করলে জীব বা জগতের কিছু আসে যায় না।

প্রকৃতির এই খামখেয়ালি, ইচ্ছা বা অবহেলা পুরুষ তার বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত করে। বার্ধক্যের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের শরীরে যৌন হরমোনের নিম্নগতি লক্ষ করা যায়, যৌনাকাঙ্ক্ষাও আগের মতো তীব্র থাকে না। কিন্তু এর মাত্রা এবং বহিঃপ্রকাশ তেমন প্রচণ্ড নয়, যেমনটি দেখা যায় নারীর বেলায়। যার জন্যে আশি বা নব্বই বছর বয়সেও পুরুষ সন্তানের জন্ম দিতে সমর্থ, নারী নয়। পুরুষের শরীরেও বৃদ্ধ বয়সে প্রস্টেটের ক্যান্সারের হার বেড়ে যায়, কিন্তু প্রথমত এই ক্যান্সার বৃদ্ধি পায় অতি ধীরে, ছড়ায় কম, এর চিকিৎসাও অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এটি নিরাময়যোগ্য। পুরুষের স্তিমিত যৌনক্ষমতাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে বাজারে কত রকম ওষুধ, টনিক ও পুষ্টি-সম্পূরকের ব্যবস্থা! আরো কত গবেষণা চলছে নতুন-নতুন ও উন্নতমানের পুরুষের যৌন-উত্তেজক ওষুধ আবিষ্কারের। নারীর জন্যে এ ধরনের প্রায় কিছুই নেই। জাপানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি আবিষ্কারের পর পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও তা বাজারজাত করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। অথচ ভায়াগ্রার মতো ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জাপানের বাজার ছেয়ে গেছে, ভায়াগ্রাকে বাজারজাত করার ছাড়পত্র পেতেও একটু দেরি হয়নি জাপানে। জগৎজুড়ে এই নিয়ে প্রবল বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে অবশ্য শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পুরুষের যৌন-উত্তেজক বড়ির ছাড়পত্র দেওয়ার পর জাপানে অবশেষে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির বাজারজাত করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতিদত্ত জৈবিক বৈষম্যকে পুঁজি করে পুরুষ ও সমাজ বরাবর নারীকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, জীবনের প্রথম দশকে নারী ও পুরুষশিশুর মধ্যে তেমন পার্থক্য বা বিভেদ লক্ষ করা যায় না। কিন্তু প্রথম দশকের পর থেকেই নারী-পুরুষ সম্পর্কে সবসময়েই একটা অসমতা বিরাজ করে, যা জীবনের শেষপ্রান্তে না আসা পর্যন্ত কোনো সমঝোতায় পৌঁছোয় না, বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে স্ত্রীর চাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীর বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছুটা বেশি হয়। জীবনের দ্বিতীয় দশকে মেয়েরা যখন কিশোরী বা কৈশোরোত্তীর্ণ, তাদের মনে পুরুষ সম্পর্কে আগ্রহ জাগে। মনের ভেতর নানা ধরনের রোমান্টিক চিন্তা ও প্রত্যাশা জন্মায়। প্রেম ও প্রেমিক সম্পর্কে রোমান্টিক সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পুরুষের কাছাকাছি আসা, এক-আধটু আলতো ছোঁয়া, পাশাপাশি বসে কথা বলা ইত্যাদি ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ে মেয়েদের; কিন্তু তখন এই বয়সের পুরুষসঙ্গী প্রচণ্ড যৌন তাড়নায় ভোগে। রোমান্টিক চিন্তা-টিন্তা নয়, সরাসরি যৌনকেলিতে অংশগ্রহণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে পুরুষ। ফলে প্রেমে হাবুডুবু খেতে-থাকা প্রেমিকা বা সদ্য বিবাহিত স্ত্রী হতাশ হয় স্বামীর আগ্রাসী আচরণে — তার একরৈখিক জৈবিক চাহিদায়। কেননা, নারীর যৌন-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা তখনো ততটা প্রকট হয়নি, যেমন হয়েছে তার রোমান্সের ধারণার, আদর ও নরম সোহাগের আকাঙ্ক্ষার। এসব আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণের পরিণতিতেই কেবল যৌনসংসর্গ উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মেয়েদের জীবনে। এছাড়া নয়। এর পরের দুই দশকে, অর্থাৎ ত্রিশ ও চল্লিশের কোঠায়, নারীর যৌনতা আস্তে-আস্তে জেগে ওঠে। পুরুষসঙ্গীর জন্যে আকুল হয় মন। কামভাবে কাতর নারী স্বামী বা প্রেমিকের শারীরিক সান্নিধ্য কামনা করে প্রবলভাবে। কিন্তু ততদিনে পুরুষ তার সঙ্গিনীর শরীর সম্পর্কে এতটাই অবগত ও পরিচিত হয়ে পড়েছে যে, তার দেহ-সম্পর্কে আগের সেই আগ্রহ আর থাকে না।

পুরুষ বরাবরই জয় করতে ভালোবাসে। নারীকে বশে এনে তাকে উপভোগ করার পর বিজয়ীর আনন্দ যতটা না সে উপভোগ করে, তার চেয়ে বেশি বোধ করে সে পুরাতনের প্রতি ক্লান্তি ও একঘেয়েমি। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের পুরুষ তার পেশা, কর্মক্ষেত্র, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব, ব্যবসা গোছানো বলতে গেলে তার পেশায় প্রতিষ্ঠা বা সাফল্য লাভেই বেশি মনোযোগী, বেশি উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ঘরের চাইতে বাইরেই সময় কাটে বেশি তার। এই সময় শিশুসন্তান ও বাড়ন্ত সংসারে বন্দি নারী নানাভাবে মুক্তি খোঁজে। কেউ তার যাপিত জীবনের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি দূর করতে ফুলের বাগান করে, কাঁথা সেলাই করে, ছেড়ে দেওয়া গানের অনুশীলন শুরু করে, কবিতা পাঠ করে, সাহিত্য রচনার চেষ্টা চালায় অথবা নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে সমমনা মানুষ খোঁজে। সেই মানুষটি আরেকটি নারী হলে সমস্যা তেমন হয় না। পুরুষ হলে, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, না গড়ে উঠলেও অপবাদের ঝড় ওঠে।

এর পরের দশকে সন্তানরা আরো যখন বড় হয়, মায়েরা সন্তানের পড়াশোনা, চাকরি-বাকরি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে এতটাই ব্যস্ত থাকে যে, সন্তান ও স্বামী ছাড়া বাকি যেটুকু সময় থাকে তার সবটাই প্রায় কাটে দৈনন্দিন রান্নাবান্না, আতিথেয়তা ও লৌকিকতায়, সঙ্গে জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব থাকলে তো কথাই নেই। এই সময় রজঃনিবৃত্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় নারী-শরীরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনতার আগ্রহ হারাতে বসে নারী। আর সেই সময় পেশায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিতৃপ্ত অথবা পেশা কিংবা ব্যবসায় ব্যর্থ এবং হতাশ পুরুষ বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে আরো বেশি। স্বামী, সন্তান ও সংসারে সমর্পিত প্রাণ, নিবেদিত জীবনের অধিকারী স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ আরো কমে যায় তার। অনাসক্ত হয়ে পড়ে পুরুষ অনুত্তেজক একঘেয়েমিতে ভরা অতি পরিচিত স্ত্রীর প্রতি।

অনেক পুরুষই এ-সময় অন্য নারী, বিশেষ করে অল্প বয়সী নারীদের প্রতি দারুণ আগ্রহ, আসক্তি ও আকর্ষণ বোধ করে। নিজের পড়াশোনা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও রুচি দিয়ে কোমলমতি অল্প বয়সী তরুণীদের মুগ্ধ করার প্রতি, তাদের মনে দাগ কাটার প্রতি তীব্র আকর্ষণ জন্মে তখন পুরুষের। সবসময় যৌন-সম্পর্ক পর্যন্ত তা না গড়ালেও যৌন অনুষঙ্গ ও যৌন ফ্যান্টাসি থেকেই যায়। আর থাকে জয়ের বাসনা। এছাড়া তাস বা দাবা খেলা, ক্লাবে যাওয়া, রাজনীতি বা খেলা নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা কিংবা স্রেফ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত করে ঘরে ফেরা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, ঘরের চাইতে বাইরে সময় কাটাতেই বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ে পুরুষ এ-সময়। সংসার ও স্ত্রীর প্রতি তার এই উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে সে বলবে, সারাজীবন এ সংসারের ঘানি টেনেছে সে। এখন এ বয়সে একটু নিজের দিকে তাকানো দরকার, একটু আনন্দ-ফুর্তি করা দরকার। জীবন তো একটাই।

কিন্তু নিজের দিকে তাকানো বা আনন্দ-ফুর্তি করার অধিকার কি কেবল পুরুষেরই রয়েছে? ঘরের নারীটির কথা কে ভাবে? তার কি সেই অধিকার কোনোদিনই থাকবে না?

সে যাই হোক, বাইরের দিকে ঝুঁকেপড়া স্বামী আর সংসারে আরো বেশি নিবেদিত স্ত্রী আস্তে আস্তে দুই পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে পড়ে। পুত্র-কন্যা উচ্চশিক্ষার্থে, কর্মোপলক্ষে অথবা বিবাহোত্তরকালে ঘর ছেড়ে চলে গেলে সংসারে বিরাট যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাকে মাঝেমধ্যে ভেঙে দেয় কেবল পরস্পরের প্রতি তিক্ত অভিযোগ, অনুযোগ, তর্ক ও ঝগড়া। এসবের অধিকাংশই তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা বা কর্মের সঙ্গে সবসময় সম্পর্কিত হয় না। হয়তো সারাজীবনের আহরিত অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চারিত যে ক্ষোভ, কোনো ছোটখাটো বা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হঠাৎ তা বিস্ফোরিত হয়ে পড়ে মাত্র। যৌন-আকর্ষণ ও যৌন-আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে আসায় এ ধরনের মনোমালিন্য ঘোচাবার মহৌষধ হিসেবে আগের মতো যৌনসংযোগের ব্যবহারও প্রায় অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। ততদিনে তাদের জীবন হয়ে পড়ে অনেকটা ভাইবোনের মতো, প্রায়শই অযৌন।

পাশ্চাত্যে একটা মজার বিষয় লক্ষ করা যায়। প্রথম বয়সে পুরুষ-নারী যখন উভয়েই তরুণ ও স্বাস্থ্যবান, তখন স্বামী-স্ত্রীর যৌথ বিছানা হয় ডাবল অথবা কুইন সাইজের। কিন্তু বয়স যত বাড়ে, যত বৃদ্ধ হয় দম্পতি, ততই দেখা যায় তাদের যৌথ বিছানার পরিধির বিস্তার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশিরভাগ বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীই ঘুমোয় কিং সাইজের বিশাল বিছানায়, যা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান, অথবা দুটি ভিন্ন টুইন সাইজ বিছানায়। এ শুধু একজনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে আরেকজন, এই সহানুভূতি বা আশঙ্কা থেকেই নয়। অথবা শারীরিকভাবে অশক্ত এবং অপেক্ষাকৃত কম সতর্ক বয়স্ক দম্পতির খাট থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বা ভয় থেকেও নির্ধারিত নয়। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে অনেক স্বামী-স্ত্রীই পরস্পরের কাছ থেকে শারীরিকভাবে যতটা সম্ভব দূরে থাকতেই পছন্দ করে। এ অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন ও উন্নতি লক্ষ করা যায় — যখন তাদের সন্তানদের ঘরে ছেলেপুলে আসতে শুরু করে, যখন নাতি-নাতনি বড় হতে থাকে। আরেকটি নতুন প্রজন্মের আগমনে অর্থাৎ নাতি-নাতনিকে পেয়ে তাদের আদর করতে গিয়ে — নিজেদের চোখের সামনে চলতে ফিরতে লাফাতে দেখে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আবার নতুন করে নিজেদের আবিষ্কার করতে শুরু করে। নাতি-নাতনির মাধ্যমে নিজেদের সন্তানদের শিশুকালের কথা স্মরণ করে তারা। এই স্মৃতি রোমন্থন ও তুলনা তাদের পুলকিত করে, উত্তেজিত করে। তাছাড়া শিশুসন্তানের সঙ্গে শিশু নাতি-নাতনির বড় পার্থক্য এখানে যে, নাতি-নাতনিকে ইচ্ছামতো আদর করা যায়, চটকানো যায়, যা খুশি করতে দেওয়া যায়, প্রচণ্ড প্রশ্রয় দেওয়া যায়, নিজের সন্তানের মতো তার প্রতি তেমন দায়দায়িত্ব থাকে না, তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্যে কঠোরও হতে হয় না। ফলে চোখের সামনে নিষ্পাপ শিশুর বেড়ে-ওঠা পর্যবেক্ষণ করে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, অথচ কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য ঘাড়ে নিতে হয় না। আর তাই জীবনের প্রথম দশকের পর পুরুষ ও নারী আবার একটা সাধারণ খেলার মাঠের সন্ধান পায় একেবারে শেষ বয়সে এসে। জীবনের শেষ দশকে বা শেষ দুই দশকে — তৃতীয় প্রজন্মকে নিয়ে।

ফলে সব মিলিয়ে দেখাই যাচ্ছে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই নারীকে বরাবর তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এসেছে — পুরুষ তার যৌনলিপ্সায় ও তার বংশরক্ষার খাতিরে এবং প্রকৃতি তার সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে। কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি কেউই নারী আসলে কী চায় — নারীর প্রকৃত কল্যাণ কোনভাবে আসতে পারে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। এই অবস্থায় নারীকেই তুলে নিতে হবে দায়িত্ব এই দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের অধিকার, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের।

নারী জানে, সন্তান এবং নাতি-নাতনি শুধু প্রজন্ম রক্ষার খাতিরেই নয়, নির্মল আনন্দ পাওয়ার জন্যে, নিজের জীবনের পরিধি বিস্তৃত করার জন্যেও দরকার। কিন্তু প্রজন্ম সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে বা তার বদলেও (যদি কোনো নারী সন্তানহীন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়) দরকার মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কীভাবে তা করবে নারী? প্রধানত, তিন উপায়ে : শিক্ষা, জীবিকা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে। পুরুষ ও প্রকৃতির কাছে অসহায়ভাবে সমর্পিত হওয়ার বদলে জ্ঞান, অর্থোপার্জন ও প্রযুক্তি নারীর সামনে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে একাধিক পথের সন্ধান। কিছু কিছু ব্যাপারে নিজের ইচ্ছামতো পছন্দ করার, বেছে নেওয়ার, বিকল্প খোঁজার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পায় নারী, যা আগে পেত না সে। শিক্ষা নারীকে শুধু কর্মক্ষম ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতেই সাহায্য করে না, শিক্ষার আলোতে অনেক কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের অসারতা সম্পর্কেও সচেতন হয় নারী। সেইসঙ্গে পরিচিত হয় সভ্যতা ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে। নারী-অবদমনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, তথ্য এবং প্রযুক্তির সঙ্গে নারীকে সম্পৃক্ত হতে না দেওয়া — সভ্যতা ও জ্ঞানের আলো থেকে তাকে আড়াল করে রাখা। শিক্ষা এবং জীবিকার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ও নীতিগতভাবে নারী যদি স্বাবলম্বী হয়, পুরুষ ও প্রকৃতির অবমূল্যায়নের ও বৈষম্যের ধাক্কা অনেকটাই সামলে উঠতে পারবে সে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর প্রযুক্তির ব্যবহারে নারী তার দৈহিক অনেক সীমাবদ্ধতাই কাটিয়ে উঠতেও সমর্থ হবে। আগেই বলেছি, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি নারীর অসহায়ত্ব ঘুচিয়ে তার সামনে পছন্দ করে নিজের মনমতো বেছে নেওয়ার মতো কিছু জরুরি উপকরণ ও পথের সন্ধান দেয়। যেমন দিয়েছে পিল।

বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি, উন্নয়নশীল দেশের মেয়েদের জীবনে গড়ে যতবার মাসিক মোকাবিলা করতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মাসিক মোকাবিলা করতে হয় উন্নত দেশের মেয়েদের। এর প্রধান কারণ, প্রথমোক্ত মেয়েরা ঘন ঘন গর্ভবতী হয় এবং দীর্ঘদিন স্তন্যদান করে। এমনও দেখা যায় যে, দুই সন্তান জন্মের মাঝখানে কোনো কোনো তৃতীয় বিশ্বের নারী একবারও মাসিকের মুখ দেখে না। এছাড়া পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্যেও মাসিকের আবির্ভাব থেকে তিরোধানের সময়টা কম তৃতীয় বিশ্বে। কিন্তু মাসিক কম বা বেশি সংখ্যায় হওয়ার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সরাসরি কোনো যোগাযোগ আজো আবিষ্কৃত হয়নি। পিলের আবিষ্কার নারীকে যৌনকর্মে অংশগ্রহণ করেও অনিবার্যভাবে সন্তানবতী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইদানীং এমন পিলও বাজারে এসেছে যার ব্যবহারে শুধু গর্ভধারণ রোধ হবে না, তিন বা চার মাস অন্তর-অন্তর একবার মাত্র মাসিক দেখা দেবে। সম্প্রতি বাজারে এসেছে এমন একটানা পিলও, যা স্থায়ীভাবে মাসিক বন্ধ করে দেবে। কথাটা শুনে অনেকেই চমকে উঠবেন এই বলে যে, এটা অস্বাভাবিক এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ এবং স্বভাবতই হয়তো স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। এই বড়ি গ্রহণ স্বাস্থ্যসম্মত কি না, দীর্ঘ ব্যবহারে কোনো বড় রকম ঝুঁকি রয়েছে কি না জানতে আরো সময় লাগবে। তবে বর্তমান গবেষণার ফল অনুযায়ী এটি নিরাপদ।

একটা কথা অনেকেরই জানা নেই, আর সেটি হলো, গতানুগতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়ার পর মাস শেষে নির্ধারিত দিনে যে মাসিক হয়, তার সঙ্গে প্রাকৃতিক মাসিকের কোনো তুলনাই হয় না। মেয়েদের স্বাভাবিক জৈবচক্রে মাসে একবার ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বাণুর নির্গমন ঘটে এবং জরায়ু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুত হয় ভ্রূণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে; কিন্তু সেই মাসে শুক্রাণুর সঙ্গে মিলে ভ্রূণের সৃষ্টি যদি না হয়, মাস শেষে জরায়ুর পর্দা ছিঁড়ে রক্তপাত হয়, যাকে আমরা মাসিক বলি। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুর নিষ্কাশনই ঘটে না (অর্থাৎ ওভুলেশনই হয় না)। ফলে ভ্রূণের সৃষ্টি বা তার প্রত্যাশায় জরায়ুর বিশেষ প্রস্তুতির প্রশ্ন আসে না। মাস শেষে যে মাসিকের মতো রক্তপাত হয়, সেটা কেবল এজন্যেই ঘটে যে, মাস শেষে কয়েকদিন হরমোন পিল খাওয়া হয় না। যারা পিল খায় না মাসজুড়ে স্বাভাবিকভাবে তাদের হরমোনের যে ওঠানামা চলে শরীরে, পিলের প্রভাবে তা ঘটে না। প্রতিদিনই একই রকম একই সমান হরমোন শরীরে থাকে পিল গ্রহণকারীদের। আর তাই হঠাৎ করে মাস শেষে কয়েকদিন ওই হরমোন তুলে নেওয়ার ফলে জরায়ু ছিঁড়ে রক্তপাত হয় — যা প্রাকৃতিক মাসিকের মতো দেখায়; কিন্তু আসলে তা নয়।

সর্বশেষ জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, যা মাসিককে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয় (যতদিন এই বড়ি ব্যবহার করা হয়), তৈরি করা হয়েছে বিশেষত সেসব নারীর কথা চিন্তা করে, যাঁরা মাসিকের সময় বিশেষ শারীরিক যন্ত্রণার শিকার হন, অথবা যাঁরা কর্মোপলক্ষে অথবা জীবনের অন্য কোনো প্রয়োজনে মাসিকের বিড়ম্বনা এড়াতে চান। প্রতিমাসে একবার মাসিক যে নারীস্বাস্থ্যের জন্যে জরুরি নাও হতে পারে তার সপক্ষে দেওয়া যায় বেশ কয়েকটি অবস্থার উদ্ধৃতি : (১) অন্তঃসত্ত্বাকাল, (২) জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ির ব্যবহার, (৩) জরায়ু বা ডিম্বকোশের অস্ত্রোপচার ও অপসারণ, (৪) দুগ্ধদানকাল। শুধু মাসিক ব্যবস্থাপনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণই নয়, শিক্ষা ও প্রযুক্তি আরো অনেকভাবেই নারীর স্বাবলম্বিতা ও ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সন্তানবতী হতে অপারগ নারীরাও প্রযুক্তির মাধ্যমে আজকাল সন্তানবতী হচ্ছে — এমনকি রজঃনিবৃত্তির বহু পরেও তাদের গর্ভবতী হওয়ার প্রযুক্তি এখন আয়ত্তের ভেতর। পাম্পের মাধ্যমে দুগ্ধ নিষ্কাশন ও রেফ্রিজারেটরে তা জমা রেখে পরবর্তীকালে শিশুকে পান করাবার ব্যবস্থাও দুগ্ধবতী নারীকে কর্মক্ষেত্র থেকে দীর্ঘদিনের বিরতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। রজঃনিবৃত্তির নানা উপসর্গের জন্যে হরমোন প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা ও গবেষণা ক্রমাগত উন্নততর ফলাফল দিচ্ছে। শরীরচর্চা, যোগ ব্যায়াম ও ক্যারাতের মাধ্যমে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার ব্যাপারেও অনেক নারী আজ সচেতন হয়েছে।

সবশেষে ধর্ষণের মতো অপরাধ এবং এ ব্যাপারে দৈহিক গঠনের কারণে নারীর অসহায়ত্ব নিয়ে কিছু না বললে নয়। ধর্ষণ এমন একটি অপরাধ, যা দুর্ভাগ্যক্রমে ধনী-দরিদ্র সব সমাজেই রয়েছে — সর্বকালেই রয়েছে। পুরুষের এই বলাৎকার বন্ধ করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে দেশের আইন ও প্রশাসন। ডিএনএর বিশ্লেষণ অপরাধীকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতেও সাহায্য করে উন্নত দেশগুলোতে। কিন্তু ধর্ষণের জন্যে যথোপযুক্ত বিচার ও শাস্তির ব্যাপারে যেমন আমরা সোচ্চার হব, তেমনি ধর্ষণ-সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধ পালটানোর ব্যাপারেও আমাদের সচেতন হতে হবে। দেশে আজ ধর্ষণের জন্যে প্রায়ই এখানে-ওখানে অল্পবয়সী মেয়েদের আত্মহত্যার সংবাদ শোনা যায় গণমাধ্যমগুলোতে। এটা নিদারুণ দুঃখজনক ও লজ্জাকর ব্যাপার। ধর্ষণকে শারীরিক অন্য যে-কোনো প্রচণ্ড প্রহার বা নির্যাতনের সমকক্ষ ভাবার মানসিকতা গঠন করার চেষ্টা করলে, এ ধরনের আত্মহত্যা হয়তো ঠেকানো যেত। ধর্ষণ যে করেছে সে-ই শুধু অপরাধী, যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নিষ্পাপ। এ বিশ্বাসে, কর্মে, ব্যবহারে প্রমাণ করতে হবে ধর্ষিতা ইজ্জত হারায়নি, হারিয়েছে সমাজ — যদি ধর্ষককে শনাক্ত করে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা না করতে পারে। যে দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে দুই থেকে তিন লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছে, সে দেশে ধর্ষণ সম্পর্কে আমাদের এত বাড়াবাড়ি রকম স্পর্শকাতরতা বজায় রাখা ঠিক নয়, যা আমাদের অবুঝ নিষ্পাপ মেয়েগুলোকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছে। প্রকৃতিদত্ত শারীরিক গঠন আমরা পরিবর্তন করতে না পারি, আমাদের মানসিকতা ও মূল্যবোধ অবশ্যই পারি পালটাতে। আর পারি চেষ্টা করতে ন্যায়ের শাসন-প্রতিষ্ঠার, যে শাসন ধর্ষণের মতো অপরাধে লিপ্ত অপরাধীর গুরুতর শাস্তি দেবে, কিন্তু ধর্ষণের শিকারকে গ্রহণ করবে সম্পূর্ণ নিঃশর্তভাবে — সর্বোচ্চ সহমর্মিতার সঙ্গে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্দশী

রূপার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। এই পৃথিবীতে কেউ তাকে ভালোবাসে না। পুকুরের বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে বসে পানিতে শুকনো পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুড়ে মারছে সে। হালকা হাওয়ায় তিরতির করে বয়ে যাওয়া পানির ওপর ছেঁড়া পাতাগুলো হেলেদুলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

'কেউ না। কেউ না। কেউ আমায় ভালোবাসে না।'

এটা কোনো রাগের কথা নয়, আবেগেরও না। রূপা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। অনেক ভেবেছেও এ নিয়ে।

কোথা থেকে কী যেন হয়ে গেল। মা সারাক্ষণ বকাবকি করে। আব্বু কেমন কঠিন দৃষ্টিতে তাকায়। বড়বু, ছোটবুকে মনে হয় আজকাল কত দূরের মানুষ। আর ভাইয়াকে তো পাওয়াই যায় না। কোথায় কোথায় ঘোরে সর্বক্ষণ। ঘরেই থাকে না। সবাই যেন কেমন বদলে গেছে। মা ও বোনদের সজাগ দৃষ্টি তার ওপর। রূপা কোথায় গেল, কার সঙ্গে কথা বলল, কোথায় ভুল করল, কখন কার সঙ্গে তর্ক করল, কাকে অমান্য করল। যত্তোসব।

এমন কেন হচ্ছে শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না রূপা। এ সবকিছুর মধ্যে, সবার চেয়ে, তাদের ভাড়াটে তপতী বৌদিকেই যা একটু সদয় মনে হয়। মাঝে মাঝে ডেকে সে-ই কথা বলে, কথা শোনে রূপার। চুল বেঁধে দেয়, সিনেমার গল্প করে। পরশু দিন একেবারে না পেরে বাধ্য হয়ে তাকে কথাটা বলতেই বৌদি হেসে খুন।

'ও তাও বুঝি তুই জানিস না কেন এমন হচ্ছে। তুই যে মাসিমার সৎ মেয়ে — দেখিস না তোর গায়ের রং, তোর বোনদের চেয়ে কত ফর্সা!' বলতে বলতে উচ্ছল হাসিতে মুখে আঁচল-চাপা দিয়েছিল বৌদি। অতীনদা আবার ভীষণ রাগ করে, বৌদি যখন অমন শব্দ করে হাসে। তাই আঁচল দিয়ে শব্দের দাপট কমানোর চেষ্টা করেছিল।

তারপর রূপার থুতনিটা ধরে আদর করে বৌদি বলেছিল, 'কিছু ভাবিস না, তিন-চার বছরের মধ্যে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে দেখবি। তখন কেউ তোকে আর ঘাঁটাবে না। তোরও সবাইকে আবার ভালো লাগতে শুরু করবে। ঠিক আগের মতো।'

বৌদি তখন আর হাসছিল না। বড় বড় চোখ দুটি নাচিয়ে নাচিয়ে খুব পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কথাটা বলেছিল তাকে। মা বলে, তপতী বৌদি নাকি খুব ছেলেমানুষ, মাত্র উনিশ বছর বয়সে কয়েক মাস আগেই বিয়ে হয়েছে। রূপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তা মনে হয় না। তবে মনে হয় বৌদিই যা একটু বোঝে তাকে। আর কেউ নয়।

'তুই যে মাসিমার সৎ মেয়ে', প্রথমে বৌদির কথাটিকে ঠাট্টা ভেবেছিল রূপা। কিন্তু ঘরে ফিরে ওই বাক্যটির মধ্যে একটা নতুন অর্থ যেন আবিষ্কার করে সে। বড়বু, ছোটবুর হাত দুখানা টেনে নিয়ে নিজের বাহুর সঙ্গে মেলায়। তারপর ছুটে যায় রান্নাঘরে। মায়ের গায়ের রংটাও আজ বেশ কালো মনে হয়। আব্বুও শ্যামলা। তাহলে কি আসলেই তার মা ও বোনেরা আপন নয়? কিন্তু সেক্ষেত্রে রূপার মা গেল কোথায়? মারা গেছে? তালাক দিয়ে দিয়েছে আব্বু? কিন্তু বুবুদের মাকে ঘরে রেখেই রূপার মাকে কি বিয়ে করেছিল তার বাবা? আজ পর্যন্ত কারো কথাবার্তায় সে রকম আভাস তো পায়নি। মাথামুণ্ড কিছু ভেবে পায় না রূপা।

রূপা একটা মোড়া টেনে মায়ের পাশে এসে বসে রান্নাঘরে। ইফতারির জন্যে বেগুন ও পেঁয়াজ কুটছিল মা। রূপা খুব নিবিষ্ট মনে মাকে দেখে। নিজের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য খোঁজে। তার মা নাকি একসময় ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল। গায়ের রংও ছিল ধবধবে ফর্সা। যদিও এখন দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

'চুলগুলো একটু আঁচড়াতেও পারিস না? পাটের আঁশের মতো রুক্ষ হয়ে আছে। গোসল করেছিস? তা করবি কেন? বেলা কত হলো! যা এক্ষুনি করে আয়।'

তরকারি কাটতে মনোযোগী মা রূপার মুখের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলে চলে। রূপা নীরবে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মনে হয় গরু-ছাগলের মতো সবসময় তাকে তাড়া করছে বাড়ির লোকজন। উপদেশ দেওয়া ছাড়া, ধমক দিয়ে কথা বলা ছাড়া তার সঙ্গে অন্য কোনো আচরণ করে না কেউ। রূপা ভেবে পায় না কোনো কিছুই কি আর সঠিকভাবে করে না সে আজকাল? তাহলে কেন কোনো আদর, কোনো প্রশংসা তার ভাগ্যে জোটে না?

সবচেয়ে অবাক করেছে তাকে আব্বু। শুধু সকালে ও রাতে দুবেলা একসঙ্গে বসে খাওয়া নয়, রূপাকে ছাড়া তার বাবা একসময় কোনো দাওয়াত, কোনো উৎসবেই যেত না। এমনকি অফিসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও নিয়ে যেত রূপাকে সঙ্গে করে। রূপা ছিল তার নয়নের মণি। অথচ আজকাল আব্বু ভালোমতো তার সঙ্গে একটু কথা পর্যন্ত বলে না। সব সভা, সব অনুষ্ঠানেই যায় একা। রূপাকে ডাকে না।

বাথরুমে ঢুকে কাপড়-জামা খুলে বালতিতে ভেজায় রূপা। তারপর ভেজা কাপড়গুলো মেঝেতে রেখে ভালো করে সাবান মাখে। খালি ছোট বালতিটায় ওগুলো তুলে রেখে বড় বালতিতে রাখা পানি মগ দিয়ে গায়ে ঢালতে শুরু করে। ঠাণ্ডা পানির প্রথম স্পর্শে গাটা কেমন শিউরে ওঠে। রূপা সাবান নিতে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো স্টিলের সাবানদানিতে হাত দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে সাদা দেয়ালে সাঁটানো আব্বুর দাড়ি কাটার চৌকা আয়নাটায় নিজের প্রতিফলন চোখে পড়ে। ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেছে তার শরীর। রূপা নিজের দিকে তাকিয়ে যেন অবাক হয়। শরীরের পরিবর্তনগুলো এমন করে চোখে পড়েনি এর আগে। রূপার ছোট স্তনবৃন্ত ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় যেন জেগে উঠেছে। মেদহীন মসৃণ ধবধবে ত্বকের ওপর মৃদু উত্থিত সুদৃঢ় সংযোজনদ্বয় নিজের কাছেই অপরিচিত ঠেকে। রূপা টের পায় তার শরীর দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই তো মাস দুয়েক আগেই মা নতুন দুটি ফ্রক তৈরি করে দিয়েছে তাকে। যদিও ফ্রক পরতে দারুণ ভালোবাসে রূপা এবং তার মা সেটা জানে, তবু এখন নতুন জামার কোনো প্রয়োজন ছিল না — কোনো উপলক্ষও ছিল না। দুটো জামাতেই মা বুকের কাছে গোল করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তিন ইঞ্চি কুঁচি। কুঁচির ডগায় আধা ইঞ্চি সূক্ষ্ম কারুকাজ করা লেস, যাতে মনে হয় ফ্রকটির সৌন্দর্য বর্ধনই এই তিন ইঞ্চি সংযোগের উদ্দেশ্য। সেলাই মেশিন থেকে শেষ জামাটি বের করে দাঁত দিয়ে সুতা কাটতে কাটতে মা কিন্তু কোনো রাখঢাক না করেই বলেছে, 'এ ফ্রকগুলো পরবি এখন থেকে। পুরনো জামাগুলো পরবি পায়জামা ওড়নার সঙ্গে। এত লম্বা লম্বা ঢ্যাঙ্গা হাত-পা। ওরকম বেঁটে বেঁটে ফ্রক আর ভালো দেখায় না।'

রূপা দেখে জামাটির ঝুল খানিকটা লম্বা করে দিয়েছে মা, অনাবৃত পা দুটো কিছুটা হলেও যাতে ঢাকা থাকে। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সে। সেইসঙ্গে পুলকিতও হয়। একটা চাপা উত্তেজনা ঘিরে থাকে তাকে, স্কুলে প্রথম প্রোগ্রেস রিপোর্ট পাওয়ার পর যেমন হয়েছিল। সেইসঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কা ভর করে।

AMARBOI.COM

রূপার মনে পড়ে, কত দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত বছরই মা সেই প্রত্যাশিত বাক্যটি তার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেছিল। এ বাক্য ছোটবু'কে যখন কয়েক বছর আগে বলেছিল মা, তখন থেকেই ছোটবু হঠাৎ অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। রূপার প্রতি মার সেই অমোঘ বাণীটি ছিল এরকম, 'এই যে এ টেপগুলো বানিয়ে রেখেছি। এগুলো সবসময় জামার নিচে পরবি। আর ছেলেদের মতো সোজা হয়ে হেঁটে বেড়াবি না। এখন বড় হচ্ছিস। শান্ত নম্রভাব মাথা নিচু করে হাঁটবি।'

মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা অবশ্য রপ্ত করতে পারেনি রূপা। কিন্তু সেই থেকে প্রবল উৎসাহেই জামার নিচে মায়ের বানানো মার্কিন কাপড়ের সেমিজ পরতে কখনো ভুলত না। এ সামান্য পরিধেয় যোগ করে অনেক সহজে অনেক দ্বিধাহীনভাবে অন্যের সামনে বেরোতে পারে রূপা। আর তখন থেকেই মাঝে মাঝে এভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখত সে। দেখে খুশি হতো।

কিন্তু এরই ভেতর কী জানি কী হয়ে গেল। মা ও বুবুরা অসম্ভব কড়াকড়ি শুরু করল হঠাৎ করে। সর্বক্ষণ শাসন আর শাসন। যখন তখন বাসা থেকে আর বেরোনো যায় না, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে বেড়াতে যেতে পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপত্তি। অসীম, রবিউলরা বাসায় এলে ওদের সঙ্গে আগের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করা চলে না। নিজের মনেও ভিড় করে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। মনে হয়, এক অন্ধকার কারাগারে বাস করছে সে। রূপার দোষও যে এতে একেবারে নেই তা নয়। পড়াশোনায় আগের মতো আর মন নেই তার। ইচ্ছে হয় শুয়ে শুয়ে কেবল গান শোনে। ভালোবাসার গান, বিশেষ করে বিরহের। তা আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি যা-ই হোক না কেন। কিন্তু তার কি জো আছে? গান শুনতে গেলেই কিছু একটা কাজের অজুহাতে তাকে অন্যত্র পাঠানো হবে। স্কুলের পড়াশোনার চাইতে গল্পের বই, কবিতা পড়তে বেশি ভালো লাগে আজকাল। কিন্তু বুবুরা গল্পের বই-উপন্যাসগুলো তাদের জিম্মায় রেখেছে। বইয়ের আলমারির চাবি তাদেরই হাতে। বই চাইলে তারা বেছে বেছে বই বের করে দেবে রূপাকে। যেন সে কচি খুকি। এখনো রূপকথা, হাসির গল্প, অ্যাডভেঞ্চার, জীবনীগ্রন্থ পড়তে হয় তাকে। অথচ নিজেরা নির্বিচারে সবকিছু পড়বে। বাংলা, ইংরেজি দুরকম বইই। মাঝে মাঝে পাবলিক লাইব্রেরিতে ও বন্ধুদের বাসা থেকেও নিয়ে আসে কত মোটা মোটা উপন্যাস। পড়া শেষে দুবোন বই নিয়ে আলোচনা করে। আর রূপা হাবার মতো ওদের মাঝখানে বসে থাকে চুপচাপ। ওদের কথা শোনে। ওইসব বই পড়ার আগ্রহ দেখালে ওরা বলবে, 'ওগুলো বড়দের বই। তোমার পড়ার নয়।'

গা জ্বলে যায় রূপার। সে নিজেই বুঝতে পারে না, সে বড় না ছোটর দলে। যদি ছোটই হবে তবে ছোটদের মতো ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারে না কেন? আর বড় হলে বুবুরা এমন অবহেলা করে কেন?

রূপা তার যক্ষের ধন, নীল কাপড় দিয়ে মোড়া প্রিয় বই দুখানি আলমারির ওপর থেকে বের করে দেখে মাঝে মাঝে। আনিস স্যার এই বই দুটি তাকে পাঠিয়েছিলেন ঢাকা থেকে। সে এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। তরুণ, অত্যন্ত কর্মঠ শিক্ষক আনিস চৌধুরী খুব বেশিদিন থাকেননি এ সরকারি স্কুলে। কিন্তু রূপার মতো ছাত্রীদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন ভালোভাবে। শুদ্ধ ইংরেজি লেখার, ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার, নতুন করে আগ্রহ জন্মেছিল তাদের। স্যার তাদের মহৎ ইংরেজি সাহিত্যের বাংলানুবাদ ও সহজ ইংরেজি সংস্করণ পড়তে দিতেন। রূপার এতো ভালো লাগত এই শিক্ষকটিকে। তাই তার চলে যাওয়ার দিন দিশেহারা হয়ে কোনো কিছু না ভেবেই একটা চিরকুট লিখে স্যারের হাতে তুলে দিয়েছিল সে। মুখে কিছু বলার সামর্থ্য ছিল না।

'স্যার,

আপনি চলে যাওয়ার পর ইংরেজি পড়া বা লেখার আগ্রহ আর থাকবে মনে হয় না। আমাদের বাসার ঠিকানা দিলাম। ভবিষ্যতে কখনো এ শহরে এলে অবশ্যই আমাদের বাসায় আসবেন।

শ্রদ্ধাসহ রূপা।' (সাবিনা আখতার)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যারের বিদায় সংবর্ধনায় যেতে পারেনি রূপা। সেই দুপুরে স্বজন হারানো শোকে বিহ্বল হয়েছিল সে। ঘোষদের পুকুরের ঘাটে বসে খানিকক্ষণ, নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনে বাকি দুপুর ও বিকাল কাটিয়েছিল।

আনিস স্যার চলে যাওয়ার মাসখানেক পরে ঘটেছিল রূপার জীবনে সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি। পিয়ন এসে উঠানে চিৎকার করে একদিন বলল, 'সাবিনা আখতারের নামে প্যাকেট এসেছে।'

রূপা ও তার দুই বুবু ছুটে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। বাদামি কাগজে মোড়া একটি ছোট প্যাকেট। ওপরে পরিষ্কার তার পোশাকি নাম, ব্র্যাকেটে রূপা, কেয়ার অব জনাব শামসুল হক, পোস্ট অফিস : গোলাপগঞ্জ, ইত্যাদি লেখা। রূপা আনন্দে উত্তেজনায় তার নিজ নামে আসা প্রথম মেইল প্রথম পার্সেল মুহূর্তের মধ্যে খুলে ফেলে। 'টম সায়ার' ও 'এ টেল অব দ্য টু সিটিজ' বই দু'খানা পাঠিয়েছেন স্বয়ং আনিস স্যার ঢাকা থেকে। সেই সঙ্গে বইয়ের ওপরে লিখে দিয়েছেন, ইংরেজি পড়ার অভ্যাসটা যাতে বজায় রাখে রূপা। এরপর স্কুলে, বাড়িতে — বিশেষ করে বুবুদের কাছে — রূপার দাম খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা সাময়িক। রূপার কাছে অবশ্য এ ঘটনার অপরিসীম মূল্য। মন খারাপ লাগলেই পরম যত্নে বই দুটি খুলে বসে সে। যদিও এত দিনে কেবল টম সায়ার পড়া শেষ করেছে। অন্যটি এখনো শুরু করেনি।

রূপার ছেলেবন্ধুরা আর আগের মতো আসে না বাসায়। আসবে কেন? সেদিন মা যেভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলো রুবেলকে। বেচারা একরকম নিরুপায় হয়েই এসেছিল রূপার কাছে। একজন খেলোয়াড় হঠাৎ আটকে পড়ে যাওয়ায় ওদের ক্রিকেট খেলাই পণ্ড হয়ে যেতে বসেছিল। রুবেল তাই এসেছিল রূপার সাহায্য কামনা করতে। ঘণ্টা খানেকের জন্যে যদি রূপা উইকেটকিপারের দায়িত্বটা পালন করতে পারে। এর ভেতরই চলে আসবে নির্ধারিত খেলোয়াড়। গত বছর পর্যন্ত রূপা কখনোসখনো খেলেছে ওদের সঙ্গে। যদিও নিয়মিত খেলা ছেড়ে দিয়েছে বছর দুয়েক আগেই। রূপা ভাবেনি তাদরে বাসার পাশে মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্যে খেলতে যেতে বাড়ি থেকে কোনো আপত্তি উঠবে। কিন্তু উঠেছিল। মা ও বড়বু দুজনের কাছ থেকেই। মানতে পারেনি রূপা ব্যাপারটা।

কেন যেতে পারব না? সোজা জিজ্ঞেস করে বসেছিল। এ কথার উত্তর রূপাকে না দিয়ে মা রুবেলের উদ্দেশ্যে বলে, 'রূপা আর বাইরে খেলতে যাবে না বাবা। ওকে তোমরা কখনো ডাকতে এসো না।'

প্রচণ্ড রাগ হলেও করার কিছু ছিল না রূপার। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুধু কেঁদেছে সারা দুপুর। ডানপিটে মেয়ে সে নয়। কখনো গাছে চড়েনি। মার্বেল খেলেনি। মাছ ধরতে যায়নি। প্যান্ট শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়নি, যা আজকাল এ শহরেও দু'একজন মেয়ে করে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা তার বাবা ব্যাট ও বল কিনে এনে নিজে হাতে ক্রিকেটের প্রথম প্রশিক্ষণ দিয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে তাদের বাসার সামনের এ মাঠেই, এ কথা কেমন করে ভুলবে রূপা?

সাবান গায়ে ধুন্দুলের ছোবড়া দিয়ে ভালো করে ফেনা তোলে। আলতোভাবে বাহু কণ্ঠ, চিবুক স্পর্শ করে। রূপা অনুভব করে তার টিং টিং-এ শরীরে একটু একটু করে মেদ জমতে শুরু করেছে। পেটেও সমতল চামড়ার ওপর ভেসে থাকা অর্ধমার্বেলের মতো নাভিখানা কখন ডুবে গেছে নিজস্ব খাদে। কিন্তু বড়বুর মতো ভুঁড়ি দেখা দেয়নি এখনো। কণ্ঠনালির নিচে দু'দিকে দুটো হাড় যেরকম বেখাপ্পা উঁচু হয়ে দু'টি খাদের সৃষ্টি করে রাখতো এতদিন তা আর আগের মতো চোখ পড়ে না। গলার নিচে চারপাশটা কেমন ভরাট হয়ে আসছে।

গোসল সেরে গা মুছে গামছায় চুল জড়িয়ে নেয় রূপা। তারপর হলুদ ছাপা সালোয়ার কামিজ গায়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মুখে স্নো মাখে। একটা দু'টা ব্রণ দেখা দিয়েছে, গালে, চিবুকে। ব্রণের ভয়ে কোল্ড ক্রিম মাখা বন্ধ করে দিয়েছে রূপা। দু'বেলা সাবান দিয়ে মুখ ধুতেও ভোলে না। রূপা খয়েরি রঙের নেইল পলিশটা নিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে গিয়ে বসে। রোদে ভেজা চুল এলিয়ে দিয়ে একমনে বাঁ হাত ও পায়ের নখে নেইল পলিশ মাখে।

তারপর ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায় রূপা। সালোয়ার কামিজ পরনে অনেক বড় দেখায় তাকে। একটা কালা টিপ পরে সে দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে। রূপা লক্ষ করে তার ভুরু দুটি বেশ মোটা। আজকাল ঢাকায় মেয়েরা বিউটি পার্লারে গিয়ে ভুরু সরু করে। এখানেও কোনো কোনো মেয়েরা ঘরে ভুরু প্লাক করে। রূপা কখনো করেনি। করার ইচ্ছেও নেই।

বাইরের ঘরে বসে টেলিভিশনটা ছেড়ে দেয় রূপা। কেবল টিভির পরপর দুটি চ্যানেলেই একগাদা ছেলেমেয়ে নাচছে। এই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েগুলো শুধু নাচে টিভিতে একইরকম ভঙ্গিতে দিনের পর দিন। রূপাদের স্কুলের ছাত্ররা খুব পছন্দ করে এই নাচ। কিন্তু রূপার ভালো লাগে না। কেমন একঘেয়ে লাগে।

সামনের বারান্দা থেকে জানালা দিয়ে কে যেন ডাকছে তাকে। নিচু গলায়, 'এই রূপা, রূপা এদিকে আয়।'

জানালার পর্দাটা আরেকটু সরিয়ে গ্রিলের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিদ্যুৎকে দেখতে পায় রূপা।

'কীরে কেমন আছিস?'

'ভালো। তুই?'

'ভালো। তুই আর বেরুস না কেন, রূপা? বেশ কদিন দেখিনি তোকে।'

'রোজার ছুটি তো! ঘরেই থাকি।'

'এই, বরই খাবি? চৌধুরীদের গাছ থেকে পেড়েছি। এই নে।'

পাঁচ-ছয়টি কাঁচা কাঁচা গোল বরই রূপার হাতে তুলে দেয় বিদ্যুৎ গ্রিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁক দিয়ে। এই ফলগুলো খুব চেনা রূপার। এ গাছটা যখন আরো ছোট ছিল নিজ হাতে কত তুলে খেয়েছে। এই বিদ্যুৎদের সঙ্গেই। টক বরই বলে চৌধুরীরাও তেমন বাধা দিত না। 'ঝাল লবণ নিবি? পারুল নিয়ে এসেছিল। দাঁড়া আছে দু'একটি পুঁটুলি।'

পকেট থেকে খবরের কাগজের ছোট একটা পুরিন্দা রূপার হাতে তুলে দেয় বিদ্যুৎ। রূপার বুকের ভেতরটা একবার মুচড়ে ওঠে। পেটের ভেতরটাও। রাগ করে সকালে কিছু খায়নি। তাই হয়তো অ্যাসিডিটি হয়েছে।

'অসীম, রুবেল, উজ্জ্বল ওরা সব কেমন আছে রে?'

'সব ভালো। অনেক দিন তুই কারো বাড়িতে যাসনি।'

'হ্যাঁ, কেন জানি আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।'

'আমি এখন যাই রে।'

'যা।'

বিদ্যুৎ এখনো হাফপ্যান্ট পরে। ওর লম্বা ও সরু পাগুলোর ওপর ছাই রঙের হাফপ্যান্টটাকে কেমন বেঁটে বেঁটে দেখায়। প্যান্টের ওপর নীল ডোরাকাটা হাফশার্ট। ঘরের ভেতর সালোয়ার-কামিজ পরেও শীত শীত করছে রূপার। অথচ বাইরের রোদে ওরা এই স্বল্প পোশাকেও কী সুন্দর খেলাধুলা করছে। রূপা জানালার পর্দা দুটি সম্পূর্ণ সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরনো বন্ধুদের দেখে দূর থেকে।

রূপার যখন-তখন বাইরে যাওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে বছর দুয়েক আগে, যেদিন ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়েই বন্ধ দরজার আড়াল থেকে চিৎকার করে মাকে ডাকতে হয়েছিল তাকে। তার কণ্ঠে কী ছিল কে জানে? মা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়েই দরজার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। ততক্ষণে রূপা বাথরুমের মেঝেতে বসে কাঁদতে শুরু করেছে। দরজার ওপারে মায়ের কণ্ঠ শুনতে পায় রূপা। মা অনুনয় করে বলছে, 'দরজা খোল, মানিক। দরজা খোল। ওটা কিছু নয়। ভয় পাস নে। সব মেয়েদের এরকম হয়। আমি আসছি। দেখিয়ে দেব। দরজা খোল, দরজা খোল রূপা।' মেয়ে নয়, মা-ই যেন এই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য সব প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। রূপা দরজা খুলে মাকে স্যাঁতসেঁতে বাথরুমের ভেতর টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই যে দরজা বন্ধ করল, আর খুলল না।

বিদ্যুৎ ও রুবেল দূর থেকে হাত নাড়ায় রূপার উদ্দেশ্যে। ঝাল লবণ দিয়ে চুকচুক করে কুল খেতে খেতে জানালা দিয়ে রূপাও হাত নাড়ায়। কিন্তু দরজা খোলে না। নিজেও বাইরে যায় না। কেমন একটি আড়ষ্টতা ভর করে থাকে।

'তুমি খুব সুন্দর।'

চায়ের কথা বলতে রুনা ভেতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মেজভাই কায়সার হঠাৎ রূপার বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরে। রূপা অবাক হয়। কায়সার ভাই

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরাবর তাকে 'তুই' বলেই সম্বোধন করত। কায়সারের হাতটা গরম — কেমন ভেজা ভেজা। নিজের ঠাণ্ডা হাতখানা টেনে আনতে গিয়ে থেমে যায় রূপা। পাথরের মতো শক্ত জমাট বেঁধে আছে হাতখানা, 'তুমি আর আগের মতো আসো না কেন? অঙ্ক বুঝতে আর অসুবিধা হয় না বুঝি?'

জবাব দেয় না রূপা। ততক্ষণে হাতখানা ছাড়িয়ে এনে দুটি হাত একসঙ্গে করে রেখেছে সে। ভেতর থেকে একটা কাঁপুনি এসে গ্রাস করতে চায় তার সর্বাঙ্গ। রূপা নড়তে পারে না। যেভাবে বসেছিল ঠায় সেভাবে বসে থাকে।

'তুমি অনেক বদলে গেছ।'

বলতে বলতে কায়সার রূপার দিকে গভীরভাবে তাকায়। রূপার মাথায় চুলে হাত বোলায়। তারপর আস্তে আস্তে হাত দুটি নেমে আসে রূপার গালের দু'পাশে। কান ও গালের পাশ দিয়ে কায়সারের আঙুলগুলো আলতো ওঠানামা করে।

'না, না, এ কী করছেন?'

রূপা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। খোলা জ্যামিতি বাক্স, রুনার অঙ্কের খাতা, কাঠ পেনসিল, সব চকিতে মাটিতে পড়ে যায় শব্দ করে। আর ঠিক সে সময় রূপা লক্ষ করে চা ও নাশতা নিয়ে রুনা ও রুবেল ঘরে ঢুকছে। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বসে থাকে রূপা। কায়সার মাটি থেকে বই-খাতা তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'ভাইয়া তুমি ভেতরে যাও তো। আম্মা ডাকছে।' রুনার কণ্ঠে আদেশ, ক্রোধ। কোনো প্রতিবাদ না করে কায়সার দ্রুত দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে যায়। রুনা রূপার পাশে এসে বসে। 'চা খেয়ে তুই বাড়ি যা রূপা। রুবেল তোকে পৌঁছে দেবে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। একা যাস নে।'

রুনা রুবেলের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিতেই হুকুম দেয়। রূপার মনে হয় যমজ ভাই নয় যেন অনুজকে পরামর্শ দিচ্ছে রুনা। সমবয়সী রুনাকে আজ বড়বুর মতো মনে হচ্ছে রূপার।

চা না খেয়েই উঠে পড়ে সে।

ঘোষদের ঘাটের পাশে এসে রূপা একটু দাঁড়ায়।

'রুবেল একটু বসবি এখানে আমার সঙ্গে?'

রুবেল ঠিক বুঝতে পারে না রূপা কী চায়। তবু বলে, 'চল বসি।' ওরা দুজন পাশাপাশি বসে সিমেন্টের সিঁড়িতে। দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে, চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকে রূপা। রুবেল বুঝতে চেষ্টা করে নিশ্চিত হয় রূপা কাঁদছে না। তখন বলে, 'তুই আর মেজ ভাইয়ার কাছে পড়তে যাস নে রূপা। ওরকম এইচএসসি পড়ুয়া মাস্টারের দরকার নেই তোর। অঙ্কে আসলেই তুই কাঁচা। একজন ভালো মাস্টার দরকার তোর। রেগুলোর মাস্টার বুঝলি? বিএসসি স্যারকে একবার বলে দেখ না।'

রূপা কোনো কথা বলে না।

'তুই কি আমার ওপর, রুনার ওপরও রাগ করেছিস? সত্যি করে বল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো?'

রূপা মাথা তোলে। হাসে।

'পাগল!'

'রূপা তোকে একটা কথা বলি। রুনা আজ আম্মাকে দিয়ে মেজভাইকে অনেক ঝাড়ি খাওয়াবে। তুই দেখিস ঠিক খাওয়াবে, আমি জানি। কিন্তু তুই আর এ কথা অন্য কাউকে বলিস না রূপা।' রূপা তাকায় তার সহপাঠী-সমবয়সী বন্ধুর দিকে। সবাই যেন আজকাল খুব দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে।

'তোকে একটা কথা বলব রুবেল? তুইও এ কথা কাউকে বলিস না। এমনকি রুনাকেও না। এটা শুধু তোর আর আমার মধ্যে। ঠিক?'

'ঠিক।'

'জানিস তোর মেজভাই যখন ইদানীং মাঝে মাঝে আমার দিকে কেমন করে তাকাত, উল্টাপাল্টা কথা বলত, আমার কেমন অস্বস্তি লাগত। ভয় করত। কিন্তু আজ যখন সত্যি সত্যি সে দু'হাত দিয়ে আমার মুখ জড়িয়ে ধরল, আমি বুঝতে পারছিলাম কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কী আশ্চর্য জানিস, আমার কিন্তু খুব ভয় লাগেনি। বরং—'

'বরং?'

'বরং কেমন ভালোই লেগেছিল। কী অদ্ভুত তাই না? ছিঃ ছিঃ, এ আমি কী বললাম। এই রুবেল, তুই কিন্তু এ কথা কাউকে বলবি না। মেজভাই, রুনা কাউকে নয়। প্রতিজ্ঞা?'

'প্রতিজ্ঞা।'

'আচ্ছা, আমি যা বললাম, তারপর তোর কি মনে হচ্ছে আমি খুব খারাপ মেয়ে?'

'না।'

'কী মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে তুই আসলেই খুব ভালো মেয়ে। তবে বোকা। এখন চল। ঘরে চল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।'

'চল।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারে বারে ফিরে ফিরে

I will plant my hands in the garden
I will grow I know I know I know
—Forugh Forrokhzad

তার প্রেমের চাইতে বড় ছিল মেয়েটি।
লোকটি তা আগে বুঝতে পারেনি।

ভেবেছিল অন্তহীন প্রেমের জোয়ারে এমন করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মেয়েটিকে, যে অন্য কিছু চাইবার থাকবে না আর তার।

অথবা অন্য কোনো কিছু ভাবার অবসর-ই পাবে না।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল অনেক কিছুই চাইবার রয়েছে মেয়েটির।

পুরুষ মানুষের ভালোবাসা সেই অনেক কিছুর একটি উপকরণ মাত্র।

ফলে লোকটার সুঠাম শরীর আর রাতভর অকৃত্রিম সোহাগ-আদর বিতরণ তাকে অনাবিল আনন্দ দিলেও তা যথেষ্ট মনে হয়নি মেয়েটির।

মেয়েটি চুপচাপ আকাশ দেখতে চাইত।

থেকে থেকে দখিনা হাওয়ায় উন্মনা হয়ে শূন্য পথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কখনো কখনো সারারাত ধরে কোনো একটি বিশেষ কবিতা বা গান তার মনে একটানা গুনগুন করে যেত।

সে বৃষ্টি, জল, গাছ ও পশুপাখি ভালোবাসত।

বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটাতে চাইত নিজের বাগানে।

দুপায়ে ঘুঙুর বাজিয়ে চৈত্রের শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে যাওয়ার শখ হতো তার।

খোলা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে দীর্ঘ পুরাণ বা পাঁচালী পাঠ করত সে।

সেইসঙ্গে আবার প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনায় অথবা মানবকুলের জন্যে মঙ্গলকর কিছু ঘটার আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকত মন।

প্রাত্যহিক ও সাংসারিক কাজের বাইরে আরো কিছু কর্মকাণ্ড, কোনো বৃহত্তর বা মহত্তর পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা করত মেয়েটি।

আকাশের মতো উদার, বটবৃক্ষের মতো দীর্ঘ আর ঋজু, দীঘির জলের মতো প্রশান্ত, আবার সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে পেখম তোলা ময়ূরের মতো উচ্ছল নৃত্যরতা হতে চাইত সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি মেয়েটির এসব পাগলামি একেবারে বুঝতে পারত না। কেমন অর্থহীন মনে হতো সবকিছু তার কাছে।

এই ধরনের ছেলেমানুষি আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার শখ প্রকৃতই অসহ্য লাগত তার।

কিন্তু পুনঃপুন নিষেধ করা সত্ত্বেও মেয়েটি তার কথা অমান্য করে নিজস্ব আনন্দ আর পছন্দমতোই চলতে থাকে।

একদিন সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায় লোকটির।

গভীর রাতে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে হঠাৎ সে মেয়েটিকে খুন করে বসে।

তারপর তার দেহটি ধারালো বঁটি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে সেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।

বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা মেয়েটির শরীরের প্রতিটি অংশ থেকে অতঃপর জন্ম নেয় এক একটি পূর্ণাঙ্গ নারী।

চেহারায়, স্বভাবে, মেজাজে, কর্মে, বুদ্ধিমত্তায় পরম বৈচিত্র্যময় সেই সব নারী, যারা প্রত্যেকেই অসময়ে খুন হয়ে যাওয়া এই মেয়েটির ভগ্নাংশ মাত্র।

দুর্গা

AMARBOI.COM

মেয়েটির ধড়টি যেখানে পড়ল, সেখানে জন্ম নিল এক অভিনব নারী, যার রয়েছে দশটি হাত। একই সঙ্গে দশ হাত দিয়ে দশ রকম কাজ করে যেতে পারে সে। তার দুই হাত যখন সন্তানকে আদর বিলাতে ব্যস্ত, তখন তার অন্য দুই হাত দুর্জন বা অসুরকে অনায়াসে বধ করতে সক্ষম। বহু গুণে গুণান্বিত দুর্গা। সে একাধারে নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকা ও স্ত্রী এবং পরম স্নেহময়ী মাতা। অন্ন ও বস্ত্রদায়িনী বলে সকলের কাছে পরিচিত সে। তার ধৈর্য, সহনশীলতা, মায়া-মমতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনো তুলনা হয় না। আবার অন্যদিকে সন্ত্রাসী বা খুনিদের আবির্ভাব ঘটলে তাদের হাত থেকে পরিবার ও প্রতিবেশীদের রক্ষা করতে সে হয়ে উঠতে পারে অত্যন্ত কঠোর এবং ভয়ংকর। অতিশয় বুদ্ধিমতী দুর্গা একজন দক্ষ ও কৌশলী যোদ্ধাও বটে। দুর্জনের প্রতি সে ভয়ানক কঠিন। শত্রু বা অনিষ্টকারীর আশঙ্কায় তার হাতে সর্বদাই ধরা থাকে ধারালো অস্ত্র, যেমন ধরা থাকে অন্য হাতে শৌখিন পদ্মফুল আর শঙ্খ। দুই পুত্র, দুই কন্যা ও সকল নারীর ঈর্ষা-জাগানো অসীম রূপবান ও ক্ষমতাধর এবং বহু গুণে গুণান্বিত স্বামীকে নিয়ে সংসার দুর্গার। তবে স্বামী তার যত নামিদামি আর শক্তিশালীই হোক না কেন, তার আত্মভোলা স্বভাব আর নেশার প্রতি দুর্বার আসক্তি দুর্গার কম মনঃকষ্টের কারণ নয়। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত দুঃখ আর হতাশা মনের গভীরে ধারণ করেও মানুষের যাবতীয় দোষত্রুটি, বিচ্যুতি যেমন, হিংসা, বিদ্বেষ, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, স্বার্থপরতা, ঘৃণা, উষ্মা, অহংকার থেকে মুক্ত করে তাদের অন্তর নির্মল করে দিতে সর্বদাই তৎপর এই মাতৃরূপী মহীয়সী নারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীতা ও আয়েশা

মেয়েটির দুটি খণ্ডিত হাতকে একসঙ্গে ছুড়ে মারলেও সেগুলো গিয়ে পড়ল যোজন যোজন দূরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই জায়গায় — পৃথিবীর দুই প্রান্তে।

বাম হাত হতে জন্ম নিল সীতা।

আর ডান হাত থেকে আয়েশা।

দুজনেরই বিয়ে হয় দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারে, স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রধান নেতার সঙ্গে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য দুজনেরই। স্বামীর কাছে সতীত্ব ও নির্দোষ প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঘটনা পরম্পরায়; যে ঘটনা বা দুর্ঘটনার ওপর তাদের কোনো হাত ছিল না।

সীতা বাম হাতের মতোই কেমন নির্জীব, নিস্তেজ, দুর্বল। অত্যন্ত শান্ত, নম্র, বিনয়ী স্বভাবের সীতা নিজের মতোই অন্য সবার মধ্যেও শুভ আর সততার সমাবেশ আশা করে। আর তাই সমাজকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তার সমাজপতি স্বামী যখন সর্বসম্মুখে তাকে তার সতীত্ব প্রমাণ করতে আদেশ করে, রাগে, দুঃখে অপমানে জর্জরিত সীতা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠার পরিবর্তে নীরবে আত্মহননের পথই বেছে নেয়।

কিন্তু দৃঢ়চেতা আয়েশা এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। তার নিষ্পাপ চরিত্রে কালিমা লেপন করে দেওয়া হবে, আর সে ভয়ে, লজ্জায় মুখ ঢাকবে বা আত্মঘাতী হবে, তা হয় না।

বুদ্ধিমতী যুক্তিবাদী আয়েশা, সার্থকভাবে সরাসরি যুদ্ধ করার যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে, ব্যক্তিগত এই সংকট ও সংগ্রামকেও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়। এমন অসম্মানজনক পরাজয়কে এত সহজে মেনে নিতে পারে না আয়েশা।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, যারা তাকে এই মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থাও করতে সমর্থ হয় আয়েশা।

রাধা

মেয়েটির উপড়ে ফেলা হৃৎপিণ্ড থেকে জন্ম নিল রাধা।

আয়ান ঘোষের গৌরবর্ণা সুন্দরী তরুণী স্ত্রী রাধার মন উদাস, অস্থির। ঘরকন্নায় তেমন নজর নেই।

কৃষ্ণ প্রেমে সার্বক্ষণিকভাবে হিমশিম খায় রাধা।

রাখাল ছেলে কৃষ্ণের বাঁশি শুনলে সব ভুলে গিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে যায় সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলসী কাঁখে ঘাটে জল তুলতে যাবার নাম করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয় রাধা।

বনফুল, ঘন কালো মেঘ, বৃষ্টির জল, যমুনা নদী, আম্রকানন যা একসময় তার বুকে অনবরত ঢেউ তুলত, তা আজ কৃষ্ণের কথাই মনে করিয়ে দেয় কেবল।

স্বামীর উষ্মা ও বিরাগ, লোকনিন্দা, সখীদের তিরস্কার কোনোকিছুতেই কিছু যায় আসে না রাধার। কৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত সে। কৃষ্ণের প্রেমে পুরোপুরি নিবেদিত।

কিন্তু স্বামীকে ভুলে যার জন্যে পাগল-প্রায় রাধা সর্বক্ষণ ঘর-বাহির করে, অসতীর বদনাম কুড়ায়, সেই কৃষ্ণ কিন্তু রাধার প্রতি মোটেও বিশ্বস্ত নয়।

রাধার প্রিয় সখীদের সঙ্গেও রাধার চোখের আড়ালে প্রতিনিয়ত ফষ্টিনষ্টি করে কৃষ্ণ।

রাধা সব বুঝেও যেন কিছুই বোঝে না, সব দেখেও যেন কিছুই দেখে না।

কৃষ্ণ ভালো করেই জানে, তার অবিশ্বস্ততাসহ যাবতীয় কুকর্মের জন্যে ক্রুদ্ধ রাধার মানভঞ্জন করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না তার।

কৃষ্ণ জানে, অন্ধ প্রেমে, এক দুর্বার আকর্ষণে, নিজের আবেগের কাছে সম্পূর্ণ বন্দি কোমলমতি রাধা কান পেতে বসে থাকবেই কৃষ্ণের ডাকের অপেক্ষায়।

রাধা সত্যি সত্যিই বসে থাকে পরম প্রতীক্ষায়।

নিরবধি বসে থাকে তার কালার সেই পরিচিত বাঁশের বাঁশির আওয়াজ শোনার আশায়।

AMARBOI.COM

রুথ

মেয়েটির যকৃত থেকে জন্ম নেয় রুথ।

নাওমির পুত্রবধূ রুথ।

অর্থাৎ নাওমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মালনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রুথের।

জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত অথচ অন্তরে নির্মল, স্বভাবে দয়ালু মধ্যবয়সী নাওমির আদি বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে।

বেশ কিছু বছর আগে খরা ও দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে স্বামী ও দুই নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের দেশ ছেড়ে এই ভিনদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল নাওমি। কালে সেই ভিনদেশের দুই কন্যা রুথ এবং অর্পার সঙ্গে নাওমির দুই ছেলের বিয়ে হয়। ততদিনে নাওমির স্বামী মারা গেছে। কিছুদিন যেতে না যেতে নাওমির দুই পুত্রও অকালে মারা যায়। শোকাতুর নাওমি নিকটতম পরিবারের সকলকে হারিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আবার স্বদেশে ফিরে যাবে। ততদিনে তার দেশে দুর্ভিক্ষও শেষ হয়ে গেছে।

দুই বিধবা পুত্রবধূকে ডেকে নাওমি বলে, 'আমি আমার দেশে ফিরে যাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ থেকে তোমরা মুক্ত-স্বাধীন। তোমাদের স্বামীরা জীবিত নেই। ফলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর থাকার প্রয়োজন নেই। তোমরা নতুন করে তোমাদের জীবন আবার শুরু করো এখানে।' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছোট পুত্রবধূ অর্পা তার জিনিসপত্র নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পরিত্যাগ করে চলে যায়।

কিন্তু রুথ প্রবলভাবে বেঁকে বসে।

শাশুড়ির কাছে আর্জি তার, 'দোহাই তোমার, তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে বলো না আমায়। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানেই যাব। তুমি যেখানে থাকবে, আমিও সেখানেই থাকব। তোমার লোকজনই আমার নিজের লোকজন। তোমার ঈশ্বর-ই আমার ঈশ্বর। তুমি যেখানে দেহত্যাগ করবে, আমিও সেখানেই মরব এবং সেখানেই সমাহিত হব।'

অতঃপর নাওমি রুথকে সঙ্গে নিয়েই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। দ্বিধাহীন রুথ অনায়াসে তার জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত পরিবেশ, সব ছেড়ে শাশুড়ির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন এক দেশে এসে বসবাস শুরু করে। সেখানে জীবনধারণের জন্যে ফসলের মাঠে কাজ করতে গিয়ে রুথের সঙ্গে আলাপ হয় নাওমির স্বামীর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের, যার নাম বোয়াজ। পরবর্তীকালে নাওমিসহ পরিবারের সবার সম্মতিতে বোয়াজের সঙ্গে বিয়ে হয় রুথের। বিয়ের কিছুদিন পর রুথের কোলে আসে ওবেদ নামে এক পুত্রসন্তান। এভাবে নাওমির স্বামীর বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে রুথ। শুধু তাই নয়, রুথের পুত্র ওবেদ আর কেউ নয়, সর্বজন পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ডেভিডের পিতামহ।

AMARBOI.COM

আম্রপালি

মেয়েটির নাভি থেকে জন্ম নেয় পরমা সুন্দরী যে-নারী তার নাম আম্রপালি। শোনা যায়, জন্মের পর এক আমবাগানে প্রথম তাকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। সেই জন্যেই তার নাম রাখা হয় আম্রপালি। কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে রাজা ও রানী তাদের কন্যা হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেন। দেখতে দেখতে রাজপ্রাসাদের ভেতর রাজকন্যা হিসেবে মেয়েটি বড় হয়ে ওঠে। তার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায় — দৃষ্টি অনড় হয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীজুড়ে এমন রূপবতী কন্যা আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। যে তাকে দেখে সেই তার প্রেমে পড়ে যায় এবং প্রত্যেকেই আম্রপালিকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। আম্রপালিকে নিয়ে রাজ্যের পুরুষ মানুষের মধ্যে রীতিমতো মল্লযুদ্ধ বেধে যায়। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক এ রাজ্যে এমন বিশৃঙ্খলা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। সংসদে এই বিষয় নিয়ে গুরুতর আলোচনা শুরু হয়। অতঃপর দেশের ও জনগণের শান্তি ও সৌহার্দ্যের স্বার্থে স্থির করা হয়, আম্রপালিকে রাষ্ট্রীয় বারবনিতা বানানো হবে, যাতে করে প্রত্যেকেরই মনোরঞ্জন করতে পারে সে। এর ফলে বাকি সকলকে বিফল মনোরথ করে বিশেষ একজনকে বিয়ে করতে পারবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্রপালি। আম্রপালির মতো সুন্দরী সচরাচর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। ফলে তার মতো অসীম রূপবতীকে অবশ্যই বহুজনের ইচ্ছা ও অভিলাষ পূরণ করতে হবে। সে স্থায়ীভাবে কোনো একজনের গৃহকোণে বাঁধা পড়ে থাকার মতো সাধারণ কেউ নয়। তাছাড়া সেরকম কিছু যদি ঘটে, তাহলে দেশময় প্রচণ্ড অসন্তোষ ও হানাহানি শুরু হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে আম্রপালিই বোধহয় একমাত্র নারী, যাকে রাষ্ট্রীয় আদেশে এবং সরকারি সিদ্ধান্তে বারবনিতা হতে হয়। ফলে আম্রপালি কী চায়, তার কী ইচ্ছা এসব বিবেচনায় না এনে তাকে রাতারাতি রাষ্ট্রীয় বারবনিতা বানিয়ে ফেলা হয়। যার খুশি সে-ই তাকে ভোগ করতে পারে। এমনকি এই রাজ্যের পরম শত্রু পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজাও আম্রপালির রূপে আকৃষ্ট হয়ে একদিন ছদ্মবেশে এসে ঢোকে আম্রপালির কুটিরে। শোনা যায়, তাদের মধ্যে দেহজ সম্পর্ক ছাড়াও আস্তে আস্তে একধরনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। একসময় দুজনের নিবিড় প্রেমে জন্ম নেয় এক শিশু। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ভিনদেশি রাজাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে হয়। আর আম্রপালি নিজের এই নষ্ট ও জিম্মি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন পর্যন্ত বৌদ্ধমন্দিরে কোনো নারী ভিক্ষু ছিল না। সকল ভিক্ষুই ছিল পুরুষ। আম্রপালিই প্রথম নারী ভিক্ষু হিসেবে সেখানে যোগ দেয় এবং বাকি জীবন বৌদ্ধমন্দিরেই কাটিয়ে দেয়।

AMARBOI.COM

এথেনা

মেয়েটির জরায়ু থেকে জন্ম নেয় যে-নারী, চেহারা ও সাজসজ্জায় যাকে নারী না পুরুষ সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় না, সেই অসাধারণ মেধাবী এথেনা কিন্তু বৈচিত্র্যময় গুণে গুণান্বিত। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, যৌক্তিক, সৃষ্টিশীল এবং রণকৌশলে পারদর্শী। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম। এথেনা সেই নারী যে তার অর্জিত বহুমাত্রিক জ্ঞান ও সাধারণ জীবন থেকে নেওয়া ব্যবহারিক প্রজ্ঞা থেকে চাষবাসের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছে। লাঙলের গড়ন পরিবর্তন ও তার সঠিক ব্যবহার, গরু ও ঘোড়াকে চাষের কাজে লাগানো, যাবতীয় গৃহস্থালি পশুর প্রজনন-পদ্ধতির উন্নয়ন, নতুন পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে অতিরিক্ত ফলনের ব্যবস্থা — এ সবই এথেনার দান। কৃষিকাজ ছাড়াও বিজ্ঞান ও শিল্প ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য নানান ছোটখাটো আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারাকে সহজতর করে দিয়েছে এথেনা। সভ্যতাকে নিয়ে গেছে অনেকখানি এগিয়ে। মোটকথা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে এক উন্নততর স্তরে পৌঁছে দিতে এথেনার অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার, নেভিগেশনের কলাকৌশলে সূক্ষ্ম পরিবর্তন করে তাকে নির্ভুল করে তোলা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন কলাকৌশল আবিষ্কার ও তার প্রয়োগও এথেনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণে মানুষ জানতে পারে। নারীদের জন্যে বিশেষ উপযোগী ও উপার্জনক্ষম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এথেনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এছাড়া কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়ী হওয়ার পদ্ধতিও শিখিয়ে গেছে এথেনা তার সতীর্থদের। এত যে গুণী এথেনা, সে কিন্তু সারাজীবনে কোনো পুরুষের ঘর করেনি, পুরুষের শারীরিক সঙ্গ উপভোগ করেনি। তাকে ধর্ষণ করতে এসে বারবার ব্যর্থ হয়েছে একাধিক পুরুষ। এথেনা চিরকাল তার কৌমার্য বজায় রেখেছে। ব্যক্তিগতভাবে পুরুষের ভালোবাসা ভোগ করার চাইতে সকলের জন্যে কল্যাণকর কিছু করার দিকে বেশি মনোযোগী ছিল এথেনা।

তুবা

মেয়েটির ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো যেখানে গিয়ে পড়ল সেখানে জন্ম নিল যে-নারী তার ছিল এক তীব্র ভীতি রোমান্টিক প্রেম ও মানবিক যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে। অথচ সে সন্তানের ব্যাপারে ছিল অতি দুর্বল। মা হওয়ার জন্যে ভয়ানক কাতর। সন্তান অভিলাষী এই নারী তার এই প্রচণ্ড ও অদম্য ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে নদীর ধারে গিয়ে একমনে ধ্যান শুরু করে। স্থির করে তার আরাধ্যকে অর্জন না করা পর্যন্ত সে এভাবেই বসে থাকবে। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ কোনোকিছুকেই পরোয়া করে না সে। হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করে, একটি বৃহৎ বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে। গাছটির নাম তুবা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এ গাছ এত বড় যে তার সামনে দাঁড়ালে আশপাশের আর কিছু দেখা যায় না। তুবা গাছের ছায়ায় যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকরা অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ঘোড়া চালিয়ে চলে যেতে পারে। বিশ্রাম নিতে পারে। দূরপাল্লার পথিকরা তুবা গাছের নিচে শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে রাত্রি কাটায়। এই গাছের পাতায় সাদা, হলুদ, সবুজ আর লাল রঙের সমাবেশ। তুবা গাছের শেকড় থেকে অনবরত ফোয়ারার মতো উথলে পড়ে খাঁটি মধু, দুধ ও দ্রাক্ষারস। দেখতে দেখতে গাছটি আরো বড় হয়। একসময় এ গাছে ফুল ফোটে। সহস্র সহস্র নয়নাভিরাম উজ্জ্বল রঙের ফুলে ভরে যায় তুবা গাছ। তুবা গাছের পাতা ও ফুল থেকে অপূর্ব সুবাস বেরিয়ে আসে, যা সত্যি অতুলনীয়। তুবার সুগন্ধ আশপাশের লোকজনকে উন্মনা করে, মোহিত করে, নির্মল আনন্দ দেয়। তুবা ফুলের পাপড়ি দিয়ে খুব মিহি ও মসৃণ একরকম কাপড় তৈরি হয়, যা দিয়ে শৌখিন ব্যক্তিদের জন্যে বিশেষ এক ধরনের পোশাক বানানো যায়। একসময় ফুল থেকে জন্ম নেয় অত্যন্ত সুস্বাদু এক ফল। এই ফলের স্বাদ এমনই অসাধারণ যে একবার যে তুবা ফল খেয়েছে, সে কোনোদিন এর কথা ভুলবে না। নদীর ধারের এই বিশাল তুবা গাছ থেকে অনবরত জলে টুপটাপ করে পড়ে তুবার ফল ও ফলের বিচি। নদীর স্রোত সেই ফল ও বিচি বয়ে নিয়ে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূর-দূরান্তে। এমনি করে বহু সন্তানের জননী এই নারী, এই তুবা গাছ, তার সাধের সন্তানদের সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়।

শাহারজাদী

মেয়েটির চোখ দুটো গিয়ে পড়ল যেখানে সেখানে জন্ম নিল শাহারজাদী বলে আয়তনয়না এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী — যার জ্ঞান, বুদ্ধি, কলাকৌশল, দূরদৃষ্টি ও সৃষ্টিশীলতার কথা রাজ্যময় পরিচিত। প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ শাহ্‌রিয়ারের প্রধান উজিরের কন্যা শাহারজাদী। ইদানীং বাদশাহ শাহ্‌রিয়ারের মনমেজাজ খুবই খারাপ। তার পত্নীর অবিশ্বস্ততার কারণে রাগান্বিত শাহ্‌রিয়ার সম্পূর্ণ নারী জাতির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েই তাই ক্ষান্ত হয়নি বাদশাহ, পুরো নারী জাতির ওপর-ই জমে উঠেছে তার তীব্র ঘৃণা। শাহ্‌রিয়ার তার প্রতি তার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প নেয়। তার ধারণা, পৃথিবীর সকল মেয়েই নষ্ট প্রকৃতির। ফলে তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। মৃত্যুই তাদের প্রাপ্য। ফলে তার আদেশমতো তার প্রধান উজির প্রতিদিন রাজ্য থেকে একটি করে কুমারী কন্যা জোগাড় করে আনে। বাদশাহ সেই রাতেই মেয়েটিকে বিয়ে করে এবং পরদিন খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই তার আদেশে নববধূকে হত্যা করা হয়। দেখতে দেখতে রাজ্যময় প্রায় সকল কুমারীকেই এভাবে হত্যা করে ফেলে শাহ্‌রিয়ার। এদিকে উজির বেচারা ভয়ে কাঁপে। কেননা নিত্যনতুন কুমারী এনে দিতে না পারলে তার নিজের গর্দানই যাবে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ রাজ্য খুঁজে বিবাহযোগ্য কুমারী মেয়ে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এই দারুণ অসময়ে পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসে শাহারজাদী। সে বাবাকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে সেই রাতে নিজেই হয় সেই কুমারী, যাকে বাদশাহ বিয়ে করে। কিন্তু তার সহজাত তীক্ষ্ম বুদ্ধি, কলাকৌশল ও সৃজনশীলতার গুণে বিয়ের রাতে সে বাদশাহকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করায় তার মুখ থেকে খুব মজার এক গল্প শোনার জন্য। এতই মনোগ্রাহী সেই কাহিনী ও বলার ধরন যে শাহ্‌রিয়ার মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতে থাকে। গল্প শুনতে শুনতে ভোর হয়ে যায়। কিন্তু এই আশ্চর্য গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটিকে তো খুন করা যায় না। ফলে শাহারজাদীর আয়ু আরো একটা দিন বেড়ে যায়। পরদিন রাতে সেই গল্প শেষ করে আরেক নতুন কাহিনী শুরু করে শাহারজাদী, যা আরো চমৎকার, আরো মনোগ্রাহী। জাদুর পরশের মতো শাহারজাদীর এই গল্প বলা বাদশাহকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে দেয়। সে একেবারে নড়তে পারে না, এমন জমজমাট কাহিনি। এভাবে রাতের পর রাত শাহারজাদী একের পর এক অভিনব গল্প শোনাতে থাকে বাদশাহকে, কখনো প্রেমের গল্প, কখনো বিচ্ছেদের, কখনো হাস্যরসাত্মক, কখনো যৌন-উত্তেজক, কখনোবা শুধুই কবিতা। এইসব কাহিনি বা কাব্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশই চেনা পৃথিবী থেকে নেওয়া। কখনো তা পঠিত কোনো বই থেকে উদ্ধৃত। কখনোবা তা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা বা স্থান নিয়ে রচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো তা নেহায়েত জাদুবাস্তবতার গল্প। আর এ শুধু তো গল্প বা কাহিনি নয়, গল্প বলার কলা ও কৌশলও যা শাহ্‌রিয়ারের মতো বাদশাহ্‌কে তার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়ে দেয়। এভাবে শাহারজাদী তার বুদ্ধি, সহমর্মিতা, সৃষ্টিশীলতা ও কৌশল দিয়ে রাতের পর রাত নিত্যনতুন গল্প শুনিয়ে শুধু নিজেই নয়, রাজ্যের আরো অনেক মেয়ের জীবন বাঁচায়।

চিত্রাঙ্গদা

মেয়েটির পা দুখানা গিয়ে পড়ল হিমালয়ের পাদদেশে মণিপুর রাজ্যে। আর সেই পা থেকে জন্ম নিল মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা তার নির্মেদ দীর্ঘ পা দুখানি নিয়ে শুধু যে হরিণের মতো অতি দ্রুত ছুটে চলতেই পারে তা নয়, ছোটবেলা থেকেই তলোয়ার যুদ্ধেও সে হয়ে ওঠে সকলের সেরা। তার ধনুক থেকে নির্গত তীর কখনো লক্ষ্য ভেদ করতে ব্যর্থ হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হতে না হতে চিত্রাঙ্গদা রণশাস্ত্রের সকল শাখায় অভূতপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়ে একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। মণিপুরকে বাইরের কোনো শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাজ্যের সকল জনগণের প্রধান ভরসা রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নিতে চিত্রাঙ্গদার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। সে পুরুষের বেশে সারা রাজ্যময় এমনকি বনেজঙ্গলেও ঘুরে বেড়ায় নির্ভয়ে। পড়াশোনা, যোগ ব্যায়াম, অস্ত্রচালন, এসব বিভিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দিন কাটে চিত্রাঙ্গদার। নারী বলে সে নিজেকে আলাদা মনে করে না। পুরুষ যা করতে সক্ষম সেটা করতে সে নিজেও সমর্থ, এটাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে চিত্রাঙ্গদা। তার জীবনযাপন ও দৈনন্দিন কার্যকলাপে সেটাই প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়। চিত্রাঙ্গদা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে যখন সে লক্ষ করে সনাতন পুরুষ নারীদের হয় দাসী অথবা দেবী হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। পুরুষের পাশাপাশি সহ-অবস্থানের সুযোগ এবং তাদের সমান মর্যাদা নারী কখনো ভোগ করতে পারে না। এই ব্যাপারটা চিত্রাঙ্গদাকে দারুণভাবে পীড়া দেয়। এরই ভেতর একদিন হঠাৎ বনের ভেতর অর্জুনকে দেখে সুপ্ত নারীসত্তা জেগে ওঠে চিত্রাঙ্গদার এবং তাৎক্ষণিকভাবে সে অর্জুনের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু সে জানে তার এই পুরুষালি বেশ ও চালচলন অর্জুনের পছন্দ হবে না। ফলে অর্জুনের মনজয় করার বাসনায় চিত্রাঙ্গদা দৈবগুণে এক পরমাসুন্দরী নারীতে পরিণত হয়। অর্জুন তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায় ও বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বাঞ্ছিত সবকিছু ঘটে যাওয়ার পর চিত্রাঙ্গদার মনে হঠাৎ এক গভীর অনুশোচনা ও সংকোচ দেখা দেয়। তার কেবল-ই মনে হতে থাকে, অর্জুনের সঙ্গে সততার পরিচয় সে দেয়নি। তীব্র অনুতাপ থেকে সে তার প্রকৃত স্বরূপ অর্জুনের কাছে প্রকাশ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কেননা চিত্রাঙ্গদা বোঝে, যে রূপ দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়েছে সেটা চিত্রাঙ্গদার আসল রূপ নয়। ইতোমধ্যে মণিপুর আক্রমণ করে বসে বহিরাগত এক শত্রুবাহিনী। রাজ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণ চিত্রাঙ্গদার মুখের দিকে চেয়ে থাকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে। তখন অবিকল সেই আগেকার যোদ্ধার বেশে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ পরিচালনা শেষে মণিপুর রক্ষা করতে সমর্থ হয় চিত্রাঙ্গদা। আর অর্জুন চিত্রাঙ্গদার এই নতুন রূপ — এই বীরত্ব দেখে অভিভূত। চিত্রাঙ্গদার পুরুষালি পোশাক তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না, বরং তার মুগ্ধতা বাড়ায়। চিত্রাঙ্গদার বুকের ওপর থেকেও এতদিনে এক ভারী পাথর নেমে যায়। অর্জুনকে সে আর মিথ্যা দিয়ে বেঁধে রাখছে না, এই বোধ তাকে শান্তি দেয় — পরিতৃপ্ত করে।

কালী

মেয়েটির গলাকাটা মাথাটি গিয়ে পড়ল যেখানে সেখান থেকে জন্ম নিল মহা শক্তিধর এক নারী-দেবতা, নাম যার কালী, শিবের সহচারিণী। জগৎ ও স্বর্গের সকল শক্তি পরাজিত হলে, সকল উপায় অকার্যকর প্রমাণিত হলে, অসুর আর দানবকে বধ করার জন্যে কালী এসে মর্ত্যে আবির্ভূত হন। পৃথিবীর এই দুঃসময়ে শিবসহ সকল দেবতা মিলে স্থির করেন কালীর আবির্ভাব মর্ত্যে একান্তই জরুরি এই মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে দেবকুলের নির্ধারিত চর মর্ত্যে এসে হাজির হন সেই টুকরো টুকরো করা মেয়েটির গলাকাটা মাথাটির খোঁজে, যার থেকে কালীর সঞ্চার ঘটানো হবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাতে ঘটে যায় এক মহাবিপর্যয়। কালীর জন্ম হয় সেই কর্তিত ও খণ্ডে খণ্ডে নিক্ষেপিত কাটা মুণ্ডু থেকেই, তবে একটু বিচিত্রভাবে, যেটা ঠিক পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। মেয়েটির খণ্ডিত মাথাটি যেখানে গিয়ে পড়েছিল সেখান থেকে মহানগরের সবচেয়ে বড় গণিকালয় খুব দূরে নয়। সেদিনই সন্ধ্যায় সেই গণিকালয়েও একটি গণিকা-কন্যা খুন হয়। ওই পল্লীতে এরকম মাঝে মধ্যে দু'একটা নারীর খুন হওয়ার ঘটনা খুব অসাধারণ বা ব্যতিক্রমী কোনো ব্যাপার নয়। কোনো খরিদ্দার, নাকি কোনো ঈর্ষাকাতর গোপন প্রেমিক অথবা গণিকালয়ের স্বার্থান্বেষী কোনো দালালের সঙ্গে অর্থ নিয়ে অবনিবনা, মেয়েটির ধড় থেকে গলা কেটে মস্তকটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্যে দায়ী, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু মৃতদেহের দুটো টুকরোই অর্থাৎ মস্তক ও ধড় দুটোই টেনে এনে গণিকালয়ের লোকেরা ফেলে দিয়েছিল নিকটবর্তী সেই মাঠে, যেখানে অনেক দূর থেকে বাতাসে উড়ে এসে পড়েছিল সেই অবিরত স্বপ্ন-বোনা-স্বপ্ন-দেখা মেয়েটির কাটামুণ্ডুটিও। স্বর্গ থেকে দেবতার চর এসে যখন দেখে সেখানে, মাঠের ওপর পড়ে আছে পাশাপাশি দুটি মস্তক ও একটি ধড়, সে তাড়াতাড়ি করে সঠিক মুণ্ডুটি বেছে নিয়ে ওটাকে জোড়া দিয়ে দেয় পাশেই পড়ে থাকা গণিকার ধড়ের সঙ্গে। অতঃপর তাতে প্রাণসঞ্চার করে সে। সব কাজ শেষ হলে, শিব দূর থেকে মন্ত্র পড়ে তাকে কালীতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু কেউ তখনো জানে না যে, মুণ্ডুটি সেই অসাধারণ, স্বপ্নচারী ও ব্যতিক্রমী মেয়েটির হলেও শরীরটা একজন গণিকা-কন্যার। ফলে রুদ্রময়ী কালী তার তলোয়ার দিয়ে দুর্জনকে একনাগাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বধ করে গেছেন সত্য, গলায় পরেছেন ব্যবচ্ছেদ করা দুর্জনের খণ্ডিত মুণ্ডুর মালা। নিহত বা আহত অসুরের প্রতি রক্তবিন্দু থেকে একটি করে মহাসুরের নতুন করে জন্ম রোধ করার উদ্দেশ্যে কালী ক্রমাগত রক্ত চুষে নিতে থাকে তার তাবৎ শিকার থেকে। কিন্তু এই যে বিশাল শক্তিধর, প্রচণ্ড সাহসী, বীর কালী যে বিশ্বসংসারে সংশয় ও শঙ্কাবিহীন বলে পরিচিত, সে কিন্তু রাত হলেই অন্য এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার দেহ, যা আসলে এক গণিকার দেহ, তাকে প্ররোচিত করতে থাকে গণিকালয়ের খুপরিতে ঢুকে যেতে এবং জানালার পাশে বসে নানান অঙ্গভঙ্গি করে, নেচেকুঁদেগেয়ে, খদ্দেরের মন ভোলাতে। তারপর রাতভর শরীর শরীর খেলায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে। দিনের কালীর ন্যায়পরায়ণতা ও প্রচণ্ড দাপটে দুর্জন বধ আর রাতের কালীর শরীর থেকে উৎসারিত অসীম ভোগের আকাঙ্ক্ষা মিলে যে দেবতার সৃষ্টি হয়, সেই কালীই হয় মানুষের সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপন এবং চেনা দেবতা। কেননা সে শুধুই কল্যাণময়ী, শুধুই দুর্জনবধকারী, শুধুই সকল ভালো এবং দেবতুল্য গুণের সমন্বয় নয়, সে কেবলই শক্তির প্রতীক নয়, তার মস্তিষ্ক যাই বলুক, তার শরীর লালায়িত হয়ে ওঠে পুরুষসঙ্গ লাভের জন্যে, উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী আকর্ষণীয় শরীর নিয়ে প্রকাশ করে তার ভোগের জন্যে কাতরতা। উলটো লিঙ্গের মানুষকে আকর্ষণ করার জন্যে বিভিন্ন ছলাকলা তাকে মানবিক করে তোলে। ভালো ও মন্দের একত্র সহবাস, একই শরীরে ভক্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা কালী দেবীকে আমাদের কাছের মানুষ বানিয়ে ফেলে। একজনের দেহ ও অন্যজনের মুণ্ডু দিয়ে গড়া এই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের সংবদ্ধ কালীকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন উপকথা নিয়ে গল্প রচনাকারী বিখ্যাত নারী-লেখক মারগারিত ইউরসেনার, বেলজিয়ামে যাঁর জন্ম, ফ্রান্স ও আমেরিকার যৌথ নাগরিক ছিলেন যিনি।

সতী

মেয়েটির কান দুটো থেকে জন্ম নিল সতী। হিমালয়ের কোলে ছোট্ট এক রাজত্বে বাস করে প্রবল আত্মম্ভরী এক রাজা, যার নাম দক্ষ। দক্ষের ঘরেই জন্ম নেন সতী। বড় হওয়ার পর শিবকে দেখে ও তার কথা শুনে সে প্রেমে পড়ে। পিতার অপছন্দ সত্ত্বেও শিবকেই বিয়ে করে সতী। এতে সতীর পিতা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়। এই বিয়ের কিছুকাল পরে মূলত শিবকে অপমান করার জন্যেই দক্ষরাজা শিব ও সতী ব্যতীত চারপাশের সকল পরিচিত ও গণ্যমান্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। কথাটা কানে গেলে সতী শুধু যে বিস্মিতই হয় তা নয়, প্রচণ্ড আহতও হয়। সেইসঙ্গে সে মনকে এটাও বোঝায়, নিজের বাবার বাড়িতে যাওয়ার জন্যে আনুষ্ঠানিক নেমন্তন্নের প্রয়োজনইবা কী? ফলে সে ঠিক করে বিনা নেমন্তন্নেই যাবে সেখানে। শিব তাকে পুনঃপুন বারণ করে যেতে, কেননা সে বোঝে এর ফলাফল ভালো হবে না। কিন্তু সতীর জেদের কাছে অবশেষে হার মানতে হয় শিবকে। তারপরেও শিব অনুরোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে সতীকে, যাতে সে তার বাবার সঙ্গে কোনো কথাকাটাকাটি বা তর্কে না যায়। সতীকে বিশেষভাবে শিব বলে দেয় যেন সে এই বাড়ির কারো মুখে, বিশেষ করে দক্ষরাজার মুখে, শিবের নিন্দা না শোনে। কেননা শিব ভালো করেই জানে সতী তা সইতে পারবে না। যদি তারা সত্যি সত্যি ও ধরনের কথা ওঠায়, সতী যেন সচেতনভাবে তা না শোনে এবং প্রয়োজনে তার কান দুটো যেন তখন বন্ধ করে রাখে। সতী বাবার বাড়িতে গিয়ে দেখে সেখানে সকলেই তার প্রতি কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আচরণ করছে এবার। সতী বোঝে, এ বাড়িতে আগেকার সেই অবস্থান বা আদর আর নেই তার। আহত, বিমর্ষ সতী পিতাকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, এত নিমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে কেমন করে তার স্বামীর একটু জায়গা হলো না এ বাড়িতে। উত্তেজনায়, অপমানে সতী ভুলে যায় শিব তাকে কী প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল। সে কান খাড়া করে শোনে তার বাবা কীরকম করে সবিস্তারে শিবের নিন্দা করছে। দক্ষরাজা সোজাসাপটা বলছে, ছেঁড়া তেনা বা বাঘের ছাল পরিহিত, জটা মাথায়, ছাইভস্ম গায়ে-মাখানো, নেশাখোর সেই লোক, অর্থাৎ সতীর স্বামী, সাপ আর ত্রিশূল হাতে নিয়ে আর যা-ই করুক, এমন উঁচু পর্যায়ের অতিথিদের সঙ্গে এসে একত্রে বসতে পারে না। সতী স্পষ্ট বোঝে তার স্বামীর প্রতি তার পিতার শুধু যে কোনো শ্রদ্ধা নেই তা-ই নয়, দক্ষরাজা শিবকে রীতিমতো ঘৃণাও করে। এটা বুঝতে পেরে মনের দুঃখে সতী তক্ষুনি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। সতীর এরকম করুণ মৃত্যুর খবর শুনে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ন শিব তার দলবল নিয়ে দক্ষরাজ্য আক্রমণ করে এবং অনায়াসে দক্ষরাজাসহ তার পুরো সেনাবাহিনীকে খুন করে গোটা রাজ্য তছনছ করে দেয়। তারপর সতীর মৃতদেহটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ত্রিভুবন ধ্বংস করে ফেলতে পারে এমন প্রলয়নাচন নাচতে শুরু করে। শিবের এই উন্মাদের মতো প্রচণ্ড ও অবিরাম নাচের দমকে সমস্ত চরাচর যখন প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জোগাড়, তখন জগৎকে রক্ষা করার জন্যে সকল দেবতা একসঙ্গে মিলে বিষ্ণুর কাছে এসে ধন্না দেয়। বাধ্য হয়ে বিষ্ণু তার চক্র দিয়ে সতীর মৃতদেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। কাঁধ থেকে সতীর দেহ উধাও হয়ে যাওয়ার পর তবেই তার প্রলয়নাচন বন্ধ করে শিব। আর সেইসঙ্গে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় পৃথিবী। বিষ্ণুর ইচ্ছায় অতঃপর সতীর পুনর্জন্ম হয় পার্বতী হিসেবে, যে বড় হয়ে পুনরায় শিবকেই বিয়ে করে।

এ কথা সকলেই জানে যে বিষ্ণুর চক্রে খণ্ডিত সতীর দেহ থেকে পুনরায় জন্ম নিয়েছিল পার্বতী।

কিন্তু এটা বোধহয় অনেকেরই জানা ছিল না যে, ব্যবচ্ছেদ-করা নারীর শরীর থেকে শুধু পার্বতী বা উমা নয়, দুর্গা, আয়েশা, সীতা, রাধা, রুথ, আম্রপালি, এথেনা, তুবা, শাহারজাদী, চিত্রাঙ্গদা, কালী ও সতীর মতো মেয়েরা বারবার ফিরে ফিরে আসে। হয়তো অন্য কোনো নামে, হয়তো অন্য কোনো দেশে, হয়তো অন্য কোনো সময়ে।

কিন্তু তারা আসে — আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋতুমতী কন্যা

রজস্বলা নারী

একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের আতিথ্যে বেশ কয়েকটি গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। গ্রামীণ মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তাদের সামাজিক সচেতনতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের নবঅর্জিত ক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রাম্য নারীদের ভেতর এই বিশাল পরিবর্তনের ধারা। শত-শত এনজিও, বহু নারী প্রতিষ্ঠান ও সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর দৈনন্দিন ও বাস্তব নানারকম সমস্যার সমাধানে সদা ব্যস্ত। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন আইনগত সমস্যায় এসব প্রতিষ্ঠান কমবেশি সবাই কাজ করে যাচ্ছে। এসব দেখেশুনে খুব ভালো লাগে। একসময় যে গ্রাম্যবধূ বিশাল ঘোমটা মাথায়, মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে, পরপুরুষের সামনে বের হতে লজ্জাবোধ করত, আজ সে জড়তাহীনভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে কাজ করছে, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলছে, নিজের শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে নিজের গরজেই চলে আসছে স্বাস্থ্যসেবা নিতে। মাত্র দুই যুগের ভেতর আমাদের উপমহাদেশে এ ধরনের বিশাল পরিবর্তন অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঘটেছে কি না সন্দেহ।

এরপরেও নারীর প্রাত্যহিক জীবনের মৌলিক একটি প্রয়োজন — গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক নিয়ে আজো কেউ মুখ ফুটে কথা বলছে না, বা এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো কর্মসূচি নিচ্ছে না দেখে আমি বিস্মিত হই। তেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের নারীদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সর্বস্তরে যে উদ্বেগ এবং যে কারণে এই মহিলারা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলাদা মনোযোগ দাবি করছে, তা হলো এই বয়সী মহিলাদের সন্তান গ্রহণের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে ভিত্তি করেই তাদের দেওয়া হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন উপদেশ ও উপকরণ, প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসূতি মায়ের পরিচর্যার, বিতরণ করা হচ্ছে আয়রন ট্যাবলেট, নিরাপদ মাতৃত্বের অঙ্গীকার। কিন্তু এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত এসবের চাইতেও মৌলিক, বাস্তব ও ব্যাপক একটি সমস্যার কথা কেউ কিন্তু উত্থাপন করছে না। বস্তুত প্রায় সকলেই অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করছেন এ ব্যাপারটা অর্থাৎ চূড়ান্ত এক বাস্তবতা। আর সেই বাস্তবতাটা হলো এই যে, কোটি-কোটি রজস্বলা নারী, যাদের নিয়ে আমাদের সকলের এত মাথাব্যথা, যাদের মাসিক একবার বন্ধ হলে সম্ভাব্য নতুন প্রাণের সংযোজনের আশঙ্কায় এবং এর অর্থনৈতিক পরিণামের ভয়াবহতায় সকলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, তারা প্রতি মাসে একটি করে সপ্তাহ কেমন করে কাটায়, শরীর নিয়ে কতটা ব্যস্ত, বিব্রত ও সংকুচিত থাকে, তার খবর কেউ রাখি না আমরা। এ বিষয়টি যে আলাদা কোনো গুরুত্ব পেতে পারে, তাও কেউ মনে করি না। অথচ এটি একটি বাস্তব ও কঠিন সমস্যা। আপনাআপনি এর সমাধান হবে না। কেননা সে ধরনের পারিবারিক কাঠামো, বাসস্থান, বাথরুম, ডাস্টবিন আমাদের গ্রামে নেই। নেই মেয়েদের কোনো প্রাইভেসি : নির্জন একখানি ঘর, পরিচ্ছন্ন একটু জায়গা। ফলে মাসের প্রত্যাশিত ওই দিনগুলো আসে তাদের কাছে বিভীষিকার মতো। এমনিতেই নিজের শরীরের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত পল্লিনারী। তার ওপর এই বিশেষ সময়ে তারা পড়ে মহাবিপদে। তার একান্ত ব্যবহৃত রঞ্জিত কাপড়খণ্ড ধোয়ার জন্য না আছে কোনো গোপন জায়গা, না আছে সবসময় প্রয়োজনীয় এক টুকরো সাবান, না আছে সূর্যালোকে উজ্জ্বল প্রাইভেট অথচ খোলামেলা কোনো স্থান, যেখানে রোদে সেঁকে জীবাণুমুক্ত করে দিতে পারে তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী। সবচেয়ে বড় কথা — ইচ্ছে থাকলেও, সামর্থ্য হলেও, কেবল ফেলে দেবার উপযোগী জায়গার অভাবেও গ্রামীণ মেয়েদের দিনের পর দিন বা মাসের পর মাস মাত্র কয়েক টুকরো কাপড়খণ্ডই ব্যবহার করতে হয়। যা থাকে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গায় মেলে দেওয়া, হাজার রকমের জীবাণুযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর লতিফা শামসুদ্দিনের এক গবেষণার ফলাফলে জানা গেছে, আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে মূত্রাশয় ও যৌনাঙ্গের বিভিন্ন সংক্রামক অসুখের একটা বড় কারণ মাসিকের সময় তাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অক্ষমতা ও অস্বাস্থ্যকর উপায়ে মাসিক মোকাবিলা করা। ফলে আমাদের মনে হয়, এই বিশেষ ব্যাপারটির সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করলে তা গ্রামীণ ও শহরের গরিব নারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য খাতে একটি বড় রকমের ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

নানান কারণে এদেশের মেয়েরা প্রাকৃতিক এই অতি স্বাভাবিক নিয়মটাকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। প্রথমত, প্রায় প্রতিটি ধর্মেই রজস্বলা নারীদের ধর্মস্থানে যেতে বা ধর্মীয় আচরণ করতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে অধিকাংশ নারীই নিজের শরীরকে এ সময় পঙ্কিল, অস্পৃশ্য ও নোংরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার ওপর ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বিশ্বাসও অনেকের মধ্যে কাজ করে যে, এসময় স্বামীসঙ্গও অপবিত্র বা অনুচিত। অর্থাৎ এই সময় যৌন সম্পর্কের জন্যও সে অনুপযোগী। ডাক্তারি শাস্ত্রে এই ধরনের কোনো বিধিনিষেধ যদিও নেই এবং পরিবার পরিকল্পনার বিবেচনায় সময়টি যদিও সবচেয়ে নিরাপদ, তবু বাস্তব অসুবিধার কারণেই অধিকাংশ দম্পতি এ সময় যৌনসংসর্গ এড়িয়ে চলে। এ কারণেও কোনো-কোনো মেয়ের নিজেকে এ সময় অপাঙক্তের মনে হয়। এছাড়া মাসিকের সময় সামাজিক ও পারিবারিক নানান বিধিনিষেধ যেমন খাবার-দাবার, চলাফেরায় বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা, খাবার তৈরি ও আচার নাড়তে বারণ করার মতো ব্যাপারগুলো মেয়েদের মধ্যে এমনিতেই একরকম হীনমন্যতার জন্ম দেয়।

আরো একটি ব্যাপার নিয়ে মাঝে-মাঝে আমি ভাবি। এটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ভাবনা। আমাদের সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে একটি বড় দুর্নাম, তারা অনেকেই ব্যক্তিগত আচরণে খুব খোলামেলা নয়। খানিকটা লুকোচুরি করতে অভ্যস্ত। তারা সোজাসাপটা কথা বলে না বা চিন্তা করে না। অপবাদ আছে, নারীরা রহস্যময়ী, সবসময়ই আলোছায়ায় তাদের চলাচল, চিন্তাভাবনাও তেমনি খুব সহজ সরল নয়। অর্থাৎ মুক্তমনা তারা নয়। কথাটা পুরুষরা নিন্দাচ্ছলে পুনঃ পুনঃ বলে এর সামাজিক একটি স্বীকৃতি মোটামুটি আদায় করে নিলেও ব্যাপারটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তবু আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের যদি শরীর নিয়ে, তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা নিয়ে সদা সতর্ক, বিব্রত ও সংকুচিত থাকতে না হতো, যদি তার যৌনতার প্রতিটি অনুষঙ্গকে গোপন বা আড়াল করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে না হতো, যদি সহজভাবে তা গ্রহণ করতে পারত, নিজের শরীর নিয়ে কোনোরকম দুর্ভাবনা না করে তাকে বিকশিত হতে দিতে পারত, তা নিয়ে গর্বিত বোধ করতে পারত, তাহলে অনেক বেশি সহজ, খোলামেলা, দৃঢ়চেতা ও আস্থাশীল তারা হয়তো হতে পারত।

ফলে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মকাণ্ডে যে সকল নেত্রী বা সংগঠন দিবারাত্র কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের সকলকে নতুন করে আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই : প্রতিটি দিনেই আমাদের দেশের কয়েক কোটি নারী রজস্বলা থাকছে; তাদের এই বিশেষ সময়টার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব এড়িয়ে তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তাদের পরিবার পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন কখনো পূর্ণাঙ্গতা পাবে না। ফলে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে প্রতি মাসে এই নারীদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া যাক বেশ কিছু পরিষ্কার পুরনো কাপড় বা তুলো আর এক টুকরো গায়ে মাখার ও এক টুকরো কাপড় ধোয়ার সাবান। তবে গ্রামের মহিলাদের যদি আমি জেনে থাকি, বুঝে থাকি, এটাও জানি — তাঁরা ধবধবে পরিচ্ছন্ন পুরনো কাপড় পেলে নিজের জন্য তা ব্যবহার না করে হয়তো সন্তানের কাঁথা সেলাই করতে লেগে যাবেন। ফলে তুলো বা টুকরো কাপড় নয়, সম্মিলিত উদ্যোগে তাদের নিজেদের হাতেই তৈরি করে নিতে হবে আজকের যুগোপযোগী কম খরচের স্যানিটারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাওয়েল। যেমন করে তারা আজ তৈরি করে ওরস্যালাইন। আর রিং ও স্লাব দিয়ে গ্রামে যেরকম এবং যেই হারে স্যানিটারি পায়খানা তৈরি হচ্ছে, তারপর আর কিছুদিন বাদে ব্যবহৃত ও পরিত্যাজ্য বস্তুগুলোর নিষ্কাশনেরও চিন্তা থাকার কথা নয়।

আমি আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের তখনো দেখেছি যখন তারা সায়া-ব্লাউজহীন শরীরে একখানা দশহাতি শাড়ি পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কোনোমতে লজ্জা নিবারণ করতে। আর সবসময় জবুথবু হয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই মেয়েদেরই আমি এখন দেখি সায়া ও ব্লাউজের ওপর শাড়ি পরে কত সাবলীলভাবে, কত স্বচ্ছন্দে গৃহনির্মাণের কাজে মাটি কাটায়, ইট ভাঙায় অংশ নিতে। আমি আশা করে আছি সেই সুদিনের, যেদিন তাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন পরিধেয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে এক সেট অন্তর্বাস ও সেইসঙ্গে প্রতিমাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর সরঞ্জাম। আমি যেন চোখ বুজে দেখতে পাই কী গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে, কতখানি সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দৃঢ় পায়ে সোজা কর্মস্থলে হেঁটে যাচ্ছে আমার সেই গ্রামীণ সহোদরারা। অবশিষ্ট দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, জড়তা কাটিয়ে নিজের সুগঠিত শরীর ও যৌনতার ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ও গর্বিত নারী আত্মপ্রত্যয়ের আলাদা ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মাঠে, কারখানায়, অফিসে, হাসপাতালে, স্কুলে, আদালতে, দোকানে, ট্রেনে, বাসে — সর্বত্র।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলা ফুলবানুরা

আরিচা ঘাটে যখন পৌঁছাল ওরা, বেলা একটা বেজে গেছে। সঙ্গে আনা খাবারের থলি থেকে কয়েকটা আঙুর, একটা কলা আর একটা ক্যান স্প্রাইটই যথেষ্ট নীলার দুপুরের খাবারের জন্য। অন্যরা অবশ্য আরো ক্ষুধার্ত ছিল। খেলও প্রচুর।

অনেক ভোরে বেরিয়েছে ওরা। পথে আর কোথাও থামেনি। সারা পথটা এক রকম। দিব্যি কেটে যায়। কিন্তু এই ঘাট পার হওয়া! সে এক অন্য অভিজ্ঞতা। সময় এখানে এসে যেন থেমে যায়। জীবনের সব তাড়া অর্থহীন। নিয়ম-কানুন, সভ্যতা-ভব্যতা সম্পূর্ণ অপরিচিত শব্দ এ জায়গাটায়। এখানে এলে যেন ভাগ্যে বিশ্বাস করতে সাধ হয়। দুপুরের দুঃসহ রোদে পুড়তে পুড়তে অপেক্ষা অসহনীয় হয়ে আসে। তখন ছোটখাটো দুর্নীতিতে অন্যকে জড়াবার প্রবণতা কেন মাঝে মাঝে প্রবল হয়, বুঝতে পারা যায় যেন।

তবু একসময় প্রতীক্ষিত সময় আসে। চাকা ঘোরে। নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে আবার মাটিতে নেমে পড়ে যাত্রীরা। ওরাও পড়ল। গাড়িটা চলছিল বেশ জোরেই। ড্রাইভাররা একেবারে কথা শোনে না। পইপই করে বারণ করার পরও নিরাপত্তার চাইতে থ্রিলটাকেই বড় করে দেখে। বিশেষ করে ঘাট পার হবার পর তো কথাই নেই। মনে হয় হারানো সবটা সময় যেন তাৎক্ষণিকভাবে পুষিয়ে নেবে ওরা।

AMARBOI.COM

একটা স্পিডব্রেকারে গাড়িটা বড় রকম ধাক্কাই খেল একটা। যাত্রীরা মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করে মোটামুটি নিশ্চুপ। এমন পরিচিত হাইওয়েতে এ ধরনের একটা সতর্ক ফলকের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা ভুলে যাওয়া ক্ষমাযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হলো না। তবু মুখে ড্রাইভারকে কেউ ধমক দেয় না। আরিচার এই পথ বড়ই বিপদসংকুল। যার হাতে প্রাণ সঁপে দেওয়া, তাকে চটিয়ে লাভ নেই — সবাই তা জানে।

শরীরের নিচের দিকে একটা উষ্ণ মৃদু প্রবাহে সামান্য চমকে ওঠে নীলা। ঝাঁকুনিটা আচমকা। হাইওয়েতে পরিচ্ছন্ন টয়লেটের অভাব। বহুক্ষণ একইভাবে বসে থাকতে হয়েছে। তলপেট চাপা। এসবেরই মিলিত কারণ হবে। নীলা ভয় পায় না। শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সামান্য দুর্ঘটনা। সামলে নেবার মতোই। সোজা হয়ে বসে নীলা। ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু না। সমতল রাস্তা দিয়ে মসৃণভাবে দ্রুত চলা গাড়িতে বসে বসেও আবার একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি। মনে হচ্ছে শরীরের কোথাও, তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে, একটা প্রচণ্ড রকম ক্ষরণ চলছে। একটা ভাঙন। নীলা এবার সত্যি শঙ্কিত হয়। পায়ের পাতা জোড়া একত্রিত করে। দুই হাঁটু জোড়া লাগিয়ে চুপচাপ বসতে গিয়ে হঠাৎ তার দাঁতে দাঁত লেগে আসতে চায়। অথচ বাইরে প্রচণ্ড রোদ্দুর। পাজেরো গাড়ির ভেতর এয়ারকন্ডিশনার চললেও ঠাণ্ডাটা অসহনীয় নয়। নীলা ঠিক কী করবে বুঝতে পারে না।

তার হাতে ধরা ছিল একটা মোটা ও বড় আকারের বাদামি খাম। যার ভেতর কালকের ওয়ার্কশপের সমস্ত কাগজপত্র। কালক্ষেপণ না করে নীলা সিট থেকে শরীরটিকে সামান্য একটু ওপরে তুলে ধরে। আর তারপর পার্শ্ববর্তী যাত্রীর অন্যমনস্কতার সুযোগে খামটি চটপট হাত থেকে স্থানান্তরিত করে সিটের ওপর বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর দুম্ করে বসে পড়ে পুনরায়। গাড়ির অন্য চার আরোহীর দৃষ্টি এড়িয়ে সমস্ত কাজটা এত দ্রুত সহজ ও নিপুণভাবে করে যে মনে হয়, এ ধরনের হাত সাফাইয়ের কাজ যেন সে আজীবন করে আসছে। কিন্তু কার্যত তা নয়। জীবনে এই প্রথম। এর আগে আর কখনো গাড়ির পেছনের সিটের নরম গদির ওপর কাগজের আচ্ছাদন বিছাতে হয়নি নীলার। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হয়। মনে হয়, ভীতু, কুচুটে, মিনমিনে স্বভাব আর অনুক্ষণ গোপন করার প্রবণতা আছে বলে মেয়েদের যে দোষারোপ করে অনেকে, তার ভেতর আংশিক সত্যতাও যদি থেকে থাকে, সেটির বড় কারণ আজ যেন আবিষ্কার করল নীলা।

বসতে গিয়ে হাতের আঙুলের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘষে যাওয়া শাড়ির ভেজা অংশ তাকে হিম-শীতল করে দেয়। পায়ের কাছ থেকে পেটিকোটের কোনা বের করে আঙুল মোছে নীলা। তাতেও আঙুলের ডগার লালিমা ভালো করে ঘোচে না। নীলার অসম্ভব কান্না পায়। অশ্রু এড়াতে জানালা খুলে বাইরে মুখ বের করে দেয়। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে ফেলে। তার ধারণা, দীর্ঘ এই পথে বন্ধ গাড়িতে অস্থির হয়ে পড়েছে ম্যাডাম। খোলা বাতাস দরকার তার।

নীলা শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকায়। হাইওয়ের পাশের সরু খালের এপার-ওপার দিয়ে গ্রামের লোকেরা বিচ্ছিন্নভাবে হেঁটে যাচ্ছে। পুরুষের পাশাপাশি অথবা আগেপিছে হাঁটছে মেয়েরা। আজ সারা বিশ্বে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধু মেয়েদেরই দেখছে নীলা — অথবা তাদের কথাই কেবল ভাবছে। আর কারো দিকে চোখ পড়ছে না। নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরছে মেয়েরা। কারো কোলে শিশু। কারো মাথায় বা কোমরে বোঝা। হাতে থলি। কারো কারো গায়ে ব্লাউজ নেই। শাড়ির নিচেও বোধহয় নেই পেটিকোট। অথচ একখণ্ড বস্ত্র — তার নিজের পরিহিত শাড়ির চাইতে যা কিনা কমপক্ষে দুই হাত লম্বায় ছোট — সামান্য এইটুকু আচ্ছাদন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কি সুন্দর করে ওরা নিজেদের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখছে। একটুও অসুবিধে হচ্ছে না লজ্জা নিবারণে। দৃপ্ত পদক্ষেপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের। সুডৌল নিতম্ব। কী অসাধারণ গর্বিত ও স্বাবলম্বী ওরা। নিজের দেশের খেটে-খাওয়া মেয়েদের এ রূপ এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি নীলা। কী সাবলীল চলাফেরা। কী অসাধারণ নিয়ন্ত্রিত জীবন। ওরা জানে, কেমন করে নিজেদের দেখাশোনা করতে হয়। অন্যের কাছে নিজেকে গ্লানিকর অবস্থায় ফেলতে না হয়। অথচ কী আশ্চর্য, বরাবর ওদের প্রতি করুণাই করে এসেছে নীলা। নিজের অফিস, ট্যুর, ক্লায়েন্ট, একগুচ্ছ সহকর্মী ও কর্মচারীপরিবৃত নীলা কতবার ভেবেছে, নিজের চারদিকে তাকিয়ে ভেবেছে প্রায় অশোভন পর্যায়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে সে। এতটা ভালো, এতটা স্বাচ্ছন্দ্য আর নিশ্চিন্তে থাকা ঠিক নয়, যেখানে অধিকাংশ লোক প্রতিনিয়ত এত অনিশ্চয়তায়, এত কষ্টে দিন কাটায়। অথচ আজ এই মুহূর্তে নীলার নিজেকে সবচেয়ে বেশি অসহায়, বিড়ম্বিত ও সবচেয়ে একাকী দুর্ভাগা মনে হয়। মনে হয়, পৃথিবীর সকলেই যে যার অবস্থায় মাথা উঁচু করে আছে। নীলাই শুধু জানে না সোজা হয়ে দাঁড়াতে।

গাড়ির ভেতরে চোখ ফেরায় নীলা। জামাল ঘুমুচ্ছে। ছেলেটা পারেও ঘুমুতে। সেই রওনা হবার পর থেকে মাঝে মধ্যে চোখ খুলে মুখে এক-আধটু খাবার পুরে দেওয়া ছাড়া বাকি সময়টাই সে অসাড়। পেছনে হেলান দিয়ে বসে বসে দিব্যি ঘুমুচ্ছে একটানা। এক-দুবার গাড়ির ঝাঁকুনিতে ওর মাথা হেলেও পড়েছে নীলার কাঁধে। সহাস্যে তা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে নীলা বলে ফেলেছে, 'উঃ! এই দিনে-দুপুরে এত ঘুমুতেও পারে কেউ।' অন্যরা খুব কিছু মন্তব্য করেনি। কেননা নীলা আর ড্রাইভার ছাড়া বাকি দুজনও অর্থাৎ ড. আনোয়ার আর প্রশান্তও প্রায় একই রকম। সবটা সময় না হলেও বেশ ঘুমিয়েছে ওরা। আধো জাগা আধো নিদ্রায়। অপ্রয়োজনীয় বাক্যব্যয়ে তাদের বড়ই আলস্য। ওদের ঘুমের দিকে তাকিয়ে নীলার হঠাৎ মনে হয়, সেও যদি এমন ঘুমিয়ে পড়তে পারত? যদি জেগে দেখত, সমস্ত অভিজ্ঞতাটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। কিন্তু তা তো হবার নয়। রাস্তার ঝাঁকুনি আর গাড়ির দ্রুতগতি, নীলাকে ততক্ষণে প্রায় ভাঙা কলসিতে পরিণত করেছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাছে রাস্তার ধারে ইট ভাঙছে বসে মেয়েরা। পরনে রংবেরঙের ছাপা শাড়ি। কোনো কোনো শিশু মায়ের পাশে মাটিতে বসে খেলা করছে। কয়েকটি মেয়ে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে ভাঙা ইটের টুকরো, বালি বা গলানো সিমেন্ট — বড় বড় চ্যাপ্টা কড়াইতে করে। কোমর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে কী সুন্দর ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে ওরা। কী নিশ্চিন্ত ওদের গতি। নীলার মতো বিব্রত, শঙ্কিত নয় জনসম্মুখে মুখ দেখাতে। অথচ এমন হবার কথা ছিল না। এই তো গতকালই এতবড় ওয়ার্কশপটা দক্ষভাবে পরিচালনা করল সে আর ড. আনোয়ার। ওদের অন্য সহকর্মীরাও অবশ্য যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু নীলা নিজেই ছিল মূল বক্তা, ড. আনোয়ার কেবল টেকনিকগুলোর ডেমোনস্ট্রেশন দিয়েছিল। লেকচার দেয়নি তেমন। কাল কিন্তু একবারও বুক কাঁপেনি নীলার। সংকোচ বা দ্বিধা হয়নি তিন গ্রুপে প্রায় একশ পেশাজীবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে। তাদের বহুমুখী প্রশ্নের উত্তর দিতে। অথচ আজ নিজের অফিসের গাড়ির পরিচিত ও আরামের গদিতে বসে সে এখন ভেবে পাচ্ছে না কী করবে — কোথায় গিয়ে নিজেকে লুকোবে।

উত্তপ্ত ও ভেজা অনুভূতিটা আবার নতুন করে ফিরে এলো। নীলার শরীরে যেন প্লাবন লেগেছে। কুলু কুলু করে সকল তরলতা যেন নিষ্কাশিত হয়ে যাবে আজ। এতক্ষণ ধরে রাস্তার দুধারে একটা দোকানপাটও চোখে পড়েনি তার। ওষুধের দোকানের তো কথাই নেই। নীলা আর কিছু ভাবতে পারছে না। চুপচাপ বসে থাকে। ততক্ষণে শহরে ঢুকে গেছে ওরা। শ্যামলীর কাছে ট্রাফিক লাইটে গাড়ি থামলে একটা ভিখারী মেয়ে বাচ্চা কোলে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। জানালার কাচ নামানোই ছিল। 'খালাম্মা দুইটা টাকা দেন। বাচ্চাটার ক্ষুধা লাগছে।'

নীলা মেয়েটির দিকে তাকায়। 'খালাম্মা' শব্দটি শ্রুতিকটু ঠেকে। ইদানীং প্রায়ই লক্ষ করছে নীলা, আগের মতো সকল ভিখারীই তাকে 'আপা' বলে ডাকে না আর। মাঝেমাঝেই 'খালাম্মা' ডাকছে। হাতব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটা বের করে নিজের মুখখানা একবার দেখে নেয় নীলা। কপালে হালকা ভাঁজ পড়েছে কি? কত বয়স হলো তার? বত্রিশ পার হয়ে গেছে। খালাম্মা ডাকার জন্য যথেষ্ট বৈকি। এই ছেলে কোলে মেয়েটির বয়স কতই বা হবে। বড়জোর আঠারো বা উনিশ। খালাম্মা ডাকতেই পারে। খানিক আগের বিষিয়ে যাওয়া মনটাকে শান্ত করে মেয়েটির হাতে পাঁচটা টাকা তুলে দেয় নীলা। আজ ট্রাফিক সিগন্যালে সবুজ বাতিই আর আসতে চায় না। সারা শহরে শুধু যেন লাল বাতিই জ্বলছে। আবির লেগেছে বুঝি চারদিকে। সব জায়গাতেই বিলম্ব।

একসময় আবার গাড়ি চলতে শুরু করে। ছেলে কোলে মেয়েটি ততক্ষণে রাস্তা পার হয়ে গেছে। ওর পেছনটি দেখা যায়। হালকা নীল রঙের শাড়ি পরনে। ছাপা ব্লাউজ। কী পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি, সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছেলে কোলে ভিক্ষা করছে। কিন্তু পোশাকে-আশাকে সম্পূর্ণ নিটোল — চলাফেরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি পদক্ষেপ দৃঢ়। প্রকাশভঙ্গি জড়তাহীন। নীলা আবার নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসে। খুব দুর্বল ও জবুথবু মনে হয় নিজেকে।

শহরে গাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই নড়েচড়ে উঠে বসেছে। জামাল ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলে, 'ম্যাডামকে আগে নামিয়ে দাও।'

'না। না। ড. আনোয়ারের বাসা আগে পড়বে। তাকেই আগে নামান।'

ড. আনোয়ার তার হাতব্যাগ নিয়ে গাড়ি থেকে নামার আগে টাক মাথার সামান্য চুলগুলো ভালোমতো ডানদিক থেকে বাঁদিকে আঁচড়ে টাকটা ঢেকে দেন। সানভাইজারের পেছনে লাগানো আয়নায় নিজের মুখখানা একবার দেখে নিতেও ভোলেন না। ভদ্রলোক মাসখানেক আগে বিয়ে করেছেন। এই ট্রিপই হয়তো প্রথম বিরহের অভিজ্ঞতা। সামনের নিচতলার জানালার পর্দার ওপর দিয়ে ভেতর থেকে একজোড়া উৎসুক চোখ উঁকিঝুঁকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারছিল। নীলা হাসে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' ড. আনোয়ার গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে নীলার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। নীলা করমর্দন করে।

'আপনাকেও ধন্যবাদ। পরে কথা হবে।' গাড়ি ছেড়ে দেয়।

জামাল আর প্রশান্তকে আগে গাড়ি থেকে নামানো এতটা প্রাণান্তকর হবে নীলা বুঝতে পারেনি। হালকাভাবে বলেছিল, 'রাইডটা এত তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই না। ফলে আপনাদের আগে নামিয়ে দিয়ে আসি। তারপর আমি নামব।'

'না, না। সে হয় না। আপনি আরেকটু ঘুরতে চান তো? আমাদেরও কোনো তাড়া নেই। আমরাও সঙ্গে চলি। কিন্তু আপনাকে আগে ঘরে নামাব ম্যাডাম।'

অনেক বলা-কওয়ার পরেও যখন ওরা নাছোড়বান্দা, তখন নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে বাধ্য হলো নীলা। 'আমি বলছি, আপনারা আপনাদের বাসায় আগে নেমে যান। আমাকে বাসায় যাবার আগে একটা কাজ সারতে হবে। আমি সবার পরে নামব।'

তার বলার ধরনে জোর ছিল। ওরা আর কথা বাড়ায় না। সবাই নেমে গেলে নীলা কাজ খোঁজে। রাস্তা থেকে গাড়িতে বসেই কলা আর পেঁপে কেনে অবশেষে। তারপর একসময় যাত্রা শেষ করতেই হয়। বাসার সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়ি। নিজের অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি অবগত ছিল নীলা। তবু ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি বাস্তব অবস্থা কতখানি শোচনীয়। অনেক কায়দা করে প্রায় ঘষে ঘষে গাড়ি থেকে নামতে হয় তাকে। যা ভয় করছিল, ঠিক তাই। বাদামি খামটি মাড়িয়ে লালচে স্রোতের ধারা পেছনের সিটে রীতিমতো মানচিত্র এঁকেছে। মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে নীলার। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কী করবে সে এখন? কোনো কিছু ভাবার আগে ভেজা ও রঙিন খামটিকে প্রথমে উলটোভাবে গোল করে বল্টে, বাঁ মুঠোতে শক্ত করে ধরে। শাড়ির আঁচলটা লম্বা করে পেছনে টেনে দিয়ে ডান কাঁধ ঢেকে সামনে টেনে আনে। একবার জোরে টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেয় নীলা।

তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোয় জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে। গাড়ির চালক ইঞ্জিন বন্ধ করতে করতে বাইরের দিকে তাকায়। নীলা এসে তার পাশে দরজার বাইরে দাঁড়ায়। 'ম্যাডাম, আপনি ওপরে চলে যান। আমি আপনার ব্যাগটা নিয়ে আসছি।' ড্রাইভার সেলিম নীলাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'সেটা পরে আনলেই চলবে। আপনি এক কাজ করুন তার আগে।' নীলা পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে এগিয়ে দেয় সেলিমের দিকে।

'আপনি গাড়িটা এখানে রেখে দোকান থেকে একটু চা খেয়ে আসুন।'

'আপনি কি তারপর কোথাও যাবেন ম্যাডাম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না', নীলা একটু থামে, 'তাছাড়া বেরোলে আমার গাড়ি তো রয়েছেই।'

অফিসের পুলের গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে কখনো ব্যবহার করে না নীলা। এটা সবাই জানে। তবু সেলিম ঠিক বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তাকায় নীলার দিকে।

'গাড়ির পেছনের সিটটা।' — কথাটা শেষ করতে করতে হোঁচট খায় নীলা।

'গাড়ির পেছনের সিটটা একটু পরিষ্কার করতে হবে আমার।' নীলা সেলিমের মুখের দিকে তাকায় না। সেলিম কিছু বলার আগেই বলে ফেলে, 'আমার হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেছে।' সেলিম আর দেরি করে না। কোনো কথা না বলে সোজা দোকানের দিকে রওনা হয়ে যায়।

ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত নীলা আস্তে আস্তে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। অতি সুস্থ ও স্বাভাবিক এ প্রক্রিয়াটিকে 'শরীর খারাপ' বলে যারা, তাদের বরাবর বড় অপছন্দ নীলার। কতবার কলেজের মেয়েদের সঙ্গে রাগ করেছে এ শব্দ ব্যবহারের জন্যে। অথচ আজ কি না নিজের মুখে তাই উচ্চারণ করল। এছাড়া কী বলতে পারত সে? সেলিমকে আর কীই-বা বলার ছিল?

ঘরে ঢুকে দেখে লিভিংরুমে বসে আছে মেজমামা। আজকে অতিথি না এলেই যেন নয়। গত ছমাসেও একবার দেখা পাওয়া যায়নি মেজমামার। আজ এ মুহূর্তে তাকে আসতেই হলো। 'ফিরলি তাহলে? আমি তো উঠি উঠি করছিলাম।'

নীলা দূর থেকে মামার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে একবার। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দৌড়ে শোবার ঘরে চলে আসে। আসতে আসতে বলে, 'মামা, তুমি বসো। আমি আসছি।'

জামাকাপড় চটপট বদলে বাথরুম থেকে এক বালতি সাবান জল আর একটি বড় স্পঞ্জ নিয়ে বাইরে বেরোতে উদ্যত নীলাকে আবার মুখোমুখি হতে হয়।

'কী ব্যাপার বল তো? এত দূর থেকে এসেই বালতি স্পঞ্জ নিয়ে আবার কোথায় যাচ্ছিস?'

সঙ্গে সঙ্গে কাজের মেয়েটিও দৌড়ে আসে।

'বুবু, আমারে দাও। কী করন লাগব?' ফুলবানুকে অনর্থক বড় উৎসাহী ও কৌতূহলী মনে হয় নীলার। কেমন উৎফুল্ল আর অহংকারীও। দুইবার তালাকপ্রাপ্ত বিষণ্ন লাজুক ফুলবানুর আজ অত গর্ব কোথা থেকে এলো? ভালো করে ফুলবানুর দিকে তাকায় নীলা। তারই বহুদিনের পরিহিত ও পরিত্যক্ত একখানা তাঁতের কমলা রঙের শাড়ি পরনে। খোঁপা নয়; একটা বেণি করেছে আজ ফুলবানু। বিকেলে হাত-মুখ ধুয়েমুছে কিছু মেখেছে নাকি। বড় বেশি উজ্জ্বল ও খুশি খুশি দেখাচ্ছে ফুলবানুকে। হাত বাড়িয়ে বালতি নিতে চায় ফুলবানু।

নীলার ভীষণ কান্না পায়। রাগও ধরে প্রচণ্ড। তবে যেভাবে তার মনোভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথম অনুভূতির ছিটেফোঁটা উপস্থিত থাকে না। মামা এবং ফুলবানু দুজনেই হতভম্ব।

'তোমাদের যা বলছি তাই করো। মামা, তুমি বসো। চা খাও। ফুলবানু তুমি চা করো। আমি এক্ষুনি আসছি।' নির্দেশটা এত কর্কশভাবে না দিলেও চলত, বুঝতে পারে নীলা।

বিস্মিত ও চিন্তিত মানুষ দুটোর দৃষ্টি থেকে পালাতে পারলে বাঁচে সে। গাড়ির কাছে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয়, সেলিম যদি গাড়িটা লক করে বেরিয়ে গিয়ে থাকে! তাহলেই হয়েছে। না, তা যায়নি। ছেলেটি বুদ্ধিমান। গাড়ি খোলাই ছিল।

সাবানের ফেনা ভরা বালতির জল দেখতে দেখতে আলতায় পরিণত হয়। নীলা শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে গাড়ির সিটটা ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে চায়। কেমন করে কাল সেলিমের মুখের দিকে তাকাবে সে? মানুষ খুন করলে বা চুরি করে ধরা পড়লেও হয়তো এমন অপরাধবোধ, সংকোচ বা জড়তা আসে না। পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও চলে যেতে পারলে বেশ হতো। ঘষতে ঘষতে ভেজা আসনটা এতক্ষণে পূর্বের নীলিমা ফিরে পেয়েছে। এখন ঠিকমতো শুকোলে বোঝা যাবে আসলেই সকল চিহ্ন মুছতে সমর্থ হয়েছে কি না। চোপড়ানো স্পঞ্জটি দিয়ে আরেকবার জায়গাটার ওপর ঘষা দেয় নীলা। রীতিমতো ঘামছে সে। দাগী অপরাধীরা এইভাবেই বোধহয় তাদের কৃত অপরাধের, জখম ও হত্যার সমস্ত চিহ্ন ঘষে ঘষে মুছে ফেলে। অথচ নীলা তো কোনো অপরাধ করেনি! তবু কেন তার বুকে এত প্রচণ্ড কাঁপন?

পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটি ও বাড়িওয়ালার ড্রাইভার কৌতূহলী দৃষ্টিতে নীলাকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে।

গাড়ির পেছনের দিকে দুটো দরজাই খোলা রাখে নীলা। হাওয়ায় দ্রুত শুকিয়ে যাবে আসনটি। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে ফিরে আসে। সিঁড়ি ভাঙতে এখন বেশ কষ্ট হচ্ছে নীলার। বয়েস বত্রিশ হয়ে গেল। এই বয়সে, এত কাল পরে, এমন বেসামাল পরিস্থিতিতে এমন দুরবস্থায় পড়তে হবে তাকে, কখনো ভাবেনি। কেমন করে ঘটল এটা?

নীলার হঠাৎ খেয়াল হলো আজ বারো তারিখ। ঠিকই আছে। হিসাব সব ঠিক আছে। সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল। জীবনে এর আগে কখনো দিন, কাল, স্থান এমন করে তালগোল পাকিয়ে যায়নি তার। ওয়ার্কশপটা নিয়ে গত পক্ষকাল ধরে এতটা বাড়াবাড়ি করেছিল নীলা বুঝতে পারেনি। হাতের ঘড়ি বারবার দেখা তার মুদ্রাদোষ, সকলেই তা জানে। অফিসে, সভা-সমিতি, অনুষ্ঠানে কখনো কোনোদিন দেরিতে যায় না নীলা। অথচ সেই নীলা আজ কেমন করে এতগুলো সময় হারিয়ে ফেলেছিল।

হঠাৎ নীলা আবিষ্কার করে তার বয়স হয়েছে। আর কচি খুকিটি নেই। ভিখারী মেয়েটিও খালাম্মা বলে ডাকছিল আজ। খালাম্মা! সেও ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালাম্মা হবার জন্য মা হবার পূর্বশর্ত তো নেই। তবু কেন জানি নীলার মনে হলো জীবনে প্রথমবারের মতো মনে হলো, তার জৈবিক ঘড়িটার টিক টিক আওয়াজ অনবরত শুনতে পাচ্ছে সে। বড় বিষণ্ন, বড় ক্লান্ত সেই শব্দ, যে-শব্দ প্রতিনিয়ত অগ্রাহ্য করেছে সে।

নীলা আরো দ্রুত সিঁড়ি ভাঙে। অফিস আর কাজের ব্যস্ততায় বহুদিন ছাদে যায় না সে। আকাশ, খোলা হাওয়া, বাগানের ফুলের গন্ধ অনেক দিন চোখে দেখেনি নীলা। ঘরে না ঢুকে তাই আজ সোজা ছাদেই উঠে যায় সে। গাড়ির পেছনটা পরিষ্কার করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় তখন ফেলে আসা হাতব্যাগটি দেখে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

বিতান এখনো ঘরে ফেরেনি। মেজমামা বাইরের ঘরে একা একা বসে আছে। তা থাকুক। নীলা এখন একটু একাকী থাকবে। তারপর ঘরে ঢুকে মামার সঙ্গে কথা বলে তাকে বিদায় দিয়ে ভালো করে উষ্ণ শাওয়ার নেবে একটা। নিজেকে ভালো করে সাজাবে আজ। বিতানকে চমকে দেবে। কাল হতে নীলা অফিস থেকে একটু আগে আগে ফিরবে — পারলে বিতানের আগেই। তারপর দুজনে মিলে কিছুক্ষণের জন্যে হাঁটতে বেরোবে — যেমন বেরোতো আগে। ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকায় নীলা। হাতব্যাগ খোলে। ভিতরের কম্পার্টমেন্টে রাখা পিলের বাক্স থেকে এক এক করে পুরো একুশটা ছোট ছোট বড়ি গুনে গুনে বের করে। তারপর সেগুলো শূন্যে হাওয়ায় ছড়িয়ে দিতে থাকে নীলা। পাশের কুল আর আমগাছের পাতা নড়ছে হাওয়ায়। উড়ছে নীলার শাড়ির আঁচল। নিজেকে এখন অনেক হালকা লাগছে তার। প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নেয় নীলা, চোখ বুজে ফুলের গন্ধ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রযুক্তির বলি নারী

মানুষ বানাবার মেশিন : প্রযুক্তি ও জরায়ু নিয়ে ব্যবসা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। প্রাত্যহিক জীবনকে সহজ ও সুখকর করে তোলে। রোগ, জরা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা তো বটেই, অনেক অনভিপ্রেত ঘটনা, দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও বাঁচতে সাহায্য করে বিজ্ঞান। সতর্ক করে দেয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে। কিন্তু কখনো-কখনো এই নবঅর্জিত জ্ঞান বা কারিগরি শিক্ষার বিকাশ সূক্ষ্মভাবে নানান সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি করে। এক মানবগোষ্ঠী দ্বারা অন্য গোষ্ঠীকে শোষণ ও নিপীড়ন করার হাতিয়ার তৈরি করার সুযোগ করে দেয় কোনো-কোনো প্রযুক্তি। দোষটি অবশ্য বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির নয়। এর ব্যবহারের অসাফল্যই এ সকল মানবিক ও সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী।

ষাটের দশকের জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির আবিষ্কার নারী-স্বাধীনতার এক বিশাল মাইলফলক। আলী কুবরার মতে, 'The contraceptive revoultion of the sixties freed women from the problem of uncontrolled fertility with its many physical and social disadvantanges.' (Practitioner, 235, 878,1991)

এটা অনস্বীকার্য যে, গর্ভধারণের প্রাকৃতিক দায়িত্ব মেয়েদের ওপর অর্পিত; শুধু এই কারণে বহু সামাজিক বিধি-নিষেধ ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয় তাদের। যৌনজীবনকে প্রজনন-জীবন থেকে আলাদা করা এবং স্বনির্বাচিত সন্তানধারণের মতো বৈপ্লবিক চিন্তাগুলো মেয়েদের মধ্যে বিকাশ ঘটাতে অভূতপূর্ব সাহায্য করেছিল এই 'পিল'। প্রকৃতি, পরিবার ও সমাজের কাছে নারীর অসহায়ত্ব ও দায়বদ্ধতা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেয়েছিল তারা।

ষাটের দশকের এই পিলের প্রবর্তন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারী-সমাজে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(যা সর্বত্র নারী-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে বরাবর) যেমন আশা ও উদ্দীপনা এনেছিল, খুলে দিয়েছিল এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার জগৎ, তেমনি অতি সম্প্রতি প্রজনন প্রযুক্তির কিছু উন্নতি ও আবিষ্কার মেয়েদের আবার মুখ্যত প্রজনন-যন্ত্রের ভূমিকায় নিক্ষেপ করছে। শুধু তাই নয়, এই নব্য প্রজনন-প্রযুক্তি সনাতন পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ছাড়াও সন্তান উৎপাদনের পদ্ধতির সন্ধান দিচ্ছে। এই ধরনের প্রজ্ঞা ও প্রক্রিয়া নারীকে, বিশেষ করে সেসব নারীকে যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ইতিমধ্যেই বঞ্চনার শিকার, নতুনভাবে ও অত্যন্ত পরিশীলিত উপায়ে শোষণ করতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের সজাগ ও নির্মোহ দৃষ্টি এবং গভীর সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ না থাকলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এর পরিণতি ভয়ংকর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রজনন-বিজ্ঞানকে ব্যক্তিজীবনে যথোচিতভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে প্রশাসক, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক ও সমাজসেবীর একত্র প্রয়াসে একটি সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ ও তার সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি।

নিচে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো, যার মাধ্যমে সমস্যাটির ধরন ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে জানার অবকাশ হবে। তার আগে সনাতন বা প্রাকৃতিক উপায় অর্থাৎ যৌনসঙ্গম ব্যতীত সন্তানধারণের নবপ্রযুক্তিগুলোর নামকরণ প্রয়োজন, যা নিচে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হলো :

১. কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুর অভ্যন্তরে শুক্র স্থাপন করা (artificial insemination) : স্বামী যদি প্রাকৃতিকভাবে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয় তাহলে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্ত্রীকে গর্ভবতী করা যায় তার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির বীর্যের সাহায্যে। এতে দম্পতিটির মধ্যে অন্তত একজনের অর্থাৎ স্ত্রীর রক্ত ও বংশজাত প্রকৃতির অস্তিত্ব থাকে সন্তানের মধ্যে। কোনো অবিবাহিতা অথবা কুমারী মেয়েও এই পদ্ধতিতে পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সন্তান ধারণে সক্ষম। ইদানীং অবশ্য এই বিশেষ প্রযুক্তিটির মাধ্যমে বন্ধ্যা, সমকামী অথবা সন্তান ধারণে অনিচ্ছুক মহিলাদের স্বামীরা তাদের বীর্য অন্য কোনো মহিলার জরায়ুতে স্থাপন করে সন্তানলাভ করে (surrogate motherhood)।

২. টেস্টটিউবে সন্তানধারণ (in-vitro fertilization) : শরীরের বাইরে ডিম্ব ও শুক্রের মিলনে (নিষেকক্রিয়া) সৃষ্ট প্রাথমিক পর্যায়ের ভ্রূণকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে জরায়ুর ভেতর স্থাপন করা হয়। সাধারণত যেসব মেয়ের ডিম্বকোশ থেকে ডিম্বাণু জরায়ুতে আসার পথে বাধা পায় এবং তার জন্য গর্ভবতী হওয়া সম্ভব হয় না, তারা এই পদ্ধতি প্রয়োগে গর্ভবতী হতে পারেন। ১৯৭৮ সালে ইউরোপে লুইস ব্রাউন বলে মেয়েটি প্রথম এই পদ্ধতির মাধ্যমে জন্মলাভ করে। অর্থাৎ লুইসের জন্মের সূচনা মায়ের শরীরের ভেতর হয়নি — হয়েছিল টেস্টটিউবে। আজকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার টেস্টটিউবে সৃষ্ট ভ্রূণকে সঙ্গে-সঙ্গে নারীদেহে স্থাপন না করেও দীর্ঘদিন ফ্রিজ করে রাখা চলে (cryopreservation technique)। ফলে এই প্রযুক্তির ব্যবহারের সম্ভাব্য প্রয়োগ ও ব্যাপকতা অসীম।

স্বামী-স্ত্রী যদি মনস্থির করে এটি তাদের সন্তান গ্রহণের সঠিক সময় নয়, তাহলে তারা তাদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষেকক্রিয়া টেস্টটিউবে ঘটিয়ে (অবশ্যই প্রযুক্তির সাহায্যে ল্যাবরেটরিতে), ভ্রূণটিকে ফ্রিজ করে রেখে দিতে পারে ভবিষ্যতের জন্যে। এভাবে একই সঙ্গে ফ্রিজ করে রাখা দুটি ভ্রূণকে এক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন সাত বছরের ব্যবধানে। ফলে একই সময় প্রাণ সঞ্চারিত হলেও বাচ্চা দুটির জন্ম ও বয়সের তফাৎ থাকে সাত বছর। আবার একই প্রক্রিয়ায় ফ্রিজ করে রাখা এক দম্পতির ভ্রূণ সময়মতো জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের আগেই স্বামী মারা যাওয়ায় স্ত্রীটি পরে আইনগত ও নীতিগত এক বিশাল জটিলতায় পড়েছিল। স্বামীর অবর্তমানে সেই ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা ন্যায়সংগত কি না স্থির করতে আদালতে বহুদিন তর্ক-বিতর্ক চলেছে। স্ত্রীটি পড়ে তখন মহাবিপাকে।

৩. এছাড়া ডিম্বাণু ও শুক্রাণু ব্যাংকের মাধ্যমে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু কিনে সন্তান জন্মে অপারগ অনেক নারী-পুরুষ সন্তানলাভে সমর্থ হচ্ছে। একসময় বলা হতো, মেয়েদের সন্তানধারণের সময়সীমা নির্দিষ্ট বয়সে সীমাবদ্ধ। যেন একটি প্রাকৃতিক ঘড়ি (biological clock) তাদের শরীরে বসানো আছে, যা প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের মধ্য দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে যায় তার প্রজননক্ষমতার সীমা শেষ হয়ে আসছে। চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকের কোঠায় একসময় সেটা তারা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিম্বাণু ব্যাংক থেকে অল্পবয়সী মেয়েদের প্রদত্ত ডিম্বাণুকে টেস্টটিউবে শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিয়ে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তাকে যদি পঞ্চাশোর্ধ্ব বা ষাটোর্ধ্ব কোনো মহিলার জরায়ুতে স্থাপন করে তাকে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় হরমোন সরবরাহ করা হয়, তাহলে সেই মহিলার পক্ষে অনায়াসে সন্তানধারণ ও জন্মদান সম্ভব। আর সেটা ঘটছেও। তাই একটি মেয়ের পক্ষে এখন যে-কোনো বয়সে গর্ভবতী হওয়া সম্ভব। গর্ভাবস্থা, শারীরিক উপসর্গ, প্রসবের যন্ত্রণা ও সন্তান প্রতিপালনের মতো বাস্তব কষ্টগুলো গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে কি না সেটাই বিবেচ্য। মেয়েটির বয়স কত, তার ডিম্বাশয় ক্রিয়াশীল কি না, সে রজস্বলা কি না — এগুলো আর জরুরি ব্যাপার নয়।

কনসেতা দিতেসা বলে দক্ষিণ ইতালির বাষট্টি বছর বয়সের এক মহিলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। কনসেতার তিপ্পান্ন বছর বয়সের স্বামীর বীর্যের সঙ্গে একটি তিরিশ বছরের মেয়ের নিঃসৃত ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে ভ্রূণটাকে কনসেতার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে প্রজনন-ক্ষেত্রে এ ধরনের নবপ্রযুক্তি মানবজীবনে, বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মেয়েদের প্রজনন প্রক্রিয়ায় নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। তাদের অকল্পনীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে। একটি মেয়ে গর্ভধারণের মতো কষ্টকর ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে না গিয়েও মা হতে পারে — কিছু অর্থের বিনিময়ে গর্ভধারণের জন্য সাময়িকভাবে অন্য একটি মেয়েকে ভাড়া করে। সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে মা হওয়ার সময় পিছিয়ে দিতে পারে তথাকথিত বায়োলজিক্যাল ক্লক অস্বীকার করে। বন্ধ্যা মেয়েদের স্বামীরাও অন্য নারীর ডিম্বাণুর সাহায্য নিয়ে নিজের শুক্রের সঙ্গে মিশিয়ে সন্তান উৎপাদন করতে পারে। যদি তার স্ত্রীর জরায়ু সন্তান গ্রহণে সমর্থ হয় তাহলে ভ্রূণটি তার স্ত্রীর মধ্যেই স্থাপন করা যায়। আর যদি ডিম্বকোষের মতো তার জরায়ুও থাকে অনুপস্থিত অথবা অকার্যকর, তাহলে সে-ভ্রূণটিকে ডিম প্রদানকারী মেয়ের বা সম্পূর্ণ অন্য একটি মেয়ের জরায়ুতে প্রবেশ করিয়েও সন্তানের বৃদ্ধি লাভ সম্ভব।

এই সকল কারিগরি ও প্রজনন-প্রযুক্তি যতই সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিক না কেন একই সঙ্গে তা নানারকম পারিবারিক ও সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। সনাতন পদ্ধতির বাইরে জন্মগ্রহণ করা সন্তানদের অনেকেরই থাকে দুইয়ের অধিক পিতামাতা। ফলে সন্তানের মালিকানার প্রশ্নে প্রায়ই আইনগত নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রকৃত মাতা-পিতা কে তা নির্ণয় করে দিতে হচ্ছে কোর্টকে। এ ধরনের জটিলতার শিকার হচ্ছে প্রধানত মেয়েরাই, কেননা গর্ভধারণ করার ব্যাপারটা পরিপূর্ণভাবে তাদের দায়িত্ব। এই নব্য প্রযুক্তি পারিবারিক কাঠামো, মানব-সম্পর্কের গতানুগতিক ধারাকেও কখনো কখনো চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা — নিষেকক্রিয়া ও গর্ভধারণকে আলাদা করা সম্ভব হওয়ায় অনেক অর্থশালী ব্যক্তি স্রেফ টাকার লোভ দেখিয়ে গরিব মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র মেয়েদের শরীর অথবা শরীর-নিঃসৃত কোষকে কিনে নিয়ে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের বাৎসল্যবোধ তৃপ্ত করতে অথবা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছে। নিচে বহুল আলোচিত ও সাম্প্রতিককালে প্রবল আলোড়নকারী এই ধরনের কয়েকটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১. আমেরিকার অঙ্গরাজ্য নিউজার্সির ছোট্ট এক শহরের ট্রাক ড্রাইভারের স্ত্রী মিসেস মেরি বেথ হোয়াইটহেড। দুই সন্তানের জননী। অত্যন্ত স্নেহশীল। আর্থিক অনটন রয়েছে সংসারে। একদিন হোয়াইটহেডরা খবর পেলেন এক নিঃসন্তান দম্পতির কথা, যারা একটি সন্তান উৎপাদনের বিনিময়ে একজন মহিলাকে দশ হাজার ডলার দিতে রাজি। দুই সুস্থ সন্তান রয়েছে হোয়াইটহেডদের। মোটামুটি শান্তির সংসার। আর সন্তান তাঁদের দরকার নেই। কিন্তু সংবাদপত্রে পঠিত এই সন্তানবুভুক্ষু পেশাজীবী দম্পতির স্ত্রী পড়াশোনা ও কাজের ব্যস্ততার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে বহুদিন সন্তানধারণ স্থগিত রাখতে গিয়ে এখন সম্পূর্ণভাবেই গর্ভধারণে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। তাঁর স্বামীও ডাকসাইটে ব্যক্তি — খুব সম্ভবত ডাক্তার। দুজনে মিলে তাই ঠিক করেছেন স্বামীর বীর্য সন্তান উৎপাদনক্ষম কোনো শরীরে স্থাপন করিয়ে সেই নারীর গর্ভে বেড়ে ওঠা সন্তানই হবে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে না হোক অন্তত স্বামীর জিনস তো থাকবে শিশুটির শরীরে। অত্যন্ত সন্তানবৎসলা মিসেস হোয়াইটহেড ভাবলেন, একটি পরিবারকে যদি সন্তান দিয়ে তিনি তৃপ্ত করতে পারেন তো ক্ষতি কী। বিনিময়ে নিজের সংসারেও আসবে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য — দশ হাজার ডলার। আইনজ্ঞের মাধ্যমে একটি চুক্তি হলো। বিশদ সে-চুক্তি, বিস্তর বিধিনিষেধ। যতদিন পর্যন্ত মিসেস হোয়াইটহেড এই সন্তানবুভুক্ষু স্বামীর অর্থাৎ ডক্টর এক্স-এর শুক্র দ্বারা গর্ভবতী না হচ্ছেন ততদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে যৌন জীবনযাপন করতে পারবেন না। কেননা তাহলে পিতৃত্বের স্থিরতা থাকবে না।

প্রতি মাসে নির্ধারিত কয়েকটি দিনে ক্লিনিকে যেতে হয় মিসেস হোয়াইটহেডকে। সেখানে ডাক্তার কৃত্রিম উপায়ে পরপুরুষের বীর্য স্থাপন করেন তাঁর জরায়ুতে। যথাসময়ে মিসেস হোয়াইটহেড গর্ভবতী হলেন। নির্দিষ্ট গতিতেও স্বাভাবিকভাবে গর্ভাবস্থা কাটাবার পর তিনি একটি সুস্থ কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন। কিন্তু গোল বাধল সন্তান-জন্মের পর। কন্যার মুখদর্শন করে মিসেস হোয়াইটহেড বেঁকে বসলেন। দশ হাজার ডলার তিনি চান না — কোনো চুক্তি মানতে রাজি নন। এই কন্যা তাঁর গর্ভজাত। তিনি মা এবং তাঁর সন্তানকে তিনি রাখতে চান। ওদিকে ডক্টর ও মিসেস এক্স কিছুতেই তা হতে দেবেন না। ডক্টর এক্স-এর ঔরসজাত সন্তান এটি। সবচেয়ে বড় কথা — চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দলিল রয়েছে তাঁদের কাছে। হোয়াইটহেডদের বাড়ি থেকে শিশুটিকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোর্ট থেকে অর্ডারসহ যখন পুলিশ এসে হাজির দরজায়, তখন মিসেস হোয়াইটহেড তাঁর স্বামীর (যার সঙ্গে সন্তানটির কোনোই সংযোগ নেই রক্তের) সাহায্যে শিশুসহ জানালা দিয়ে পালিয়ে চলে গেলেন ফ্লোরিডা।

অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনার মধ্য দিয়ে বহুদিন ফেরার থাকার পর মিস্টার ও মিসেস হোয়াইটহেড ধরা পড়লেন এবং বিচারের রায় অনুযায়ী শিশুটিকেও তুলে দিতে হলো ডক্টর ও মিসেস এক্স-এর হাতে। মিসেস হোয়াইটহেড এ সন্তানের মা নন। কেবল ভাড়া-করা জন্মদাত্রী (surrogate mother)। অর্থের বিনিময়ে তাঁর মাতৃত্বকে তাঁর সন্তানকে কিনে নিয়েছেন এক দম্পতি। ফলে কিছুই করার নেই তাঁর। ইতিমধ্যে হোয়াইটহেডদের শান্ত রুটিন জীবনে ঝড় উঠে গেছে। কোথা থেকে একটি শিশু এসে সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতসব ঘটনার অস্বাভাবিক অবস্থার চাপ এবং মিস্টার হোয়াইটহেডের চাকরি হারানো পরিবারে দুর্গতি বয়ে আনে। তাঁদের এতদিনকার সুখের সংসার ভেঙে যায়। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে হোয়াইটহেডদের। আর ডাক্তার স্বামী ও আইনজ্ঞ স্ত্রী মিসেস হোয়াইটহেডের গর্ভজাত সন্তান নিয়ে সুখে ঘরসংসার করতে থাকেন।

ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? শুধু সন্তানধারণে অক্ষম স্ত্রীরাই artificial insemination-এর সুবিধা ভোগ করেন না। এ পদ্ধতির মাধ্যমে যে-কোনো সচ্ছল দম্পতিও স্থির করতে পারেন — সন্তান উৎপাদনের মতো ঝামেলার ব্যাপার, কষ্টকর অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ শারীরিক উপসর্গ তাঁরা সহ্য করতে চান না। অতএব ক্যাটালগ দেখে জামা কেনার মতো করে কোনো মহিলার ডিম্বাণুর সঙ্গে স্বামীর শুক্র মেশালে কাঙ্ক্ষিত সন্তানের জন্ম হতে পারে, তা বেছে নিতে পারেন তাঁরা ঘরে বসে ছবি দেখে, ভিডিয়ো চালিয়ে অথবা ইন্টারভিউর মাধ্যমে। অর্থের অভাবে কত মিসেস হোয়াইটহেড এরকম করে সন্তান উৎপাদনে রাজি হবেন। ডক্টর এক্সরাই নির্ধারণ করবেন বাদামি চুল না খয়েরি চুল চান, খাড়া নাক না ছোট নাক, বড় টানা চোখ না ছোট অথচ ধারালো চোখ দরকার। সন্তান উৎপাদনের ব্যবসায় সবরকম মহিলাই প্রতুল। আর এ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির প্রয়োগে ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার অথবা আইনজ্ঞের মতো সমাজের ওপরতলার লোকরা যে চিরকাল ট্রাক ড্রাইভার, মেথর ও তাদের স্ত্রীদের ব্যবহার করবে তা তো বলাই বাহুল্য। কেননা যারা দরিদ্র তাদের পেটে যেহেতু খিদে, বাৎসল্যবোধের কী বোঝে তারা? টাকার বিনিময়ে সন্তান হস্তান্তর করতে তাদের তো আপত্তি করার কথা নয়। মিসেস হোয়াইটহেডের মতো বোকা আর কজন? অকাট্য যুক্তি বটে! একজন সমাজসচেতন বিজ্ঞানী এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিলেন, Surrogate motherhood was, effectively, sale of a child, the only mitgating factor being that one of the purchasers was the father, and he had no constitutional right to procreate and retain custody of the child. The custody, care, companionship and nurturing that follow birth are not part of the right to procreate.

২. ক্রিসপিনা ক্যালভার্ট সন্তানধারণে অক্ষম। কেননা তাঁর হিস্টারেক্টমি (জরায়ু অপসারণ) হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় ক্রিসপিনা ও তাঁর স্বামী চুক্তি করলেন এক অবিবাহিত যুবতী নার্স অ্যানা জনসনের সঙ্গে। চুক্তি অনুযায়ী ক্রিসপিনার স্বামীর শুক্রাণুর সঙ্গে ক্রিসপিনার ডিম্বাণু মিলনে টেস্টটিউবে নিষেকক্রিয়া সমাপনে যে-ভ্রূণের সৃষ্টি হবে, তা অ্যানা বহন করবে তার জরায়ুতে। অর্থাৎ ডাক্তারের ক্লিনিকে ক্যালভার্ট দম্পতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু দান করবেন, যার মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণকে ডাক্তার অ্যানার জরায়ুতে স্থাপন করবেন। নির্ধারিত সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে অ্যানা সন্তানকে ক্যালভার্ট দম্পতিকে হস্তান্তর করবেন, বিনিময়ে তিনি পাবেন দশ হাজার ডলার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে সন্তানধারণ করলে যে-মহিলা ডিম্বাণু সরবরাহ করে, সে-ই জরায়ুতে সন্তানধারণ করে। যেমন ঘটেছে মেরি বেথ হোয়াইটহেডের বেলায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এক মহিলা ডিম্বাণু দিয়েছে আর গর্ভবতী হয়েছে অন্য মহিলা।

যা হোক, গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে অ্যানার কী যে হলো! হঠাৎ তিনি স্থির করলেন অনাগত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একজন মা হিসেবে সেই বাচ্চার সাক্ষাৎলাভের বৈধতা তাঁর রয়েছে এবং কোর্টের কাছে সে-দাবি মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করলেন। ১৯৯০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জন্ম হলো ক্রিস্টোফারের। রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, অ্যানা জনসনের সঙ্গে ক্রিস্টোফারের কোনো জেনেটিক সম্পর্ক নেই। বিচারক তখন রায় দিলেন যেহেতু অ্যানা আর ক্রিস্টোফারের মধ্যে কোনো জেনেটিক সম্পর্ক নেই সেহেতু মা হিসেবে ক্রিস্টোফারকে নিয়মিতভাবে দেখতে পাবার অধিকার অ্যানার নেই। জজ রিচার্ড পার্সলোর মতে, অ্যানার ভূমিকা এখানে ফস্টার মাতার মতো, যিনি সাময়িকভাবে প্রকৃত মাতার (ক্রিসপিনা ক্যালভার্ট) অনুপস্থিতিতে অথবা অক্ষমতায় সন্তানের দেখাশোনা করেছেন — খাইয়েছেন মাত্র। যমজ সন্তানদের উদ্ধৃতি দিয়ে বিচারক বলেন যে, পরিবেশের চাইতে বংশগত সত্তার (জিনসের) প্রভাব অনেক বেশি। তাছাড়া অ্যানা জনসন চুক্তিবদ্ধ এই দম্পতির কাছে। সবচেয়ে বড় কথা — ক্রিস্টোফারের মঙ্গলের জন্য তাকে তিনজন মাতা-পিতার বদলে স্বাভাবিক পরিবারের মতো দুই মাতা-পিতার সঙ্গেই বসবাস করতে দেওয়া সংগত।

কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে অ্যানা আপিল করলেন। আপিল কোর্টও আগের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। তারা অবশ্য চুক্তি বা ক্রিস্টোফারের কল্যাণের কথা উল্লেখ না করে কেবল নির্ণয় করতে চেষ্টা করছেন কে ক্রিস্টোফারের প্রকৃত মা — যে ডিম্বাণু দান করেছে সে, না যে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে ও ন'মাস পর প্রসব করেছে সে? কোর্ট ঠিক করল যেহেতু পিতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগলে রক্ত পরীক্ষা করেই তা নিষ্পত্তি করা হয়, মাতৃত্বের ব্যাপারেও অনুরূপ নীতি অনুসরণ করতে হবে। অবশ্য আমেরিকায় সাধারণ অবস্থায় অবৈধ সন্তানের সামাজিক সমস্যা এড়াতে একটা নিয়ম চালু আছে। একত্রে বসবাসকারী বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, স্বামীটি যদি impotent অথবা sterile না হন, তাহলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সে-ই স্বীকৃত হবে সন্তানের বাবা হিসেবে (প্রকৃত অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা না হলেও)। কিন্তু সন্তানের পিতৃত্বে যদি প্রশ্ন জাগে এবং স্বামী বা স্ত্রী দুজনের কেউই যদি চায় পিতৃত্ব নির্ণয় করতে, তাহলে যে পদ্ধতিতে তা নির্ণয় করা হয় সেটা রক্ত পরীক্ষা। ফলে বিচারকের বিবেচনায় একই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত এক্ষেত্রেও এবং সেখানে তাই অ্যানা জনসনের কোনো ভূমিকা নেই। জেনেটিক উপায়ে পরীক্ষা করলে তাকে মা বলা যায় না। অ্যানা সেটা কখনো দাবিও করেনি। ফলে অ্যানার মাতৃত্ব আইনে গ্রাহ্য নয়।

অ্যানা জনসন তখন ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য আইনের মাধ্যমেই তাঁর দাবি পেশ করতে চেষ্টা করেন। আইনানুযায়ী একজনকে মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রমাণ করতে হয় যে, সে সন্তানকে জন্ম দিয়েছে — যেমন অ্যানা সন্তানধারণ করেছেন এবং জন্ম দিয়েছেন। অ্যানা আরো একটি বিষয়ের উদ্ধৃতি দিলেন। তিনি জানালেন, কোনো লোক যদি বীর্যদান করে আর যদি সেই বীর্য কৃত্রিম উপায় তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলার জরায়ুতে স্থাপন করে তাকে গর্ভবতী করা হয়, তাহলে আইনানুযায়ী সেই লোক সেই সন্তানের পিতৃত্বের দাবি করতে পারে না। মহিলার প্রকৃত স্বামীই আইনানুসারে সে-সন্তানের জনক। কিন্তু অ্যানা জনসন অবিবাহিতা। ফলে তার দুটো যুক্তিই টেকনিক্যাল কারণে অগ্রাহ্য করেন বিচারক।

আপিল কোর্ট অবশেষে বলতে বাধ্য হলো যে, আসল কথা — সমাজ কখনো ভাড়া-করা মায়ের স্বার্থ দেখার চেষ্টা করে না, সন্তানও পারিবারিক সম্পর্ককেই গুরুত্ব দেয়। শুধু তাই নয়, বিচারক এও বললেন যে, জীবজগতে জিনসই (Gene) সবকিছুর মূল। শুধু চেহারা, শারীরিক প্রতিটি অঙ্গ ও তার কার্যকারিতাই নয়, চারিত্রিক লক্ষণ এমনকি কথা বলার ধরন, মুদ্রাদোষ, পছন্দ-অপছন্দ, ব্যক্তিত্ব সবকিছু নির্ণয় করে জিনস। ফলে সেই জিনস যেহেতু দিয়েছে মিসেস ক্যালভার্ট তাই তিনিই ক্রিস্টোফারের মা, অ্যানা জনসন নন। অ্যানা জনসন ফস্টার হোমের মতো তাঁর জরায়ু ভাড়া দিয়ে শুধু ভ্রূণটিকে বিকাশ ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন, তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ব্যাপারটি আরো ঊর্ধ্বতন কোর্টে গেলে প্রচলিত আইনের আওতায় যেহেতু ঘটনাটি পড়ে না, বিচারক এই বলে রায় দিলেন যে অ্যানা জনসন ও ক্যালভার্ট দম্পতি যদি নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটার ফয়সালা করে নিতে না পারেন তাহলে ক্রিস্টোফারকে দুপক্ষের কাউকেই দেওয়া হবে না, সরাসরি ফস্টার হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রাজা সলোমনের পদ্ধতি আর কি! কিন্তু এই ব্যবস্থায় জেনেটিক পিতামাতা রাজি হলেও অ্যানা জনসন যে সন্তানটিকে ন'মাস গর্ভে ধারণ করেছেন ও প্রসব করেছেন তিনি কিন্তু রাজি হলেন না। পরিবর্তে তিনি তাঁর দাবি প্রত্যাহার করে নিলেন সন্তানের কল্যাণের কথা ভেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কেসে কোর্টের উল্লিখিত যুক্তিগুলোর মধ্যে একাধিক শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে : (ক) প্রাকৃতিক মা বলতে কেন কেবল জেনেটিক মাকে বোঝানো হবে? অ্যানা জনসনের জরায়ুতে ন'মাস ধরে যেখানে সন্তান বেড়ে উঠেছে এবং তিনিই যেখানে সন্তানকে প্রসব করেছেন সেখানে কেমন করে অ্যানা অপ্রাকৃতিক মা হতে পারেন? (খ) পুরুষদের সঙ্গে নারীর প্রজনন প্রক্রিয়ার তুলনা করা হয়েছে কোর্টে। কিন্তু এ তুলনা চলে না। কেননা পিতা কেবল জিনস প্রদান করেন, কিন্তু মা জিন দিয়ে রেহাই পান না, তাঁকে গর্ভধারণ ও প্রসব করতে হয়। একটি জীবকোষ থেকে তিল তিল করে পরিপূর্ণ একটি মানুষ সৃষ্টি করতে হয় নিজের শরীরের ভেতর। এমন একসময় ছিল যখন জিনস দান ও গর্ভধারণ দুটোই অবধারিতভাবে করত একই মা। কিন্তু এখন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশে মায়েদের এ দুটো কাজকে আলাদা করা সম্ভব। এখন অনায়াসে এক মা জিনস দিতে পারে তো অন্য মা জরায়ুতে সন্তান ধারণ ও প্রসব করতে পারে। আর এই বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানান সামাজিক সমস্যা। কে মা আর কে নয় সেটা ঠিক করার দায়িত্ব কার? মিসেস ক্যালভার্টকে প্রাকৃতিক মা বলে আখ্যায়িত করে অ্যানা জনসনকে ভাড়া করা মা বলে অ্যানার ভূমিকাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে কোর্টে। 'প্রাকৃতিক' বলতে কী বোঝায়? যে অ্যানা জনসনের শরীরের ভেতর তাঁর রক্ত-মাংসে পুষ্টিতে বেড়ে উঠেছে একটি শরীর তিনি কেমন করে প্রাকৃতিক মা না হয়ে অন্য কিছু হতে পারেন? আসল কথা হলো — কোর্ট যাই বলুক বিচারক নিজেও জানেন যে, দুজন মহিলাই ক্রিস্টোফারের মা এবং তাঁরা দুজনেই সমানভাবে প্রাকৃতিক। যে-কোনো একজনকে প্রাকৃতিক ধরে নিয়ে অন্যজনকে অগ্রাহ্য করা বা তার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা অত্যন্ত অমানবিক। কোর্টের এই সিদ্ধান্ত গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসবকে ছোট করে দেখছে। অসম্মান করছে। অথচ উলটোটি মেনে নিলে জিনস এবং জেনেটিক্সকে অপমান করা হতো। (New England Journal of Medicine, 326 : 417-420, 1992)

৩. আমেরিকার অঙ্গরাজ্য টেনেসিতে এক দম্পতির কাছ থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করার পর প্রতিষ্ঠিত এক ক্লিনিকে এক ডাক্তার টেস্টটিউবে সাতটি ভ্রূণের সৃষ্টি করল। আজকাল যেহেতু এইসব ভ্রূণ বহুদিন পর্যন্ত ফ্রিজ করে রাখা চলে তারা সাতটি ভ্রূণকে আপাতত ওইভাবেই রেখেছিল — পরবর্তীকালে সময়-সুযোগমতো জরায়ুতে স্থাপন করার ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে দম্পতিটির বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যায়। ফলে এখন সোনার কাঠি রুপোর কাঠি ছোঁয়া ঘুমন্ত এই সাতটি রাজপুত্র-কন্যার দায়িত্ব নেবে কে? মা-বাবা দুজনেই ভিন্ন-ভিন্নভাবে সন্তানের অধিকার দাবি করেন। কিন্তু কোর্ট দুজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌথ অধিকারই স্বীকার করে নিয়ে দুজনকেই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়। কিন্তু এ ব্যবস্থায় সদ্য বিচ্ছেদপ্রাপ্ত দম্পতির কেউই রাজি নয়। ফলে সাতটি সন্তান হয়তো সাত ভাই চম্পার মতো অনির্দিষ্টকাল — হয়তো চিরকাল — আলো-বাতাসহীন পরিবেশে ঘুমন্ত অবস্থায় জীবন কাটাবে ঠিক মাটির নিচে নয়, ফ্রিজারের ছোট অন্ধ কুঠুরিতে গভীর শীতলতায় আর অন্ধকারে। (New England Journal of Medicine, 323 : 1200-1202, 1990)

৪. দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনা এটি। মেয়েটি জরায়ু হারিয়েছে অল্প বয়সেই শারীরিক জটিলতার শিকার হয়ে। সন্তানহীন এ দম্পতি একটি সন্তানের জন্য এতটাই উন্মুখ যে, মেয়েটির মা এক অভিনব উপায়ে কন্যাকে একটি সন্তান উপহার দিতে রাজি হলেন। তিনি তাঁর মেয়ে ও জামাইয়ের থেকে সংগৃহীত ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মাধ্যমে টেস্টটিউব সৃষ্ট ভ্রূণকে নিজের জরায়ুতে স্থাপন করিয়ে গর্ভবতী হলেন এবং যথাসময়ে কন্যাটির জন্যে একটি সুস্থ সন্তান প্রসব করলেন। মায়ের এ এক বিরাট দান সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূরণে। কিন্তু প্রশ্ন হলো — এই সন্তানটির সঙ্গে এই সন্তানধারণকারী ও প্রসবকারী মহিলার সম্পর্কটা কী হবে? তিনি কি তার দিদিমা, নাকি মা? জামাইয়ের সঙ্গেই-বা শাশুড়ির সম্পর্কটা কী হবে? এই বিশেষ ক্ষেত্রে মা, মেয়ে ও জামাই তিনজনে মিলেই একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং ভিন্ন-ভিন্নভাবে তিনজনেই মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের দাবিদার। অবশ্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটায় হয়তো অধিকার নিয়ে আইনগত টানাহেঁচড়া চলবে না। কিন্তু সামাজিকভাবে এদের সম্পর্কের নমুনা কী হবে?

প্রজনন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের প্রযুক্তির উন্নতিতে বহু নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানলাভে সমর্থ হচ্ছে, এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে কারিগরি ও প্রযুক্তির পর্যাপ্ততার অভাবে এখন পর্যন্ত এই সকল পদ্ধতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের বিত্তবান সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, এ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র অনূর্ধ্ব এক লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করেছে টেস্টটিউবে নিষেকক্রিয়ার মাধ্যমে। সন্তানহীনা কোনো নারীকে অন্য এক নারী যদি মানবিক কারণে সন্তানবতী করতে এগিয়ে আসেন, তাঁর শরীর থেকে নিঃসৃত ডিম্বাণু সরবরাহের মাধ্যমে অথবা জরায়ুতে ধারণ করে ও প্রসব করে, প্রশংসা ছাড়া তার এই মহতী কর্ম অন্য কোনো বিতর্কের সূচনা করে না। কিন্তু যখন টাকার বিনিময়ে ধনী এক দম্পতি অভাবী একটি মেয়েকে ভাড়া করে আনে সন্তান গ্রহণ করার কাজে, শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে তার মানবিক সকল অনুভূতিকে অস্বীকার করতে বাধ্য করে তখন তাকে কোনোমতেই শুভ বা মহৎ কাজ বলে মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্য টাকার বিনিময়ে অন্য দম্পতির জন্য যারা সন্তানধারণ ও প্রসব করেছেন তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলেই যে মানসিকভাবে ভূমিষ্ঠ শিশুটির সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আত্মিকভাবে জড়িয়ে পড়েন অথবা পরবর্তীকালেও এ কারণে সবসময়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়। তবে আংশিকভাবেও যদি তা ঘটে, সেই বিশেষ নারীটির কষ্ট ও যন্ত্রণা সমগ্র পদ্ধতিটির নৈতিক যথার্থতা সম্বন্ধে আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার নিজস্ব গতিতে প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন আবিষ্কার ও নতুন উদ্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। তার গতি থামিয়ে রাখা যাবে না, রাখা উচিতও নয়। কিন্তু বিজ্ঞান আহরিত জ্ঞান ও নবপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে গভীর বিবেচনার সঙ্গে, যাতে মানবজাতির সমষ্টিগত কল্যাণের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার organ transplanation (অঙ্গ সংযুক্তি)-এর ব্যাপারে যে-নীতি, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুদান এবং গ্রহণ সম্বন্ধে যে ধরনের কড়াকড়ি রয়েছে রক্ত, রক্তজাতদ্রব্য ও প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় টিস্যুর ব্যাপারে তা প্রযোজ্য করা হয়নি। রক্ত ও রক্তাণুর ব্যাপারে এ শিথিলতা অনুমেয় ও গ্রহণযোগ্য। রক্তদান জীবনদানের নামান্তর এবং এই দান বা গ্রহণ যথার্থভাবে করা হলে দাতা ও গ্রহীতা দুপক্ষের কারোর জন্যেই শারীরিক বা মানসিক কোনো জটিলতার সৃষ্টি করে না। কিন্তু আমরা একই কথা কি বলতে পারি ডিম্বাণু, শুক্রাণু বা ভ্রূণের ব্যাপারে? এগুলো তো কেবল পুনঃপুন সৃষ্ট ও নিঃসৃত শারীরিক কতকগুলো কোষই নয়, হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি ও অনুভূতি এবং চিন্তাসমেত পরিপূর্ণ একটি মানুষ তৈরি করতে সক্ষম এগুলো — সক্ষম পারিবারিক ও সামাজিক নানান জটিলতা সৃষ্টি করতে। ফলে এগুলোর দান ও গ্রহণে যথেচ্ছাচার কোনোমতেই বরদাশত করা যায় না। ডিম্বাণু, শুক্রাণু ও ভ্রূণের বণ্টন সম্পর্কে খুব সুচিন্তিত নীতি-নির্ধারণ একান্ত জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রদান ও প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে যে-ধরনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেছে তার থেকে অব্যাহতি দিয়েছে প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অঙ্গ, কোষ, এমনকি ভ্রূণকেও। 'Organ'-এর সংজ্ঞাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে : 'The term human organ is used there to cover organs and tissues with the exception of reproductive tissues, namely ova, spermatozoa, ovaries, testicles and embryos, and of blood and blood constituents for transfusion purposes (world health Forum. page 310. 1991)।'

যুক্তরাষ্ট্রে যকৃত, বৃক্ক অথবা হৃৎপিণ্ডের মতো অঙ্গ বিক্রি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু শুক্রাণু বা ডিম্বাণু সরাসরি কেনাবেচায় কোনো বাধা নেই। বাধা নেই ডিম্বাশয় অথবা জরায়ু ভাড়া করতেও। সুখের বিষয়, ইদানীং কোনো-কোনো দেশে প্রজনন-অঙ্গ অথবা কোষ দান-গ্রহণের ব্যাপারেও কিছুটা সচেতনতা, কড়াকড়ি ও আইন প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রিয়াতে টেস্টটিউবে নিষেকক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তানলাভ করতে সক্ষম হবে কেবল বিবাহিত দম্পতি অথবা যে-দম্পতি অন্তত তিন বছর একসঙ্গে বসবাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু বেচাকেনা আইন অবহির্ভূত বলে বিবেচিত হবে। শুক্রাণু ব্যাংকে শুক্রাণু দানের জন্য দাতা কোনো অনুদান পাবে না এবং সেই শুক্রাণু সৃষ্ট সন্তানে তার কোনো অধিকার থাকবে না। ডিম্বাণু দান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, যেহেতু সংগ্রহের পদ্ধতি মেয়েদের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া এ পদ্ধতি প্রয়োগে মেয়েকে শোষণ করা হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুক্রাণু, ডিম্বাণু ও ভ্রূণের লেনদেন, surrogate motherhood সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে অস্ট্রিয়ায়। এ আইনকে চ্যালেঞ্জ করে কিছু ডাক্তার ইতিমধ্যেই আপিল করেছেন।

ডিম্বাণু, শুক্রাণু ও প্রজনন অঙ্গের বিকিকিনি ও ভাড়ার মাধ্যমে আজ শুধু বন্ধ্যা নারীরই নয়, যে-কোনো বিত্তবতী মহিলা সন্তানধারণ করার শারীরিক অসুবিধার জন্য অথবা নান্দনিক কারণে অনায়াসে দেখেশুনে একটি মেয়েকে ভাড়া করে নিতে পারে সন্তানের জন্মদাত্রী হিসেবে। আমাদের দেশে কাজের মেয়েকে নিয়োগ করার আগে যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হয় মেয়েটি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী ও কর্মক্ষম কি না। এই ভাড়াটে মা-টিকেও স্বামী-স্ত্রী মিলে দেখে নিতে পারেন — তার কোনো জীবাণুবাহী বা পারিবারিক রোগ আছে কি না, অতীতে কোনো সমস্যা ছিল কি না, মেয়েটির এর আগের কোনো সন্তান থেকে থাকলে তারা কীরকম হয়েছে দেখতে, তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা রয়েছে কি না ইত্যাদি। মানুষ বানাবার মেশিনের আর কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আমেরিকা-ইংল্যান্ডের মতো দেশের আইনপ্রণয়নকারী বিভাগ — হয়তো ফর্দ বানাবে এখন। এই পদ্ধতিগুলোর অপপ্রয়োগ ও গরিব অসহায় নারীকে শোষণ করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে তারা, এ আশা কি করা যায়?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীদেহে অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক অস্ত্রোপচার

নারীর যৌনতাকে নিয়ে পুরুষের বড় ভয়। ভয় নানা কারণে। প্রথমত নারীর যৌন আবেদন, তার শরীরের বিভিন্ন যৌন অনুষঙ্গ যতটা দৃশ্যমান, যতটা বিস্তৃত ও প্রচ্ছন্ন, পুরুষের তা নয়। নারীর স্তন, নিতম্ব, ওষ্ঠদ্বয় পুরুষদের প্রতিনিয়ত উন্মনা করে, উত্তেজিত করে, আকর্ষিত করে। এর থেকে নিস্তার পেতে এবং নারীকে ভোগের সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু ভাবার যৌক্তিকতা মনে ধারণ করতে পুরুষ বরাবরই আশা করেছে নারী তার যৌন আবেদনকে সবসময় পাহারা দেবে, লুকিয়ে রাখবে। এটা সম্পূর্ণই তার একক দায়িত্ব। নারীর যৌন আবেদনে পুরুষ যেন অবুঝ শিশুর মতোই সম্পূর্ণ অসহায় ও অন্ধ। দ্বিতীয়ত পুরুষ তার শারীরিক শক্তি, টেস্টোস্টেরন হরমোন ও সবল মাংসপেশির জোরে যৌনতার ব্যাপারে বরাবরই থাকে এক ভিন্ন অবস্থানে। প্রাণিজগতের অন্যান্য জীবের মতোই যৌনতার ক্ষেত্রে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবপ্রকাশ, আচরণ ও ভূমিকা নারীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। নারীকে চিরাচরিতভাবে পুরুষ তার বিশেষ ও তীব্র এক ধরনের আনন্দের উৎস বলেই বিবেচনা করে এসেছে। অথচ এ বিষয়ে নারীর আগ্রহ, মতামত বা চাহিদার ব্যাপারে সে থেকেছে পুরোপুরি উদাসীন। যৌন উদ্যোগ ও আচরণে পুরুষ তাই সক্রিয় ও অগ্রণী। নারীকে থাকতে হয়েছে নীরব, প্যাসিভ সহযোগী হয়ে। তৃতীয়ত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই যেহেতু সবকিছুর কর্ণধার, সর্বক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী, সর্ববিষয়ের সিদ্ধান্তদাতা, নারীকেও সে তার অন্যান্য সম্পদের মতোই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। আর সে জন্যই বিভিন্ন সমাজে কালে কালে নারীর বিরুদ্ধে বহু অনিয়ম, বিকৃতি, নিষ্ঠুরতা, দৈহিক পীড়ন ও নারীদেহ বিকলাঙ্গ করার উদাহরণ রয়েছে।

রক্ষণশীল সমাজে একটি মেয়েকে যখন একটি পুরুষ নিজের ভোগের জন্য নির্বাচন করবে, সে-মেয়েটিকে হতে হবে ফুটন্ত ফুলের মতো পবিত্র, অনাঘ্রাত, আছোঁয়া। একবার গ্রহণ করার পরও তার একনিষ্ঠ কর্তৃত্ব যাতে মেয়েটির ওপর বজায় থাকে তার নিশ্চয়তায় একেক সমাজে একেক ধরনের বাড়তি সংযোজন, বর্জন বা বিকৃতি হয়েছে নারীদেহে। পুরুষের সেই বহুবিধ দাবি পূরণ করতে কোনো কোনো সমাজে আজো বিভিন্ন ধরনের সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও ভয়াবহ অস্ত্রোপচার করা হয় নারীর যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের, বিশেষ করে পুরুষের, প্রত্যাশা পূরণ করতে কখনো নারী করে তা স্বেচ্ছায়, কখনো পরিবারের মুখ রক্ষা করতে, কখনো সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে। নিচে সংক্ষেপে এরকম দুটি অনর্থক অস্ত্রোপচারের উল্লেখ করা হলো। সমাজের অযৌক্তিক রীতিনীতি, প্রত্যাশার চাপে পড়ে নারীর শরীর কীভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে, তারই দলিল এই অস্ত্রোপচার। (যদিও এ ধরনের রীতি আমাদের দেশে চালু নেই, তবুও আফ্রিকা এবং আরব দেশের মেয়েদের সামগ্রিক অবস্থান বোঝার জন্য এ তথ্য সাহায্য করতে পারে)।

১. মেয়েদের খতনা : আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এবং কোনো-কোনো আরবীয় অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে খতনা করাবার রেওয়াজ রয়েছে। এ পদ্ধতিতে একটি মেয়ে শিশু বা কিশোরীর যোনির বহিরাঙ্গে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্লাইটরিস ও তার আশপাশের অংশবিশেষ পুরোপুরি বা আধাআধি কেটে ফেলে দেওয়া হয়। এটি একটি সামাজিক নিয়মে পরিণত হলেও এর উৎস এবং কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। জর্ডান বলে এক বিজ্ঞানী একসময় প্রচার করেছিলেন, ছেলেদের খতনার মতোই এটি মুসলমান ধর্মের গৃহীত একটি পদ্ধতি। তাঁর মতে ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকে এই নিয়ম প্রচলিত। কিন্তু পরবর্তীকালে গডউইন মেনিরু এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক একমত হয়েছেন যে, এ রীতির উৎপত্তিকে কোনো বিশেষ ধর্ম, বর্ণ, দেশ বা সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় না। ইসলামের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এর প্রচলন ছিল এবং যেসব জায়গায় ইসলাম প্রচার হয়নি সেসব অনেক জায়গাতেও এ রীতি বহাল রয়েছে। নাইজেরিয়া ও সোমালিয়ায় এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি।

এ পদ্ধতি সংযোজনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মেয়েরা যাতে যৌনানন্দ ভোগ করতে না পারে এ জন্যই এ পদ্ধতির উৎপত্তি ঘটেছিল। যৌন-আস্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম নারী যদি অন্য পুরুষের মনোযোগ স্থাপন করে, এ আশঙ্কায় সমাজ তাকে নিশ্চিত বেঁধে দিতে চেয়েছে তার দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব গ্রহণকারী কোনো পুরুষের সঙ্গে। আফ্রিকার ২৮টি দেশে ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর রীতিটি চালু রয়েছে। প্রায় বিশ লাখ নারীকে প্রতিবছর এই অমানবিক অস্ত্রোপচারের শিকার হতে হয়। বহু আন্তর্জাতিক নারী সংস্থা, চিকিৎসক সমিতি, সামাজিক সংগঠন, সংবাদমাধ্যমের সমালোচনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মেয়েদের ওপর এই খতনা পুরোদমে চলছে বহু দেশে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আইসিপিডি সম্মেলনে মেয়েদের খতনাকে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ ও ভয়ংকর বলে অভিহিত করে সত্বর এর পরিসমাপ্তি দাবি করা হয়েছে। এই ভয়াবহ পদ্ধতি প্রয়োগে শুধু যে মেয়েরা যৌন আনন্দ গ্রহণ করতে অসমর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে অথবা তীব্র ব্যথা বা অন্য জটিলতায় সহজ যৌন জীবনযাপন করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, এই অস্ত্রোপচারের ফলে অতিরিক্ত রক্তপাত বা সংক্রামক রোগের ছড়াছড়িতে অনেক মেয়ে মারাও যায় বা সারাজীবনের জন্য পঙ্গু বা কর্মে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গর্ভাবস্থায় চিকিৎসাসেবা পেতেও তাদের অসুবিধা হয়। প্রসবকালীন বিভিন্ন রকম সমস্যাও দেখা যায়।

আমেরিকার বিখ্যাত জার্নাল 'আমেরিকান জার্নাল অব অবস্ট্রেটিক্স অ্যান্ড গাইনোকলজি'-তে এ ধরনের বেশকিছু কেস স্টাডি দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আগত ইমিগ্র্যান্টদের প্রসবকালীন অনেক জটিলতার মধ্যে অন্যতম হলো সিজারিয়ান সেকশনের প্রকোপ যা মেয়েদের খতনার জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। ডাক্তারদের মতে, এই খতনার ফলে মেয়েদের গোপনাঙ্গের মাংসপেশি এমন খাবলা খাবলা করে উপড়ে ফেলা হয় যে, অবশিষ্ট অংশ একটির সঙ্গে আরেকটি বেখাপ্পাভাবে জোড়া লেগে যৌনাঙ্গের এক বীভৎস চেহারা নেয় এবং তা তার স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কার্যকলাপে বাধা দেয়। ডাক্তারদের জন্যে গর্ভাবস্থায় সন্তানের অবস্থান যাচাই করার মতো পরিবেশও যেখানে আর থাকে না।

একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ছত্রিশ বছর বয়স্ক এক সুদানিজ মহিলা আমেরিকার ডাক্তারের কাছে এসেছিলেন তার তৃতীয় সন্তান জন্মাবার আগে। তার আগের দুটো সন্তান সিজারিয়ান পদ্ধতিতে সুদানেই হয়েছে এবং এ জন্য শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে যথেষ্ট গালমন্দ খেতে হয়েছে বউটিকে। তাঁদের ধারণা, তাদের পুত্রবধূ অত্যন্ত দুর্বল মানসিকতার মানুষ, তাই স্বাভাবিক প্রসব ঘটেনি। এবার সে তাই আগেভাগেই চলে এসেছে আমেরিকা, যৌনিপথে প্রসবের আশায়। ডাক্তার তো তার যৌনাঙ্গ দেখে হতবাক। প্রসব করাবেন কী, একে পরীক্ষা করাও তো দুষ্কর। ডক্টর বেকার মহিলার ওপর আরেকবার অস্ত্রোপচার করে তার স্কার টিস্যুগুলোকে আস্তে আস্তে সরিয়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করেন। যথাসময়ে তার একটি সুস্থ সন্তান জন্ম নেয় যোনিপথে।

কিন্তু আফ্রিকার কোনো-কোনো গ্রামাঞ্চলে যেখানে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা আমাদের দেশের মতো বা তার চেয়েও খারাপ, সেখানে কত মা না জানি শুধু খতনার মতো এ অনর্থক অস্ত্রোপচারের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। প্রসবপথ এলোপাতাড়ি স্কার টিস্যু দিয়ে দুর্গম হওয়ায় স্বাভাবিক প্রসব অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। অথচ যথাসময়ে সিজারিয়ান করাও সবসময় হয়ে ওঠে না। এ জন্যও হয়তো অনেকে মারা যান। নাইজেরিয়ান ইবো গোষ্ঠীর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে মহিলাদের সবারই খতনা করা রয়েছে। ছয় বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে মেয়েদের মধ্যে এর হার ১৬.৫ শতাংশ। শতকরা বিশজন মেয়ে এই অস্ত্রোপচারের ফলে কোনো না কোনো মারাত্মক জটিলতার শিকার হচ্ছে। তবু আজো আন্তর্জাতিক তীব্র বিরোধিতার মুখেও দুই ডজনের বেশি দেশে এ অমানবিক রীতি চালু রয়েছে।

২. সতীচ্ছদ মেরামত করার অস্ত্রোপচার : গত কিছুদিন ধরে মিশরের এক অন্যতম প্রধান ব্যবসা হলো সতীচ্ছদ মেরামত করার অস্ত্রোপচারের সেবাদান। আরব দেশগুলো থেকে বহু নারী আসে এখানে এ জরুরি কাজটি সেরে নিতে। বিয়ের রাতে রক্তে ভেজা চাদর না দেখাতে পারলে বিয়ের লগ্নে বধূর কুমারীত্ব প্রমাণিত হয় না এখানে। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়েও এই অতি প্রাগৈতিহাসিক রীতিটি চালু রয়েছে ওসব দেশে। বিয়ের সময় মেয়ে কুমারী ছিল না, এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হলে পরিবারের মাথা শুধু হেঁট হয়ে যায় না, এ বিশাল পারিবারিক লজ্জা ও অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং অবশিষ্ট পারিবারিক সদস্যের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যভিচারী সদ্যবিবাহিত মেয়েটিকে তার ভাই বা বাবা নিজে হাতে খুন করেন। কখনো-কখনো জেলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সমাজের প্রত্যাশা পূরণে তারা সেটা করেন। তাই অকুমারীটি কুমারী সাজার জন্য যদি সতীচ্ছদ জোড়া লাগাবার আশায় দেশান্তরে ছোটে, অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মিশরে মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাদের সদস্যদের এ ধরনের অস্ত্রোপচার করতে বারণ করেছে। কেননা ডাক্তারি শাস্ত্রমতে এটি অনৈতিক ও অপ্রয়োজনীয়। মিশরের স্বনামধন্য আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের অপারেশনের বিরোধিতা করেছে। কেননা এটা 'পরিপূর্ণ ঠকানো' বা 'বাটপারি করা'। কিন্তু আসল কথা হলো, এই অস্ত্রোপচার চালু হওয়ার পর আরব দেশে পূর্বে উল্লিখিত 'পবিত্রতার জন্যে খুনের' পরিমাণ ৮০ শতাংশ কমে গেছে। এই অস্ত্রোপচারের সময় সার্জন ছিঁড়ে যাওয়া সতীচ্ছদের বাকি অংশ টেনে এনে সম্পূর্ণটা আবার জুড়ে দেন। সেইসঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি টকটকে লাল রং ভর্তি ক্যাপসুলও ঢুকিয়ে দেন যোনিপথে, যা প্রথম সহবাসে সহজেই ফেটে গিয়ে রক্ত হয়ে ঝরে পড়বে। স্বামী সেই রক্তে ভেজা রুমাল বা বিছানার চাদর গর্বের সঙ্গে বাসরঘরের বাইরে অপেক্ষারত কৌতূহলী গ্রামবাসীদের হাতে ছুড়ে মারবেন। কুমারীত্বের পরীক্ষায় পাস করে যাবে মেয়েটি।

একটি নিবন্ধে জানা গেছে, এ ধরনের সার্জারির চাহিদা মিশরের গ্রামের মেয়েদের মধ্যেও কম নয়। সামিয়া সালাত বলে এক মিশরীয় ডাক্তার জানিয়েছেন, তাঁর এক গ্রামের রোগী বিয়ের পরও দীর্ঘদিন স্বামী সহবাস থেকে বিরত থেকেছেন স্রেফ পাগল সেজে থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে রোগীটি অপেক্ষা করছিলেন একটা সুযোগের জন্য, সেই ফাঁকে এসে তিনি এই জরুরি অস্ত্রোপচারটি করিয়ে নিতে পারবেন।

এই বিশেষ সার্জারি নিয়ে কয়েক বছর ধরে পশ্চিমা জগতে অনেক তর্কবিতর্ক, তোলপাড় চলছে। প্রশ্ন উঠেছে আমেরিকা বা হল্যান্ডের মতো দেশে এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় একটি অস্ত্রোপচার সার্জনরা করবেন কি না। এটা করা আদৌ ন্যায়সংগত কি না। অথচ আরব দেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিবাসীরা যারা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে জীবনযাত্রার প্রতিপদে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে ভুগছেন, তাদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক জীবনের কথা চিন্তা করে তাদের এ অনুরোধ উপেক্ষা করাও কতটা যুক্তিসংগত হবে, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। নৈতিকতার প্রশ্নে ডাক্তার সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। যাঁরা এই ঐচ্ছিক অস্ত্রোপচারের বিরোধিতা করেন তাঁরা বলেন, এটি সুচিন্তিতভাবে লোক ঠকানো। যা সঠিক নয়, সত্য নয় সেটা প্রমাণ করতে এবং অন্যকে ধোঁকা দিতে চিকিৎসক সমাজ এগিয়ে আসতে পারে না। অন্য দল যাঁরা এই অস্ত্রোপচারের প্রতি সমব্যথী তাঁরা বলেন, ডাক্তারের প্রধান দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য তার রোগীর প্রতি। সেটা শুধু তার শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে নয়, মানসিক প্রশান্তি ও কল্যাণের জন্যও বটে। রোগী যদি চায় অথবা তার জীবনের মান উন্নয়নে, বিশেষ করে তার জীবন রক্ষায়, এ অস্ত্রোপচার যদি সহায়তা করে, এটা অবশ্যই করা দরকার।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা তথ্য দিয়ে রাখা ভালো। যেসব মেয়ে এ বিশেষ সার্জারির জন্য সার্জনদের কাছে আসেন, তাঁদের ৫০ শতাংশ বলেছেন, তাঁদের কুমারীত্বের অবসান ঘটেছে ধর্ষণের মাধ্যমে এবং তার অধিকাংশই ঘটেছে পারিবারিক সদস্যের দ্বারা। ডাক্তাররা এর সত্যতা বিচার করতে পারেননি। ব্রিটিশ জার্নাল অব মেডিসিনের সূত্র ধরে জানা যায়, যদি কিছু কিছু মেয়ে এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেও থাকে, তবু কিশোরী ও বালিকাদের ওপর এ ধরনের বলাৎকারের ঘটনা রক্ষণশীল সমাজে বা পরিবারে হয়তো যথেষ্টই বিদ্যমান। এ ব্যাপারটিও আরো তলিয়ে দেখা দরকার। এ বালিকাদের আত্মরক্ষার উপায় ও কৌশল শেখানোই অভিভাবকদের প্রধান কাজ। হয়তো অনেক সতীচ্ছদই অক্ষত থেকে যেতে পারে তাহলে।

সবশেষে ডাক্তারদের অভিমত — সতীচ্ছদ মেরামত নয়, ব্যক্তিমানসিকতার পরিবর্তন এবং সমাজবাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনই এর সমাধান। শিক্ষার প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রয়াসেই তা সম্ভব। সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সতীচ্ছদ শুধু যৌনমিলনের কারণেই ছিঁড়ে যায় না, খেলা, দৌড়ঝাঁপ, ট্যাম্পন ব্যবহারেও তা ঘটতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাআপনিও তা ছিঁড়ে যেতে পারে। এই বিশেষ পর্দাটির অস্তিত্ব আছে বলেই নারীকে তার কুমারিত্বের অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে একজনের জীবনসঙ্গী হতে হবে, এর কোনো মানে হয় না। একই রকমভাবে কিন্তু কোনো পরীক্ষা পুরুষকে দিতে হয় না। শত নারীর সঙ্গসুখ উপভোগ করেও পরিপূর্ণ কুমার সেজে অনায়াসে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারে সে। কোনো চিহ্নই থাকে না। অথচ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, মানুষ হিসেবে, জীবনসঙ্গী হিসেবে একজন নারীর মূল্যায়নে বা নির্বাচনে কুমারীত্বকে আজো দুঃখজনকভাবে প্রধান বিবেচনায় রাখা হয়।

এ দুটি অস্ত্রোপচার ছাড়াও নারীদেহে প্রতিদিন বহু অপ্রয়োজনীয় সার্জারি করা হচ্ছে। অনবরত চলছে প্রত্যঙ্গচ্ছেদ। নিরাপদ মাতৃত্বের নামে কত যে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান করা হচ্ছে জগৎজুড়ে, তার হিসাব নেই। অর্থের লোভে ও মানুষের সন্তানের ব্যাপারে দুর্বলতা (বিশেষ করে অনেক সাধ্যসাধনার পর যে শিশুর জন্ম) ও অহেতুক ভয়কে পুঁজি করে পৃথিবীজোড়া এক বিশাল ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে স্বাস্থ্যব্যবস্থা। অথচ যাদের সত্যিকার অর্থেই প্রয়োজন সিজারিয়ান, যাদের অবস্থা এই অপারেশন ছাড়া মরণাপন্ন, তারা কিন্তু অনেকেই পাচ্ছে না এই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা। সিজারিয়ান সেকশনের পুরো ব্যাপারটাকেই ইচ্ছাকৃতভাবে রহস্যাবৃত (মিস্টিক) করে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো নারী তার এই অক্ষমতাকে (যোনিপথে প্রসবে ব্যর্থতা) নিয়ে গর্ববোধও করে। তার কাছে মনে হয় তার তারুণ্য ও যৌন আবেদনের প্রতীকই এই সিজারিয়ান। আসলে এটা অনেকেই জানেন না যে শরীরের কাঠামোগত কারণে সিজারিয়ানের প্রয়োজনীয়তা হয় খুবই কম। বেশির ভাগ সময়েই এটা হয় শেষ মুহূর্তে শিশুর অবস্থান পরিবর্তনের কারণে অথবা অন্য কোনো জটিলতার আবির্ভাবে। আর কাঠামোগত কারণে যখন সেটা হয়ও, প্রধানত তা হয় পেলভিক হাড়ের গড়নের জন্যে — মাংসল কোনো অঙ্গের যেমন জরায়ু বা যোনির ইলাসটিসিটি বা অন্য কোনো গুণাগুণের জন্যে নয়।

একবার সিজারিয়ানে বাচ্চা প্রসব করলে পরবর্তী প্রসবেও সেভাবেই তা ঘটতে হবে, ডাক্তারদের এককালের এই মতামতকেও আর গ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। পশ্চিমের দেশগুলোতে এখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানকেও স্বাভাবিকভাবে প্রসব করানো হয়, প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান সিজারিয়ানে হওয়া সত্ত্বেও। এদেশেও এই ধরনের মনোভাব ও চর্চা প্রসার পাবে বলে আমরা আশা করব। প্রয়োজনে সিজারিয়ান অপারেশন জীবনরক্ষাকারী একটি পদক্ষেপ। সেটা সেভাবেই সংরক্ষিত থাক। ব্যথাহীন প্রসব, প্রসব-প্রস্তুতিপর্বের সুবিধা এবং ডাক্তার বা ক্লিনিকের আর্থিক লাভ যেন এর কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। অযথা একটি নারীর দেহেও যেন কখনো অস্ত্রোপচার না ঘটে, বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার পরিহার সম্ভব হলে।

এছাড়া কথায় কথায় হিস্টারেক্টমি (জরায়ু ফেলে দেওয়া), জোর করে স্টেরিলাইজেশন (বন্ধ্যাত্বকরণ), অপ্রয়োজনীয় এপিসিওটমি (প্রসবের সময় যোনি ও মলদ্বারের মাঝখানটা কেটে ফেলে সন্তান প্রসবের সহায়তা করা), স্তন ক্যান্সারে ক্যান্সারের অংশটুকুর পরিবর্তে প্রায় সর্বদাই পূর্ণ মাস্টেক্টোমি (স্তন ফেলে দেওয়া) নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিশেষ করে নারী যদি যৌবনাতিক্রান্ত হয়, তার সন্তানধারণের প্রয়োজনীয়তা যদি আর না থাকে, তাহলে তার শরীরের এই বিশেষ দুটি প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ স্তন ও জরায়ু যেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে সমাজের চোখে। শুধু শারীরিক ব্যথা, অস্বাচ্ছন্দ্যেই নয়, জরায়ুহীন বা স্তনহীন একটি নারী যে প্রবল মানসিক যন্ত্রণার ভেতর বসবাস করে তার খবর কে রাখে? ভাবখানা এমন যে নারীদেহ যদি কেবল সন্তান বানাবার যন্ত্র ও সন্তানের খাদ্য জোগাবার বস্তু না হয়ে থাকে, তাহলে তা শুধুই পুরুষের আনন্দ জোগাবার রসদ। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা নারী যেহেতু পুরুষের নজর কাড়তে ততটা সফল নয়, তার এই প্রত্যঙ্গগুলো তাই তখন মূল্যহীন ও অবহেলিত হয়ে পড়ে সমাজের চোখে। অনেক নারীই তার জীবনচক্রের এই স্বাভাবিক গতিকে, ধীরে-ধীরে বার্ধক্যের দিকে এগোনোকে মানতে পারে না। কোনো-কোনো নারী আবার তার ওপর পুরুষ-আরোপিত সেই বিশেষ ভূমিকায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত করে স্তন উত্তোলন ও বর্ধনে চামড়া কেটে বুকের ভেতর সিলিকা জেলের ব্যাগও ঢোকাচ্ছে একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও মারাত্মক (সিলিকা জেল শরীরে শোষিত হয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে) অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে।

শেষ হোক নারীদেহের ওপর অমানবিক, অপ্রয়োজনীয় এ ধরনের সকল উৎপাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের খোঁজে

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের একটি নিবন্ধ আমার নজর কেড়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকী ও খবরের কাগজগুলোতে বেশ কিছু লেখা বেরোচ্ছে। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে ভাববার; চাঞ্চল্যকর তো বটেই। ঘটনাটা হলো, বাংলাদেশসহ এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে কোটি-কোটি মেয়ে সবার চোখের আড়ালে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তারা প্রতিদিন — প্রতিমুহূর্তে। তাদের খোঁজ করা দরকার। কোথায় যাচ্ছে তারা — কী হচ্ছে তাদের — কেমন করে সেটা সম্ভব হচ্ছে, এসবই জানা দরকার।

প্রতি পরিবারে সমান-সমান ছেলে ও মেয়ে সন্তানের সংখ্যা যদিও সচরাচর চোখে পড়ে না, তবু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ও পরিসংখ্যানের ফর্মুলা অনুযায়ী গড়ে মেয়ে ও ছেলের মোট সংখ্যায় খুব বেশি একটা তারতম্য হয় না। লিঙ্গভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ করা না হলে স্বাভাবিকভাবে মেয়ে ও ছেলের আনুপাতিক হার ১.০৫ বা এর খুব কাছাকাছি হতে দেখা যায়। আর এই সংখ্যাটি কিছু জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া সর্বকালে সর্বদেশের জন্যেই প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সসহ ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশই মেয়ে আর ছেলের আনুপাতিক হার ১.০৫ বা তার সামান্য ওপরে অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন ছেলের সঙ্গে ১০৫টি মেয়ে রয়েছে। অথচ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপারটা ঠিক উলটো। অর্থাৎ এই আনুপাতিক হার মেয়েদের বদলে ছেলেদের অনুকূলে। এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চলে মেয়ে ও ছেলের হার কমতে কমতে একের নিচে চলে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, এই হার মিশরে ০.৯৫। বাংলাদেশ, চীন ও পশ্চিম এশিয়ায় ০.৯৪; ভারতে ০.৯৩ আর পাকিস্তানে ০.৯০। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, এসব দেশে মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণই এই অস্বাভাবিক সংখ্যার জন্যে দায়ী। যে তিনটি উপকরণ প্রধানত মেয়ে ও ছেলের আনুপাতিক হারের জন্যে দায়ী সেগুলো হলো : (১) জন্মের হার, (২) মৃত্যুর হার ও (৩) দেশত্যাগ অথবা বহিরাগমনজনিত পরিবর্তন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সব জায়গাতেই মেয়েসন্তানদের চেয়ে ৫ শতাংশ পুত্রসন্তান বেশি জন্মগ্রহণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সংখ্যায় বেশি জন্মগ্রহণ করলেও জীবনধারণ বা বেঁচে থাকার ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি। এছাড়া হৃৎপিণ্ডের অসুখ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ইত্যাদির মতো মারাত্মক অসুখগুলোর প্রকোপও মেয়েদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে তাদের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল গড়ে ছেলেদের চেয়ে বেশি। যুদ্ধ, ধূমপান, মদ্যপান, সড়ক দুর্ঘটনা, খুনখারাবিজনিত মৃত্যুর হারও যেহেতু পুরুষদের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত বেশি, সেহেতু সব দিক থেকেই মোট সংখ্যায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের তুলনায় এগিয়ে থাকা স্বাভাবিক। উন্নত দেশগুলোতে সেটাই ঘটে থাকে। দেশত্যাগী বা বহিরাগতদের কারণে কোনো-কোনো বিশেষ সময়ে বিশেষ দেশে মেয়ে ও ছেলের আনুপাতিক হার কিছুটা হেরফের হলেও প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে প্রতিটি উন্নত দেশের মেয়ে ও ছেলের পার্থক্যের কারণ কখনই এটা হতে পারে না। হলেও উলটোটাই হওয়া উচিত।

আর সেটাই যদি সত্য হয়, তাহলে এশিয়ায় মেয়েদের তুলনায় ছেলের সংখ্যা এত বেশি কেন? এসব অঞ্চলের কোটি কোটি মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে? ইউরোপ ও আমেরিকায় যা স্বাভাবিক, সেই হিসাব করলে চীনে পাঁচ কোটি মেয়ের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তারা গেল কোথায়?

কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে, আমেরিকা বা ইউরোপকে মানদণ্ড বিবেচনা করে আমাদের মতো উন্নয়নীল দেশকে বিচার করলে চলবে না। কেন না ওইসব দেশের তুলনায় জন্মের হার ও মৃত্যুর হার আমাদের মতো দেশে অনেক বেশি। সম্ভাব্য জীবনসীমাও তুলনামূলকভাবে কম। এই সব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যদি এশিয়ার দেশগুলোতে উন্নত দেশের পরিবর্তে আফ্রিকার উপ-সাহারা অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে কী হয়? আফ্রিকার ওইসব অঞ্চলে জন্ম-মৃত্যুর হার ও সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল যেহেতু আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনীয়, ওখানকার মেয়ে-পুরুষের আনুপাতিক হারের পার্থক্য কেবলমাত্র মেয়েদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানগত কারণের জন্যেই হওয়া স্বাভাবিক। অর্থোপার্জনে মেয়েদের অংশগ্রহণ করার কারণে উপ-সাহারা অঞ্চলের আফ্রিকানদের মধ্যে মেয়েদের প্রতি বিরূপ মনোভাব তেমন লক্ষণীয় নয়। সেই হিসাবে দেখা গেছে যে, উপ-সাহারা অঞ্চলে মেয়ে-পুরুষের আনুপাতিক হার ১.০২২। এ সংখ্যাটিকে মানদণ্ড বিবেচনা করলেও চীন দেশের ৪.৪ কোটি ও ভারতে ৩.৭ কোটিসহ সমগ্র পৃথিবীতে ১০ কোটি মেয়ের কোনো খোঁজ মেলে না।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে অমর্ত্য সেনের হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের ওপর রচিত সিরিজের ওপর পরবর্তীকালে অন্যান্য অনেক অর্থনীতিবিদই কাজ করেছেন। সম্প্রতি জার্মানির স্টিফেন ক্লাজেন ও ক্লদিয়া উইস্ক এ ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অমর্ত্য সেনের আনুমানিক সংখ্যা ১০ কোটির চাইতেও বেশি এই হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের সংখ্যা। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোটি। প্রধানত দুই উপায়ে এই সংখ্যা নির্ণিত হয় : (১) বয়স অনুযায়ী ছেলে ও মেয়েদের মৃত্যুর হার নির্ণয় করা এবং (২) আপামর জীবিত জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যার আনুপাতিক হার বের করা। ভাবতে গা শিউরে ওঠে যে, বিংশ শতাব্দীতে জগৎজুড়ে দুর্ভিক্ষজনিত কারণে যেসব মৃত্যু হয়েছে, সেসব একত্রিত মৃত্যুর সংখ্যার চাইতেও বেশি এই হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের সংখ্যা। এই সংখ্যা দুই বিশ্বযুদ্ধে নিহত এবং ১৯১৮-২০ সালের ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে মৃতের একত্রিত সংখ্যার চাইতেও বড়। পৃথিবীজুড়ে এইডস রোগে মৃতের সংখ্যার চাইতেও বেশি এ সংখ্যা।

তবে আশার কথা হলো, ইদানীংকালে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় এ ব্যাপারে উন্নতি লক্ষ করা গিয়েছে। ভারতে অপেক্ষাকৃত কম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আর চীনে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের সংখ্যার নিম্নগতি লক্ষ করা যায়। অন্য একটি জরিপে কোল এবং তাঁর সহকর্মীরা জন্ম-মৃত্যুর হার ও সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বিবেচনা করে দেখিয়েছেন যে, মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা না হলে এশিয়ার দেশগুলোতে এই মুহূর্তে যতজন নারীর অস্তিত্বের কথা ছিল, তার তুলনায় চীনে ২.৯ কোটি, ভারতে ২.৩ কোটি এবং অন্যান্য দেশসহ পৃথিবীতে সবসুদ্ধ অন্তত ছয় কোটি মেয়ে কম বিদ্যমান।

অন্যান্য দেশের তুলনায় এশিয়ায় মেয়েদের এই নিম্ন আনুপাতিক হারের কারণটা কী? অনেক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ছেলেশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুর মৃত্যুর হার অনেক বেশি এশিয়ায়। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, জন্মের পর প্রথম চার দশকে পুরুষের তুলনায় নারীর মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ অবশ্য গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালীন মৃত্যুর হার অধিক। কিন্তু জন্মের পর থেকে প্রাক-কৈশোর পর্যন্ত মেয়েদের সংখ্যাস্বল্পতার জন্যে তো গর্ভাবস্থায় জটিলতাজনিত মৃত্যু দায়ী হতে পারে না। তাহলে? অন্য কারণগুলো কী? বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, এর প্রধান কারণ নারীশিশুর প্রতি পরিবার ও সমাজের অবহেলা ও ঔদাসীন্য। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অনেক দেশে প্রতিনিয়ত মেয়েশিশুরা পরিবারে এ ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আওতাভুক্ত 'ট্রপিক্যাল ডিজিজ রিসার্চ' (টিডিআর) বুলেটিনের একটি নিবন্ধে এ ধরনের একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য ছিল। ওই নিবন্ধে একটি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে থাইল্যান্ডে বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেন যে, ওই রোগে ছেলেরাই তুলনামূলকভাবে বেশি আক্রান্ত হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে না পেরে লিঙ্গভেদের দরুন দৈহিক পার্থক্যকেই তাঁরা প্রথমত দায়ী করে বসেছিলেন। তারপর পরম বিস্ময়ে তাঁরা লক্ষ করলেন, ব্যাপারটা তা নয়। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যেসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগীকে নিয়ে আসা হয়, তারা বেশির ভাগই হলো পুরুষ রোগী। মেয়ে রোগীদের, এমনকি অসুস্থ শিশু মেয়েদেরও অপেক্ষাকৃত কম আনা হয় চিকিৎসাকেন্দ্রে। এটার সত্যতা বিচার করার জন্যে তাঁরা একই সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করেন হাসপাতালের পরিবর্তে বাড়ি বাড়ি গিয়ে। মাঠকর্মীদের সংগৃহীত সেই তথ্যে জানা গেল, প্রকৃতপক্ষে ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কোনো তারতম্যই নেই।

এ ঘটনার পর ট্রপিক্যাল ডিজিজ রিসার্চ বিভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কেবলমাত্র মেয়েদের ওপর বিভিন্ন ট্রপিক্যাল রোগের প্রকোপ, আনুষঙ্গিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর ওপর গবেষণার জন্যে একটি পৃথক কমিটি ও বিশেষ ফান্ডের ব্যবস্থা করে।

অনুরূপভাবে মনিকা দাসগুপ্তের একটি সমীক্ষায় দৃষ্টি উন্মোচনকারী এক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবে পাঁচ বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর হার জরিপ করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করছেন যে, যেসব মেয়ে শিশুর বড় কোনো বোন নেই, তাদের মৃত্যুর হার সমবয়সী ছেলেশিশুদের মৃত্যুর হারের তুলনায় সামান্য বেশি। কিন্তু যেসব মেয়েশিশুর একটি অগ্রজ সহোদরা রয়ে গেছে, তাদের মৃত্যুর হার ছেলেশিশুদের তুলনায় দ্বিগুণ। এ তথ্য এই সংবাদই পরিবেশন করে যে, মেয়েশিশুদের প্রতি এসব দেশে রয়েছে পরিবারের গভীর অবজ্ঞা, যা কিছুটা কম স্পষ্ট হয় যদি কন্যাটি ভাগ্যক্রমে প্রথম সন্তান হয়। দাসগুপ্তের এই নিরীক্ষা অনুযায়ী শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে মেয়েদের জন্যে ১৯.৬ ও ছেলেদের জন্য ১৪.৮।

ইতিমধ্যেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম না হলে উন্নয়নশীল দেশের মেয়েশিশুরা সাধারণত এক থেকে দু-বছর পর্যন্ত অন্তত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে মারাত্মক বৈষম্যের শিকার হয় না। এর কারণ — দেশের অনেক মায়েরাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখেন সন্তানদের। আর তাই এই সময়টাতে মেয়েসন্তানদের খাবারের জন্যে বাড়তি খরচের দরকার হয় না। কিন্তু যখন থেকেই শিশুরা বাইরের খাবার খেতে শুরু করে তখন থেকেই ছেলেশিশুদের তুলনায় মেয়েশিশুদের মধ্যে পুষ্টির অভাব ঘটতে শুরু করে। মেয়েদের প্রতি অবহেলা ও আপামর ভুল শিক্ষার ফলে সাধারণ গরিব পরিবারে তাদের অপেক্ষাকৃত কম ও নিকৃষ্টমানের খাদ্য পরিবেশন করা হয়। এছাড়া অসুখবিসুখে তাদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা, বিশ্রামের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় না।

কয়েকটি রাজনৈতিক নীতি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রযুক্তির অগ্রগতিও পরোক্ষভাবে মেয়েদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কাজ করছে। প্রথমত, চীনে সত্তরের দশকে এক সন্তানের বাধ্যবাধকতা সরকারিভাবে অনুমোদিত হয়ে যাওয়ার পর মেয়ে ও ছেলের আনুপাতিক হার আরো কমতে শুরু করে। সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে মেরে ফেলার মতো জঘন্য রীতি প্রাচীনকাল থেকেই এ সমাজে প্রচলিত থাকলেও এই প্রগতির যুগে তা আবার নতুন করে ঘটতে শুরু করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চীনদেশে এক সন্তানের নীতি প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই। বংশরক্ষা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জন্যে এদেশে পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমাদের দেশের মতোই প্রচলিত। ফলে চীনদেশে বর্তমানে নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার ০.৯৪ হওয়ার অন্যতম কারণ শিশুকন্যা নিধন অথবা প্রথম কন্যার জন্মসংবাদ গোপন রেখে দ্বিতীয় সন্তান গ্রহণ। যে-সন্তানের অস্তিত্ব জনসম্মুখে স্বীকার করতেই কুণ্ঠা, সে-সন্তানের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান সহজেই অনুমেয়। কয়েক বছর আগে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় বেশ কয়েকটি সংবাদ বেরিয়েছিল চীনের এক সন্তান কর্মসূচি ও মেয়েশিশুদের অবস্থা সম্পর্কে।

বিজ্ঞানের নবতম প্রযুক্তির সাহায্যে আরেকভাবে জন্মের আগেই মেয়েসন্তানদের বিনষ্ট করা হচ্ছে ইদানীং। এই পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক নাম এমনিওসিন্টেসিস। এই পরীক্ষার জন্যে গর্ভবতীর পেটের ভেতর মোটা সুই ঢুকিয়ে ৩০-৩৫ মিলিমিটার এমনিওটিক ফ্লুইড (গর্ভথলির ভেতর যে পানীয়তে শিশু ভেসে বেড়ায়) বের করে আনা হয় সিরিঞ্জ নিয়ে। সেই পানীয়তে ছড়িয়ে থাকে ভ্রূণের শরীর থেকে ছিটকে পড়া জীবকোষ। এই জীবকোষ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারেন অনাগত শিশুটির মারাত্মক জন্মগত কোনো অসুখ আছে কি না অথবা তার বিকলাঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না। অবশ্য মাত্র কয়েকটি জন্মগত অসুখ বা অসুবিধের সম্ভাবনাই কেবল জানা যায় এ পরীক্ষায়, সার্বিক সুস্থতার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। আরো একটি সংবাদ জানা যায় এ পরীক্ষার মাধ্যমে। জানা যায়, শিশুটি মেয়ে না ছেলে। শেষের তথ্যটি জানার জন্যে এ পরীক্ষার উদ্ভব হয়নি। প্রথম তথ্যগুলো জানার জন্য যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে হয়, তাতেই অতিরিক্ত সংবাদ হিসেবে এই খবরটি বেরিয়ে আসে। বস্তুত পশ্চিমা দেশগুলোতে শিশুর লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা বেআইনি। মায়ের বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হলে (যখন বিকলাঙ্গ অথবা অসুস্থ শিশু জন্মাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে) অথবা পারিবারিক ধারা বা মায়ের ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপনের কারণে অনাগত সন্তানের সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগলেই কেবল এ পরীক্ষা করা হয়। অথচ ভারতসহ বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে এই পদ্ধতিটি ভুল ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে গর্ভের সন্তানটির লিঙ্গ নির্ণয়ের উপায় হিসেবে।

নিউইয়র্ক টাইমসের একটি খবর অনুসারে বম্বের ক্লিনিকগুলোতে লাইন ধরে গর্ভবতী মহিলারা দাঁড়িয়ে থাকে এ পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে। কোনো কোনো প্রাইভেট ক্লিনিকে নাম লিখিয়ে শত শত মেয়ে অপেক্ষা করছে ভবিষ্যৎ সন্তানদের লিঙ্গ জানবার আশায়। আর যখন তারা জানতে পারে গর্ভের সন্তান অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যা, তখন তাদের জন্যে সেই ক্লিনিকেই ব্যবস্থা রয়েছে গর্ভপাতের। যথেষ্ট পরিমাণ এমনিওটিক ফ্লুইড জমা না হওয়া পর্যন্ত এ পরীক্ষা যেহেতু করা যায় না, সেহেতু গর্ভের প্রথমাবস্থায় এমনিওসিন্টেসিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা সম্ভব নয়। যে পর্যায়ে তা করা হয় তখন যদি গর্ভপাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তাহলে কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্যে যথোচিত সতর্কতার সঙ্গেই করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় গর্ভবতীর জীবনাশঙ্কা দেখা দিতে পারে। অনাগত শিশুটির বিকলাঙ্গ হওয়ার বা বংশগত রোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা এতই অল্প যে, পশ্চিমের অধিকাংশ গর্ভবতীকেই এ পরীক্ষার পর গর্ভপাত করতে হয় না। অথচ বাঞ্ছিত লিঙ্গের সন্তানের জন্যে উন্নয়নশীল দেশে যারা এ পরীক্ষা করে থাকে, তাদের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগেরই সম্ভাবনা থাকে গর্ভপাতের ঝুঁকি নেওয়ার। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো যে, পরীক্ষাটি মা ও অনাগত সন্তান উভয়ের জন্যেই বেশ খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ; উপরন্তু যা এমনকি পশ্চিমের দেশগুলোতেও যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ, সেই পরীক্ষাটি সরকার কেমন করে এত সহজে এত স্বল্প খরচে সকলের জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ করে দিলো, সেটা খুবই রহস্যজনক। পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহ দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, একবারও কি তারা ভেবে দেখবে না মেয়ে-পুরুষের ভারসাম্য যেখানে ইতোমধ্যেই লঙ্ঘিত এবং মেয়েরা সংখ্যায় এতটা কম, সেখানে এরকম একটি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বিচারে মেয়ে ভ্রূণের বিনাশ শুধু যে অমানবিক তা-ই নয়, ভবিষ্যতের জন্যেও তা একটি বড় রকম সামাজিক সমস্যার কারণ হতে পারে। (পরবর্তীকালে অবশ্য ভারতে এ প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন পাস হয়েছে।)

মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশ কম এবং তা আরো কমছে। এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু এর সমাধান কী? গতানুগতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব অবশ্যই প্রয়োজন। ছেলেশিশুর প্রতি অহেতুক স্পর্শকাতরতা নিরসনে বাস্তব পদক্ষেপ ও গঠনমূলক নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা খুবই জরুরি। দেখা গেছে, মেয়েদের আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের বিষয়ে মানুষের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। জীবন ও সংসারের মৌলিক ব্যাপারগুলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও বাড়ে মেয়েদের। ঘরের বাইরে অর্থকরী কাজে নিযুক্ত মেয়েদের সমাজে ও সংসারে সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। নিজেদের ও মেয়েসন্তানদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে কথা বলার সাহস জাগে এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও তা মেনে নেয়। কেননা একটি অর্থোপার্জনক্ষম মেয়ে তার পরিবারে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, মেয়েরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল নয়; পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতায় তাদের দায় আছে, করণীয় আছে এবং তা তারা যথোচিতভাবে পালন করছে। অর্থোপার্জন ছাড়াও শিক্ষার বিস্তার এই হারানো মেয়েদের সন্ধানলাভে ও তাদের ভবিষ্যতে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এছাড়া আইনগতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বৈষয়িক মালিকানা অর্জন এবং বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ে মেয়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও সমাজ থেকে নারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি এ ধরনের অনভিপ্রেত ও বৈষম্যমূলক আচরণ কমতে শুরু করবে। এ সকল ব্যাপারে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা ও সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ড. অমর্ত্য সেন উদাহরণস্বরূপ ভারতের কেরালা রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই অঞ্চলটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে। আজো এই রাজ্যে ওই দেশের সবচেয়ে উঁচুমানের স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। শতকরা ৯০ জনেরও বেশি লোক লেখাপড়া জানে সেখানে। অধিকাংশ মেয়ে সম্পত্তির ভাগ পায়। মেয়েদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্থকরী কাজে নিয়োজিত। ওখানকার স্বাস্থ্য-বিভাগও উন্নতমানের এবং জনসাধারণ ব্যাপকভাবে এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কেরালা যদিও ভারতের অন্য সকল দরিদ্র রাজ্যের একটি, তবু সরকারি পর্যায়ে এখানে বিভিন্ন জনহিতকর পরিকল্পনা গ্রহণের কারণে এ রাজ্যে সম্ভাব্য জীবনসীমা বর্তমানে মেয়েদের বেলায় ৭৩ বছর ও পুরুষদের বেলায় ৬৭ বছরে উন্নীত হয়েছে, যা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশি। উল্লেখ্য, কেরালায় মেয়ে ও পুরুষের আনুপাতিক হার আমেরিকা ও ইউরোপের মতো ১.০৪, যদিও সারা ভারতে এই হার পড়ে ০.৯৩। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার তুলনায় মেয়েদের অস্তিত্বের ব্যাপারে কেরালার এই উজ্জ্বলতর অবস্থান এই সত্যই নতুন করে মনে করিয়ে দেয় যে, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজসচেতনতা ও সুস্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে এইসব হারানো মেয়েকে উদ্ধার করা সম্ভব, সম্ভব বঞ্চিত এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ন্যায্য আলোর মুখ দেখানো। আর মানবজাতির সার্বিক মঙ্গলের জন্যেই তা করা উচিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আসে আনন্দে

দুম করে কথাটা বলে ফেলল কৃষ্টি।

এত সহজে এত শান্ত গলায় বলল, মনে হলো, যেন তার পছন্দের লাউ-চিংড়ি অথবা রসমালাই খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করল মাত্র। শব্দগুলোর ভেতর যে মহা বিস্ফোরক কোনো বস্তু, রীতিমতো নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন লুকিয়ে ছিল তা যেন সে খেয়ালও করেনি।

রাতের খাবার শেষে জয়ন্ত সবে কাঁটাচামচ দিয়ে একখণ্ড ত্রিভুজ আকারের আপেল পাইয়ের কোনা ভেঙে ছোট্ট একটি টুকরো মুখে পুরেছে। মাধুরীর নিজের হাতে বানানো আপেল পাই। এ বাড়ির সকলের প্রিয়। কিন্তু আজ জয়ন্তর মনে হলো পাইয়ের ভেতরটা বড্ড বেশি গরম। মুখের ভেতরের তালু আর জিভ পুড়ে যাচ্ছে যেন। জয়ন্ত ভেবে পাচ্ছে না টুকরোটা গিলে ফেলবে নাকি মুখ থেকে বের করে ফেলে দেবে। মনস্থির করতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে মেয়ের মুখের দিকে কেবল তাকিয়ে রইল। এই মাত্র যা শুনল জয়ন্ত, সত্যি সত্যি-ই কি কৃষ্টি তাই বলেছে? নাকি বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে তার? ইদানীং কখনো কখনো কথা বুঝতে অসুবিধা হয় জয়ন্তর।

ব্যবহৃত বাসনকোসনগুলো সিঙ্কে নামিয়ে রেখে মাধুরী সবে সবাইকে আপেল পাইয়ের ওপর হুইপিং ক্রিম মাখিয়ে পরিবেশন করতে শুরু করেছিল। তৃতীয় টুকরোটির ওপর হুইপিং ক্রিম মাখানো আর হলো না। হাতটা থেমে গেল মাধুরীর। এসব কী বলছে কৃষ্টি? ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

'আমি একটা বাচ্চা নেওয়ার কথা ভাবছি। সিরিয়াসলি!'

কথাটা বলেই এক মনে আপেল পাই খেতে শুরু করল কৃষ্টি। যেন নেহায়েত মামুলি একটা কথা বলেছে। যেমন কাল সন্ধ্যায় বলেছিল, সিনেমা হলে গিয়ে একটা ছবি দেখতে চায়। ক্রিসমাসের ছুটিতে যখনই আসে বাড়িতে, এমনি ছোটখাটো ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে দুসন্তানই। সব দেখে মাধুরীর মনে হয়, এ সময়টা এলে ওরা যেন ইচ্ছে করেই শৈশবে ফিরে যেতে চায়। এ বাড়িতে এই ডিসেম্বরের শেষ আর জানুয়ারির শুরু ছাড়া অন্য কোনো সময় কোনো উৎসব পালনের রেওয়াজ নেই কিনা।

কৃষ্টি কি বুঝতে পারছে কী সাংঘাতিক কথা উচ্চারণ করল সে এইমাত্র?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে অঝোরে বরফ পড়ছে। সেই সকাল থেকেই। মাধুরী ভাবে, এইবার সকলের সাধ মিটেছে, সাদা ক্রিসমাস হয়েছে। কিন্তু এর পরেও বরফ কমছে না। গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা কণাগুলো আকাশ ফুটো করে অনবরত ঝরে পড়ছে মাটিতে। কাচের জানালার মধ্য দিয়ে মাধুরী দেখে, তাদের বাড়ির সামনের লাইট পোস্টের আলোয় সহস্র হিমকণা ক্রমাগত ঝিরঝির করে ভেসে বেড়াচ্ছে। বরফের সঙ্গে একটু হাওয়াও আছে মনে হয়। সমস্ত অঞ্চলটা সাদা ধবধবে হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারকে ফালা ফালা করে কেটে দিয়ে স্তূপীকৃত তুষার থেকে বিচ্ছুরিত এক ফ্যাকাসে আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আশপাশে গাছের কালো কালো কাণ্ড আর পাতাহীন ডালগুলোর অর্ধেক ঢেকে রেখেছে সাদা বরফের স্তর। ঝাঁকড়া গাছগুলোতে ঝুলন্ত তুষারের ছোট ছোট নানান আকারের রুপোলি অলংকার বিদ্যুতের আলোয় ঝিকমিক করছে।

খাবার শেষ করেই বাইরের ঘরে টেলিভিশনের সামনে গিয়ে আবার বসেছে সবাই। ফিয়েস্তা বোউল দেখানো হচ্ছে এনবিসিতে। সকালের টিম ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান খেলছে সেখানে। এবারের মিশিগান টিম অন্যান্যবারের মতো ভালো হয়নি। তবু তো বোউল গেমে যেতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত! রোজ বোউলে না হোক, ফিয়েস্তা বোউলে তো গেছে!

কৃষ্টির কোনো কথাই কানে যায়নি সকালের। প্রবল উৎসাহে এইমাত্র হাত চাপড়ে উঠল সকাল, তার দলের সাফল্যে। লুইজিয়ানা একটা ফাম্বল করেছে। করেছে তো করেছে, একেবারে মিশিগানের দশ গজের ভেতরে এসে। আর মিশিগানের ডিফেন্সের টম কিটিং সেই বল নিয়ে সোজা দৌড়ে একবারে টাচডাউন করে দিয়েছে। নব্বই গজের টাচডাউন। সোজা কথা? সতেরো-দশে মিশিগান এখন এগিয়ে রয়েছে। থার্ড কোয়ার্টার চলছে। সকালকে আর পায় কে?

ক্রিসমাস ব্রেকে বাড়ি এলে অর্ধেক সময়ই কাটে তার কেবল টেলিভিশনে খেলা দেখে।

'কী বলছিস এসব?' বিরক্তির সঙ্গে কথাটা বলে মাধুরী কন্যার দিকে সরাসরি তাকায়।

'Yes Ma. I am thinking about having a baby.' আগের মতোই নির্বিকার কৃষ্টি।

'হ্যাবিং এ বেবি' কথাটায় হোঁচট খায় জয়ন্ত ও মাধুরী দুজনেই। কৃষ্টি যদি বলত, 'থিঙ্কিং অ্যাবাউট অ্যাডপ্টিং এ বেবি' তাহলে চমকে গেলেও এতটা ঘাবড়ে যেত না তারা। মাধুরী তবু চেষ্টা করে বৃষ্টির শব্দ চয়নের ভুল শুধরে দিতে। সেইসঙ্গে খানিকটা জাগতিক জ্ঞান দিতেও।

'একটা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করলেই হলো না, সন্তান বড় করা অনেক বড় কাজ। অনেক বেশি দায়িত্ব। এটা ছেলেখেলা নয়। এসব পাগলামি রাখো।'

'কে বলল তোমায়, আমি অ্যাডপ্ট করতে যাচ্ছি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্টির কথা বোধহয় কানে যায় না মাধুরীর। সে তখনো নিজের কথার রেশ ধরে বলে চলেছে, 'এটা তোর ছোটবেলার কুকুরছানা পোষার মতো ব্যাপার নয় যে শখ হলো কিনে আনলি, আবার ইচ্ছে হলো না, কাউকে দিয়ে দিলি। তাছাড়া ভুলে যাসনে তুই একা। এখনো বিয়ে-থা হয়নি।'

প্রসঙ্গটা আসায় মনে পড়ে যায় কৃষ্টির ছোটবেলার কুকুর পোষার কথা। সহস্রবার বারণের পরও ক্ষান্ত হয়নি কৃষ্টি। তার যখন যা চাই, তা পেতেই হবে। অবশেষে জয়ন্ত হার মানে। একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ধবধবে সাদা এক ছোট্ট কুকুরছানা কিনে নিয়ে আসে ঘরে, মাধুরীকে না জানিয়েই। প্রথম দুদিন কৃষ্টির যেন নাওয়া-খাওয়া নেই। সবসময় তার পরম আদরের স্নোয়িকে নিয়েই আছে সে। সবকিছু দেখাশোনা করছে নিজ হাতে। কিন্তু দু-তিনদিন পর থেকেই সকল উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। আদর করা আর চটকানো ছাড়া স্নোয়ির জন্যে আর কিছুই করে না কৃষ্টি। জয়ন্ত অথবা সকালও না। সব দায়িত্ব এসে পড়ে মাধুরীর ওপরে, যে নাকি সবচেয়ে আপত্তি করেছিল কুকুরের ব্যাপারে। কৃষ্টি তখন খুব ছোট নয়। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স তার।

কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর মাধুরী কৃষ্টিকে ডেকে নিয়ে কঠিন ভাষায় দুটি পন্থার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলে। হয় কুকুরকে বিদায় করো, কিংবা কুকুরের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব নাও। অবশেষে একটা রফা হলো। স্নোয়িকে প্রতিদিন তিনবার করে হাঁটানো ও সপ্তাহান্তে একবার শ্যাম্পু করার ভার নিল কৃষ্টি। আর তা নিয়মিত ও মনোযোগ দিয়েই করতে শুরু করল।

কলেজে যাবার আগে সে স্নোয়িকে দিয়ে দিলো তার বন্ধু জেসিকাকে যেহেতু তার নিজের ডর্মে কুকুর রাখা যায় না, আর জেসিকা কলেজে পড়বে তার বোনের বাসায় থেকে যে বাসাটি কলেজ থেকে বেশি দূরে নয়। এতে করে স্নোয়িকে মাঝে মাঝেই দেখতে পাবে কৃষ্টি। তাছাড়া মায়ের ওপরেও কুকুরের সব বাড়তি কাজের ভার চাপিয়ে দিতে হবে না এই ব্যবস্থায়। কৃষ্টির এই সিদ্ধান্তকে মাধুরী তার দায়িত্বশীলতার পরিচয় বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এখন যা বলছে সে, তাতে কৃষ্টিকে আবার সেই তেরো-চোদ্দ বছরের অবুঝ, জেদি, আত্মমগ্ন কিশোরী বলেই মনে হচ্ছে।

মাধুরী নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে।

'মানুষ কুকুরছানা নয় রে কৃষ্টি। বাচ্চা অ্যাডপ্ট করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। যার পরে যেটা আসে। আগে বিয়ে কর, তারপরে বাচ্চার কথা ভাববি।'

কন্যার বিয়ের আশা এখনো পরিত্যাগ করেনি মাধুরী।

'অ্যাডপ্ট করব কে বলল তোমায়? বললাম তো আই উইল হ্যাভ এ বেবি। আর বাচ্চা নেবার জন্যে বিয়ে করাটা আজ আর জরুরি নয় মা।'

বাইরের হিমেল হাওয়া অবশেষে এই উত্তপ্ত ঘরটিকেও বোধহয় ঠাণ্ডা করে জমিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নীরবতা। কেউ কোনো কথা খুঁজে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর ইউ প্রেগন্যান্ট?' পাইয়ের প্লেটটা টেবিলে রেখেই উঠে দাঁড়ায় জয়ন্ত। ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে তার জন্যে।

'ও নো বাবা, নো। সে রকম হলে তোমরা নিশ্চয় জানতে।' কৃষ্টি হেসে ওঠে। জোরে। হাসির দমকে তার পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি আর একশ পঁচাশি পাউন্ডের শরীরটা দুলে ওঠে প্রচণ্ডভাবে। সেইসঙ্গে দুলে ওঠে গদি দেওয়া প্রশস্ত চেয়ারটাও, যেখানে সে বসে আছে।

মাধুরী দেখে তার রক্ত ধারণ করেও কৃষ্টি তার মতন হয়নি। শুধু চেহারা বা কথাবার্তার ধরনেই নয়, স্বভাবে-উদ্যোগেও তারা আলাদা। মাধুরী কিছুতেই নিজেকে — নিজের শরীরকে এই পর্যায়ে আনতে দিত না। এ নিয়ে বহু তর্ক-ঝগড়া হয়েছে মেয়ের সঙ্গে। অনেক বোঝাবার চেষ্টাও করেছে মাধুরী। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। কৃষ্টি যেমনটি ছিল তার চেয়ে বরং আরো ভারী হয়েছে, হালকা হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। অথচ ছোটবেলায় কী রোগাই না ছিল কৃষ্টি! তবু কী মিষ্টি লাগত দেখতে!

'তাহলে তোর কারো সঙ্গে ভাব হয়েছে বল! এসব কোনো কিছুই তো জানি না। বলিসনি কখনো। জানলে তো তোদের বিয়ের ব্যবস্থাটা' —

মাধুরীর কথা শেষ করতে দেয় না কৃষ্টি।

'না। তেমন কোনো মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি মা, যাকে আমি প্রেমিক বলতে পারি, যার সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পার।'

'তাহলে? এসব কথার মানে কী? কী বলছিস সব আবোলতাবোল?'

কৃষ্টি চেয়ার থেকে উঠে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

'মা, আমি আজীবন অপেক্ষা করতে পারি না কবে বা কখন সেই মিস্টার রাইট গাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমি জানি না সে আদৌ আসবে কি না আমার জীবনে। অথচ আমার বায়োলজিক্যাল ক্লক প্রতিমুহূর্তে আমায় জানিয়ে দিচ্ছে আমার হাতে আর সময় বেশি নেই। ফর গডস সেইক মা, ভুলে যেয়ো না আমার বয়স চৌত্রিশ।'

জয়ন্ত ঘর ছেড়ে চলে যায়। যেতে যেতে বিরক্ত হয়ে বলে, 'যত্ত সব ননসেন্স। হলোটা কী আজকালকার ছেলেমেয়েদের, আমি বুঝি না।'

মাধুরী কন্যার কাছে এসে বসে। আজ রাতে অনেক কথা বলার রয়েছে, মা-মেয়ের। মাধুরী বোঝে, বলার চাইতে আজ শোনার দরকারই বেশি। সে বোঝে কৃষ্টি কিছু বলতে চায়, যা তার কাছে এখন খুবই জরুরি। সে এও বোঝে, কৃষ্টি মনস্থির করে ফেলেছে। আর একবার যদি সে ঠিক করে কিছু করবে, কারো সাধ্য নেই তার মত পালটায়।

এই মুহূর্তে কৃষ্টি একটা কথার ওপরেই জোর দিচ্ছে, আর তা হলো কেউ যদি জীবনে কোনো কারণে একটা জৈবিক ভূমিকা পালন করতে অসমর্থ হয়, তার মানে এই নয় যে তাকে তার অন্য জৈবিক ভূমিকা বা চাহিদাকেও অস্বীকার করতে হবে। তার কথাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারে না মাধুরী, জয়ন্ত পারলেও। কিন্তু গ্রহণ করতেও যে যথেষ্ট দ্বিধা, সে কি কেবল সংস্কার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

বিয়ের আগে সন্তান নেওয়ার ব্যাপারটা মানাই যদি সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে দূরতিক্রম্য বলে বিবেচনা করে থাকে জয়ন্ত-মাধুরী, তারা তখনো জানে না নিকট ভবিষ্যতে আরো কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

একা সন্তানধারণ যদি প্রচলিত ধারায় গ্রহণযোগ্য না হয়, তিনজনে মিলে একটি সন্তান সৃষ্টির ব্যাপারটাকে তাহলে কীভাবে দেখবে তারা?

কৃষ্টি মা হতে চায়। নিজের গর্ভে সন্তানধারণ করবে সে — অন্তত সেটাই তার ইচ্ছে। কিন্তু কোনো পুরুষের সঙ্গে এমন সম্পর্ক নেই তার, যাকে সে গ্রহণ করতে পারে তার সন্তানের প্রাকৃতিক পিতা হিসেবে।

রিচার্ড কৃষ্টির বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। প্রকৃত সুহৃদ। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, রৌদ্রে, কুয়াশায়, আনন্দে, বেদনায় তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই। একসময় মাধুরী ও জয়ন্ত উভয়েই মনে করত রিচার্ড ও কৃষ্টির মধ্যে এক ধরনের রোমান্টিক সম্পর্ক রয়েছে। তাতে তাদের সম্পূর্ণ সায়ও ছিল। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি বেশি। কৃষ্টি নিজেই একদিন বাবা-মায়ের এই মিথ্যা ধারণা বাতিল করতে সাহায্য করেছিল।

কৃষ্টির মতো রিচার্ডেরও নাকি খুব শখ একটি সন্তানের। কিন্তু রিচার্ডের আসক্তি বা বাসনা নারীতে নয়। রিচার্ড গে, অর্থাৎ হোমোসেক্সুয়াল। তার একজন ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ প্রেমিক রয়েছে, যার নাম ডেভিড। ডেভিডের সঙ্গেই একত্রে বাস করছে রিচার্ড আজ প্রায় চার বছর হয়ে গেল। এ খবর মোটামুটি সবাই জানে। কিন্তু যেটা কেউ জানে না, সেটা হলো ডেভিডও নাকি বাচ্চা পছন্দ করে, খুব রিচার্ডের মতোই।

কৃষ্টির সঙ্গে কয়েক কিস্তিতে দীর্ঘ কথা হয়েছে রিচার্ড আর ডেভিড, দুজনেরই। কোনো কোনো আলোচনায় ওদের সঙ্গে ছিলেন কলাম্বিয়া প্রেসবেটারিয়ানের রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিনের প্রফেসর ড. এরিক্সন আর দুই উকিল। শুধু কথা নয়, আইনি কাগজপত্রও লেখা হয়েছে, সই করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে স্থির হয়েছে, কৃষ্টি আর রিচার্ডের সন্তানের জন্মের সূচনা হবে টেস্টটিউবে ডাক্তার এরিক্সনের ক্লিনিকে। পরে ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা হবে কৃষ্টির শরীরে। সন্তান বড় করবে কৃষ্টি। তবে দুবছর পর থেকে রিচার্ড ও ডেভিড সপ্তাহে একদিন করে সন্তানকে তাদের কাছে নিয়ে রাখতে পারবে। এ ছাড়া যখন প্রয়োজন হয়, তখনই কৃষ্টি তাদের সাহায্য পাবে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার জন্যে। কার্যত তিনজনেই হবে সমান অংশীদার — তিনজনেই হবে মাতাপিতা-অভিভাবক, ভবিষ্যৎ এই সন্তানের। কিন্তু বার্থ সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকবে কেবল কৃষ্টি আর রিচার্ডের নাম। সেটা করতে হবে, কেননা ডাক্তার এরিক্সনের ক্লিনিকের নিয়ম এটাই। সামাজিক ভূমিকা নয়, জেনেটিক সূত্র ধরেই মা-বাবার নাম লিপিবদ্ধ হয় এখানে। আর সেই নিয়ম অনুসারেই হাসপাতালও চলে। তিন পিতামাতার নাম বার্থ সার্টিফিকেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখার রেওয়াজ আজো চালু হয়নি কোথাও। তা সত্ত্বেও সন্তানের জীবনে ডেভিডের স্থান ও অধিকার থাকবে প্রায় রিচার্ডের সমানই।

যদি একটি সুস্থ সন্তান জন্মের পরেও কোনো ভ্রূণ অবশিষ্ট থাকে ডাক্তার এরিক্সনের ফ্রিজারে, সেই ভ্রূণ বা ভ্রূণদের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টারের স্টেম সেল রিসার্চে দান করা হবে।

তিন

সবচেয়ে সহজে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মেনে নিল সকাল। তার সোজাসাপ্টা কথা। জীবনটা কৃষ্টির। সে পরিণত বয়স্ক। সুস্থ মাথায় সে যা স্থির করে, তাকে স্বাগত জানানো ছাড়া পরিবারের কিছু করার নেই। কৃষ্টিকে যারা ভালোবাসে, কৃষ্টির সুখ আর আনন্দেই তাদের খুশি হওয়া উচিত। ওর সিদ্ধান্তের ভালো-মন্দ বিচার করার ভার তাদের নয়। কৃষ্টির এখন দরকার নিঃশর্ত সমর্থন, আর সকাল সেটা দিতে রাজি।

তাছাড়া তার বোন যে প্রচলিত নিয়ম ভেঙে সাহস করে নতুন কিছু করতে যাচ্ছে, তার জন্যে সকাল গর্বিতও বটে। তার বিশ্বাস, পরিবারের সনাতন ধারণা পালটাচ্ছে, পরিবারের সংজ্ঞা বিস্তৃত হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীজুড়েই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই পরিবর্তনটা সকলের মেনে নেওয়া দরকার। সকাল নিজে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে তার ভাগ্নির (ডাক্তার বলেছেন একটা কন্যাসন্তানের মা হতে চলেছে কৃষ্টি) জন্মলগ্নের।

জয়ন্তর অবস্থান ঠিক বিপরীতে। সামাজিক অবক্ষয় ছাড়া একে অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কৃষ্টির এ ধরনের পাগলামি সমাজে তাদের যারপরনাই হেয়প্রতিপন্ন করছে বলে বিশ্বাস করে জয়ন্ত।

যত অস্বাভাবিকই হোক না কেন গোটা ব্যাপারটা, তবু রিচার্ডকে হয়তো একরকম করে মেনে নেওয়া যেত। রিচার্ডের যাতায়াত এ বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু ডেভিডকে কোথায় লুকাবে জয়ন্ত? কৃষ্টির বাচ্চার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এই ডেভিড নামক ব্যক্তিটি লেজের মতো সবসময়ই ঝুলে থাকবে ওদের জীবনে, সর্বক্ষণ বুক উঁচিয়ে রয়ে যাবে ওদের পাশাপাশি। সবার কাছে ওকে কী বলে পরিচয় করিয়ে দেবে জয়ন্ত? সে কে? তার সঙ্গে কী সম্পর্ক কৃষ্টির বা তার সন্তানের?

তার অবিবাহিতা মেয়ে সন্তানবতী হচ্ছে এটা যদি যথেষ্ট না হয় জয়ন্তর মাথা হেঁটে করার জন্যে, এই সম্পূর্ণ দৃশ্যপটে ডেভিডের অবস্থান ও উপস্থিতি ষোলোকলা পূর্ণ করে দেবে। এটা কেমন করে মেনে নেওয়া যায় যে, দু'দুটি পুরুষ থাকবে তার মেয়ের জীবনে, তার নাতনির জীবনে, অথচ এদের কারো সঙ্গেই কৃষ্টির প্রকৃত অর্থে জৈবিক কোনো সম্পর্ক নেই — থাকবে না বাকি জন্মে! এসব আজগুবি ব্যাপার বরদাশত করা জয়ন্তর পক্ষে সম্ভব নয়।

সবচেয়ে মরণ হয়েছে মাধুরীর। অন্তত তাই বলছে সে মুখে। মাধুরী না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে গিলতে, না পারে ফেলতে। দুদিকেই প্রচণ্ড হুল বেঁধে মনে। এ যেন 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।' সে ভেবে পায় না কী করবে সে, কী করা উচিত।

হঠাৎ করে এত বছর পরে মেয়েটা আবার যেন নতুন করে মধ্যরাতে তাদের বিছানায় এসে দুজনের মাঝখানে শুয়ে পড়েছে।

জয়ন্তকে আর ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায় না মাধুরী। আজকাল জয়ন্ত প্রায় কথাই বলে না মাধুরীর সঙ্গে। তার ধারণা মাধুরী যথেষ্ট কড়া হতে পারেনি মেয়ের স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে।

আর ওদিকে কৃষ্টি মনে করে, তার অনাগত সন্তানের উৎস আর ভবিষ্যৎকে মানতে না পেরে গোটা বর্তমানকেও অর্থাৎ নিজেদের গর্ভবতী কন্যাকেও এক রকম পরিত্যাগ করেছে তার বাবা-মা।

কৃষ্টি সন্তানসম্ভবা। স্বভাবতই তার এটা ওটা খেতে ইচ্ছে করে। আর এসব ইচ্ছার কথা বোঝার এবং সেগুলো মেটাবার ক্ষমতা মাধুরীর চাইতে আর কার বেশি আছে? কিন্তু তবু মাধুরী যায় না কৃষ্টিকে দেখতে। কৃষ্টিও আসে না মায়ের কাছে তার উদ্ভট সব ক্রেভিংয়ের কথা জানাতে। এভাবেই কেটে যায় প্রথম চার মাস।

কিন্তু এরপর আর পারেনি মাধুরী। একদিন সকালে ঘন্যা শুঁটকি, কুচো চিংড়ি ঠাসা আস্ত পটোল ভাজা, শর্ষে ইলিশ, লাউ-চিংড়ি, রসমালাই আর খেজুরের গুড়ের পায়েস নিয়ে হাজির হয় সে কৃষ্টির বাসায়। সঙ্গে হাসিমুখে সকাল। শুরুটা এভাবেই।

এরপর জয়ন্তকে অগ্রাহ্য করে আরো কয়েকবার গেছে মাধুরী। কৃষ্টি কিন্তু তারপরেও আসেনি মায়ের বাড়িতে। তার বাবা যতদিন তার এ সিদ্ধান্ত মেনে না নেবে, কৃষ্টি আসবে না পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

মাধুরী মনে করে, তার চিন্তা বা কর্মে কোনো অস্বচ্ছতা, অসংগতি বা বিভ্রান্তি নেই। সে জানে সে আসে কেবল তার মেয়ের কাছে, ডাক্তারি শাস্ত্র অনুযায়ী যার এখন সেবা ও শুশ্রূষা দরকার। একজন মা হিসেবে সেটা মাধুরী দিতে চায় কন্যাকে। কিন্তু কৃষ্টির ভবিষ্যৎ সন্তানের ব্যাপারে মাধুরীর কোনো মাথাব্যথা নেই। এ প্রসঙ্গটা সে অতিযত্নে পরিহার করে চলে। কোনো কথা বলে না সে এ বিষয়ে।

কোনো রকম ভাবনা বা পরিকল্পনাই নেই তার সেই অনাগত শিশুকে নিয়ে।

চার

হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে ওরা চারজন।

রিচার্ড, ডেভিড, মাধুরী আর সকাল।

রিচার্ডের মা-বাবা-বোনও এসেছিল। এতক্ষণ ছিল এখানে। এখন চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। বলেছে আবার আসবে সুখবরটা পেলেই।

জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত আসতে রাজি হয়েছিল। বলেছিল বেলা দশটার মধ্যেই আসবে হাসপাতালে। কিন্তু এখনো এসে পৌঁছায়নি।

শরীরের ভেতরে নিজের রক্ত-মাংসে বেড়ে ওঠা প্রাণটির সঙ্গে মায়ের যে বন্ধন, তার সঙ্গে পিতার বন্ধনের কোনো তুলনা হয় না, এমন একটি কথা মাধুরীর মনে অনেক দিন থেকেই নড়াচড়া করছে। এখন সে তা পুরোপুরিই বিশ্বাস করে। সে মনে করে, সন্তান আর পিতার সম্পর্কটা সবটাই অর্জিত, লালিত — পুরোটাই একটু একটু করে শিখে নেওয়া, রপ্ত করা — পুরনো অভ্যাসের মতো একটা ব্যাপার। জৈবিক যে বন্ধন, শরীরের বিচিত্র সব হরমোনের অদ্ভুত ওঠানামার ফলে আজীবনের জন্যে অচ্ছেদ্য যে সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে তিল তিল করে গড়ে ওঠে সন্তানের, জন্মেরও আগে থেকে, বাবার সঙ্গে সে রকম কোনো সম্পর্ক কখনো নির্মিত হয় না। হওয়ার সুযোগ নেই। তা নইলে এমন সময়েও কি কেউ রাগ পুষে রাখতে পারে? মাধুরী পেরেছে? জয়ন্ত সত্যি সত্যি আসবে না, এটা ভাবতেও পারেনি মাধুরী। কিন্তু এটা ঘটছে। জীবনের এমন বড় একটা ক্রাইসিস মাধুরীকে একা একাই মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অথচ তার স্বামী বেঁচে আছে। এবং সে অসুস্থ নয়।

এদিকে বিরতিহীন পায়চারি করছে ডেভিড, হলওয়ের এপাশ থেকে ওপাশে। রিচার্ড কখনো বসছে, কখনো একটু হাঁটছে ডেভিডের সঙ্গে, কখনো আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে স্রেফ তাকিয়ে আছে, ফাঁকা।

মাধুরী বসে আছে কোণের চেয়ারটিতে, শক্ত হয়ে।

এইমাত্র সকাল গিয়ে কাফেটেরিয়া থেকে নিয়ে এলো চার কাপ কফি — একটা চৌকো কাগজের ট্রের চার কোনায় ঢুকিয়ে। কে কালো কফি খাবে, কে নেবে দুধ-চিনি, কারটায় দিতে হবে শুধুই দুধ, এসবই জানা হয়ে গেছে তার এরই মধ্যে। রিচার্ড সকালের হাত থেকে দুকাপ কফি নেয়। দুধ মিশিয়ে এক কাপ তৈরি করে এনে দেয় মাধুরীর হাতে। অন্যটা দেয় ডেভিডকে। আর রিচার্ডকে তার কালো কফির কাপটি দিয়ে নিজের জন্যে বেশি করে দুধ চিনি দিয়ে কফি বানাতে শুরু করে সকাল।

বেলা এগোরোটা বাজে।

একটু পরপরই ঘড়ি দেখছে মাধুরী।

কৃষ্টিকে ডেলিভারি রুমে নিয়ে যাওয়ার পর এক ঘণ্টা মাত্র পেরিয়েছে। কিন্তু এরই ভেতর মাধুরীর মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে সে।

অতঃপর ডাক্তার এলো।

নাম ধরে রিচার্ড স্মিথের খোঁজ করল ডাক্তার।

জানালার পাশ থেকে রিচার্ড এগিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে।

ওকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। রিচার্ড আর ডাক্তারকে ঘিরে ধরে ডেভিড ও সকাল। মাধুরী নড়ে না। যেখানে বসে ছিল, সেখানেই বসে থেকে লক্ষ করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে রিচার্ডের দিকে।

'কংগ্রেচুলেশন্স! তুমি বাবা হয়েছো। তোমার একটি সুন্দর মেয়ে হয়েছে। সাত পাউন্ড এক আউন্স ওজন।'

রিচার্ড দুহাত বাড়িয়ে ডাক্তারের ডান হাতটি চেপে ধরে।

'সত্যি বলছ ডাক্তার? সত্যি?'

ডাক্তার হাসে। নতুন বাবাদের এই ধরনের আবেগ এই প্রথম দেখছে না ডাক্তার।

'হ্যাঁ সত্যি। তুমি নিজের চোখেই দেখে আসো না কেন? এসো আমার সঙ্গে। একটা গাউন পরতে হবে কেবল।'

এ দেশের হাসপাতালে প্রসবের সময় পিতা বা হবু পিতাকে প্রসব-কক্ষে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় তার সাথীকে প্রসবে সহযোগিতা করার জন্যে। সে সুযোগ রিচার্ডকেও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুমেয় কারণেই রিচার্ড তা গ্রহণ করেনি। কৃষ্টিও চায়নি তা, বলাই বাহুল্য। একই সন্তানের মাতাপিতা হলেই যে তারা পরস্পরের কাছে বস্ত্রহীন অবস্থায় উপস্থাপিত হতে অভ্যস্ত, এমন ধরাধাঁধা নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা বোধহয় আর নেই।

রিচার্ডকে নিয়ে ভেতরে যাওয়ার আগে ডাক্তার অন্যদেরকে উদ্দেশ করে বলে, 'তোমাদের একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে, বেবিকে নার্সারিতে না আনা পর্যন্ত। ধরো, আর আধ ঘণ্টার মতো। তখন কাচের জানালা দিয়ে তোমরা সকলেই তাকে দেখতে পাবে। তোমাদের প্রেশাস ডলকে।'

AMARBOI.COM

পাঁচ

এখন সেই কাচের জানালার দিকে যাচ্ছে ওরা।

একত্রে। পাঁচজন। মাধুরী, সকাল, রিচার্ড, ডেভিড ও জয়ন্ত।

হ্যাঁ, জয়ন্ত অবশেষে এসে পৌঁছেছে। এই তো মিনিট বিশেক আগে।

ওরা ধীর পায়ে এগুচ্ছে। সঙ্গে একজন নার্সেস এইড, যে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রিচার্ড ইতোমধ্যে, একা, কৃষ্টি ও বাচ্চাকে দেখে এসেছে। এক অবিশ্বাস্য, স্বপ্নিল সেই অনুভূতি।

আনন্দে, উত্তেজনায় এখনো সে একরকম ঘোরের ভেতর রয়েছে।

নার্সারি রুমের কাচের জানালাটা বেশ ছোট — প্রশস্তে। পাশাপাশি তিনজনের বেশি দাঁড়ানো যায় না। জানালাটি অবশ্য উঁচু অনেকটাই। বুকের কাছ থেকে শুরু করে মাথা পার হয়ে ওপরের দিকে অনেকটাই চলে গেছে। রিচার্ডের অনুরোধে মাধুরী, জয়ন্ত ও ডেভিড দাঁড়ালো সামনের সারিতে। তাদের ঠিক পেছনে সকাল ও রিচার্ড।

ছোট ছোট খাঁচার মতো একক শয্যায় কম্বল দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা অনেকগুলো তুলতুলে শিশু শুয়ে আছে পাশাপাশি। সব শিশুর গায়েই একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম সাদা-কমলায় ছাপানো কম্বল, একই তাদের আকৃতি, প্রায় একই রকম সব দেখতে। আগে শিশুদের হাত দুটি কম্বলের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এখন মাধুরী দেখে, তাদের সবার হাত দুটিই বাইরে রয়েছে। এমনকি হাতের মধ্যে সুতি কাপড়ের মিটেনও পরানো নেই, যা পরানো হতো এককালে যখন মাধুরীর সন্তানদের জন্ম হয়েছিল। নখ দিয়ে বাচ্চারা যাতে নিজেদের আঁচড়ে দিতে না পারে, তারই পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ছিল এই মিটেন পরাবার ব্যবস্থা।

পুরো নার্সারিটাতে কেবল দুজন নার্স। তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়, আর মাঝে মাঝে বাচ্চাদের কাছে এসে দেখে যাচ্ছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। মাধুরী একবার বাঁদিক থেকে আস্তে আস্তে ডানদিকে চোখ ফেরাবার চেষ্টা করতেই এক জায়গায় এসে তার দৃষ্টি থেমে যায়। একটি শিশু তার ছোট্ট মুঠো করা বাঁ হাতটি দিয়ে ধীরে ধীরে তার নিজের বাঁদিকের গালটি ঘষছে। তার দুটি চোখই খোলা। চোখের ওপরের পাতা এখনো বেশ ভারী এবং লালচে। তা সত্ত্বেও তার খোলা চোখ দুটি পিটপিট করছে। বাচ্চাটির গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। তার মাথাভর্তি ঘন চুল — কুচকুচে কালো রঙের শয্যার পাশে লেখা ওর নামটা দেখা বা যাচাই করার তর সয় না মাধুরীর। প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠে, 'ওই তো! ওই তো কৃষ্টির বাচ্চা। আহা, কী মিষ্টিই না লাগছে। দেখছ না, প্রথম সারিতে বাঁ থেকে পঞ্চম।'

রিচার্ড খুব অবাক হয়। অন্য সকলেও। কেননা নাম লেখা কার্ডগুলো এমন করে রাখা আছে যে শুধু পঞ্চম কেন, চতুর্থ, সপ্তম অথবা অষ্টম শিশুটির নামও পড়া যাচ্ছে না। এখান থেকে। কিন্তু অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই মাধুরীর। আর অন্য কোনোদিকে সে তাকাচ্ছেও না, দৃষ্টি তার আবদ্ধ এক জায়গায়। সে একমনে ওই একটা শিশুর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

জয়ন্তকে ডেকে বলছে, 'দেখেছ, কী আশ্চর্য, ঠিক কৃষ্টির মতো করে গাল ঘষছে বাঁ হাত দিয়ে। কৃষ্টির গালগুলোও এ রকম ফোলা ফোলা ছিল। দেখো, দেখো, আর একটি বাচ্চাও এমন করছে না কিন্তু। তোমার মনে আছে, ঘষতে ঘষতে গাল একেবারে লাল করে দিত কৃষ্টি! দেখো।'

জয়ন্ত তাকায় পঞ্চমার দিকে। কী হয় তার ভেতর কে জানে! হঠাৎ তার খুব তীব্র ইচ্ছে হয়, এ কাচের জানালার ভেতর দিয়ে ঘরটাতে ঢুকে পড়ে ওই বাচ্চাটিকে একবার কোলে নিতে। অথচ এত ছোট শিশুকে কোলে নেওয়ার আগ্রহ সাধারণত কখনো বোধ করে না সে। নিজের কাছে প্রায় অপরিচিত এক শিহরণ ও পুলকে, অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। নার্সারির জানালায়।

ঘরের ভেতরে একটি নার্স এতক্ষণে এগিয়ে আসে জানালার পাশে। বাইরে থেকে তাকে রিচার্ড ইশারা করলে, সে নাম ও জরুরি তথ্যবাহী ছোট কার্ডগুলোকে ঘুরিয়ে দেয় এদিকে, যাতে জানালার বাইরের দর্শকরা তা পরিষ্কার দেখতে পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধুরী ছাড়া অন্য সকলেই অবাক হয়, যখন দেখে পঞ্চমার পাশে উন্মোচিত কার্ডটিতে সত্যি সত্যিই লেখা রয়েছে, 'মিষ্টি সেন-স্মিথ'। নিচে মা বাবার নামের জায়গায়, কৃষ্টি ও রিচার্ডের নাম। ইংরেজিতে মিষ্টি বানান করা হয়েছে Misty বলে। জয়ন্ত বোঝে, এটা কৃষ্টিরই কাজ। যে বিবেচনায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে মেয়ের নাম তারা রেখেছিল কৃষ্টি, একই বিবেচনায় নিজের সন্তানের প্রথম নামও কৃষ্টি রেখেছে এমন করে যাতে তা বাংলা এবং ইংরেজি দুভাষারই একটি পরিচিত শব্দের মতো শোনায়।

মাধুরী ওই কার্ডে লেখা নামধাম, পদবি অথবা মাতৃপিতৃ-পরিচয় পড়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। সেদিকে ফিরেও তাকায় না একবার। তার যা জানার তা জানা হয়ে গেছে — যা দেখার দেখতে পেয়েছে সে। আর কিছুই দরকার নেই। এক অবর্ণনীয় আনন্দে, উত্তেজনায়, উল্লাসে সে শিশুটির দিকে অপলক চেয়ে থাকে। বুকের ভেতরটায় একটা তীব্র টনটনে অনুভূতি। এটা এতটাই অভিনব, এতটাই মিশ্রিত, যে মাধুরী ভেবে পায় না ওই অপার সৌন্দর্য — ওই তীব্র আকর্ষণ ছেড়ে সে আর কোথাও, কখনো আদৌ যেতে পারবে কি না। পা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে সিমেন্টের মতো লেগে রয়েছে মেঝের সঙ্গে, এই ছোট্ট জানালাটির পাশে।

সকাল পেছন থেকে বলে ওঠে, 'ওয়েলকাম টু দিস স্ট্রেঞ্জ মিস্টেরিয়াস ওয়ার্ল্ড, মিষ্টি।'

পঞ্চমার দিকে ফিরে তাকায় সবাই।

দেখে, চারদিকে একরাশ আনন্দ আর উত্তেজনা ছড়াতে ছড়াতে ঘুমিয়ে পড়েছে মিষ্টি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুটি বাঁধার রহস্য

Social monogamy, where you've got a pair bond, is not the same as genetic monogamy. Genetic or sexual monogamy appears to be the exception rather than the rule among pairs in the animal kingdom. —**Stephen Elman**

যুগলবন্দির ইতিকথা

একগামিতা বা বহুগামিতা কি প্রাণিজগতের সাধারণ একটি প্রবণতা? এটা কি জিনস বা বংশ দিয়ে নির্ধারিত? নাকি পরিবেশ বা সামাজিকভাবে অর্জিত অন্য অনেক কিছুর মতো এটিও স্বভাবগত একটি বৈশিষ্ট্য? বিজ্ঞানীরা আজকাল অবশ্য মানুষের আচরণ ও প্রবণতার অনেক কিছুর ভেতরেই জেনেটিক কারণ আবিষ্কার করেছেন। মদ্যপানের নেশা থেকে শুরু করে বহুগামিতা, ঘন ঘন দুর্ঘটনার শিকার হওয়া, ধর্ষণ বা খুনের প্রবণতা, দাঁতের পোকা লাগা থেকে শুরু করে বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের প্রকোপতা, বার্ধক্য, জরা, রুচি, স্মরণশক্তি, প্রসন্ন কি উৎফুল্ল মানসিকতা, বিষণ্নতা, স্নেহশীলতা, মেজাজ, যুক্তিনিষ্ঠা — প্রায় সবকিছুর ভেতরই কোনো বিশেষ জিনের কর্মতৎপরতা বা প্রভাব লক্ষ করেছেন তাঁরা। আর গায়ের, চুলের বা চোখের রং, চেহারা, স্থূলত্ব, বিশেষ কোনো বিষয়ে মেধা, মাথায় টাকা পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে বংশের ধারার কথা তো বহুদিন ধরেই সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। প্রাণিজগতের বিভিন্ন পশুপাখির স্বভাব ও আচরণ পর্যালোচনা করে ও তাদের জিনসের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, একগামিতা বা বহুগামিতার প্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বনির্ধারিত অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জিনসের কর্মকাণ্ডেই পরিচালিত। কখনো কখনো তা সামাজিকভাবেও অর্জিত। তাই এ ব্যাপারে একেক প্রাণীতে একেক ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানুষসহ যেসব প্রাণীর মধ্যে একগামিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ করা গেছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা রক্ত বা 'জিনস' দিয়ে পরিবাহিত নয়। পরিবেশগত কারণে ও সামাজিক প্রয়োজনে বা চাপে তারা একগামিতার চর্চা করে থাকে। প্রাণিকুলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুরকম একগামিতা রয়েছে। ১) যৌনসংক্রান্ত বা বংশগত একগামিতা (জেনেটিক একগামিতা); ২) সামাজিক একগামিতা। এমন অনেক পশুপাখি আছে যারা যৌন আচরণে একগামী নয়। কিন্তু বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণে, গৃহনির্মাণে ও একসঙ্গে বসবাসে, চলাফেরা করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিকভাবে একগামী। ফলে সাধারণভাবেই প্রশ্ন এসেছে, একগামিতা কি তাহলে সমাজ ও পরিবারের স্বার্থে, জীবকুলের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে, আরো পরিষ্কার করে বললে সন্তানের কল্যাণের প্রয়োজনে, তার সুস্থ লালন-পালনের নিশ্চয়তা বিধানে পিতা-মাতার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বা তাদের স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নেওয়া একটি বাড়তি দায়িত্ব? এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাণীর ওপর গবেষণা করে যা পাওয়া গেছে, তা সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো।

এক

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর ওয়ার্বলার নামে একরকম পাখি রয়েছে যাদের মেয়ে-পাখিগুলো সেসব পুরুষ-পাখিকেই বেশি পছন্দ করে, যারা বিভিন্ন সুরে নানারকম করে গান গাইতে পারে। কিন্তু যেসব পুরুষ-পাখির গানের স্টক খুব কম, মেয়েরা পারতপক্ষে তাদের সঙ্গে মেশে না। জেনেটিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এসব অতি সুরেলা বহুবিধ গান-গাইয়ে পাখিগুলোর জিনস খুব মজবুত ও সেরা প্রকৃতির। এদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে যে সন্তানদের জন্ম হয়, জীবনের দৈর্ঘ্য ও অন্যান্য গুণগত বিচারে আসলে তারাই সেরা। ফলে মেয়ে-পাখিগুলো যদি একবার ওই সুরেলা 'সুপার' পুরুষ-পাখির সন্ধান পায়, তাহলে তারা একগামী থেকে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তারা 'স্বল্পপুরুষ' অর্থাৎ কেবল একটি বা দুটি-গান গাইয়ে সঙ্গীর কবলে পড়ে, যাদের সঙ্গে নিকৃষ্টতর সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে তারা, তাহলে মেয়ে-পাখিদের চোখ সবসময় ঘুরে বেড়ায় আরো বেশি পুরুষালি স্বভাবের সুকণ্ঠী সেই সঙ্গীর সন্ধানে, যাকে দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে। ফলে এখানে একগামিতা ও বহুগামিতা নির্ভর করছে কোন ধরনের পুরুষের সংসর্গে ছিল মেয়ে-পাখিটি। আর এ ভিত্তি হিসেবে মেয়ে-পাখির আকাঙ্ক্ষিত সুস্থ, সবল, দীর্ঘজীবী সন্তানের নিশ্চয়তাকেই চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা।

দুই

কাটা বা নষ্ট ফলের ওপর উড়ন্ত মাছিদের ভেতর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। পুরুষ-মাছিগুলো নিজের বংশবৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিতে সঙ্গমের সময় বীর্যের সঙ্গে কিছু বিষাক্ত পদার্থ ঢেলে দেয় মেয়ে-মাছির শরীরে, যা মেয়েটির কামস্পৃহা দাবিয়ে রাখে। শুধু তাই নয়, এই বিষ অন্য পুরুষ-মাছির শুক্রাণুকে ধ্বংস করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। সেইসঙ্গে মেয়ে-মাছিটাও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি কৃত্রিমভাবে এ প্রজাতিকে একগামী করার একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁরা জোড়ায়-জোড়ায় এ মাছিদের ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রেখে কয়েক প্রজন্ম ধরে অনুসরণ করে দেখেছেন যে, এই বিশেষ প্রজাতির মাছিদের কোনোমতে যদি একগামী করা যায়, অর্থাৎ পুরুষ-মাছিদের যদি নিশ্চয়তা দেওয়া যায় যে তার নিজস্ব বংশেরই শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে তার সঙ্গিনী, অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে না, তাহলে তার বীর্যের ভেতরে সেই বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ আস্তে-আস্তে কমতে-কমতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ একগামী সঙ্গীর বীর্যের প্রকৃতি বহুগামী সঙ্গীর বীর্যের মতো হিংসুটে, স্বার্থপর, ক্ষতিকর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির নয়, একগামী স্ত্রী-মাছিকেও দেখা গেছে তার একগামী সঙ্গীর (বহুগামী সঙ্গীর তুলনায়) প্রেম নিবেদন ও যৌন আচরণে অনেক বেশি উৎসাহী, আগ্রহী ও সক্রিয় হতে। একগামী মাছি-দম্পতির জীবিত সন্তানের সংখ্যাও গড়ে ২৮ শতাংশ বেশি বহুগামী দম্পতির তুলনায়।

তিন

ব্লু বার্ড নীল পাখির কথা অনেকেই জানেন। সামাজিকভাবে এরা জুটি বাঁধে খুব গভীরভাবে। নীড় রচনা, ডিমে তা দেওয়া, শিশুসন্তানকে সঙ্গ দেওয়া, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, খাবার জোগাড় করা, খাইয়ে দেওয়া — সব ব্যাপারেই এ দম্পতি পরস্পরকে সহযোগিতা করে। কিন্তু জেনেটিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এদের মধ্যে প্রায় শতকরা ১৫-২০টি বাচ্চার সামাজিকভাবে স্বীকৃত পিতা আসলে জেনেটিক পিতা নয়। অর্থাৎ এত ঘনিষ্ঠতা, এরকম পারস্পরিক নির্ভরতা, একত্রে সন্তান লালন-পালন, চলাফেরার পরেও দেখা যায়, স্ত্রী ব্লু বার্ড কখনো-সখনো এদিক-সেদিকে নজর দিয়ে ফেলে। অবশ্য পুরুষ ব্লু বার্ডের যদি এ ব্যাপারে মনে কোনো সন্দেহ বিঁধে থাকে, যদি তার ধারণা হয়, এ ডিম বা শিশুপাখি তার নিজের সন্তান নয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে পরিত্যাগ করবে সেই নীড়, তার সঙ্গিনী এবং সন্তানদের। এমনকি পরসন্তানদের কখনো-কখনো মেরেও ফেলে সে। তবু জেনেটিক একগামিতা একেবারে পুরোপুরি না থাকা সত্ত্বেও সামাজিক একগামিতার যে চিত্র দেখা যায় ব্লু বার্ডের সমাজে, তাকে বিজ্ঞানীরা এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, প্রায় সব পাখিকুলেই এবং বিশেষ করে ব্লু বার্ড প্রজাতির ভেতর সন্তান লালন-পালনের জন্যে পিতা-মাতা উভয়ের অবদানই প্রয়োজন — অর্থাৎ দুজনের সক্রিয় ভূমিকাই দরকার। যেহেতু পাখিদের বাসা বাঁধতে হয়, ডিমে তা দিতে হয়, ছোট্ট শিশুদের খাবার জোগাড় করে এনে মুখে পুরে দিতে হয়, একা মায়ের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয় না। ফলে খুব নিবিষ্ট মনে তারা সন্তানের জন্য জুটি বাঁধে। এ জুটি মূলত সামাজিক জুটি।

কিন্তু এরই মাঝে পুরুষ ব্লু বার্ড ফাঁকতালে অর্থাৎ মেয়ে ব্লু বার্ড খাবারের সন্ধানে গেলে কখনো-সখনো পাশের বাড়ির মেয়ে সঙ্গিনীর সঙ্গে লীলাকলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেতে ওঠে। আর মেয়ে সঙ্গিনীও অনুরূপভাবে কখনো-কখনো এখানে-সেখানে মন ও দেহ দেওয়া-নেওয়া করে আবার গুটিগুটি পায়ে ঘরে ফিরে আসে। দাম্পত্য জীবনের বাইরে এ ধরনের সম্পর্ক পুরুষ-পাখি করে পুরুষ জাতির মৌলিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে অর্থাৎ যতগুলো সম্ভব ততগুলো সন্তান উৎপাদন করতে। কিন্তু মেয়ে-পাখিরাও কেন এমন করে ফেলে মাঝেমধ্যে? প্রথম প্রথম মেয়ে-পাখিগুলোর বহুগামিতাকে অন্য পুরুষ-পাখি কর্তৃক ধর্ষণ বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করতেন। কিন্তু পরে দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পাখিদেরও এরকম সংক্ষিপ্ত সম্পর্কে সক্রিয় সমর্থন রয়েছে। অর্থাৎ এটি স্বেচ্ছাকৃতই। তা না হলে তারা ইচ্ছে করলেই অনাকাঙ্ক্ষিত বীর্য শরীর থেকে উপড়ে ফেলতে পারে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে, মেয়ে-পাখিরা অন্য পুরুষের সঙ্গে সাময়িক এ সম্পর্ক করে বৈচিত্র্যময় প্রজন্ম সৃষ্টি করার জন্য, যাতে তার প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় থাকে। একই রকম সন্ত ানধারণ করার ফলে যাতে কোনো প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত পরিবর্তনে তার সম্পূর্ণ প্রজাতি একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়।

চার

ক্যালিফোর্নিয়ায় একরকম ইঁদুর আছে, যারা ভীষণভাবে একগামী। যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার অনেক আগে থেকেই তারা জুটি বাঁধে এবং আমৃত্যু এ জুটির বাঁধন অটুট রয়ে যায়। এই ইঁদুরকে বিজ্ঞানীরা বিরলের চেয়েও বিরল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রজাতির ভেতর পুরুষ-ইঁদুররা এতই দৃঢ়চেতা যে যৌনতাড়িত মেয়ে-ইঁদুররা পাশাপাশি ঘোরাঘুরি করলেও, যৌন আমন্ত্রণ জানালেও, নিজের সঙ্গিনীকে ছেড়ে সে ওইসব ডাকে কখনো সাড়া দেবে না। একই রকমভাবে একবার জুটি বাঁধার পর স্ত্রী-ইঁদুরটিও অন্য কোনো পুরুষ-ইঁদুরের দিকে ফিরে তাকায় না। এদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এ বিশেষ ইঁদুরদের জীবন বড়ই সংগ্রামময়। খাদ্যের দারুণ অভাব। সর্বোপরি শীতকালে এত বেশি ঠাণ্ডা যে সেখানে সেই পাখিদের মতো এ ইঁদুরদেরও সার্বক্ষণিকভাবে নিজেদের শারীরিক উষ্ণতা দিয়ে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আর সেটা মা বা বাবা একার পক্ষে কোনোমতেই করা সম্ভব নয়। একজনকে সন্তানদের উষ্ণতা বিলাতে হলে আরেকজনকে যেতে হয় খাদ্যের সন্ধানে। আর তাই পাখির মতোই এ প্রাণীরাও জুটি বাঁধে। শুধু সামাজিক জুটি নয় — যৌন জুটি বা জেনেটিক জুটিও বটে।

পাঁচ

সামাজিক ও জেনেটিক ভিত্তি ছাড়াও জুটি বাঁধার 'নিউরোহরমোনাল' একটি কারণ রয়েছে বলে ইদানীং বিজ্ঞানীরা কেউ-কেউ মনে করছেন। তাঁরা 'প্রেইরি বোলস' বলে একরকম 'ছুঁচো' জাতীয় প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে এ তথ্য বের করেছেন। এ প্রজাতির ভেতর পুরুষ ও স্ত্রী একবার জুটি বাঁধার পর চব্বিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘণ্টার মধ্যে অসংখ্যবার যৌনমিলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। এদের এ অতিরিক্ত যৌনক্রিয়া ও প্রগাঢ় জুটি বন্ধনের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, অল্প সময়ের ভেতর এতবার যৌনমিলনের ফলে এদের উভয়ের শরীরের ভেতরেই এক বিশেষ রকম হরমোন নির্গত হয়। পুরুষদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত নির্গত এ হরমোনটি হলো ভেসোপ্রেসিন (পুরুষের আগ্রাসী স্বভাব ও পিতৃসুলভ আচরণের জন্য দায়ী হরমোন)। আর মেয়েদের মধ্যে নির্গত হরমোনটি হলো অক্সিটোসিন (যে হরমোন মাতৃত্বের বিকাশ ও দুগ্ধদানে সাহায্যকারী)। রক্তে এসব হরমোনের উর্ধ্ব মাত্রাই পরস্পরের সঙ্গে জুটি বাঁধাকে এতটা মজবুত, এতটা প্রগাঢ় করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর শরীরেও যৌনমিলনের ফলে এ ধরনের কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে কি না, যা তাদের যুগলবন্দি রচনায় সহায়ক, তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

ছয়

বেশ কয়েক বছর আগে আমেরিকান এক নৃতাত্ত্বিক লক্ষ করলেন যে, বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি, যাদের সাত বছরের অধিককাল হলো বিয়ে হয়েছে অথচ সন্তান হয়নি। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কও ঘটে এ সময়েই সবচেয়ে বেশি। তিনি আরো দেখিলেন, যেসব দম্পতির প্রথম সন্তানের বয়স ছয় বা সাত পেরিয়ে যাবার পরও দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়নি, তাদের মধ্যেও বিচ্ছেদের হার খুব বেশি। অথচ পাঁচ বছরের মধ্যে যাদের আরেকটি সন্তান হয়েছে, তাদের বিয়ে ভেঙেছে খুব কম। অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা সাধারণভাবে মনে আসে তা হলো, সন্তান হয়তো একটি সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। দুজনের সম্মিলিত সৃষ্টি এ সন্তান হয়তো তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত ও সুখকর করতে সাহায্য করে। কিন্তু এ নৃতাত্ত্বিকের মতে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সন্তান পিতা-মাতার সম্পর্কে এক ধরনের সেতুবন্ধ সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই শেষ বা একমাত্র কথা নয়। আসল কথা হলো জন্মের পর মানবশিশুর লালন-পালন ও পরিচর্যার প্রয়োজন হয় জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ গবেষক উল্লেখ করেছেন, একজন ষাট কেজি ওজনের মায়ের নবজাত সন্তানের ওজন হয় মাত্র আড়াই থেকে সাড়ে চার কেজি। অর্থাৎ মানবশিশু তুলনামূলকভাবে আকৃতিতে অত্যন্ত ছোট ও কাঠামোগতভাবে বেশ দুর্বল হয়ে জন্মায়। ফলে গরু, ছাগল, বাঘ বা কুকুরের বাচ্চারা জন্মের কয়েক মিনিট থেকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যেমন হেঁটে চলে বেড়াতে পারে ও নিজে নিজে খেতে পারে, সেখানে মানবশিশুর লাগে বেশ কয়েক বছর সেই অবস্থায় পৌঁছাতে। আর তাই জন্মের প্রাথমিক বছরগুলোয় তাদের পরিচর্যায় এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয় পিতা-মাতাকে যে, নিজেদের জীবনের অন্য সমস্যাবলি, অভাব অথবা দুর্বলতাগুলো ততটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না তখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোট কথা প্রকৃতিগতভাবে অসহায়, পরমুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল মানবশিশু পিতা-মাতাকে একত্র করে রাখে তার লালন-পালনের ব্যস্ততায়। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গবেষক বলেছিলেন, যখন থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলার বদলে দুপায়ে নির্ভর করে লম্বা হয়ে চলতে শুরু করল মানুষ, তখন থেকেই হয়তো এ পরিবর্তনের সূচনা। কেননা পায়ের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় সোজা হয়ে চলার জন্য মানুষের জরায়ুর আয়তন গেছে কমে। ফলে তাদের গর্ভজাত সন্তানের আনুপাতিক ওজনও হয় অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় কম — যার জন্যই তারা অনেক বেশি নির্ভরশীল ও অসহায়। পরিশেষে বলা যায় :

১. প্রাণিকুলে একগামিতার প্রবণতা বা চর্চা স্বাভাবিক কোনো প্রক্রিয়া বা নিয়ম নয়। এটা ব্যতিক্রম।

২. একগামিতা (জেনেটিক না হলেও সামাজিক একগামিতা) সন্তানের জীবনরক্ষা, লালন-পালন ও কল্যাণের জন্যই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যে-প্রজাতির শিশু যত অসহায় ও পিতা-মাতা উভয়ের ওপর যত নির্ভরশীল সে-প্রজাতির পিতা-মাতার জুটির বাঁধন তত মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

৩. প্রাণিজগতে বহুগামিতার ভিত্তি হিসেবে পুরুষদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও মেয়েদের বৈচিত্র্যময় প্রজন্ম সৃষ্টিকে (যা পরবর্তী বংশধরদের টিকে থাকা বা প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়) চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. মানুষের যৌনাচার বা যৌনপ্রবণতা অনেকটা নীল পাখিদের মতো। সামাজিক একগামিতা রয়েছে। কিন্তু মাঝেমধ্যে দৃষ্টি ও মনোযোগ এখানে-সেখানে নিবদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ও আগ্রহ। আমেরিকান এক বিজ্ঞানীর মতে, যুক্তরাষ্ট্রে যদি কখনো সঠিক পিতৃত্ব নির্ণয় করা হতো, তাহলে দেখা যেত অন্তত ১০ শতাংশ সামাজিক পিতা তাদের সন্তানদের জেনেটিক পিতা নন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ফেরা-না ফেরা

ও ফিরে এসেছে। সাড়ে তিন হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছে। একটানা; প্লেনে চেপে। এমন একটা সময় ছিল যখন ওকে আমি পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছি। আমার সর্বস্ব তখন ওকে দিয়ে দিতে রাজি ছিলাম আমি, তবু যদি আমার ছেলেটাকে কোনোমতে বাঁচানো যায়! অথচ আজ! আমি জানি না, ওকে ঠিক কীভাবে গ্রহণ করব। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরনটার ব্যাপারেও আজ আমার মনে যথেষ্ট সংশয়। প্রমিত, যে আমাদের মধ্যেকার একমাত্র যোগসূত্র, এখনো হাসপাতালে।

'তুমি কী খাবে, বলো তো? চা, কফি, কোক, হট চকোলেট, অরেঞ্জ জুস, দুধ! ওয়াইন, বিয়ার, হুইস্কি, লিকোরও রয়েছে। যা চাও সবই মনে হয় আছে ঘরে। কী দেব, বলো?'

ও হাসে। অবাক হয় না আমার কথা শুনে। সে জানে, প্রমিতের কাছে বহুবার শুনেছে, এইখানে, এই ঘরে, সব সময়েই ফ্রিজ-ভরা খাবার থাকে — থাকে ডিপ ফ্রিজ ঠাসা ঘরে-তৈরি নানারকম মজাদার নাশতা ও মিষ্টিদ্রব্য। রান্নাঘরে অনবরত তৈরি হতে থাকে রকমারি এবং নিত্যনতুন খাদ্যসামগ্রী। কে না জানে আমি, প্রমিতের মা, রাঁধতে বড় ভালোবাসি। রান্নার বিচিত্র সব পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যেতে গিয়ে, বিভিন্ন মসলা আর খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করে উনুনে চাপাতে গিয়ে জীবনের জটিলতা ও বঞ্চনাকে ভুলে থাকা যায়।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে লিজ একবার ঘরের এপাশে-ওপাশে তাকায়। চারদিকে যথারীতি পরিচিত সম্ভার দেখে সে বিন্দুমাত্র চমকায় না। এমনটিই তো হবার কথা ছিল! এ বাড়ি না দেখলেও যে তার অতি চেনা! প্রায় মুখস্থ। বাইরের ঘরের কোন কোনাটায় মেডিসিন কেবিনেট রয়েছে, কোথায় জরুরি কাগজপত্র রাখার লোহার ফাইল কেবিনেটটি দাঁড় করানো, সবই জানে সে। শুধু স্থির ছবি থেকে নয়, ভিডিও করেও লিজকে দেখিয়েছে প্রমিত। নিউ ইয়র্ক শহরের সীমানায় তাদের নিজেদের এই পুরনো বাড়িটি, যেখানে জন্ম থেকে বেড়ে উঠেছে প্রমিত, নিয়ে তার অনেক স্মৃতি। এই বাড়ির নাড়িনক্ষত্র তাই লিজকে চিনিয়ে নিতে উৎসাহের সীমা ছিল না তার। এ বছরেরই শেষের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমিতের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসার কথা ছিল লিজের।

লিজ দেখে চারদিক। এখনো এই দ্বিতল বাড়ির প্রতিটি ঘরের ছবি রয়েছে তার কাছে, মানে তার কম্পিউটারে। সামনের বারান্দার লাল ও কালো রঙের পোড়া ইটগুলোর খানিক অসম আকার ও রঙের অসংগতি যে গঠনগত কোনো ত্রুটির সাক্ষ্য নয়, প্রকৃত নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সযত্নে বাছাই করার পর সংগৃহীত ইট ও পাথরগুলোকে অতি যত্নসহকারে একটি একটি করে গাঁথা হয়েছে দেয়ালে, প্রমিতের আর্কিটেক্ট বাবার সরাসরি তত্ত্বাবধানে — অর্থাৎ বাড়ির বাইরে সামনের বারান্দার দেয়ালে এই অসম এবং পারস্পরিক সাদৃশ্যহীন ইটের সমাহার সবটাই যে ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পনামাফিক, সে খবরও তার জানা। এছাড়া, রাত্রিতে এ পরিবারের গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী এক গ্লাস করে গরম দুধ না খেয়ে শুতে গেলে যে শুধু তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাই নয়, পরদিন বাথরুমেও নির্ঘাৎ অনেক বেশি সময় কাটাতে হয়, এই অতি অন্তরঙ্গ পারিবারিক তথ্যটুকুও প্রমিতের কল্যাণে লিজের জানা আছে। কিন্তু সেসব কোনো কিছুই সে বলবে না আজ এই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে।

'এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল কেবল।' লিজ এতক্ষনে টের পায় তার পিপাসা পেয়েছে।

বরফ দেওয়া জলের গ্লাসটি ওর হাতে তুলে দিয়ে একটা গদি-দেওয়া মোড়া টেনে নিয়ে বসি কাছাকাছি। প্রায় ওর মুখোমুখি। কমল, আমার একমাত্র সন্তান প্রমিতের পিতা, আমাদের 'গুড নাইট' বলে শুতে চলে গেছে একটু আগেই। সে আবার অনেক সকালে ঘুম থেকে ওঠে কি না!

'আমি আর একটু পরেই চলে যাব হোটেলে। যদি একটু বলতেন, প্রমিতের সঙ্গে কখন, কোথায় দেখা হতে পারে আমার?' ও স্পষ্ট জানতে চায়। কোনো জড়তা নেই কণ্ঠে। তবে উৎকণ্ঠা স্পষ্ট।

'কাল দুপুরের আগে নয়। তোমার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবার ব্যাপারটা ওকে এখনো বলিনি। আগের শক্‌টা পুরোপুরি এখনো কাটিয়ে ওঠেনি সে। এই সংবাদটা পেলে প্রাথমিকভাবে কীভাবে রিয়্যাক্ট করবে বুঝতে পারছি না আমরা। আমরা মানে আমি, ওর বাবা আর প্রমিতের ডাক্তার।'

আমি ব্যাখ্যা করি আমার উক্তির। তারপরে সন্তানের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা, তার স্বার্থ রক্ষাকারী আদর্শ মায়ের মতো করে বলি, 'সকালে প্রমিত বেশ দেরি করেই ঘুম থেকে ওঠে আজকাল। উঠেই বড় করে ব্রেকফাস্ট খায়। হাসপাতালের খাবার নয়। বাসা থেকে বিশেষ বন্দোবস্তে ওর জন্যে স্পেশাল খাবার যায়। কাল এগারোটা নাগাদ ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালের খাবার শেষ হলেই তোমার প্রসঙ্গটা তোলার কথা ভাবছি। এ ছাড়া নার্স বলে দিয়েছে, দুপুরের আগে কোনো ভিজিটরকে সেখানে না যাবার জন্যে। ফলে তোমাকে এর পরেও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে হয়তো।'

'ভিজিটর! আমি প্রমিতের ভিজিটর!' স্বগতোক্তির চেষ্টা থাকলেও শব্দগুলো অশ্রুত ছিল না।

আমি হাসি। 'হ্যাঁ, আপাতত তোমাকে ভিজিটরের নিয়ম মেনেই চলতে হবে সেখানে। গত দুমাসে ওকে তো দেখোনি! আমরা ওকে প্রায় হারাতেই বসেছিলাম। সত্যি বলতে কী, আমি আর কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নই।' বেশ জোর দিয়েই শেষ কথাগুলো বলি। আমি কি ওকে দেখাতে চাইছি হু ইজ দা বস্! নাকি বলতে চাইছি, তোমার ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে লিজ। স্বেচ্ছায় তুমি তা হারিয়েছ। এখন স্টেশনে আমার ট্রেন দাঁড়ানো। আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে বৈকি!

তারপরেও কথাটা বলেই মনে হলো, ইংরেজিতে বাক্যালাপ করতে গেলে শব্দচয়নগুলোও কীরকম কাটাছেঁড়া বিদঘুটে হয়ে যায়, বিশেষ করে আমাদের মতো মানুষের মুখে যারা এত বছর এখানে থাকার পরেও এই বিদেশি ভাষাটা ভালোমতো রপ্ত করতে পারিনি, এখনো ও-ভাষায় কথা বলতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। কেবলই মনে হয়, ঠিক এই কথাটি আমি বলতে চাইনি, অথবা ঠিক এভাবে বলতে চাইনি। কিন্তু আসলে আমি কি এখন, এই মুহূর্তে, আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি? ওর জীবনযুদ্ধে হৃত অথবা অবহেলায় খোয়ানো রাজ্য এত সহজে ফিরিয়ে দেব না বলে? কিন্তু আমি তো প্রকৃতই দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম যখন কোনো দূর মেঘের ওপার থেকে হঠাৎ টেলিফোনে ওর কণ্ঠ ভেসে এসেছিল পরশু রাতে। যেভাবে সে চলে গিয়েছিল শুনেছি, তাতে আমরা কেউ ভাবিনি আবার কখনো ওর সঙ্গে যোগাযোগ হবে। ও ফিরে আসছে, আসছে সোজা এখানে, শুনে কিন্তু আমি হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। খুব খুশি হয়েছিলাম। খুশি হয়েছিলাম, অন্য কিছু না ভেবে, শুধু ছেলের কথা চিন্তা করেই। মেয়েটাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছিল আমার পুত্র। একথা আমার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে?

সানফ্রান্সিস্কো শহরে প্রমিত তখনো হাসপাতালে। সেখান থেকে ছাড়া পেলেই ওকে নিয়ে রওনা হব নিউ ইয়র্ক। তাই ওর সেই ভাড়া বাসা ছেড়ে দেবার আগে ঘর খালি করার জন্যে ওর সব জিনিসপত্র গোছাতে আর কিছু কিছু ফেলতে চেষ্টা করছিলাম। আর তখনই ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা বেশ কয়েকটি অসমাপ্ত ও সমাপ্ত চিঠি আমার চোখে পড়েছিল, যা প্রাপকের হাতে কোনোদিনই পৌঁছেছিল কি না আমি জানি না। সবগুলো চিঠিই লিজকে উদ্দেশ করে লেখা। বুঝতে পেরেছিলাম, প্রমিতের কোনো আকুতিই শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি লিজকে। একদিন কোনোকিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেনি সে। সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল। প্রমিত সেটা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেনি।

কোনো কথা না বলে চুপচাপ আমার মুখের দিকে এখন তাকিয়ে আছে লিজ।

প্রায় ছ'ঘণ্টা একটানা আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে করে এদেশের পশ্চিম প্রান্তের একেবারে শেষ মাথা থেকে উড়ে এসেছে সে পুবপারের সর্বশেষ ভূখণ্ডটিতে। দুটি শহরই এদেশের পূর্ব-পশ্চিমের দুই প্রান্তে যথাক্রমে প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ানো। রাত আটটায় এখানে এসে পৌঁছেছে সে। লাগোর্ডিয়া নয়, কেনেডি বিমানবন্দরেই এসেছে। এয়ারপোর্ট থেকে তুলে ওকে সোজা নিয়ে যাই ওর হোটেলে। অবশ্য বাঙালি আতিথেয়তার ধারাবাহিকতায় ওকে আমাদের বাসায় ওঠার সম্ভাবনার কথাও একরকম ইঙ্গিত অথবা প্রস্তাবের মতো করে উত্থাপন করেছিলাম। ঘোর আপত্তি না করলেও মনে হয়েছিল হোটেলেই সে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। তা ছাড়া, একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবার আগেই ওকে ঘরে এনে তোলার ব্যাপারে আমারও খানিকটা দ্বিধা ছিল। যদিও কমল তাকে সরাসরি আমাদের বাড়িতে এসে ওঠানোরই পক্ষপাতী ছিল। হোটেলে চেকইন করিয়ে সুটকেসটা ওর বারো তলা রুমে রেখেই আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম ওকে নিয়ে। আজকাল আমেরিকার ভেতরে কোনো ফ্লাইটেই খাবারটাবার দেয় না। ফলে ও নিশ্চয় খুব ক্ষুধার্ত। হাত-পা ধুয়ে প্রথমেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই আমরা। তারপর এই তো সবে বসেছি একটু কথা বলতে। এরই ভেতর রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

আমরা এখনো মুখোমুখি বসে আছি। বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই চুপচাপ কেটে যায়। কোথা থেকে কী বলে শুরু করব কেউই বোধহয় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মাত্র ঘণ্টাতিনেক আগে জীবনে প্রথম দেখা হলেও আমরা পরস্পরের অপরিচিত ছিলাম না। বহুবার ফোনে কথা হয়েছে। তাছাড়া ছবি, ভিডিও, ই-মেইল, গ্রিটিং কার্ডের আদান-প্রদান তো ছিলই। আর ছিল মাঝখানে, সার্বক্ষণিকভাবে প্রমিত, যে আমাদের — মানে আমার ও আমার স্বামীর, আক্ষরিক অর্থেই যৌথ বেঁচে-থাকা। আমি জানি, গত সাড়ে তিন বছর ধরে প্রমিতের সমস্ত হৃদয়জুড়ে দাপটে রাজত্ব করে বেড়িয়েছে এই মেয়ে —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিজ। মানে এলিজাবেথ।

আমরা, এই বিশাল দেশের দুই প্রান্তের দুটি মানুষ, এক বিশেষ জরুরি অবস্থায় আজ একত্রিত হয়েছি। প্রকৃত অর্থে অবশ্য কেবল এই দেশের দুই প্রান্তের দুই অধিবাসীই নই, এই পৃথিবীরই সম্পূর্ণ দুই বিপরীত প্রান্তের, দুটি ভিন্ন সমাজের, দুটি পরিপূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ আমরা — লিজ ও আমি — প্রমিতের জীবনের নিকটতম দুই নারী — আজ, এতদিন পর, মিলিত হয়েও কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অবশেষে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকি।

জিনসের প্যান্টের ওপর সাদা টি-শার্ট পরা মেয়েটি, যার বাঁ দিকে সিঁথি করে আঁচড়ানো ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ সোনালি চুল প্লেনযাত্রায় এখন কিঞ্চিৎ অবিন্যস্ত, আমার চোখের সামনে নিশ্চল বসে থাকে আরো অনেকক্ষণ। জড়ো করা হাত দুটো কোলের ওপর নিয়ে সোফার এক কোণে চুপ করে বসে আছে সে। ওকে দেখে মোটেও উড়নচণ্ডী মনে হয় না। বরং কেমন নিরীহ ও দুঃখী-দুঃখী লাগে।

ও কোনো কথা বলছে না, গভীর কোন ভাবনায় ডুবে আছে কে জানে! আমি তাই নিজেই শুরু করি। তা না হলে রাত ভোর হয়ে যাবে, কিছুই জানা যাবে না, বলা হবে না।

'তুমি প্রমিতকে কোনোকিছু না বলে ওভাবে হঠাৎ কেন বা কোথায় চলে গিয়েছিলে, সে সম্পর্কে আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না। কোথায় ছিলে এতদিন তাও জানতে চাইব না। শুধু বলো আমায়, কেন আবার ফিরে এলে। দুমাসের মধ্যেই, এত দূরে ছুটে এলে কেন?'

মেয়েটি একটু চুপ করে থাকে। যে কথাগুলো কেবল তার প্রেমিককে একান্তে বলার জন্যে প্রস্তুতি ছিল তার, সেই অতি ব্যক্তিগত কথাগুলো অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা বড় সহজ নয়। বিশেষ করে সেই অন্য মানুষটি যখন ষাট বছর বয়সের এক বঙ্গললনা হয়। কিন্তু লিজ এটাও জানে, এটা তার পরিচিত সানফ্রান্সিস্কো শহর নয়, প্রমিত বা তার নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টও নয়। এটা খোদ নিউ ইয়র্ক শহর। আর এই বাড়ি, এই ঘর, এখানে রয়েছেন বহু বছর ধরে বসবাসরত এক বাঙালি পরিবার। এই জায়গায় নিভৃতি, নিজস্ব চরাচরের ভূমি বা ব্যক্তিস্বাধীনতা পারিবারিক কল্যাণের নামে শুধু অনাদৃত নয়, প্রতিনিয়তই খণ্ডিত হচ্ছে। কিছুই যায় আসে না তাতে কারো। ফলে এখানে তার ভাবনা প্রকাশ না করার যুক্তি কোনোমতেই গ্রাহ্য হবে না। লিজ তাই বলতে শুরু করে।

'অনেক মানুষ তো দেখলাম জীবনে। সব দেখেশুনে মনে হলো, গভীরভাবে বুঝলাম, প্রমিতের মতো মানুষ হয় না। সত্যিকারের একজন 'ডিসেন্ট ম্যান প্রমিত'।'

'একজন ডিসেন্ট ম্যানই কি পার্টনার হবার জন্যে যথেষ্ট?'

'হয়তো নয়। কিন্তু একজন মানুষ ডিসেন্ট আর কম্প্যাশোনেট না হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার আর সব গুণ ঢাকা পড়ে যায়। অন্তত আমার চোখে। তাছাড়া ...'

'তাছাড়া?'

'তাছাড়া, ও কাছে থাকলে আমি খুব আরাম বোধ করি, নিশ্চিন্ত হই। ওর শান্ত স্বভাব আমাকে কেমন এক ধরনের প্রশান্তি দেয়। আমি দারুণ স্বস্তিবোধ করি। নিরাপদ মনে হয় নিজেকে। কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। ওর কাছ থেকে দূরে চলে যাবার আগে এসব এমন করে বুঝিনি। অন্য ছোটখাটো না-পাওয়াগুলোই তখন খুব বড় করে দেখতাম।'

মেয়েটি জানায়, প্রমিতের সঙ্গে জানাশোনা হবার কয়েক বছর আগে ওর একবার বিয়ে হয়েছিল। পাঁচ বছরের একটি মেয়েও আছে তার, যা হয়তো আমরা জানি না; কিন্তু প্রমিত জানে সবই। কন্যাটি থাকে তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে। নিজের কাছে এনে রাখতে পারে না মেয়েকে যেহেতু এখনো তার পড়াশোনাই শেষ হয়নি। তাছাড়া, সন্তান লালন-পালনের জন্যে যথেষ্ট রোজগারও নেই তার। লিজের সেই প্রাক্তন স্বামী, পল, পাগলের মতো ভালোবাসতো তাকে। কিন্তু সবসময় এমন করে তাকে আগলে রাখত, এমনভাবে দখল করে রাখত যে নিঃশ্বাস নেবারও যেন সুযোগ দিত না। তার সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করে নিয়েছিল তার স্বামী। লিজের জন্যে এক ফোঁটা ফাঁকা জায়গা ছিল না তার। তাই একদিন স্বামী-কন্যা উভয়কে ফেলেই পালিয়েছে লিজ।

যে কথা, যে ভাবনা বেশ কিছুদিন ধরে আমায় কুরে কুরে খাচ্ছিল অনুক্ষণ, নেহায়েত আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবেই সে-কথার দিকে দৃষ্টি ঘোরাবার চেষ্টায় হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'একটা কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করি তোমায়। খোলামেলা ও সত্যিকার জবাব আশা করব।'

কথাটা বলতেই আমার দেড় মাস আগের সেই তড়িঘড়ি করে ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রার কথা মনে পড়ে যায়। যার একমাত্র পুত্র অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে হাসপাতালের বিছানায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, তার পক্ষে এই অনিশ্চিত সময়ে উড়োজাহাজে করে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া যে কী কষ্টকর, কী অসহনীয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কী অদ্ভুত পরিহাস! এর আগে কতবার ওখানে বেড়াতে যেতে বলেছে ছেলে-স্বামী, উভয়েই। ইচ্ছে করেই যাইনি, অথবা কোনো না কোনো সাংসারিক কারণে যাওয়া হয়নি। এতদিন পর অবশেষে যখন ছুটে গেলাম, তখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে ছেলে। আর এই ভিন্ন অচেনা শহরে তার বাসায় তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি তখন একা একা বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছি। আর মাথামুণ্ডু অনেক কিছু ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারছি না। আমার স্বামী তখন দেশে। গেছে মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে।

আমি ওখানে যাবার দিনদুয়েক পরেই প্রমিতের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। একটু সুস্থ হলেই ছেলেকে নিয়ে পূর্ব উপকূলে ফিরে আসব, এই আশায় আমি একটু একটু করে ওর ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করি। আর তখুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে-সেখানে, ড্রয়ারে-ক্লজেটে-মেঝেতে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রাত্যহিক জীবনের দরকারি কিছু সামগ্রী, সেই সঙ্গে লিজের কাছে লেখা কয়েকটি অর্ধসমাপ্ত চিঠি এবং অত্যন্ত গোপনীয় ও একান্তে ব্যবহারের জন্যে প্রমিতের নামে লেখা একটি ওষুধের প্রেসক্রিপশন থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না আমার, এ ঘরের লিজে কেবল আমার পুত্রের নাম লেখা থাকলেও এখানে আরো একজন বাস করত, অন্তত কিছুকালের জন্যে। সেই গৃহসঙ্গীটি নারী — এদেশি শ্বেতকায়া এক নারী — আমার পুত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন, যার কথা আমি জানি, যার সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে বহুবার। জানতাম না শুধু যে তারা একত্রে বসবাস করছে।

যে প্রশ্নটা করার জন্যে সেই ভূমিকার অবতারণা করেছিলাম, তা অবশেষে মুখ থেকে বেরোলো আমার।

'আমার ছেলের সঙ্গে বিছানায় তুমি কেমন ছিলে?' সরাসরি প্রশ্নটা করে লিজের মুখের দিকে তাকাই।

আমি স্পষ্ট দেখি আক্ষরিক অর্থেই মেয়েটির ঠোঁট দুটো সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ওর ছোট ছোট বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর দৃষ্টি ফাঁকা। ও চমকে উঠেছে।

...'মানে — আমরা — ' আমার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় সে।

যৌনতার বিষয়ে কথা বলতে একটি পশ্চিমি মেয়েরও এতটা সংকোচ থাকতে পারে ভাবিনি।

আমি তখন নিজেই আবার বলি, 'তোমার কী মনে হতো যা চেয়েছিলে, আশা করেছিলে, যেভাবে তা আসবে ভেবেছিলে, সেভাবে তা এলো না? সবকিছু কেমন অপূর্ণ রয়ে গেল! তারপরেও কি তুমি অভিনয় করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে, প্রমাণ করতে যে সব ঠিক আছে? কিন্তু মনে মনে তখন তোমার কি খুব রাগ হতো না প্রমিতের ওপর? ভিন্ন প্রসঙ্গে, সম্পূর্ণ অন্য কোনোকিছুকে উপলক্ষ করে তখন শুধু শুধু ওকে গালমন্দ করতে না তুমি?'

'প্রমিত এত কথা বলেছে আপনাকে?'

আমি হাসি।

'তোমাদের অন্তরঙ্গ কোনো কথা প্রমিত আমায় বলবে দূরে থাক, সাধারণভাবেও ওর সঙ্গে এ ধরনের বিষয়ে কোনোদিনই কোনো আলোচনা হয়নি আমার। তুমি জানো, বাঙালি পরিবারে এসব এখনো টাবু। এ পরিবারে তো বটেই।'

'তাহলে এত কথা আপনি জানলেন কী করে? কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই একটি ব্যাপার ছাড়া, হি ইজ জাস্ট পারফেক্ট। কোনো জায়গায় এক ফোঁটা গলতি নেই — কোনো অভিযোগ করার উপায় নেই। তাই তো সব ভেবেচিন্তে আবার ফিরে এলাম ওর কাছেই।'

'না, তুমি ফিরে আসোনি, অন্তত প্রমিত তাই জানবে। তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি জানি, ওকে তুমি যতই ভালোবাসো না কেন, ওর প্রতি যতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভূতি থাকুক তোমার, এই একটি কারণে বারে বারে তোমার বাইরের দিকে নজর পড়বে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে, বুঝতেও পারবে না সবসময়। কখনো কখনো হয়তো তুমি তোমার এই বাইরে চোখ ফেলবার আগ্রহটাকে প্রশ্রয়ও দেবে না। নিজেকে সংযত করবে, বঞ্চিত করবে। কিন্তু তা করে আবার ভেতরে ভেতরে নিজেই গুমরে মরবে। প্রমিতের ওপর রাগ, ঘৃণা আরো বাড়বে।'

'কিন্তু ও যে সত্যি খুব ভালো মানুষ। এমন খোলা মন, উদার দৃষ্টি, দয়ার শরীর। এত শান্ত স্বভাব। ওর মতো আর কাউকে আমি পাইনি জীবনে। গত দুটি মাস প্রতি মুহূর্তে সেটা টের পেয়েছি। ওকে ভীষণ মিস করেছি। দোহাই আপনার, আমাকে ওর কাছে যেতে দিন।'

আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র হেলে পড়ি না। গলে যাই না। আমি জানি, এটা মস্তবড় এক পরীক্ষা আমার জীবনে। ওদেরও। নরম হবার জায়গা কোথায় এখানে?

'আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরেও যদি তুমি বা তোমরা পরস্পরের প্রতি একই রকম টান, একই রকম বোধ বজায় রাখতে পার, আর তখন যদি পরিস্থিতি অনুকূল থাকে, তোমরা তখন একত্রিত হয়ো। কারো কিছু বলবার থাকবে না। কিন্তু এখন এটা হয় না। হলেও তা টিকবে না। তোমার বয়স কত হলো লিজ? চব্বিশ-পঁচিশ! না, না, এই বয়সে এটা হয় না।'

আমি একটু থামি। তারপরে বলি, 'প্রমিত অনেক কষ্ট পেয়েছে তোমাকে হারিয়ে। জেনেশুনে ওর কষ্ট আমি আবার বাড়াতে দেব না। আমি জানি, ফিরে এলেও তুমি আবার চলে যাবে, না গেলেও প্রমিতের ঘরে — প্রমিতের জীবনে থেকেও তুমি ঠিক সেভাবে থাকবে না, যেভাবে ও তোমাকে চাইবে। জানালা আর ঘুলঘুলি দিয়ে অনবরত বাইরের দিকে চোখ পড়বে তোমার। মনের ভেতর কেন এত হাহাকার, কান্না, কেন এত শূন্যতা, বাইরের আকর্ষণ কেন এত তীব্র, বুঝতেও পারবে না সবসময়। তাছাড়া তুমি সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী, স্বাভাবিক একটি তরুণী। কারো জন্যেই এতবড় স্বার্থত্যাগ তুমি করো না — আমার ছেলের জন্যেও নয়। এটা করা উচিত নয়। জীবন তো একটাই।'

আমি একটু থামি। তারপর বলি, 'তবে যদি প্রমিত কোনোদিন এমনিতেই বা চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিক, সুস্থ হয়ে ওঠে, আর তুমি যদি তখনো বন্ধনহীন থাকো, ঠিকই খবর পাবে।'

টেবিল থেকে গাড়ির চাবিটি নিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই।

'চলো, তোমাকে হোটেলে রেখে আসি। অনেক রাত হয়ে গেল, আমি দুঃখিত। আর শোনো, কাল সকালেই তুমি ফিরে যাও। প্রমিত ঘুম থেকে ওঠার আগেই। ও জানতেই পারবে না তুমি এসেছিলে, যেমন সে আজো জানে না — বুঝতেও হয়তো পারে না ঠিকমতো, কেন তুমি ওকে কিছু না বলে ওভাবে চলে গিয়েছিলে।'

বেরোবার মুখে আমাদের ঘরের সামনের দুদিকে দুটো গাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবসন্তে ফোটা বড় বড় কয়েকটি ম্যাগনোলিয়া ছিঁড়ে ওর হাতে তুলে দিই।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে আর না তাকিয়ে, কোনো কথা না বলে, চুপচাপ গাড়িতে গিয়ে উঠি।

লিজকে বিমানবন্দরে রেখে ঘরে ফিরে দেখি, এপ্রিলের শুরুতে, এই মেঘনা-শীতল সকালে, মাথায় একটা উলের স্কার্ফ মুড়িয়ে, ফুলহাতা সোয়েটার পরে বারান্দার গোল টেবিলটার পাশে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছে কমল। আমাকে একা ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করে।

'ও কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো!'

'চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কেন? এই যে বলল অনেক ভেবেচিন্তে ফিরে এসেছে? বলল, প্রমিতই তার জীবনের আসল পুরুষ, দুমাস ওকে ছেড়ে থেকে সেটা সে বুঝে গেছে।'

'ওটা দয়া। নেহায়েতই মায়া। ভালোবাসা নয়।'

'দোষ কী তাতে? দয়া আর মায়া তো অনেক বেশি খাঁটি, মৌলিক, অনেক বেশি শক্তিশালী অনুভূতি। দয়া আর মায়াই তো মানুষের সঙ্গে মানুষকে বেঁধে রাখে। ভালোবাসা কি রাখে? নাকি থাকে ভালোবাসা আজীবন? আমি তো মনে করি, দয়া আর মায়ার বন্ধন অনেক গভীরে প্রোথিত। ভালোবাসার চাইতেও সলিড।'

ওভাবে কথা বলা ওর অভ্যেস হলেও, আজ কমলের কথাগুলো ঠিক বইয়ের ভাষায় লিখিত বক্তব্যের মতো শোনায় আমার কানে।

আমি বলি, 'আমি জানি না। কিন্তু আর যাই করো, প্রমিতকে লিজের ফিরে আসার কথাটা কখনো বলো না। ভালোই হয়েছে। বারে বারে না গিয়ে একবারেই চলে গেছে মেয়েটা। কেউ যদি হাজারবার মরার আগে একবার ভালো করে বাঁচার চেষ্টা করে, তাকে বাঁচতে কি দেব না আমরা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ম্বরা

রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভা।

রাজা-রানী, উজির-নাজির, দেশ-বিদেশের মান্যগণ্য অতিথিবর্গ উজ্জ্বল পোশাক আর স্বর্ণালংকারে ভূষিত হইয়া রাজউদ্যানে সমবেত।

রাজ্যের একমাত্র রাজকন্যা বাগানের মধ্যস্থলে দুর্লভ মণিমুক্তাখচিত এক স্বর্ণাসনে শ্বেত ও রক্তিম বসনে উপবিষ্টা।

সকলের জন্যই এক মহাবিস্ময় এই রাজকন্যা। অতি বিদুষী সে। বছরের পর বছর ধরিয়া সর্বকালের সর্বজাতির ইতিহাস, সমাজ ও বিজ্ঞান-সাধনা পঠন ছাড়াও দর্শন ও সাহিত্যে তাহার বহুমাত্রিক জ্ঞানার্জন তাহাকে জীবিত কিংবদন্তির মর্যাদা দিয়াছে। তাহার সুরেলা কণ্ঠের সংগীত হিংস্র সিংহকেও নাকি বশ মানাইতে সক্ষম। আর তাহার রচিত কবিতা? উহা তো শব্দগুচ্ছ নয়, যেন মতির মালা। তাহার অঙ্কিত অসাধারণ সব বিমূর্ত ও নিসর্গ চিত্রকলা অনায়াসে রাজপ্রসাদকে এক দুর্লভ শিল্পাঙ্গনে পরিণত করিতে সক্ষম। কিন্তু রাজকন্যার এত যে গুণ, তাহা তাহার রূপের মতোই সকলের চক্ষুর আড়ালেই থাকিয়া যায়। জনসম্মুখে সংগীত পরিবেশন, কবিতা প্রকাশ অথবা চিত্র প্রদর্শন দূরে থাকুক, রাজকন্যার দর্শন মেলাও অসম্ভব। সুন্দরী, যুবতী, গুণবতী কন্যা প্রাসাদের বাহিরে এমনকি নিজের কক্ষের বাহিরেও ক্বচিৎ কালাতিপাত করে। ফলে রাজদরবারের অনেকেই তাহাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পর্যন্ত পায় নাই। এমনই যে রহস্যময়ী ও অবগুণ্ঠিতা রাজকন্যা, তাহার বিবাহের কী ব্যবস্থা হইবে? রাজা চিন্তিত। রানীর নিদ্রা তিরোহিত। এমন সময় স্বয়ং রাজকন্যাই একদিন আগাইয়া আসে একটি প্রস্তাব লইয়া। স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হউক। পাণিপ্রার্থী দেশ-দেশান্তর হইতে আগম্য তরুণদের মধ্য হইতে মন্ত্রীবর্গ ও পণ্ডিতকুল মিলিয়া সবচাইতে জ্ঞানী, গুণী, চরিত্রবান ও সুশ্রী পাঁচজন যুবককে বাছাই করিয়া লইয়া আসিবেন রাজউদ্যানে। তাহাদের সম্মুখে রাজকন্যার একবার পদব্রজে আগমন ঘটিবে, কেবল পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়ের জন্য। তাহার পর কন্যা যাইয়া উপবিষ্ট হইবেন বাগানের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সংস্থাপিত একটি আরামকেদারায়। অপেক্ষারত যুবককুল দশ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনিটের জন্য রাজকন্যাকে পরিদর্শন করার সুযোগ পাইবে। অতঃপর একে একে তাহারা কন্যার কাছে ব্যক্ত করিবে কোন বিশেষ কারণে তাহারা এই রাজকন্যাকে বিবাহে আগ্রহী। সকলের কথা শ্রবণান্তে রাজকন্যা নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উপস্থিত সুধীজনের সম্মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করিবে কেন এই বিশেষ ব্যক্তিটিকে সে মনোনীত করিয়াছে।

প্রথম রাজপুত্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, কেন সে এই রাজকন্যাকে বিবাহে আগ্রহী? রাজপুত্র বলিল, 'রাজকন্যার প্রজ্ঞা আর মেধাই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সেই বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডারের জন্যই আমি তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছি।'

দ্বিতীয় যুবা আসিল। 'কন্যার সুরেলা মধুর কণ্ঠ, সংগীতের ওপর রাজকন্যার সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং একজন সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমাকে বিমোহিত করিয়াছে।'

তৃতীয় রাজপুত্রকে একই প্রশ্ন করা হইল। তাহার উত্তর, 'আমি রাজকন্যাকে পত্নী হিসাবে পাইতে ইচ্ছুক, কেননা তিনি একজন অসামান্য কবি। কবিতার প্রতি আমার দুর্বলতা এবং তাঁহার লিখিত উঁচুমানের কবিতাই রাজকন্যাকে আমার নিকট অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।'

চতুর্থ রাজার পুত্র আসিয়াই কহিল, 'রাজকন্যার শিল্পীসত্তাই আমাকে সবচাইতে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার তুলিতে রঙের বিন্যাস ও মাধুর্য এবং বিভিন্ন রেখা ও আকৃতির বিচিত্র সমাবেশ আমাকে চিরকাল যাদুর মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে বলিয়া আমি মনে করি।'

পঞ্চম যুবক আসিল। রাজকন্যার দিকে সোজা তাকাইয়া বলিল, 'রাজকন্যা, আপনার অনুপম রূপ আমাকে মুগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়াছে। আপনাকে যখন দেখিলাম, আমার শরীরে একটা অভূতপূর্ব শিহরণ জাগিল। স্নায়ুতে স্নায়ুতে উত্তেজনায় অধীর হইলাম আমি। আপনার হাঁটা, আপনার কথা বলা, আপনার ঐ বসিয়া থাকার ভঙ্গি আমাকে চঞ্চল করিয়াছে। গোলাপের পাপড়ির মতো নরম ও রক্তাভ আপনার ঐ ওষ্ঠযুগল, এই অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল, মসৃণ ত্বক, সুডৌল পয়োধর, আপনার দীর্ঘ উজ্জ্বল কেশরাশি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। আপনাকে আমার চাই। আর তাহার জন্যই আপনাকে বিবাহ করিতে আমি আগ্রহী।' রাজা ও রানী যুগপৎ উঠিয়া দাঁড়ান, তাঁহাদের চক্ষু ও মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান। প্রহরীরা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসে। উপস্থিত সুধীবৃন্দ অস্বস্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। এসব কী বলিতেছে এই পঞ্চম যুবক? এই প্রগলভ্‌তার শাস্তি কী হওয়া উচিত? রাজকন্যা কেদারা ছাড়িয়া সামনে আগাইয়া আসেন। ইশারা করিয়া প্রহরীদের নিবৃত্ত করেন। তাহার পর রাজা ও রানীর সামনে মাথা নিচু করিয়া অভিবাদন জানাইয়া কন্যা ঘোষণা করেন, 'এই শেষোক্ত যুবককেই আমি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজসভায় প্রবল গুঞ্জন। রাজা-রানী উভয়েই স্তম্ভিত। বিস্মিত সুধীজন পরস্পরের মুখাবয়বের নিরীক্ষণে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে থাকেন।

রাজকন্যার এত যে গুণ, কোনো গুণই যে এই যুবককে আকৃষ্ট করে নাই! এত শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্না, স্বাধীনচেতা রাজকন্যার এ কী মতিভ্রম?

ইহা কেমন মনোনয়ন?

রাজকন্যা হাসে। যুবকের হাত ধরিয়া দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ : 'আমি উহাকে জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি, কারণ সে সত্যবাদী।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী, যৌবন, যৌনতা

অফুরন্ত যৌবনের সন্ধানে

চিরস্থায়ী যৌবনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। যৌবন সে-অর্থে কোনো অর্জন নয়। তবু কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রাকৃতিক উপায়ে লব্ধ যৌবনকে আজীবন ধরে রাখার জন্য কী সাংঘাতিক ও প্রাণপণ লড়াই না করে যাচ্ছে মানুষ সেই আদিকাল থেকে। মৃত্যুর অনিবার্যতার মতো যৌবনের অবসানও অমোঘ বুঝতে পারার পরও অন্তত এ তারুণ্যকে প্রলম্বিত করার চেষ্টার ঘাটতি নেই তার। অনবরত সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই মহৌষধ বা কলাকৌশল, যার মাধ্যমে বয়সকে ঢেকে অথবা অস্বীকার করে যৌবনের দেহাবরণে অন্যের সামনে সে আবির্ভূত হতে পারবে।

মহাভারতে আছে মহারাজ যযাতি। তাঁর অসীম কামস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য নিজের কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর কাছে থেকে এক হাজার বছর তারুণ্য ধার করেছিলেন। কিন্তু এক হাজার বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর যৌনতাড়না প্রশমিত হয়নি উপলব্ধি করে যযাতি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অনিয়ন্ত্রিত কাম-কাতরতা আগুনে ঘি ঢালার সমকক্ষ, যা কেবল বেড়েই চলে, নেভার ধার ধারে না।

গ্রিক পুরাণে আছে, ইয়স তার প্রেমিক রাজকুমার টিথোনাসের জন্য অমরতা প্রার্থনা করেছিল দেবতা জিউসের কাছে। জিউস ইয়সের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে (নাকি আফ্রোদিতের অভিশাপের ফলে?) ইয়স টিথোনাসের জন্য চিরস্থায়ী যৌবনের প্রার্থনা করতে ভুলে গিয়েছিল। ফলে টিথোনাস অমর হলো ঠিকই, কিন্তু জবুথবু বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকল। আর ইয়স, যে আফ্রোদিতের প্রেমিককে ভাগিয়ে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করার অপরাধে আফ্রোদিতের অভিশাপের শিকার হয়ে অনবরত কেবল তরুণ প্রেমিক খুঁজে বেড়ায়, শিগগিরই বৃদ্ধ টিথোনাসের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ল। সে রাগে, বিরক্তিতে, ঘেন্নায় টিথোনাসকে লুকিয়ে রাখল ক্লজেটের ভেতর, যেখানে টিথোনাস একদিন ফড়িংয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

আর আইরিশ পুরাণে রয়েছে অফুরন্ত যৌবনের দেশ তীর-না-নগের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনি। আয়ারল্যান্ডের অয়সিন একদিন বনে শিকার করতে গিয়ে সাক্ষাৎ পায় সুন্দরী স্বর্ণকেশী নিয়ামের। তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রেমে পড়ে যায় এবং নিয়াম তার জাদুর ধবল ঘোড়াতে চড়িয়ে অয়সিনকে নিয়ে আসে তীর-না-নগে। অফুরন্ত যৌবনের দেশ তীর-না-নগ। সেখানে অয়সিন তিনশো বছর ধরে সুখে আনন্দে জীবন কাটায় নিয়ামের সঙ্গে। তার একদিনও বয়স বাড়ে না, যেমন বাড়ে না নিয়াম অথবা তীর-না-নগের অন্য বাসিন্দাদের। কিন্তু তবু দিন যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অস্থির উন্মনা হয়ে পড়ে অয়সিন। তার মাতৃভূমি, নিজের পরিচিত পরিবেশের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নিয়াম বুঝতে পারে অয়সিনের অবস্থা, সমব্যথী হয়ে সে অয়সিনকে তার জাদুর শ্বেত ঘোড়াটিতে চড়িয়ে আয়ারল্যান্ডে পাঠায়। যাওয়ার সময় নিয়াম সাবধান করে দেয় কখনো যেন আয়ারল্যান্ডের মাটি স্পর্শ না করে অয়সিন। যদি করে, তাহলে আর কোনোদিন এ অফুরন্ত যৌবনের স্বপ্নময় দেশে ফিরে আসতে পারবে না সে।

অয়সিন ফিরে আসে তিনশো বছর পর তার নিজস্ব ভূমিতে। কিন্তু সেখানে এসে সে যা দেখে, তা আদৌ সুখকর নয়। তার পরিচিত সবাই মারা গেছে এবং তাদের গোষ্ঠী ও বংশধরদের কথা কেউ-কেউ হয়তো কেবল কল্পকাহিনির মতো কোনোমতে মনে করতে পারছে।

অয়সিনের এসব দেখেশুনে ভালো লাগল না। সে তীর-না-নগে তার প্রেয়সীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু ফেরার পথে কয়েকজন লোককে বহু কষ্ট করে একটি বিরাট ও ভারী পাথরখণ্ড সরাতে দেখে সে। অয়সিন যেই তাদের সাহায্য করার জন্য পাথরে হাত লাগিয়েছে, অসাবধানতাবশত ঘোড়া থেকে তার পাখানি সরে গিয়ে মাটি স্পর্শ করে ফেলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে এ মরণশীল দুনিয়ায় আবার ফিরে আসে অয়সিন। সে দেখে, সে আর যুবক নেই, একজন অতি বৃদ্ধ ও অন্ধ লোক হয়ে গেছে।

যৌবনের জন্যে হা-পিত্যেশ শুধু বিভিন্ন সংস্কৃতির পুরাণ-কাহিনিতেই সীমাবদ্ধ নয়। জানা যায়, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকায় দ্বিতীয়বার যাত্রার সফরসঙ্গী হুয়ান পন্স ডি লিয়নও সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন সেই জাদুময় যৌবনের ফোয়ারাকে, যার জল পান করলে বা সেই জলে স্নান করলে মানুষ চিরস্থায়ী যৌবন লাভ করবে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অভিযাত্রিক লিয়ন স্পেনের সেই বিখ্যাত ঔপনিবেশিক শক্তি, যিনি জীবিতাবস্থায় দক্ষিণ স্পেনে অগুনতি মুসলমান নিধন করতে যেমন পিছপা হননি, আমেরিকায় এসে সেখানকার মাটিতে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের কচুকাটা করতেও দ্বিধা করেননি। তা সত্ত্বেও এসবের মাঝে এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রায় সবটা সময়ই তিনি কাটিয়েছেন আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সেই কাল্পনিক বামিনী দ্বীপ আবিষ্কারের নেশায়, যে দ্বীপে অত্যাশ্চর্য সেই যৌবনের ফোয়ারা আছে বলে তিনি শুনেছেন—যার প্রভাবে অফুরন্ত যৌবন লাভ সম্ভব।

বলা বাহুল্য, স্পেন সরকারের দেওয়া নৌবহর ও আর্থিক সহযোগিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া সত্ত্বেও লিয়নের পক্ষে সেই বামিনী দ্বীপ বা চিরন্তন যৌবনের ফোয়ারা আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। বরং ফ্লোরিডায় রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত কিউবায় গিয়ে মারা যায় লিয়ন। লিয়নের সেই জাদুময় যৌবন-ফোয়ারাকে ভিত্তি করে রন হাওয়ার্ডের ছবি 'কোকুনে'-ও দেখা যায় কিছু বৃদ্ধ অন্য গ্রহের অধিবাসীদের মধ্যস্থতায় এক বিশেষ সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে যৌবন ফিরে পায়। কিন্তু তাদের আসল অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয় যখন তাদের কাছে কেবল দুটি পথ খোলা থাকে—হয় চিরঞ্জীবী হয়ে অফুরন্ত যৌবন ভোগ করবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ভিন্ন গ্রহে চলে যেতে হবে; অথবা পৃথিবীতে নিজ পরিবারের সঙ্গেই থাকবে কিন্তু যৌবনকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সময়মতো মৃত্যুকেও মেনে নিতে হবে। এ হলো মানবজন্মের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে জীবন ও তারুণ্যের দুর্নিবার স্পৃহা, সেইসঙ্গে অমোঘ নিয়ম—বার্ধক্য ও মৃত্যুকে মেনে নেয়ার মানসিকতা অর্জন।

তারুণ্যকে ধরে রাখা, নিদেনপক্ষে দীর্ঘায়িত করার জন্য আদিকাল থেকে মানুষ নানারকম ব্যবস্থা, কলাকৌশল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে। গাছগাছালি থেকে আহরিত নির্যাস থেকে শুরু করে নানারকম প্রধাসনী সামগ্রীর ব্যবহার, এমনকি প্লাস্টিক সার্জারি করেও জীবন থেকে কয়েকটি বছর ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করে মানুষ। আর এ অদম্য স্পৃহাকে কেন্দ্র করে জগৎজুড়ে চলছে কতরকম ব্যবসা! ভিটামিন মিনারেলের ব্যবসা তো রয়েছেই। নানারকম লতাগুল্মের তৈরি ওষুধ, বিশেষ বিশেষ খাদ্য বা মশলা, চামড়ার তারুণ্য ও মসৃণতা রক্ষা করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রিম ও মেকআপ, হাকিমি দাওয়াই, কবিরাজি ও আয়ুর্বেদিক ওষুধের ছড়াছড়ি বাজারে। এই বয়স-না-বাড়ার প্রতিযোগিতাকে আবার একটু বেশি মাত্রায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নারীর ওপর। আদিকাল থেকে সব সমাজেই নারীর যে দুটি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বলে বিবেচিত হয় পুরুষের কাছে, তা হলো নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও তারুণ্য। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, শারীরিক সামর্থ্য ও পার্থিব যোগ্যতা সবচেয়ে বড় বিবেচনার বিষয়।

তবে তারুণ্য, রোমান্স, যৌনতা—এসবই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিয়ন্ত্রিত হয় অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে, প্রধানত মেয়েলি হরমোন এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন এবং পুরুষালি হরমোন টেস্টোস্টেরনের সরাসরি প্রভাবে। হরমোন হলো এক রকমের রাসায়নিক পদার্থ, যা শরীরে বিশেষ কোনো অঙ্গ বা গ্ল্যান্ড থেকে খুব নিয়মমাফিক ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নিঃসৃত হয় রক্তে। রক্তের ধারা সেই হরমোনদের যথাসময়ে পৌঁছে দেয় নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। সেখানে গিয়ে তারা নানাধরনের শারীরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। হরমোন সরবরাহ করে তারুণ্য বজায় রাখা তাই নতুন কোনো ঘটনা নয়।

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যে-সব মেয়ের শরীরে এস্ট্রোজেনের মাত্রা বেশি তাঁরা বয়স হলেও দেখতে অপেক্ষাকৃত তরুণ থাকেন, আর যাঁদের শরীরে এস্ট্রোজেনের মাত্রা কম, তাঁদেরকে বয়সের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলনায় আট-দশ বছর পর্যন্ত বেশি বয়সী বলে মনে হতে পারে। এছাড়া রজঃনিবৃত্তির পর শারীরিক শ্লথতা অস্বাচ্ছন্দ্য ও কামস্পৃহার ঘাটতি কাটাতে ষাটের দশক থেকেই শরীরে হরমোন পুনঃস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চলেছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের শরীরে এস্ট্রোজেনের পরিমাণ যে হারে কমে যায়, পুরুষদের শরীরে টেস্টোস্টেরন কমে যাওয়ার হারের চাইতে তা অনেক বেশি দ্রুত। এ কারণে নারীর শরীরে তারুণ্যের উপস্থিতির সামাজিক বিপুল চাহিদার জন্য হরমোন নিয়ে নারীর তারুণ্য রক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। একমাত্র এস্ট্রোজেন থেরাপির ফলে বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এস্ট্রোজেনের সঙ্গে সামান্য প্রজেস্টেরন মিশিয়ে প্রাকৃতিক হরমোনের আবহ সৃষ্টি করার চেষ্টাও চলছে নারীদেহে। এ হরমোন পূরণের প্রাথমিক সাফল্যের ধারা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না।

এটা অনস্বীকার্য যে, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। প্রায় প্রতিটি দেশে, প্রতিটি সমাজে, এখন মানুষ বাঁচে অনেকদিন। ভালো খাদ্য, উন্নত চিকিৎসা ও জীবনযাপনের উন্নত মানের জন্য দিন দিন তাদের আয়ু আরো বেড়ে যাবে বলেই ধারণা। এ অবস্থায় মানুষের পরিণত জীবনের দৈর্ঘ্যও অনেকটাই বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। আগে সন্তানরা সাবালক হতে না হতেই পিতা-মাতার মৃত্যু হতো। ফলে একটি প্রজন্ম প্রজননশীল হলেই আরেক প্রজন্মের চলে যাওয়ার সময় হয়ে আসত। মনে হতো মানবসন্তানের সৃষ্টি ও লালন-পালনের জন্যেই কেবল মানুষের জন্ম। আজ মানুষ বুঝে গেছে, প্রজন্ম দাঁড় করানো তার অস্তিত্বের ও বেঁচে থাকার মূল ভিত্তি হলেও সামগ্রিক জীবনের আবেদন আরো ব্যাপক, আরো বৈচিত্র্যময়।

আজকাল মানুষ অনায়াসে বেঁচে থাকে তার দুই বা তিন প্রজন্মের সদস্যসহ। এ দীর্ঘ বেঁচে থাকা শুধু বাঁচার জন্যেই হতে পারে না। কেবল পর্যাপ্ত মুখরোচক খাবার আর সুচিকিৎসার বন্দোবস্তই যথেষ্ট নয়। জীবনকে অর্থবহ ও আনন্দকর করে তোলার জন্য জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মান উন্নয়নও প্রয়োজন। প্রাণিজগতের সব প্রাকৃতিক ও মৌলিক প্রবৃত্তি এবং প্রবণতাগুলোর মধ্যে যৌনতার বোধই হয়তো সবচেয়ে দেরিতে আসে এবং সবচেয়ে আগে হ্রাস পায়। অথচ মানবজগতের সবচেয়ে যে প্রগাঢ় ও শক্তিশালী সম্পর্ক বা বাঁধন, তা হলো নর-নারীর সম্পর্ক, যার ভিত্তি যৌনতা। ফলে যৌনজীবনকে আরো দীর্ঘায়িত, সচল ও আনন্দদায়ক করে তোলা মানুষের দীর্ঘ আয়ুর সুফল ভোগ করার বড় ধরনের শর্ত। প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে এসে মানুষের, বিশেষ করে নারীর, যৌনাকাঙ্ক্ষা কমে যায়, পুরুষের যৌনক্ষমতা হ্রাস পায়। পড়তি বয়সে যৌনবাসনা সঞ্চালন ও আনুষঙ্গিক শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার জন্য রজঃনিবৃত্তির পর বাইরে থেকে মেয়েলি হরমোন গ্রহণ করা শুরু করেছিল মেয়েরা প্রায় তিন-চার দশক আগে থেকে। প্রথম-প্রথম মনে হয়েছিল প্রকৃতির কাছে হার মানতে নারাজ মানুষের জয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় অনিবার্য। যে হরমোন প্রাকৃতিক নিয়মে আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়ে যায় সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা লোপ পাওয়ার পর, বাইরে থেকে তা সরবরাহ করে মেয়েদের শরীর ও মন বোধহয় প্রায় আগের মতোই চাঙ্গা করে দেওয়া সম্ভব। এটা সর্বজনবিদিত যে, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের হার্ট অ্যাটাক কম হয়। কিন্তু লিঙ্গভেদে এ রোগের প্রকোপতার যে তারতম্য তা প্রায় দেখাই যায় না। যখন মেয়েদের বয়স বাড়ে, অর্থাৎ তাঁরা পঞ্চাশোর্ধ্ব অথবা ষাটের কোঠা পার হন। তাঁদের মধ্যে আরো কতগুলো জরার চিহ্ন স্পষ্ট হয়—যেমন হাড় ভঙ্গুর হয়ে আসে, কারো-কারো স্তনে বা জরায়ুতে ক্যান্সার হয়। তাছাড়া মাঝে-মাঝে প্রবল ঘাম আর গরম লাগা, সেইসঙ্গে স্মৃতিবিভ্রম, যোনির শুষ্কতা ও সংকোচন এবং যৌনসংযোগে অনীহা ইত্যাদি অনেক কিছু ঘটে।

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট (প্রতিস্থাপন) থেরাপির প্রথম দিকের গবেষণায় মনে হয়েছিল এসব শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যগুলোর প্রায় সবই ঠিক করে ফেলা যাচ্ছে, শরীরে কমে যাওয়া মেয়েলি হরমোনগুলোকে বুদ্ধিমানের মতো বাইরে থেকে সরবরাহ করে। কিন্তু কয়েক বছর আগে দীর্ঘ কয়েকটি গবেষণার ফল প্রকাশ পেলে সমস্ত আশা ও স্বপ্নের সলিলসমাধি ঘটল। দেখা গেল—হৃৎপিণ্ডের অসুখ, স্মৃতিশক্তি লোপ, স্তনের ক্যান্সার কোনো ব্যাপারেই হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি কোনো কল্যাণকর ভূমিকা নেয় না, বরং এ তিনটি অসুখের সম্ভাবনাকেই বাইরে থেকে দেয়া এস্ট্রোজেন এবং এস্ট্রোজেন/প্রজেস্টেরন বাড়িয়ে দেয়। শুধু হাড় মজবুত করতে ও রজঃনিবৃত্তির পরপর দৈনন্দিন শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করতেই এ হরমোন সাহায্য করে।

আমরা সবাই জানি, স্মৃতিশক্তি যা মানববন্ধনের এক শক্তিশালী ভিত্তি তা হরমোন ও বার্ধক্য দ্বারা প্রভাবিত। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে স্মৃতিশক্তি ও এস্ট্রোজেন উভয়ই কমে। অথচ বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী এস্ট্রোজেনের সংযোজন স্মৃতিশক্তি বাড়ায়নি। ফলে অন্য বিজ্ঞানীরা যে আজ সরব হয়ে দাবি তুলছেন, টেস্টোস্টেরন হরমোনের সংযোজন (টেস্টোস্টেরন প্রতিস্থাপন থেরাপি) হারাতে-বসা স্মৃতিশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবে—এ আশাও আর করা যায় না। (বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার অবশ্য আরেকটি কারণ শরীরে কর্টিসান হরমোনের ঊর্ধ্বমাত্রা)। শুধু স্মৃতিশক্তি পুনর্নির্মাণেই নয়, শ্লথ ও নির্জীব যৌনজীবনকে চাঙ্গা করার জন্য হলেও টেস্টোস্টেরন থেরাপির কথা ভাবছেন কোনো কোনো বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক। আর এ থেরাপি তারা শুধু পুরুষদেহে নয়, নারীদেহে সংযোজন করার কথাও চিন্তা করছেন। কোননা স্বল্প পরিমাণের টেস্টোস্টেরন নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে ও যৌনসুখ উপভোগ করতে সাহায্য করে। তবে তিন-চার দশক ধরে মেয়েদের শরীরে এস্ট্রোজেনের সংযোজনের সব মাহাত্ম্য, সব জাদু যখন ধুম করে ধসে পড়ল বেশ কয়েকটি বড় ও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার ফল প্রকাশ পেলে, টেস্টোস্টেরন থেরাপিও যে একই ফল বয়ে আনবে না, তা নিয়ে কেউ জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কিছু বলতে পারে না। ইদানীংকালে ভায়াগ্রাসহ প্রধানত হরমোনবিহীন বহু যৌন-উদ্দীপক ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে—যা প্রধানত পুরুষের জন্য, কিন্তু কিছু-কিছু নারীর জন্যও বাজারজাত হয়েছে। এসব ওষুধ যৌনজীবন, নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি কী প্রতিক্রিয়া ফেলবে, এখুনি তা বলা যাচ্ছে না।

সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে শরীরে ওঠানামা করা এসব হরমোনের নিশ্চয়ই একটা বৃহত্তর ভূমিকা রয়েছে। হয়তো বা এর কোনো অন্তর্নিহিত কারণ আছে, হয়তো কোনো সুফল রয়েছে, যেটা এখনো পরিষ্কার নয়। শরীরে নিঃশেষিত বা হ্রাসকৃত একটি হরমোনকে বাইরে থেকে সরবরাহ করলেই হয়তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, বরং এ কৃত্রিম আবহে শরীরের অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে। আমরা সবাই জানি, শরীরে কোনো হরমোনই এককভাবে কাজ করে না। একটি হরমোন অন্যটিকে প্রভাবিত করে। আমরা এও জানি, হরমোনগুলো জীবকোষের আচ্ছাদনে বসে থাকা তাদের জন্য নির্ধারিত কতগুলো রিসিপ্টরের মাধ্যমে কাজ করে। খেয়ালখুশিমতো শুধু একটি হরমোনকে শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেই হয়তো প্রার্থিত ফল আসবে না। মানুষের বিরাট রক্তভাণ্ডারে অজস্র যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্য রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত একটি পদার্থের উপস্থিতি এ সামগ্রিক অবস্থাকে ওলটপালট করে দিতে পারে—প্রাকৃতিক ব্যালেন্স নষ্ট করে দিতে পারে।

তাছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হরমোন বা তার পরিমাণ নয়, আমাদের প্রতিটি জীবকোষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতারও বহু পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় কোনটা যে কারণ আর কোনটা ফলাফল তা সবসময় নির্ণয় করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে শরীরে বিভিন্ন হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের পারস্পরিক সংযোগ এবং সম্পর্ক আবিষ্কার করা না যাবে, ততদিন পর্যন্ত বিগত যৌবন নিয়ে দুঃখ না করে যৌবনাক্রান্ত জীবনের অন্যান্য রসদ থেকে জীবনকে অর্থবহ ও সুখী করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে পরিণত জীবন একদিন যৌনতাড়না ও একটি বিশেষ মানুষকে কেন্দ্র করে শুরু হয়, তা-ই আস্তে আস্তে মহীরুহের মতো ডালপালা মেলে অন্য অনেক মানববন্ধনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এসব বন্ধন আমাদের অন্তরকে স্নিগ্ধ ও স্থির করে মনকে প্রসারিত করে, নিশ্চয়তা দেয়, জীবনকে সমৃদ্ধ করে অন্যের কাছে নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তোলে, ভালোবাসায় সিক্ত করে মন। এ বৃহত্তর জীবন ও তার বোধ—যা অক্সিটসিন, ভেসোপ্রেসিন, নরএপিনেফ্রিন, এন্ডরফিনের মতো সহস্র পদার্থ নিয়ে চালিত, যা আমাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও যাপিত জীবনের সার্বিক পরিবেশ দিয়ে পরিচালিত, সেই জীবনের সমস্ত ভাণ্ডারকে কী সাধ্য যে এস্ট্রোজেন বা টেস্টোস্টেরন এক হাতে কাত করে দেবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একের ভেতর পাঁচ

একই মায়ের পেটে একত্রে নয় মাস নয় দিন বেড়ে ওঠার পর ওরা জন্মেছিল একই সঙ্গে।

শোভা, যুবা, মেধা, যুক্তি আর বোধি।

একসঙ্গে জন্মালেও বোধি বরাবরই সবার চেয়ে পরিণত।

একদিকে ওর প্রজ্ঞা, অন্যদিকে স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা, তার সঙ্গে এসে মিশেছে দূরদর্শিতা,—এর যেন আর তুলনা হয় না।

সত্যি বলতে কী, বাকি চারজনকে বোধি প্রায় নিজের মধ্যেই ধারণ করে বসে আছে।

ওদের কল্যাণের কথা ভেবে, ওদের মঙ্গলের জন্যে চিন্তা করে, সারাক্ষণ বোধি ছায়ার মতো ওদের পাশে থাকে—আগলে রাখে ওদের সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা থেকে।

নিজের শরীর আর বুদ্ধি দিয়ে সকল বিপদ-আপদ থেকে ওদের রক্ষা করে, সর্বক্ষণ পাহারা দেয় ওদের। দেখে মনে হয়, বোধি ওদের সঙ্গে একই সময় জন্মায়নি। মনে হয়, বোধি যেন ওদের অগ্রজা বা জননী, অথবা তারও চেয়ে বড় কেউ।

শোভা আর যুবা ঠিক তার উল্টো।

নিজেদের ছাড়া আর কারো কথা জানে না, বোঝে না ওরা।

জন্মের প্রথম দশকে শোভাকে ছাড়া ওদের কারো দিকে কেউ তেমন নজর দেয়নি।

যে দেখে শোভাকে, সেই কেবল বলে, 'আহা কী সুন্দর মেয়ে', অথবা, 'বেশ তো দেখতে মেয়েটি!'

যদিও কখনোসখনো কঠিন কঠিন ও দীর্ঘ সব কবিতা মুখস্থ করার পর হাত-পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে ওসব আবৃত্তি করে, অথবা সুর আর তাল মিলিয়ে দু-একখানা গান গেয়ে মেধা যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে কাউকে কাউকে।

কিন্তু সেসব লোকে মনে রাখেনি।

শুধু মনে রাখতো তারা, এ বাড়িতে সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে আছে —যার নাম শোভা।

কিন্তু ওদের জন্মের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লোকজনের দৃষ্টি একটু প্রসারিত হলো, অর্থাৎ শোভার সঙ্গে যুক্ত হলো এবার যুবা।

দ্বিতীয় দশক থেকে চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলল সেই ধারা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সুদীর্ঘ সময়টাতে যৌথভাবে শোভা ও যুবাকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল যতরকম হইচই-মাতামাতি।

লোকজনের মধ্যে, বিশেষ করে পুরুষ মানুষের মধ্যে, রীতিমতো কাড়াকাড়ি মারামারি লেগে যেত ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, একটু কাছে যাবার জন্যে, সামান্য একটু ছোঁয়া পাবার জন্যে।

সে কী মহা উচ্ছ্বাস, উল্লাস! সে কী উন্মাদনা!

মেধা আর যুক্তির অবস্থান প্রায় সব ব্যাপারেই মাঝামাঝি।

না তারা বোধির মতো সম্পূর্ণ আত্মত্যাগে প্রস্তুত, না তারা শোভা আর যুবার মতো কেবল নিজেকে নিয়ে মশগুল।

শোভা আর যুবার প্রতি সকল মানুষের এমন হুমড়ি খেয়ে পড়া দেখে বেচারা মেধা, এমনকি কখনো কখনো যুক্তিও, বেজায় মন খারাপ করে।

শোভা-যুবার পাশে থেকেও যেন তারা নেই।

লোকে অগ্রাহ্য করে ওদের।

বেজার মুখ করে এককোণে চুপচাপ বসে থাকে ওরা।

আর ভাবে এটা কিন্তু লোকজনের খুবই অন্যায়।

শোভা আর যুবাই কি সবকিছু? তারা কি কিছুই নয়?

এ ব্যাপারে অবশ্য মন বেশি খারাপ করত মেধাই, যেহেতু শোভা ও যুবার তুলনায় তার অর্জন ও সাফল্যের পাল্লা অনেক ভারী।

কবিতা লেখা, গান করা, নাটকে অভিনয়, ছবি আঁকা, আবার সেই সঙ্গে অঙ্কে একশতে একশ পাওয়া, ইংরেজি ও বাংলা নির্ভুল বানান ও উচ্চারণ করা, এসব কি কিছুই নয়?

যুক্তি যেহেতু খুব অভিমানী নয়, কথায় কথায় সে ভাবাবেগে গাল ফোলায় না মেধার মতো, চলমান সকল ঘটনাকেই নিজে নিজে বিশ্লেষণ করতে পারে যুক্তি। সে শক্তি তার রয়েছে। আর তাই লোকজনের আচরণে দুঃখিত হলেও তাদের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে ওদের ক্ষমা করে দেয় সে।

মেধা কিন্তু পারে না যুক্তির মতো মুহূর্তেই গা ঝাড়া দিয়ে এসব অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে।

তার খালি মনে হতে থাকে, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রে তার অপরিসীম সাধনা ও পারদর্শিতা যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে না এখানে।

সমস্ত ব্যাপারটা এভাবে না ঘটলেই খুশি হতো যুক্তি।

খুশি হতো বোধিও।

কেননা, সত্যি বলতে কী এই প্রবল জনপ্রিয়তার জন্যে শোভা বা যুবাকে কিছুই করতে হয়নি।

কোনো পরিশ্রম, অধ্যবসায় অথবা চেষ্টার মাধ্যমে কোনোকিছু আয়ত্ত, অর্জন বা জয় করেনি ওরা।

যা ঘটেছে ওদের মধ্যে, যা দেখে লোকজন মধু-অন্বেষণে ঘোরে ওদের পেছনে, লেগে থাকে আঠার মতো, তা আর কিছুই নয়, স্রেফ প্রকৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে ওঠা।

সন্দেহ নেই, গায়ে-গতরে বড় হয়েছে,—বিশেষ বিশেষ স্থানে মেদ-মাংস লেগেছে, মোহনীয় হয়ে উঠেছে ওরা।

ব্যস্! এ পর্যন্তই।

কিন্তু এ সবই তো ঘটেছে আপনা-আপনি—প্রাকৃতিক নিয়মে। কিছুই তো করতে হয়নি ওদের এ জন্যে।

কিন্তু মেধা বা যুক্তির বেলায় তো সেই কথা খাটে না!

শুধু ঘিলু নিয়ে জন্মালেই চলেনি তাদের, খুলির ভেতর সুরক্ষিত পেলব এই স্নেহজাতীয় পদার্থটিকে আরো জাগ্রত ও উচ্চকিত করে তোলার জন্যে বিভিন্ন রকম সুকুমার বৃত্তি ও তর্কশাস্ত্রের চর্চা ও অনুশীলন করে যেতে হয়েছে অনুক্ষণ।

বাইরের জগৎ থেকে পাওয়া ক্রমাগত অবহেলা ও অবজ্ঞা ভুলে, মেধাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যুক্তি, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে।

খেদ করে কোনো লাভ নেই।

যা ঘটেছে, সেটা ঘটাই স্বাভাবিক।

সাধারণত মানুষের কাছে এর বেশি আশা করা যায় না।

তবে এটি চিরস্থায়ী হবে না।

দৃষ্টি আবার ঘুরবে, শোভা বা যুবার বাইরেও অনুসন্ধান করা হবে অন্যকিছুর, তবে তা এখন নয়।

আরো বছর পাঁচেক পরে।

ধৈর্য ধরে মেধাকে অপেক্ষা করতে বলে যুক্তি।

যুক্তিকে সমর্থন করে বোধি।

যুক্তি ও বোধির পরামর্শে মেধা অপেক্ষা করে সুদিনের জন্যে, যেদিন তার অর্জিত গুণাবলির দিকে চোখ তুলে তাকাবে মানুষ, স্বীকৃতি দেবে তার বিশেষ কলায় অসাধারণ পারদর্শিতার।

চল্লিশ বছরের ব্যবধানে এই একই জায়গায় আবার এসেছে ওরা। শোভা, যুবা, মেধা, যুক্তি ও বোধি।

চল্লিশ বছর আগে সঙ্গে এসেছিল তখনকার দিনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, কমলা। কমলা এসেছিল সাথে, কারণ সেই বয়সে একা আসার সাহস ছিল না, বাড়ি থেকেও অনুমতি মিলত না। এবার আর সঙ্গে লেজুড় আনা হয়নি। জায়গাটা বেশ পাহাড়ি। বন-জঙ্গলে ঘেরা নির্জন এই ডাকবাংলোয় সেবার ওরা যখন এসেছিল, ভয়ে সারারাত ঘুমুতে পারেনি কেউ। ভয়টা অবশ্য মূলত ছিল শোভা আর যুবাকে নিয়েই। সন্ধ্যায় যখন খেতে গিয়েছিল ডাকবাংলো-সংলগ্ন বাঁশের ওই সরাইখানায়, কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন লোক বলা নেই, কওয়া নেই এসে পাশ ঘেঁষে বসেছিল ওদের টেবিলে। যে আয়োজক ওদের এনেছিল এখানে, প্রাকৃতিক শোভা দেখাবার জন্যে, সরাইখানার খাবার টেবিলে ওদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেয়ে, বাকি রাতের জন্যে সে উধাও হয়ে গেছিল এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে যে এ বনের লোকজন বড়ই নিরীহ প্রকৃতির। সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ কম বলেই হয়তো ওরা লোকের ক্ষতি করতে শেখেনি, ওদের নিয়ে কোনো ভয় নেই। আগামীকাল সকালে আবার দেখা হবে বলে বিদায় নিয়েছিল ভদ্রলোক। কিন্তু সে রাতে সরাইখানার টেবিলে গা ঘেঁষে পাশে এসে বসা পুরুষ মানুষগুলোকে তেমন নিরীহ মনে হয়নি ওদের। ভাষা তাদের ভিন্ন, পরস্পরের কথা বোঝা যায় না হয়তো, কিন্তু তাদের চোখ-মুখের আর্তি, আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা, অন্যসব পরিচিত-অপরিচিত ও তথাকথিত সভ্য লোকদের চেয়ে ভিন্নতর কিছু ছিল না। চল্লিশ বছর আগে তখন তারা কৈশোর শেষ করে যৌবন ছুঁই ছুঁই করছে কেবল। সেই সময়েও শোভা আর যুবা বনের এই মানুষদের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে প্রথম প্রথম আহ্লাদিতই হয়েছিল। একটু প্রশ্রয়ও দিয়েছিল বুঝি। যুক্তি ও বোধির সতর্কবাণীতে একসময় তাদের হুঁশ হয়। ততক্ষণে স্থানীয় তাড়ি খেয়ে টলমল দুজন লোক শোভা ও যুবাকে হাত ধরে টানতে শুরু করেছে। মেধা ও যুক্তি লোক দুটোকে বোঝাতে চেষ্টা করে, এটা ঠিক হচ্ছে না। মরিয়া হয়ে মেধা একসময় তাদের গান শোনাবার প্রস্তাব পর্যন্ত দেয়, কেননা আয়োজক ভদ্রলোক জানিয়েছিল, নাচ-গান বড় পছন্দ করে এ বনের লোকজন। গান শুনলে যদি তাদের মতিগতি অন্যত্র ধাবিত হয়, যদি রেহাই দেয় তারা শোভা আর যুবাকে! কিন্তু মেধার কথা শুনে লম্বা লম্বা দাঁত বের করে হাসে লোকদুটি। মেধার প্রস্তাব অবিকল উচ্চারণে পুনরাবৃত্তি করে ওর কাছেই আবার ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু কোনো আগ্রহ দেখায় না গান শোনার ব্যাপারে। যুক্তি ও বোধি টের পায় তাদের ভাষা ওরা ঠিকই বোঝে।

প্রতিষ্ঠিত শিল্পী মেধার গানের প্রতি এতটা অবহেলা বনের বাইরেও কেউ দেখাতে পারে না আজ। অথচ গান-নাচের জন্যে রীতিমতো পাগল এরা কি না মেধাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল! উপায় না দেখে বোধি ও কমলা সরাইখানার মালিকের হস্তক্ষেপ কামনা করলে, কোনোমতে তার মধ্যস্থতায় অক্ষত অবস্থায় সকলে ডাকবাংলোয় ফিরে আসে সে রাতে। বাকি রাত বলাই বাহুল্য পুরোপুরি অনিদ্র কাটে তাদের। বাইরে কোনো শব্দ হলেই মনে হয় এই বুঝি এলো সেই লম্বা লম্বা দাঁতের বিকট হাসির লোকদুটো। যুক্তির অবশ্য এই পুরো ভ্রমণটির ব্যাপারেই আগে থেকে অনেক দ্বিধা ছিল। সতর্ক করে দিয়েছিল সে, এই ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চারে বেরোবার ব্যাপারে, বিশেষ করে সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গায়, পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন এই জঙ্গলে। তার বাড়তি ভয় ছিল যেহেতু এই যাত্রা সদলবলে নয়, কোনো অভিভাবকও যাচ্ছে না সঙ্গে। কিন্তু শোভা, যুবা ও মেধার আগ্রহে, আর বিশ্বাসযোগ্য বন-প্রতিনিধির আশ্বাস ও সহায়তায় বোধি অবশেষে রাজি হয়েছিল, যুক্তির কথা একরকম খণ্ডন করেই। সেই রাতে ঘরের ভেতর ভয়ে আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে অবশ্য সকলেই যুক্তির দূরদর্শিতার প্রশংসা করেছিল। তা সত্ত্বেও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পরেরদিন ঠিকই ওরা বেরিয়েছিল। হাতির পিঠে চড়ে বন, উঁচু-নিচু থ্যাবড়া থ্যাবড়া পাহাড়ি পথ আর পাথরের টুকরো বিছানো হাঁটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবধি টলটলে জলের প্রবল স্রোতঃশীলা নদী পার হয়ে নিকটবর্তী ভারত-বর্ডার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। যেতে যেতে হাতিচালক জোয়ান ছেলে দুটি বারবার ফিরে ফিরে কেবল হস্তী-আরোহিত শোভা আর যুবাকে দেখছিল। শুধু তো তাই নয়, পথে পনেরো মিনিটের বিশ্রামকালে কাছে থেকে হাতির দাঁত দেখাবার নাম করে শোভা আর যুবার হাতের আঙুল থেকে শুরু করে পিঠ এবং মাথায় পর্যন্ত তারা হাত বুলিয়েছিল। অথচ দুটো ছেলেকে দেখলেই মনে হয়, ভাজা মাছটিও উলটিয়ে খেতে জানে না। এ ধরনের অসভ্যতা ও বেলেল্লাপনায় শুধু বোধি, যুক্তি আর মেধাই নয়, বিরক্ত হয়েছিল শোভা আর যুবা নিজেও।

চল্লিশ বছর পরে এবার যখন সেই একই ডাকবাংলোয় এসে ওঠে ওরা, দেখে শুধু ডাকবাংলো নয়, আগের সেই সরাইখানাটিও ঠিক তেমনি রয়েছে। কেবল বাহ্যিক চেহারার জৌলুস বেড়েছে খানিকটা। এবার স্রেফ বেড়াতে আসেনি ওরা। এসেছে আমন্ত্রিত সংগীতশিল্পী মেধার সঙ্গে। মেধা এসেছে তার জন্যে নির্ধারিত একটা কনসার্টে যোগ দিতে। কনসার্টটি ঠিক এখানে নয়। এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে নিকটবর্তী থানার গা ঘেঁষে টিএনওর বাসার সামনে। বিশাল প্যান্ডেল বেঁধে মহা সমারোহে তার আয়োজন চলছে।

গেলবারের মতো এবারও সন্ধ্যার পর সরাইখানায় গেল ওরা। খরিদ্দারদের চেহারা ও পোশাক-আশাক দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, দু-একজন শহুরে লোক ছাড়া বাকি সবাই স্থানীয়। শুধু সরাইখানার ভেতরে নয়, বাইরে আশেপাশে ঘাসের ওপরে বসেও বেশ কিছু পুরুষ-নারী তাড়ি পান করছে। ওদের ঢুকতে দেখে কেউ কেউ এই সন্ধ্যা রাতেই ঢুলু ঢুলু চোখে, কেউ কেউ আবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু এই পর্যন্তই। এর পরে আর কেউ ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে। এমনকি শোভা বা যুবার দিকেও নয়। সরাইখানায় ঢুকে ওরা কোনার দিকে একটি টেবিলে গিয়ে বসে। তারপর প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় ধরে সেখানে বসে পানাহার করে। এবার কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না তাদের দিকে, হাত ধরে টানাটানি করা তো দূরের কথা। কেমন একটা সমীহের দৃষ্টি তাদের চোখে। যুক্তি অবশ্য বলে, সেটা মেধা আর বোধির নিজস্ব কল্পনা। আসলে সম্মান নয়, একটা প্রচ্ছন্ন অবহেলা ও অবজ্ঞা কাজ করছে এই আচরণের পেছনে। বোধি অবশ্য এরকম বহিঃপ্রকাশে বেশ তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। ওরা তো গেলবারের মতো যন্ত্রণা করছে না তাদের!

শোভা ও যুবার দিকে ভালো করে তাকায় বোধি। ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু এখনো যথেষ্ট সুশ্রী। তবে ভালো করে তাকালে বোঝা যায়, প্রসাধনের নিচে চামড়ায় এখানে সেখানে শিথিলতা এসেছে, কপালে পড়েছে দৃশ্যমান ভাঁজ। ঠোঁটের দুই পাশে গাল ও চিবুকের মাঝখানে একাদশীর চাঁদের মতো বাঁকা রেখা এখন স্পষ্ট। হাসতে গেলে রেখা দুটো আরো গভীর, আরো পরিষ্কার হয়। চোখের ওপরে আর ভুরুর নিচের ছোট্ট মাংসপেশি ঋজুতা হারিয়ে কিছুটা ঝুলে পড়েছে চোখের পাপড়ির ওপরে। টেবিলের ওপর রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত দুটি অনুসরণ করে বাহু পর্যন্ত এলে লক্ষ করা যাবে, বাহুর মাংসপেশি আগের মতো পেলব আর দৃঢ় নেই। চামড়া থেকে মাংস আলাদা হয়ে এসেছে ওপরের বাহুতে। আসলে চামড়া আর মাংসের মাঝখানের বেশ খানিকটা মেদ গেছে উধাও হয়ে। ফলে টেবিলে হাতজোড়া রাখার জন্যে বাহুর যে অংশটা শূন্যে ঝুলে আছে, সেখানে মেদ-মাংসহীন কিছুটা পাতলা চামড়া তির তির করে নড়ছে বাতাসে। ক্রিম মাখার পরেও হাতের ওপরকার চামড়ার শুষ্কতা কমেনি। সেখানে হানিকম্বের ডিজাইনে সহস্র ছোট ছোট ভাঁজের চিহ্ন।

খেয়েদেয়ে ডাকবাংলোয় ফেরে ওরা একটা ফুরফুরে মন নিয়ে। আগেরবারের মতো সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা নেই, এই বুঝি ওরা এলো, এই বুঝি কেউ কাছে এসে সখ্যের নামে হাত দুটি জড়িয়ে ধরল। এবার ট্রেনে আসার সময়ও খুব নিঃসংকোচে দাপটের সঙ্গে আসতে পেরেছে ওরা। সেকেন্ড ক্লাস বগির অন্য লোকগুলো বিরক্ত করেনি আগেরবারের মতো। যুক্তি ও বোধি ভাবে, পুরুষদের স্বাধীনভাবে দিনে-রাত্রে যেখানে খুশি সেখানে চলাফেরার অধিকার ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে একদিন যে ঈর্ষান্বিত ছিল তারা, সেই অধিকার, সেই গ্রহণযোগ্যতা অবশেষে আজ নিজেরাই অর্জন করেছে তারা। সর্বক্ষণ নিজের শরীরকে পাহারা দিতে হয় না আর। এ জন্যে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে যদিও। সত্যি বলতে কী, শোভা বা যুবার চাইতে মেধার গানের প্রতি লোকের আগ্রহ অনেক বেশি এখন।

মুক্তির আনন্দে ভরপুর পঞ্চমা ডাকবাংলোর বারান্দায় চেয়ার টেনে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকে। খোলা দখিনা বাতাস লুটোপুটি খায় ওদের চুলে, শাড়ির আঁচলে, পায়ের পাতায়। এই স্বাধীনতা-বোধ, এই মুক্তির আনন্দ এর আগে এমন করে কখনো অনুভব করেনি ওরা। যে শরীর এতদিন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অনেক হালকা লাগছে আজ। প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে চোখ বোজে ওরা।

রাত্রি শেষ হতে চলল। কিন্তু ঘরের ভেতরে যাবার নাম নেই। বারান্দার বেতের চেয়ারে ওভাবেই বসে থাকে ওরা। পাশ দিয়ে কথা বলতে বলতে অথবা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে স্থানীয় লোকেরা ঘরে ফিরছে। দেখতে দেখতে শেষ লোকটিও ঘরে ফিরে গেল। তারপরেও বসে রইল ওরা। মেধা তার গানের খাতাটি নিয়ে আসে, তারপর একটার পর একটা গান গেয়ে যায় যেগুলো আগামীকাল টিএনওর বাসার সামনে প্যান্ডেল করা বিশাল জলসায় গেয়ে লোকদের মাতিয়ে দেবে মেধা।

হঠাৎ একটা কথা মনে আসে, অদ্ভুত একটা কথা মনে আসে বোধির। না, আগের সেইসব দুঃসহ অভিজ্ঞতার কিছুই ভোলেনি তারা। যেখানেই গেছে, যা-ই করেছে সবসময় ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়েছে। স্বাভাবিক হতে পারেনি। বিশেষ করে কোনো ভিড়ে, পালাপার্বণে, রেলস্টেশনে, সিনেমা বা নাটক শেষে গেট দিয়ে বের হবার পথে। সুযোগ পেলেই শরীরের বিশেষ স্থানে কারো না কারো হাত পড়বেই, ভিড়ের চাপে যাকে ধরার কোনো উপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। আর অন্য সময়, দৈনন্দিন জীবনে, আর কিছু না পারুক, ঐসব লোক কতবার যে শুধু দৃষ্টি দিয়ে, মুখগুলোর অভিব্যক্তি দিয়ে একেবারে কেটে-ছিঁড়ে খেতে চেয়ে ওদের! সব সত্ত্বেও মনে হয়, একান্ত চুপিচুপি করেই কথাটা মনে আসে, আহা, যদি কোনোভাবে আবার চল্লিশ বছর আগের সেই দিনটিতে ফিরে যাওয়া যেত!

শোভা, যুবা, মেধা ও যুক্তি, প্রত্যেকে বৈচিত্র্যময় শ্বাসরুদ্ধকর সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে না। নিজেদের গুটিয়ে তারা বোধির এই অন্তিম বাসনার কাছে পুরোপুরি সমর্পিত হতে চায়।

সকাল বেলা ডাকবাংলোর মালি এসে দেখে, মেমসাব ঘুমিয়ে আছে বারান্দার চেয়ারে। তার দীর্ঘ চুল উড়ছে বাতাসে। তার দুটো হাত টেবিলের ওপরে উপুড় করে রাখা। চেয়ারে বসে সেই হাতের ওপরে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে আছে মেমসাব। তার শূন্যে ঝুলন্ত বাহুর কিছুটা অংশ থেকে মেদ-মাংস আলাদা হয়ে যাওয়ায় পাতলা একটা চামড়ার পর্দা বাতাসে তিরতির করে নড়ছে। টেবিলের অন্য পাশে খোলা গানের খাতাটা উলটো করে রাখা। গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে মেমসাব। পুরোনো মালি। বহুকাল এখানে কাজ করে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবে মালি, এমন সুন্দর গতর, এমন মিষ্টি গানের গলা আর এতসব বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণ নিয়ে সারাটা জীবন এভাবে একা একাই পার করে দিল মেমসাব!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী নির্যাতন : দেহে-মনে

সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার নারী

একবিংশ শতাব্দীকে আমরা বরণ করেছি রাজধানী ঢাকায় প্রকাশ্যে নারী-লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। যে-আনন্দোৎসব নতুন বছর, নতুন শতক, নতুন সহস্রাব্দকে স্বাগত জানাবার জন্যে আয়োজিত হয়েছিল, সে উৎসবে যোগ দিতে এসে একদল সমবয়সী পুরুষের হাতে নির্যাতিত হলো একটি মেয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে বড়কর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও অন্যান্য বড় বড় কর্মকর্তা অপরাধীর চেয়ে অপরাধের শিকারকেই দোষী করতে চাইলেন সর্বাগ্রে। এ দেশে, এ সমাজে নারীর চলার গণ্ডি যে সীমিত তা কি মেয়েটি জানত না? হয়তো জানত, হয়তো নয়, হয়তো জেনেও মানতে চায়নি। আর এই না-মানাজনিত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই নারীর স্বাধীন চলাচল —মুক্ত ও স্বাচ্ছন্দ্য গতি একদিন স্বীকৃতি পাবে। যেমন পেয়েছে তার শিক্ষার অধিকার, জীবিকা অর্জনের অধিকার। এর জন্যে একজন দুজনকে দিতে হবে আত্মাহুতি অথবা চরম মূল্য।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশে নারীর ওপর সহিংসতা ও নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ বিষয়ে আইনের কিছু সংযোজন ও কড়াকড়ি কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অদক্ষতা, আপামর জনসাধারণের অসচেতনতাজনিত অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মানসিক দৃঢ়তার ঘাটতি, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা ও পক্ষপাতিত্ব দিনের পর দিন এ অবস্থার অবনতি ঘটাচ্ছে। নারীর ওপর সহিংস আচরণ শুধু বাইরে অপরিচিত পুরুষ দ্বারাই ঘটছে না, নিজের ঘরে পরিচিত পরিবেশেও অহরহ সেটা ঘটে চলেছে স্বামী অথবা শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের দ্বারা, যাদের মধ্যে পুরুষ-নারী উভয়েই রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর ওপর প্রধান প্রধান সহিংসতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এ দেশে। তথ্যগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে পরিবেশিত হলো :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাল	ধর্ষণ	যৌতুকজনিত মৃত্যু	এসিড নিক্ষেপ
১৯৯৭	৭৪৯	৬৬	১১০
১৯৯৮	১০২৭	৮৩	১০১
১৯৯৯	৯৫২১	৯৬	১৭৮

সাম্প্রতিককালের (দ্য বাংলাদেশ টুডে, জুলাই ৭, ২০০৮) এক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নারীর প্রতি নৃশংসতা ভয়াবহভাবে বেড়ে গিয়েছে। কেবল বিগত ছয় মাসেই ৫৬৭ জন নারীকে বিভিন্নভাবে হত্যা করা হয়েছে। এর ভেতর ৬৬ নারীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। ৯৯ জনকে মারা হয়েছে যৌতুকের জন্যে। বাকি ৪০২ জন বিবিধ কারণে জীবন দিয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবে বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেত্রীদের দ্বারা আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়। তাঁরা জানান, এই ৫৬৭টি হত্যা ছাড়াও ৫৭ জন নারীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, যার কোনো কারণ জানা যায়নি। এ ছাড়া ১৩৫ জন নারী আত্মহত্যা করেছে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে। হত্যা ছাড়াও এ সময় বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় যে মেয়েরা তার একটা আংশিক তথ্য তুলে দেওয়া হলো নিচে :

AMARBOI.COM

নির্যাতনের রকম	**নারীর সংখ্যা**
যৌন নির্যাতন	১৯০
গণধর্ষণ	৭৩
মারধর	৫৮
এসিড নিক্ষেপ	৪৯
আগুন দিয়ে পোড়ানো	২২
অপহরণ	৫৫
জোর করে যৌনকর্মে নিয়োগ	১০
যৌতুকের জন্যে অত্যাচার	৪৯
প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন	১৫৫
পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন	৮
জোর করে বিয়ে দেয়া	২
ফতোয়ার শিকার	১৩
গৃহকর্মীর ওপর অত্যাচার	২৭

এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে ও স্কুলে নারীদের ওপর যৌন অবদমন ও অত্যাচারের ঘটনা ঘটে অহরহ। এসব অত্যাচার সইতে না পেরে ৩০ জন ছাত্রী গত পাঁচ বছরে আত্মহত্যা করেছে। এসবই ঘটেছে যখন প্রত্যাখ্যাত পুরুষদের প্রদর্শিত ভয়, হুমকি ও অপমান অসহনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। কোনো কোনো ছাত্রী তাদের শিক্ষকদের লালসার শিকার হতেও বাধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। অন্যান্য জায়গাতেও নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারছে না — প্রায়ই তারা যৌন নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত নারী নেত্রীরা এই সংবাদ সম্মেলনে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত ও কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও কর্মস্থানে যৌন নির্যাতনের শিকারদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্যে নির্ধারিত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। এছাড়া সাংবাদিক, সামাজিক কর্মী, নেতা ও সুশীল সমাজের কাছে দাবি করেন, যাতে তারা সকলে সমাজে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে, প্রতিবাদী হতে সাহায্য করে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ধর্ষণকারীদের ভেতর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পুলিশ বিভাগে কর্মরত সরকারি কর্মচারী। এদের সংখ্যা ১৯৯৭ সালে ছিল ছয়, ১৯৯৮তে ষোল এবং ১৯৯৯-এ দশ। এসিড নিক্ষেপের মতো বর্বর ও হিংস্র একটি অপরাধ, ভয়াবহতার দিক দিয়ে অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে যার তুলনা করা যায় না — ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। এসিডসংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি অপরাধই ঘটে ব্যর্থ, পরাজিত প্রেমিকের হিংস্রতা ও প্রতিশোধস্পৃহা থেকে। হত্যা না করেও মুহূর্তের মধ্যে ফুটফুটে একটি নারীর গোটা চেহারাকে স্থায়ীভাবে কতটা বিকৃত করে ফেলা চলে, তার দৃষ্টিশক্তিসহ অন্য কত ক্ষমতা ও সম্ভাবনা হরণ করা যায়, তার ব্যাপকত্ব চিন্তার বাইরে। সাম্প্রতিককালে এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এরকম কয়েকটি মেয়ে স্পেন থেকে চিকিৎসাশেষে দেশে ফিরে এসেছে। ছয় থেকে নয় মাস একের পর এক প্লাস্টিক সার্জারির পরও তাদের চেহারায় যেরকম স্থায়ী বিকৃতি রয়ে গেছে, তাতে তাদের ওপর সহিংসতার প্রাথমিক পর্যায়ে কী হয়েছিল অনুমান করতে কষ্ট হয় না। ব্রিটেনের সাধারণ মহিলাদের অর্থানুকূল্যে এইসব হতভাগা মেয়ের জন্যে একটি নিরাপদ চিকিৎসালয় ও বিশ্রামাগার করা হয়েছে রাজধানীর একটি অভিজাত অঞ্চলে, যেখানে থেকে তারা দীর্ঘ চিকিৎসা পেতে পারবে। কোনো প্রেস নয়, মন্ত্রী নয়, টেলিভিশন ক্যামরা নয় — নিতান্ত ঘরোয়াভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি চালু হলো কিছুকাল আগে শুধু তাদের নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান সরাসরি এসিড নিক্ষেপের শিকারদের নিয়ে কোনো না কোনোভাবে কাজ করে। মেয়েদের নিরাপত্তার খাতিরে বাড়িটির সামনে কোনো সাইনবোর্ড রাখা হয়নি। এইসব এসিডে পোড়া ক্ষতবিক্ষত মেয়ের জন্যে শুধু চিকিৎসার সুন্দর ও উন্নত ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্ন বিছানাসহ থাকা-খাওয়ার জায়গাই করা হয়নি, বিষণ্নতায় যাতে তারা না ভোগে সেজন্যে সাদা দেয়ালজুড়ে এঁকে দেয়া হয়েছে বড় বড় দেয়ালচিত্র — উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ রঙে। আমরা বাঙালিরা যা পারিনি বা করিনি, ওরা বিদেশিরা তাই করছে আমাদের এই দুর্ভাগা মেয়েগুলোর জন্যে। অথচ অপরাধটা একেবারেই দেশীয়। কবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কোন ব্যর্থ প্রেমিক একদিন রাগের মাথায় প্রেমিকার মুখে এসিড ছুড়ে দিয়েছিল, তার পর থেকে এটা আজ মহামারীর মতো, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে — গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র। প্রতি বছর এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অপরাধীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এসিডের ব্যবহার ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত করলে কিছুটা সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সে ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।

নারীর ওপর সহিংসতার স্বরূপ আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখা গেছে, এর একটি বিরাট অংশই ঘটে চলেছে পরিবারের অভ্যন্তরে। গৃহে সংঘটিত অর্ধেকেরও বেশি মারাত্মক অপরাধের কথা কখনো কেউ জানতে পারে না। নীরবে চলে এই নির্যাতন — দিনের পর দিন। ঘরের ভেতর নির্যাতিতদের অধিকাংশই নারী, বেশির ভাগের বয়স তিরিশের নিচে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম জায়গা-জমি দখলসংক্রান্ত মারামারি ও হত্যা — যেটা পুরুষদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি। গৃহে নির্যাতিত নারীর অধিকাংশই বিবাহিত (৮৫%)। শহরের উচ্চবিত্তদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এর উপস্থিতি কম হলেও অনুপস্থিত নয়। অশিক্ষা, বেকারত্ব অপরিসর জায়গায় বসবাসের সঙ্গে পারিবারিক নারী নির্যাতনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা গেছে। যে পরিবারের নারীরা নির্যাতিত, বিয়ের অব্যবহিত পর থেকেই সাধারণত সেই নির্যাতন শুরু হয়। লরি হেইস ও মেরি এলসবার্গের একটি গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, পারিবারিক সহিংসতায় শারীরিক নির্যাতন প্রায় কখনো বিচ্ছিন্নভাবে আসে না। এর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে আরো গভীরে প্রোথিত মানসিক ও অনেক ক্ষেত্রেই যৌন নির্যাতন। শারীরিক নির্যাতিতদের ৫০ ভাগই যৌন নির্যাতনেরও শিকার, শতকরা ৯৭ ভাগ মানসিক নির্যাতনের শিকার। বহুজাতিক এ গবেষণাপত্রে তাঁরা দেখিয়েছেন, জগৎজুড়ে ১৬%-৫০% মেয়ে তাদের পুরুষ সঙ্গী দ্বারা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের একটা বিরাট অংশ (৩%-২০%) শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। আমাদের দেশেও মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর একটি উল্লেখযোগ্য (১৪%) কারণ গর্ভাবস্থায় সহিংসতা। মেয়েরা কেন গর্ভাবস্থায় এ ধরনের শারীরিক নির্যাতনের বিশেষভাবে শিকার হচ্ছে তা বলা শক্ত। তবে এ সময় শারীরিক অবস্থার কারণে ঘরসংসারে ও ক্ষেতে-খামারে তার কাজের শ্লথগতি, বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা, যৌনসম্পর্কে অনুৎসাহ, নতুন প্রাণ সংযোজনের আশঙ্কায় গৃহস্বামীর দুশ্চিন্তা ইত্যাদি অনেক কারণ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন মেয়েদের সবচেয়ে যত্নের ও বিশ্রামের দরকার তখনই তারা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হচ্ছে। একটি নতুন জীবন আনতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে।

গৃহে নির্যাতন শুধু যে গরিব অশিক্ষিত পরিবারে বা অনুন্নত সমাজে ঘটছে তা নয়। বহু শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারেরও তা অবিরাম ঘটে চলেছে। জাপানের মতো উন্নত ও ধনী দেশেও এর প্রকোপটা খুব বেশি। একটি গবেষণায় পাওয়া গেছে, শতকরা ৫৭ ভাগ জাপানি মেয়ে জীবনে কোনো না কোনো সময়ে শারীরিক, যৌন ও মানসিক—এই তিন নির্যাতনেরই শিকার হয়েছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমা অনেক দেশেও এর প্রকোপ বিস্ময়কর। ফলে শুধু অবস্থার নয়, অবস্থানেরও পরিবর্তন দরকার। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কেবল বাহ্যিক অবকাঠামো তৈরি করে। এতে প্রাণ সঞ্চার করতে হলে চাই সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন—নারীকে সম্মান ও মূল্য দেবার দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন।

হেইস ও এলসবার্গের গবেষণায় আরো দেখা গেছে, প্রজনন-স্বাস্থ্যের ওপর সহিংসতার কী নিদারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। যেসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এর কুফল পরিলক্ষিত হয় তা হলো, জন্মনিরোধকের ব্যবহার, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার, কিশোরীদের বিশেষ করে অবিবাহিত কিশোরীদের — গর্ভধারণের হার, ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের প্রকোপ, এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌন রোগের প্রকোপতা, অবাঞ্ছিত সন্তান ধারণ ও প্রসবের হার ও স্বল্প ওজনের সন্তান প্রসবের আধিক্য। ফলে দেখা যায়, সহিংসতা শুধু সরাসরি শারীরিক জখমই করে না, ধূমপান ও অতিরিক্ত মদ্যপানের মতো একটি বাড়তি ঝুঁকি হিসেবে সাধারণ স্বাস্থ্যে ও বিশেষ করে প্রজনন-স্বাস্থ্যে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার মেয়েরা বিষণ্নতা ও হতাশার কারণে জীবনবিমুখ হয়ে পড়ে, যার সবচেয়ে বড় প্রতিফলন ঘটে প্রজনন-স্বাস্থ্যে তাদের অবহেলার মধ্য দিয়ে। হয়তো নির্যাতনকারীর সঙ্গে এ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আবিষ্কার করে মেয়েরা।

একবিংশ শতাব্দীতেও পুরুষসঙ্গী কর্তৃক নারীর ওপর এই যে শারীরিক নির্যাতন আজো চলছে, চলতে পারছে তার বড় কারণ আশপাশের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা ও দায়িত্বশীল প্রতিবেশীসুলভ আচরণ গ্রহণে দ্বিধা বা অনাগ্রহ। অধিকাংশ সমাজেই আজো এ ধরনের অত্যাচারকে 'পারিবারিক অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে মেনে নেয়া হয়। কোনো কোনো সমাজে আবার একে শাসনের জন্যে অথবা সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে ধরে নেয়া হয়। কোন্ কোন্ গাফিলতি, অন্যায় বা বেয়াদবির জন্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পেটানো মেনে নেয়া যায় এই প্রশ্ন করলে মিসরের স্বয়ং মেয়েদেরই ৭০% বলেছে, যৌনসঙ্গমে রাজি না হওয়া তেমন একটি কারণ। এদের মধ্যে ৬৯% বলেছে, অবাধ্য হলেও পেটানো চলে। ঘানার মেয়েরাও বলেছে (৪৩%) যৌনসঙ্গমে আপত্তি করলে স্ত্রীকে পেটানো যুক্তিসংগত। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডে পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যেই মাত্র ১% বলেছে, যৌনসঙ্গমে অনীহা বা অবাধ্য হওয়ার জন্যে বউ পেটানো চলে। নিকারাগুয়াতেও অপেক্ষাকৃত কম লোক (১০%) এসব কারণে বউকে মারার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ফলে দেখা যায় শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও নারীদের অবস্থান উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন বা মুখর নয়।

যেসব মেয়ে শিশু যৌন ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার, তারা দেখা গিয়েছে বড় হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ওপর পুনঃপুন নির্যাতন — বিশেষ করে তা যখন ঘটে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা, তাদের ভালোমন্দের বোধকে ধোঁয়াটে ও মলিন করে দেয়। নিজেদের ওপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আস্তে আস্তে কমে যায়, নিজেদের ক্ষমতায়, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে হয়ে পড়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত-সংশয়ী। অতি সহজেই তারা অন্য আরো অনেকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ে। এক গবেষক মন্তব্য করেছেন, 'এইসব মেয়েরা জানে না কখন এবং কার জন্যে কাপড় খুলবে সেটা তাদের নিজেদেরই ঠিক করার কথা। তারা মনে করে, অন্য যে-কেউ যখন খুশি তাদের কাপড় খুলতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের যেন কিছুই করার নেই।' ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এদের কেউ কেউ চলে যায় পতিতালয়ে, কারো কারো ভাগ্যে জোটে পাচার হওয়া ও পরবর্তী পাশবিক নির্যাতন। গৃহে ও গৃহের বাইরে সহিংসতা ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর এই চরম সামাজিক অবমূল্যায়ন, অর্থাৎ পতিতাবৃত্তি ও পাচারকৃত হওয়ার জন্যেও অনেকাংশে দায়ী।

কেন ঘটে গৃহে এই সহিংসতা? এর পেছনে বহু আর্থসামাজিক, মনোজাগতিক বিশ্লেষণ রয়েছে — থিওরি রয়েছে। কোনোটিই এককভাবে জনসমর্থন পায়নি। আক্রমণকারী এক বিশেষ রোগের শিকার এই মতবাদ বহুল প্রচারিত হলেও অনেক সময় মেডিক্যাল শাস্ত্র আক্রমণকারীর শরীরে বা মনে অন্য কোনো জটিলতার সন্ধান দিতে পারে না। দ্বিতীয় থিওরিটি দিয়েছেন ফ্রয়েড নিজে। তাঁর মতে, মেয়েদের শিশ্নহীনতাজনিত হীনম্মন্যতার কারণেই তারা স্বামীদের প্ররোচিত করে নিজেদের লাঞ্ছিত করার জন্যে, কেননা তারা মনে করে এটা তাদের প্রাপ্য। অন্যদিকে পুরুষরা আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয় তার শিশ্ন রক্ষা ও নিরাপত্তার খাতিরে। এই থিওরিকে এখন প্রায় কেউ স্বীকার করে না। আরেকটি মতবাদ বলে, হতাশাজনিত কারণে কখনো কখনো মানুষ আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয়। কিন্তু হতাশার বহিঃপ্রকাশ বউ পেটানোতেই কেন ঘটতে হবে সে-প্রশ্নের জবাব নেই। সত্তরের দশকে স্ট্রস একটি থিওরি দেন; তাঁর মতে দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের মতো নেতিবাচক বিষয়গুলো মানুষকে প্ররোচিত করে গৃহে নির্যাতন ঘটাতে। অন্যদিকে পারিবারিক সদস্য ও প্রতিবেশীদের সহমর্মিতা, সহযোগিতা, পরামর্শ ও পারস্পরিক মঙ্গলের জন্যে উন্মুখ আচরণ সহিংসতার বিপক্ষে কাজ করে, অর্থাৎ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ফলে পারিবারিক সহিংসতা শুধু একটি ব্যক্তি-আচরণ নয়, এটি একটি সমষ্টিগত ও সামাজিক অবকাঠামোর ব্যাপার। সত্তরের দশকে বান্দুরার আরেকটি থিওরি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তা হলো — মানুষ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা শেখে, সেই রকম আচরণেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে যে-পুত্র বাবাকে ছোটবেলায় দেখেছে মাকে ধরে মারতে, সে সেই সময় মায়ের জন্যে যতই দরদি থাক না কেন, ভবিষ্যতে স্বামী হয়ে স্ত্রীকে পেটাতে সে কোনোই দ্বিধা করে না, বরং তার কাছে এটা অতি গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক মনে হয়। কেননা সে জানে এবং সে দেখেছে কত তুচ্ছ কারণে তার বাবা তার মাকে ধরে অনায়াসে পিটিয়েছে। এই থিওরি অনেকেই মেনে নিলেও এটি কখনো উত্তর দেয় না — কেন এই পরিবেশে বড় হওয়া সত্ত্বেও সব পুরুষই স্ত্রীকে ধরে পেটায় না। অন্য একটি থিওরির মতে, পুরুষ যেহেতু কর্তৃত্ব করতে চায়, আর সেটা করতে চায় পরিবারের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের মাধ্যমে, যখন সে সম্পদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন সে তার শারীরিক শক্তি প্রয়োগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে স্ত্রীর বশ্যতা আদায় করতে চায়। পিতৃতান্ত্রিক আরেকটি থিওরি অনুযায়ী অবশ্য পুরুষতন্ত্রের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ নারীর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সামাজিক অবস্থিতিকে প্রতিষ্ঠার জন্যেই নারীর প্রতি পুরুষের শারীরিক নির্যাতনের এই সূচনা। গেলেস ১৯৭৪ সালে বিনিময় থিওরি প্রবর্তন করেন। এই থিওরি অনুযায়ী — প্রতিটি সম্পর্ক এক ধরনের দেয়া-নেয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত; বেশির ভাগ সময়েই এই বিনিময় ভাব-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সমর্থন ইত্যাদি অবৈষয়িক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু কখনো কখনো তা পূর্ণ বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েও ঘটে থাকে। প্রত্যাশিত যৌতুকের জন্যে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বধূ নির্যাতন বা বধূহত্যা অথবা যথেষ্ট যৌতুক পেলে বউকে সমীহ করা এই থিওরি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চললেও অন্য অনেক নির্যাতনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। সবশেষে ১৯৭১ সালে ওয়াকারের বৃত্তাকার থিওরি অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভালোবাসা ও ঘৃণা বৃত্তাকারে ক্রমাগত ওঠানামা করে বলেই ঘটে এই পারিবারিক সহিংসতা। এই বৃত্তাকার পরিমণ্ডলে প্রথমে দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ধীরে ধীরে বিরোধ জমাট বাঁধতে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তার বিস্ফোরণ ঘটে। তখন স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নিগৃহীত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে স্বামী অনুতপ্ত ও প্রবল ক্ষমাপ্রার্থী। ধীরে ধীরে ভালোবাসা ঘৃণার জায়গা দখল করে। তখন স্বামী অতি কাতর, অতি নরম হয়ে পড়ে। স্ত্রীও ক্ষমার মধ্য দিয়ে শান্ত হয়ে আসে। একটা স্থিতিশীল সমাহিত পরিস্থিতি চলে কিছুকাল। তারপর আবার বৃত্তাকারে পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এই থিওরি সহিংসতার প্রকাশ ও স্বরূপ বর্ণনা করলেও ভালোবাসা ও ঘৃণার ক্রম উত্থান-পতন ও বৃত্তাকারে চলাচলের কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা দেয় না।

তবে কারণ যেটাই থাক, শারীরিক-মানসিক নির্দিষ্ট কোনো রোগ এর জন্যে দায়ী হোক বা না হোক, মেয়েদের ওপর এ লাঞ্ছনা, এ নির্যাতন ও সহিংসতার অবসান একান্তই জরুরি। নীরব সংস্কৃতির সভ্য সদস্য সেজে পরিবারের বা প্রতিবেশীদের এই যে নিশ্চুপ আচরণ, একে আমরা সমর্থন করি না। এ ধরনের সমস্যা পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমাদের অনুচিত। একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের যেমন কর্তব্য এই অন্যায়ের বিরোধিতা করা (শারীরিক নির্যাতন কোনো অপরাধেরই শাস্তি বা সংশোধনের উপায় বলে বিবেচিত হতে পারে না), তেমনি দায়িত্বশীল চিকিৎসকের উচিত সৎসাহসের সঙ্গে সময়মতো নির্যাতিতকে পরীক্ষা করে সঠিক রিপোর্ট পেশ, আইনশৃঙ্খলায় নিয়োজিত ও বিচার বিভাগীয় লোকের উচিত সততা, সদিচ্ছা ও সহমর্মিতার সঙ্গে প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি প্রদান। তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধী অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা চলবে, অন্যথায় সে জেলে বসবাস করবে। ঘরে বা বাইরে থেকে ক্রমাগত নারী-নির্যাতনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তাকে দেয়া যায় না—দেয়াটা গুরুতর অপরাধ। আমাদের নীরব থাকার দিন শেষ হয়ে এসেছে। নারীর প্রতি সহিংসতা এখন আমার-আপনার সকলের সমস্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বেগুনি টিউলিপ

তাপ কমে এলে, দিনের আলোর উজ্জ্বলতা ম্লান হলে, ছড়ানো পাপড়ির বেগুনি ফুলটি আস্তে আস্তে লজ্জাবতী নারীর মতো নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এক লাফে সম্পূর্ণ এক পর্ব পিছিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কেমন করে যেন কমিয়ে ফেলে নিজের বয়স। পূর্ণযৌবনা নারীর বিকশিত রূপ পরিত্যাগ করে সে আবার অধরা ষোড়শীর মতো আধফোটা, অনূঢ়া, অপরিণত, কৈশোরিক এক রূপ গ্রহণ করে, কেবল রাত্রিটুকুর জন্যে। অন্ধকার কেটে আলোর আভাস দেখা দিলে তার প্রস্ফুটিত ও পূর্ণ সৌন্দর্য পুনরায় দৃশ্যমান হয়।

'এটা কী?'

বাগানের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে অকস্মাৎ ভারী গলায় শামীমের কণ্ঠ সচকিত করে তোলে বাণীকে। এই প্রশ্ন, এই কৌতূহল, এই আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে সারাদিন ধরে কত কী-ই না করেছে বাণী। কিন্তু কিচ্ছু লাভ হলো না তাতে। শামীমের 'এটা কী' প্রশ্ন বাণীর একান্ত নিজস্ব এক ফালি জমিকে, — নিশ্চিন্তে এবং প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেবার মতো সামান্য কয়েক ফোঁটা খোলা নির্মল হাওয়াকে মুহূর্তে কেড়ে নিল তার কাছ থেকে। বাণী বুঝতে পারছে, তিল তিল করে গড়ে তোলা তার আনন্দের ছোট্ট টিপিটার ওপর মারাত্মক এক আঘাত আসছে। হয়তো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়বে তা, শুকিয়ে যাবে তার অসীম পুলকের উৎস, নির্বাপিত হবে চোখের তৃপ্তি—বাগানবিহারী গাঢ় বেগুনি পুষ্পের অতি-পরিচিত নিষ্পাপ অবয়ব।

বাণী ভেবেছিল, রোদ থাকতে থাকতে যদি এখানে এসে পড়ে তারা, এই বাগানের যে অরূপরতনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে অসীম আনন্দে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে — সে লালচে গাঢ় নীলের অপরূপ কান্তিকে নিবিড় তন্ময়তার বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে তার মন, শামীমের চোখ তা কিছুতেই এড়িয়ে যাবে না। আর তা না গেলে সঙ্গে সঙ্গেই খটকা লাগবে, যা জন্ম দেবে হাজারো প্রশ্নের। বাণীর ব্যাপারে কিছু একটা বিচ্যুতি — কোনো একটা ত্রুটি টের পেলে বরাবর যেমন হয়, এবারও তেমনি শামীমের মুখ থেকে প্লাবিত হতে থাকবে অভিযোগ-অনুযোগের খরস্রোতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্যা। আশেপাশে কে আছে, কারা শুনতে পাচ্ছে, কী ভাবছে তারা, এসব কোনোকিছু খেয়াল না করে, খোলা মাঠেই বাণীকে সজোরে চেপে ধরবে শামীম, বাধ্য করবে প্রকাশ করতে তার এই বিশেষ আগ্রহের বস্তুটি, নবলব্ধ সম্পদটি কোথা থেকে এসে জুটেছে এখানে, মানে তাদের বাগানে, যেখানে সবজি ছাড়া আর কিছু থাকার কথা ছিল না।

গাঢ় সবুজ রঙের ভারী পাতাসহ, দেখতে অনেকটা ছোট কলাগাছের মতো — মাত্র সাত-আট ইঞ্চি লম্বা চারাগাছটির ঠিক মাঝখান দিয়ে ওপরের দিকে সোজা উঠে যাওয়া কালচে লম্বা ডগার শেষ মাথায় এক অপূর্ব বেগুনি সৌন্দর্য। অপরিচিত হলেও এটি যে এক ধরনের দুষ্প্রাপ্য ফুল, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে সময় লাগবে না শামীমের। বড় গলায় তার মতামত জাহির করতে তাই আর দ্বিধা হবে না তখন। স্পষ্ট জানিয়ে দেবে, এই জায়গাটি, তরকারির জমিটি, এই ধরনের ফ্যান্সি কিছু রোপণের জন্যে যথার্থ স্থান নয়। তাছাড়া বাণীর সঙ্গে অন্যরকম অঙ্গীকার ছিল শামীমের — এই টুকরো জমিখানি ব্যবহারের ব্যাপারে। বাণী তা অস্বীকার করে না। তবে শেষ পর্যন্ত সে তার কথা রাখেনি বা রাখতে পারেনি।

দুপুরের পর থেকেই আজ ঘরে বসে বসে বাণী প্রতীক্ষা করছিল সূর্যটা পশ্চিমের দিকে কখন খানিকটা হেলে পড়বে, সেই আশায়। সূর্য যখন মধ্যগগনে, পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত লালচে আভাযুক্ত গাঢ় নীল রঙের ফুলটির ঠিক মাঝখানে হলুদ পরাগ রেণুর মুকুট মাথায় নিয়ে সাদা সুতার মতো কেশরগুচ্ছ বেগুনি পাপড়িগুলোকে আরো যেন জীবন্ত করে তোলে। বাসন্তী হাওয়ায় ফেঁপে ওঠা রোদে শুকনো সুতি কাপড়ের মতো ঈষৎ ফোলা ফোলা অর্ধবৃত্তাকার রঙিন পাপড়িগুলো গায়ে গা লাগিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একত্রে একটি চিমনির আকারে পরিণত হয়। আর সেই রঙিন চিমনি তখন সূর্যের আলোকে অন্তঃপুরে ধারণ করে এমন চমৎকারভাবে চিকমিক করে ওঠে যে তা অনায়াসে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এখন, এই বেলাশেষে, অনালোকে, অর্ধেক সৌন্দর্য আর বেশির ভাগ রঙের ঔজ্জ্বল্য নিজের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে, অঞ্জলির ভঙ্গিতে বুজে যাওয়া কালচে মাজা-নীল রঙের ফুলটির পক্ষে হয়তো আর সম্ভব হবে না নজর কাড়ার, শামীম কিংবা মৌমাছির। ফলে, বাণী মনে মনে ভাবে, কুমড়া ও লাউয়ের মাচায় ডজন ডজন উজ্জ্বল হলুদ আর ধবধবে সাদা ফুলের মাঝখানে একটি মাত্র ব্যতিক্রমী বেগুনি রঙের কুঁড়ি নিশ্চয় তখন এতখানি দৃষ্টিনন্দন হয়ে উদ্ভাসিত হবে না, যে তা শামীমের চোখে দর্শনীয়ের মর্যাদা পাবে, বিশেষত এই বেলাশেষে — বলতে গেলে সন্ধ্যাবেলায়। আলোর যথেষ্ট অপ্রতুলতায়, বাগানের দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে একাকী দণ্ডায়মান টিউলিপের কলিটি, তাও আবার গাঢ় বেগুনি রঙের, হয়তো আদৌ নজরে পড়বে না শামীমের। আর পড়লেও, তা পড়বে এত দেরিতে, তখন ঘরে ফেরার তাড়ায়, সে নিশ্চয় আলাদা করে কিছু ভাবার সুযোগ পাবে না আর। বাণী অন্তত সেরকমই ভেবেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বাইরে বেরোবার জন্যে তাই তার কোনোরকম ব্যস্ততা ছিল না আজ। ঘরে বসে আয়েসে এটা-ওটা করতে শুরু করে বাণী, যার কোনোটাই জরুরি নয়, সম্পন্নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাও বাঁধা নেই কোনোটিরই। বাণী কাজ করে আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়। অনেকক্ষণ ধরে দুধ গাঢ় করে বেশি চিনি আর এলাচ-দারুচিনি দিয়ে চা তৈরি করে। শামীম এ-ধরনের মসলা দেওয়া ক্ষীর ক্ষীর দুধের চা খেতে খুব পছন্দ করে — বিশেষ করে শীতকালে। একটি বড় সিরামিক মগ ভরে বাণী গরম গরম চা এনে দেয় শামীমকে। নিজেও খায়। ধীরে ধীরে। চায়ের সঙ্গে সরিষার তেল আর নারকেল-কোরা দিয়ে মাখা মুঠো মুঠো মুড়ি-চানাচুর মুখে দেয়। বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা তোলে — কথা বলে। বাণী সময় পার করতে চায়। ততক্ষণে সূর্য সত্যি সত্যি পশ্চিমে হেলে পড়তে শুরু করেছে। রোদের তাপটাও অনেকটাই কমে এসেছে। তখন দোতলায় ওদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ওরা। শামীম হাঁটতে শুরু করে। বাণীর পাশাপাশি। তাদের গন্তব্য যে জায়গাটায়, সেটার অবস্থান আজ আর ভালো করে মনে নেই শামীমের। একবারই তো মাত্র গিয়েছিল ওখানে, তাও বছর দুয়েক আগে, নেহায়েত কৌতূহল মেটাতেই। তাছাড়া ওখানে কমিউনিটি-বাগান করার পরিকল্পনা কী রকমভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেটাও দেখে আসার উদ্দেশ্য ছিল শামীমের। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেয়েছিল, সবজি লাগানো দূরে থাক, মাপজোক করে প্লট আলাদা করে দেয়ার কাজটা পর্যন্ত শুরু হয়নি তখন পর্যন্ত। সেবার অবশ্য জমি নেয়নি ওরা। নেয়নি গতবারও। এবারই তাদের প্রথম প্রচেষ্টা, বাগান করার — মৌসুমি শাকসবজির।

শামীম কাজে চলে গেলে বাণী এখন প্রতিদিনই যায় সেখানে — তাদের জন্যে নির্ধারিত বাগানটিতে। একবার নয়। একাধিকবার। অতি উৎসাহে দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা করে কাটায় সে তার বাগানের পরিচর্যায়। আশেপাশে অন্য বাগানওয়ালীরা টিপ্পনী কাটে। তাদের ভাষায়, বাণীর এই ঘন ঘন বাগানে আসার মূল কারণ, তার 'কালা-কৃষ্ণের' দেয়া ব্যতিক্রমী সেই উপহার, ছোট্ট গোলাকার শালগমের মতো শুকনো খোসাসুদ্ধ সেই জীবন্ত বস্তুটি — যার থেকে তার বাগানে ওই বিদেশি বেগুনি ফুলগাছটির জন্ম। বাণী অবশ্য সে কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। সে মৌখিকভাবে যেমন তা মানে না, মনে মনেও স্বীকার করে না, যে কেবল সে-জন্যেই সে আসে বাগানে। ওই বেগুনি ফুলগাছটি অবশ্যই তার প্রিয়, কিন্তু এছাড়া তার ক্ষেতে এখন অনেক রকম ফসল ফলেছে, যাদের দেখাশোনা দরকার, যার জন্যে তাকে নিয়মিত আসতে হয়। যারা এসব কথা বলে বাণীকে, তারা যে নিতান্তই ঠাট্টাচ্ছলেই বলে, অন্য আর কিছুই বোঝাতে চায় না এই ধরনের মন্তব্যে, এ-ব্যাপারে প্রায় নিঃসন্দেহ বাণী। তা নইলে শুধু বাণী কেন, এখানে আর যারা বাগান করে, প্রধানত আশপাশের গৃহবধূরা, তারা সকলেই তো সেই 'কালা-কৃষ্ণ' বিদেশি সাহেবের কাছ থেকেই উন্নতমানের বিচি কেনে, সার কেনে, চারা কেনে, শিখে নেয় বিচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা চারা রোপণের ও রক্ষণাবেক্ষণের সঠিক সব পদ্ধতি। তাহলে?

রাস্তায় নেমে ওরা হাঁটতে শুরু করে। অন্তত এই একটি জায়গায় যেতে অবশেষে বাণীকে অনুসরণ করে শামীম। অন্য আর সব ক্ষেত্রে অবধারিতভাবেই বাণী অনুগামী হয় শামীমের। অর্থাৎ কেবল আজকের এই বাগান-যাত্রা ছাড়া শামীমকেই সর্বত্র অনুসরণ করে চলতে হয় বাণীকে। এর কোনো বিকল্প বা ব্যতিক্রম নেই — কক্ষনো নয়। স্বেচ্ছায় না হলেও, শান্তির অন্বেষণেই তা ঘটে অনুরূপভাবে — মানে সর্বক্ষণ শামীমের খেয়ালখুশি আর ইচ্ছামতোই সকল ওঠাবসা — চলাফেরা বাণীর। যে রাস্তা দিয়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছে, তার ঠিক বাম পাশ ঘেঁষে চলে গেছে বিশাল লম্বা পার্ক। বেলা পড়ে যাওয়ায় অনেক লোক হাঁটতে বেরিয়েছে তখন। কেউ হাঁটছে সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে, কেউ কেবল শরীরের ওজন কমাতে। কেউ হয়তো হাঁটছে বা দৌড়াচ্ছে স্রেফ রাতে বিয়ে বাড়িতে বিরিয়ানি খাওয়াকে ফরজ করার জন্যে। অর্থাৎ সুস্বাদু কিন্তু হৃৎপিণ্ডের জন্যে ক্ষতিকর এই তৈলাক্ত খাদ্যটি গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণ বা যোগ্যতা অর্জন করার জন্যেই এখন — এই বেলাশেষে, প্রাণপণে দৌড়াতে চেষ্টা করছে কেউ কেউ। মোট কথা, বাড়তি কিছু ক্যালোরি খরচ করাটাই এই হাঁটা বা দৌড়াবার মুখ্য উদ্দেশ্য, অধিকাংশের জন্যেই, সন্দেহ নেই। স্বাস্থ্য-সচেতন ব্যক্তিরা ছাড়াও, কেউ কেউ একটু দ্রুত, কেউ বা ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে, যেমন যায় প্রাত্যহিক কোনো কাজে, অন্য কোথাও। কেউ যাচ্ছে খালি হাতে, কেউ বা বোঝা বা শিশু সঙ্গে নিয়ে। শামীম যাচ্ছে, বাণীর সঙ্গে, হেঁটে, তাদের একচিলতে তরকারির বাগানটা পরিদর্শন করতে। প্রথমবারের মতো।

ওদের বসতবাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে, বাড়ির মালিকের সামান্য খানিকটা খালি জমি রয়েছে যেখানে গিজগিজ করা একটার গায়ে লাগানো আরেকটি দালান ওঠেনি এখনো। কর্পোরেশন থেকে বাড়ির ডিজাইন পাশ করার ব্যাপারে কী নাকি গোলমাল দেখা দিয়েছে। আর তাই ওই জায়গাটায় বাড়ি তুলতে এই দীর্ঘ বিলম্ব। তবে আশপাশের মতো এখানেও সুউচ্চ দালান উঠবে, ঠিক কবে উঠবে সেটা জানা না গেলেও। এই অবসরে সেই সামান্য খালি জায়গাটুকুকে একেকটি কবরের আকারের ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপার্টমেন্টকে দেয়া হয়েছে, অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে, হেমন্ত থেকে বসন্তের মৌসুমে নিজ হাতে তরিতরকারির বাগান করার সুযোগ করে দিতে। একটি টিউবওয়েলও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে জমির ঠিক মধ্যিখানে, যেখান থেকে জল নিয়ে ফসলের বাগানে দিতে পারে এইসব শৌখিন শহুরে কৃষক, যাঁরা সবাই একই মালিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা এবং মূলত নারী। আশপাশে এই বহু-কোটি টাকার মালিকের যতগুলো অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে, মোট বাগানের সংখ্যা, আকারে তা যত ছোটই হোক-না কেন, তার চেয়ে অনেক কম। ফলে বাগান করতে চাইলে শীত আসার অনেক আগেই, অর্থাৎ জুলাই/আগস্টের মধ্যেই অগ্রিম টাকা দিয়ে দিতে হয়, তা না হলে জমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তবে সবাই যে আবার বাগান করার ঝামেলা পোহাতে চায়, তাও নয়। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় এই অধিকার বা সুযোগ ছেড়ে দেয়, সংখ্যায় যদিও তারা বেশ কম।

বাগানের ব্যাপারে অনেকদিন ধরে বহু অনুনয়-বিনয় করার পরে এবার শামীমকে রাজি করাতে পেরেছিল বাণী। বলা চলে, বাণীর দীর্ঘদিনের একক এবং গভীর এক বাসনা বা শখের জন্যেই শেষ পর্যন্ত এই তরকারির বাগান করা। জীবনে প্রথমবারের মতো। শামীমের শুধু একটাই প্রত্যাশা, শীতকালে মাঝে মাঝে নিজের বাগান থেকে টাটকা সবজি তুলে এনে খাওয়া হবে। বাগান করার ব্যাপারে বাণীর নিজস্ব ধারণা ও কল্পনা অবশ্য একটু আলাদা। যদি পারত সে, এই দু-চার পয়সার তরিতরকারি না লাগিয়ে নিজের খুশিমতো অন্য কিছুর চাষ করত সেখানে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। অন্তত গৃহশান্তির জন্যে তো নয়ই। তা নইলে অসম্ভব মোটেই ছিল না, সম্পূর্ণ বাগানজুড়ে কেবল বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ করা। প্রকৃতপক্ষে বাণীর পাশের বাড়ির প্রতিবেশী সাবিহা খান তার পুরো বাগানজুড়ে শুধু সূর্যমুখী লাগিয়েছেন। ফুলের সৌন্দর্যের জন্যে ততটা নয়, যতটা তাঁর একমাত্র শিশু নাতির জন্যে খানিকটা খাঁটি সূর্যমুখী তেল জোগাড় করার আকাঙ্ক্ষায়। তেল তৈরি করা ছাড়াও কিছু নোনতা সূর্যমুখীর বিচি রোস্ট করে তুলে রাখার ইচ্ছে আছে সাবিহার। কিন্তু বাণী ভালো করেই জানে, সে যা চায়, যা সে করবে ভাবে, তার কিছুই শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারে না। দৃশ্যত কোনো বাহ্যিক শক্তি অথবা সবার অগোচরে কোনো ব্যক্তি বা কোনো ঘটনা তার ইচ্ছাগুলোকে সবসময় পেছনে টেনে ধরে রাখে। অথবা বাইরের কোনো শক্তি নয়, হয়তো তার নিজেরই রক্তচক্ষু, যা বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার নিজের ভেতরে, বাণী টের পায়নি, ক্রমাগত চোখ রাঙায় তাকে। তাই বাণীর আটাশ বছরের শরীরটাতে যে জীবন সে বয়ে বেড়ায়, তা প্রায়শই তার নিজের বলে মনে হয় না আর। যেন এক আগন্তুকের মতো, দূর কোনো দেশ থেকে সদ্য উপস্থিত হওয়া কোনো অতিথির মতো সে এই পরিচিত বাড়িটিতে আনমনে ঘুরে বেড়ায়।

তবু, এরই মাঝে সূর্য ডোবে, সূর্য ওঠে। চরাচরে আলো-আঁধার খেলা করে যুগপৎ। রোদ-বৃষ্টি, ছায়া, গাছ-পাখি, গান, কবিতা মাঝে মাঝে পুলকিত করে, উন্মনা করে বাণীকে। বছরের পর বছর কেটে যায়। প্রায় একই রকম করে, একটা নির্দিষ্ট গতিতে। দিনের শেষে রাত, তারপর আরেকটি দিন, আরেকটি রাত। আসে-যায়। আবার আসে। আবার যায়। বাণীর বয়স বাড়ে। আরো পরিণত, আরো অন্তর্মুখী, আরো সংহত হয় সে।

বেগুন, মুলা, ডাঁটা, কুমড়া, লাউ, শশা, কাঁচামরিচ, পুঁইশাক, ধনেপাতার গাদাগাদি সহ-অবস্থানের ভেতর নিমীলিত চোখের নিরীহ এই একটিমাত্র বেগুনি কলিসহ লম্বা ও খাড়া, সরু ডগাটি এই সন্ধ্যাবেলায় কারোর দৃষ্টিতে পড়ার কথা নয়। অন্তত বাণী ভাবেনি সেটা লক্ষ করবে শামীম। কিন্তু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামীমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে কিছুই যেন আর এড়িয়ে যায় না। ওটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শামীমের চিরকালীন স্বভাবমতো এটিকে নিয়েই তুমুল ঝড় ওঠায় সে — সেখানেই, সেই মুহূর্তে। প্রশ্নের বাণে ক্রমাগত বিদ্ধ হতে থাকে বাণী। সমস্ত বাগানের সব সবজি, রংবেরং, সব রকম চারাগাছ, ফসল, গন্ধ, সবুজের ছড়াছড়ি, সব, স-ব ছেড়ে শামীমের সম্পূর্ণ আগ্রহ আর কৌতূহল এসে জমা হয় কৃশকায় লম্বা ডগাসহ একটি মাত্র অচেনা ভিনদেশি বেগুনি ফুলের কুঁড়িতে। জমিটি নেয়ার সময় শামীমের সঙ্গে বাণীর মৌখিক চুক্তি হয়েছিল, ফুল নয়, নির্ভেজাল তরকারির বাগান করবে তারা সেখানে। বহুদিন থেকেই শামীম দেখে দেখে বিরক্ত, কিছুটা রাগান্বিতও যে বাণী তার সামান্য হাত খরচের টাকা বাঁচিয়েও রান্নাঘরের জানালার পাশে একটি বা দুটি ফুলের টব রাখে সবসময়। প্রতি সকালে নিজে কিছু মুখে দেয়ার আগে ফুলগাছগুলোর গোড়ায় জল দেয় — হোক সেটা গাঁদা ফুল, গন্ধরাজ কিংবা রজনীগন্ধা। টবের এইসব গাছে নতুন করে ফুল ফুটলে বা কুঁড়ি এলে বাণীর আকর্ণ হাসি আর তৃপ্ত মুখমণ্ডল, দুই চোখের ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ, রীতিমতো চোখে পড়ার মতো; এমনটি সহজে দেখা যায় না বাণীতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরনের অপচয়ের, সময় এবং পয়সা উভয় অর্থেই, কোনো মানে খুঁজে পায় না শামীম। এই সব ফুল বা ফুলের চারা এবং সেই সঙ্গে ওগুলোর জন্যে দরকারি পাত্র, বিশেষ ধরনের মাটি, সার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক মালমসলা — ওগুলো তো আর বিনে পয়সায় ঘরে আসে না। নগদ টাকা দিয়েই কিনতে হয়। কিন্তু ঘরের ভেতর এরকম দু'চারটা ফুলের গাছ, কী কাজে লাগে জীবনে? পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ানো ছাড়া? তার চেয়ে বাণী যদি দুটো কাঁচামরিচ বা কিছু ধনেপাতা লাগাত ঘরে, এই ওম-ওম শীতের সকালবেলা অফিসে যাওয়ার আগে গরম ভাত আর ভাজা ইলিশের সঙ্গে সরষের তেল দিয়ে তা বেশ মজা করেই খাওয়া যেত। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে শামীমের আবার বরাবরই প্রচুর আগ্রহ ও বিলাস, যে ব্যাপারটাতে বাণী খুব গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না।

'এটা কী?'

বাগানে ঘুরতে ঘুরতে এ নিয়ে দুবার একই কথা জিজ্ঞেস করলো শামীম। বেগুনি সুন্দরীকে নিয়েই যে তার এই প্রশ্ন বুঝতে কষ্ট হয় না বাণীর। তা সত্ত্বেও সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। উত্তর দেয় না। যেন শুনতে পায়নি। আর শুনতে না পেলেই উধাও হয়ে যাবে প্রশ্নটা, এরকম একটা সুপ্ত প্রত্যাশা হয়তো ছিল তার মনে। এবার শামীম টিউলিপ গাছটির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রক্তাভ গাঢ় নীল ফুলটার গায়ে ডান হাতের বুড়ো আর তর্জনীর আঙুল মিলিয়ে একটি বৃত্ত রচনা করে মার্বেল ছোড়ার মতো করে আস্তে টোকা মেরে বৃত্তটিকে ভেঙে দেয়।

'বলি, এটা কী? এখানে কেন?'

আশপাশের দু'একজন কৌতূহলী নারী শামীমের উচ্চৈঃস্বরে সমূহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহবিবাদের গন্ধ পেয়ে কান পাতে, চোখ ফেরায় তাদের দিকে। বাণী শামীমের খুব কাছে সরে আসে। প্রায় ফিসফিস করে যা বলে, তার জন্যে কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না তার। মাত্র একটু আগেও ভাবতে পারেনি, তার মুখ থেকে এমন কথা উচ্চারিত হবে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না বাণী। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পায়, সে বলছে, 'ও, ওটা? ওটা এক বিশেষ ধরনের বেগুনি পেঁয়াজ। বিদেশি। খুব উন্নত মানের। এই দেশে এটার চাষ করা যায় কি না দেখার জন্যে ...।'

'ও, এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে? তা সেটা আমাদের বাগানে কেন? এত জায়গা থাকতে?'

এর যথার্থ উত্তর জানা নেই বাণীর। শুধু বলে, 'কেবল এখানে নয়, অন্য আরো অনেক জায়গাতেও লাগানো হয়েছে, দেখার জন্যে আমাদের দেশে কেমন হয় এর চাষ।'

সব কথা শুনতে না পেলেও বাণীর শেষের বাক্যটা আশপাশের প্লটে কর্মরত অনেকেরই কানে গেছে। পশ্চিম দিকের বাগানের সালেহা ঢেঁড়স তুলতে ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বাণীর মুখের দিকে। সালেহার দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয় বাণী। সে জানে সালেহা কী ভাবছে তার সম্পর্কে। তবে সে জন্যে বাণীর মুখমণ্ডলে কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না।

'কালা-কৃষ্ণ' মানে ডেভিড রিফেনবারিক। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী কৃষ্ণকায় এই আমেরিকান ছেলেটি কর্নেল থেকে বিএ পাশ করেই ইউএসএআইডির একটা বৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছিল। ইচ্ছা, এখানে বছরখানেক থেকে কৃষি বিষয়ে তৃতীয় বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন। আপাতত স্থানীয় একটি এনজিওর মাধ্যমে সে বাড়িতে বাড়িতে ও কমিউনিটি গার্ডেনের সদস্যদের কাছে গিয়ে গিয়ে, সামান্য মূল্যের বিনিময়ে, উঁচুমানের তরকারির বিচি ও চারা সরবরাহ করে। উত্তম পদ্ধতিতে বিচি ও চারা লাগানো, সার ও কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার এবং ফসলের অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কলাকৌশলও শেখায় সে। মাঝে মাঝে ছবিসহ ছাপানো কাগজপত্র বিলি করে। দ্বিতীয়বার যখন বাণীদের এই বাগানে এসেছিল ডেভিড, ওর ঝুলির তলদেশ থেকে নানান কিছু বের করতে গিয়ে প্রথমেই তার ঝুলির ওপরের দিকে রাখা একটা বড় সেলোফেনের ব্যাগ বের করে তার পাশে মাটিতে রেখেছিল। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল একদিকে সুচালো, অন্যদিকে কিছুটা চওড়া, ছোট ছোট গোল গোল অনেকটা কচি শালগমের মতো দেখতে একরকম জিনিস। সংখ্যায় বেশ কয়েকটি। একদিকে চোখা, অন্যদিকে চ্যাপ্টা, গোলাকার শালগমের মতো ওই সামান্য লম্বাটে বলগুলোর গা থেকে পেঁয়াজের বাইরের দিকটার মতো মচমচ করে উঠে আসছিল খসখসে শুকনো এবং পাতলা বাদামি খোসা। কী জানি কী এগুলো? কোনো ফল-টল হবে হয়তো। অথবা কচুটচুও হতে পারে, ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণী। কিন্তু কৌতূহল বাঁধ মানে না। একসময় ডেভিডের কাছে জানতে চায় বাণী, ওগুলো আসলে কী? ডেভিড তার ঝুলি থেকে বাণীর জন্যে ছোট ছোট লাল মূল্যের বিচি বের করার চেষ্টা করছিল তখন। বাণীর প্রশ্নের জবাবে জানায়, সেলোফেন ব্যাগের ভেতর ওই গোল গোল জিনিসগুলো হচ্ছে টিউলিপ ফুলের বাল্ব। শীতের দেশে হেমন্তকালে মাটির নিচে এগুলোকে পুঁতে দেয়া হয়। পোঁতার সময় খেয়াল রাখতে হয়, চওড়া ও চ্যাপ্টা দিকটা যাতে নিচের দিকে আর সুচালো দিকটা ওপরের দিকে থাকে। মাটির তলে থাকাকালীন পুরো শীতকালটাতে এদের ওপর দিকে বয়ে যায় অতি ঠাণ্ডা আবহাওয়া — মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বরফপাত। বাল্বগুলোর সুপ্ত অবস্থার একটা পর্যায়ে এই তীব্র শীতলতার সম্ভবত দরকার হয়। বিশেষত অঙ্কুরায়ণে। শীত শেষে বসন্তের শুরুতে তাপমাত্রা একটু বাড়লেই মাটির নিচের এই বাল্ব থেকে গজিয়ে ওঠে কলাবতী গাছের মতো টিউলিপ চারা। তারপর কিছুদিন গেলে চারার মাঝখান দিয়ে বের হয় লম্বা এক ডাঁটি, যার শেষ মাথায় একটি করে টিউলিপ ফোটে প্রতিটি গাছে। একটি করে ফুল ফুটলেও টিউলিপ ফুলের আয়ু অনেক দিনের। একবার ফুটেই তারা ঝরে পড়ে না। বেশ কদিন ধরে ফুলটি সতেজ থাকে গাছে। শুধু তাই নয়। একবার টিউলিপ লাগালে মাটির নিচের একই বাল্ব থেকে প্রতিবছর বসন্তের নির্দিষ্ট সময়ে এই ফুলগাছের চারা বেরোয় আপনাআপনি। তবে বাল্বগুলো মাটির নিচে থাকাকালীন বাইরে তীব্র শীত আর বরফপাতের ব্যাপারটা বোধহয় আসলেই জরুরি। তা না হলে প্রতিবছর একই বাল্ব থেকে পুনরায় গাছ গজাবে কিনা সন্দেহ। ডেভিড তার টিউলিপ বাল্বের ব্যাগখানি দেখিয়ে বলে, এই বাল্বগুলো মিশ্র প্রকৃতির। অর্থাৎ এগুলো থেকে বিভিন্ন রঙের টিউলিপ হবে — সাদা, লাল, হলুদ, গোলাপি, কমলা, বেগুনি, খয়েরি। ডেভিড তার ঝোলার ভেতর হাত দিয়ে টিউলিপের ওপর রচিত ও প্রচুর রঙিন ছবিসহ বড় আকারের একটি বই বের করে এবার। বই খুলে বাণীকে বিভিন্ন রঙের ও নানান ধরনের টিউলিপ ফুলের ছবি দেখায়। হল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় ফুল টিউলিপ। সেখানে মাইলের পর মাইল লম্বা লাইন ধরে বিভিন্ন রঙের টিউলিপ উদ্যানের মনোরম ছবি দেখে আবিষ্ট হয়ে পড়ে বাণী। ডেভিড তখন তাকে বিখ্যাত পেইন্টার মোনের অঙ্কিত টিউলিপ উদ্যানের কয়েকটি পৃষ্ঠাব্যাপী ছবির রিপ্রিন্টও দেখায়, একই বইয়ের শেষের দিকে রয়েছে সেগুলো। ডেভিড জানায়, ইস্টার উপলক্ষে আমেরিকা থেকে তার বোন এই বইটি আর টিউলিপের বাল্বগুলো পাঠিয়েছে তাকে উপহার হিসেবে। সেইসঙ্গে অনুরোধ করেছে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে, গরমের দেশে টিউলিপ চাষ করা যায় কি না, যেহেতু বরফের নিচে মাটির তলে পড়ে থাকার কোনো সুযোগ এখানে নেই। ডেভিড চেষ্টা করে দেখবে। পঁচিশটা বাল্ব থেকে কিছু তার অফিসে, কিছু তার বাসায় লাগাবার ইচ্ছা আছে তার, যাতে নিজেই এগুলোর দেখাশোনা-তদারকি করতে পারে। বলেই প্লাস্টিকের ব্যাগটা ওপরের দিক থেকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে একটা বাল্ব বের করে বাণীর হাতে দেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেভিড। বলে, 'জানি তোমার ছোট্ট বাগানে জায়গার বড়ই অভাব। অনেক কিছু লাগিয়েছ। কিন্তু তুমি কি মনে করো তোমার বাগানে এই একটি বাল্বের জায়গা হবে? তাহলে এটা রেখে যাই। যদি লাগাও, এক্ষুনি কিন্তু সময়, মাটির নিচে পুঁতে দেবার।' বাণী একেবারেই আশা করেনি এমন মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য একটি উপহার ডেভিড তাকে দেবে। আশপাশের বাগানের অন্য নারীরা ঈর্ষান্বিত একেবারে হয়নি, এ কথা বলা যাবে না। বাণী লক্ষ করে, বাগানে কাজ করতে করতে বাঁকা চোখে তারা ওদের দেখছে, ওদের কথা শুনছে। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বাণী ডেভিডকে কথা দিয়েছিল, অবশ্যই সে চেষ্টা করে দেখবে যদি এই বাল্ব থেকে ফুল ফোটানো সম্ভব হয়। এই দুরূহ কাজটিকে একটা চ্যালেঞ্জের মতো করেই গ্রহণ করেছিল বাণী। ডেভিড নিজে বাল্বটিকে মাটির নিচে পুঁততে এবং সার দিতে সাহায্য করেছিল বাণীকে। এরপর প্রতিদিন শূন্য মাটির ওপর জল ঢালতে ঢালতে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত বাণী, যদি কিছু গজায়। দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে যায়। কিছুই বের হয় না। যখন প্রায় হাল ছেড়ে দেয়ার অবস্থা, হঠাৎ এক কুয়াশাঢাকা ভোরে বাণী এসে দেখে, সত্যি সত্যি মাটি ঠেলে উঠে আসছে হালকা সবুজ রঙের ভাঁজ করা একটি কচি চারা। দেখে বিস্ময়ে, আনন্দে, উত্তেজনায় বাণী প্রায় কেঁদে ফেলে। শুধু তাই নয়। মাস দেড়েক ধরে সেই ছোট্ট চারা গাছটাকে অতি যত্নে আস্তে আস্তে বড় করে তোলার পর, অবশেষে হাড়কাঁপানো-শীতের দেশের সেই ফুল, একটি পার্পল বা বেগুনি টিউলিপ, ফোটাতে সক্ষম হয়েছিল বাণী তার এই গাছে, তার নিজস্ব বাগানে—এখানকার প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও। যতবার সে এই ফুলটির মুখদর্শন করে, ততবার একটা নির্জলা প্রশান্তিতে ভরে যায় তার মন, জীবনের সব জটিলতার ভেতরও তখন নিজেকে সম্পূর্ণ নির্ভার লাগে তার। বাণীর গাছে বেগুনি টিউলিপটি ফুটতে দেখে ডেভিডও বেজায় খুশি। বাণীর দুহাত নিজের দুহাতে ধরে সবার সামনে এই বাগানের ভেতরই এক পাক ঘুরে তার আনন্দ প্রকাশ করেছিল। ডেভিডের এই ছেলেমানুষিতে একটু লজ্জা পেয়েছিল বাণী। তবে ঘন কালো দাড়ি আর ছয় ফুট উচ্চতা সত্ত্বেও ডেভিড যে আসলে ছেলেমানুষই, সে কথাও বাণী ভুলে যায়নি। বাণীকে ডেভিড বলেছিল, এখন কেবল দেখতে হবে, তুষারপাত আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছাড়াও একই বাল্ব থেকে সামনের বারও আবার নতুন করে গাছ বেরোয় কি না, টিউলিপ ফোটে কি না। তার বোনের ধারণা, সেটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে মনে করে, মাটির নিচে বাল্বগুলো থাকাকালীন তাদের নতুন করে প্রাণশক্তি জোগাতে অন্তত কিছুকালের জন্যে অতি শীতল তাপমাত্রা আর বরফপাত অত্যন্ত জরুরি। সামনের বসন্তে যেহেতু ডেভিড থাকবে না এদেশে, বাণী যেন অবশ্যই জানায় তাকে নতুন করে টিউলিপ আবার গজালো কি না এখানে। যাওয়ার আগে সে তার আমেরিকার ঠিকানা দিয়ে যাবে বাণীকে।

সেদিন শুক্রবার। এই একটা দিন মহাসমারোহে নিজের হাতে কাঁচাবাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে শামীম। আজো করেছে। ব্যাগ থেকে বাজারগুলো তুলতে তুলতে বাণী জিজ্ঞেস করে, 'কাপড় কাচার সাবান আনোনি?'

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কাগজ থেকে চোখ না তুলেই শামীম জবাব দেয়, 'ভুলে গেছি।'

'আর পেঁয়াজ?'

'এনেছি।'

শামীম আরামকেদারা থেকে উঠে দাঁড়ায় পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রস্তুতিতে। প্রত্যাশিত প্রশ্নটা উচ্চারিত হয় বাণীর মুখে।

'কোথায়? পেঁয়াজ কোথায়? দেখছি না তো!'

বাজারের ব্যাগে আঁতিপাঁতি করে পেঁয়াজ খোঁজে বাণী!

'ওখানে নয়। এই দেখো, এখানে। বেগুনি পেঁয়াজ এনেছি আজ তোমার জন্যে।'

বাণী চমকে ওঠে। শামীমের মুখ গম্ভীর।

তার হাতে নেতিয়ে পড়া লম্বা একটা গাছের চারা বা লতা, যেটা সে তার প্যান্টের পকেট থেকে বের করে। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেই চারাগাছটিকে বাণীর চোখের সামনে শূন্যে দোলাতে থাকে — একবার বাঁদিক থেকে ডানদিকে — আরেকবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে, ক্রমাগত। এবং দ্রুত। এই সময় শামীমের মুখমণ্ডলের মাংসপেশি ও চোয়াল শক্ত হয়ে আসে।

গাছটির সবজে পাতা, স্বচ্ছ বাদামি রঙের পেঁয়াজ বা শালগমের মতো ছোট্ট গোড়া, কালচে লম্বা ডাঁটি, আর ডাঁটির ওপরে — একেবারে শেষ মাথায় নুয়ে পড়া অতি পরিচিত সেই লালচে বেগুনি ফুল।

বাণীর বিস্ফারিত চোখ দুটো মুখমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। মুখ দিয়ে অনবরত অস্পষ্ট গোঙানির মতো শব্দ। কিন্তু কোনো কথা, কোনো স্পষ্ট শব্দ বেরোচ্ছে না কণ্ঠ দিয়ে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না বাণী। সত্যি সত্যি এটা ঘটেছে তাহলে।

কিছুক্ষণ পর খাটের কোনায় মশারি টাঙাবার জন্যে কাঠের তৈরি সুডৌল একখানি স্তম্ভ কোনোমতে জড়িয়ে ধরে নিজের পড়ে যাওয়া বোধ করে বাণী। তারপর সেখানেই — খাটের ওপরেই বসে পড়ে সে।

'এ কী করেছ তুমি? ... কেমন করে পারলে ... ?' আর কিছু বলতে পারে না বাণী। দাঁত বের করে শব্দ করে হাসে শামীম।

'কেন? তুমিই না বলেছিলে এটা উন্নতজাতের বেগুনি পেঁয়াজ? বিদেশি? দেখো না, চেষ্টা করে এক পদ রাঁধা যায় কি না এটা দিয়ে?'

'যত্তসব রাবিশ!' হাতে ধরা বস্তুটিকে ঘরের অন্য কোণে ছুড়ে ফেলে দেয় শামীম।

মূল থেকে উৎপাটিত নেতিয়ে পড়া টিউলিপ গাছখানাকে দ্রুত মেঝে থেকে দুহাত দিয়ে তুলে নেয় বাণী। সযত্নে ওটাকে ধরে এপাশ-ওপাশ ভালো করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষা করে বুঝতে পারে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। গাছটি প্রায় মৃত তখন। একেবারেই ঢলে পড়েছে। নিশ্চয় বাজারে যাবার পথেই সে গিয়েছিল বাগানে, ফেরার পথে নয়। ফেরার পথে হলে এতটা নেতিয়ে পড়ত না গাছটি। বাণী তারপরেও একটি কাচের গ্লাসের ভেতরে ঢলে পড়া গাছটিকে রেখে অন্য গ্লাস দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢালে তাতে। তারপর গ্লাসটা খাবার টেবিলের ওপর রেখে আবার বিছানার ধারে গিয়ে বসে বাণী। তার পায়ের মাংসপেশিতে আর কোনো জোর অবশিষ্ট নেই মনে হয় তার। বিছানায় বসে চুপচাপ কাঁদতে থাকে বাণী, যেমন করে তার পোষা কুকুরটা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলে একনাগাড়ে নিঃশব্দে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ। শামীমের উষ্মা তাতে কমে না।

'কী সাহস! আমার কাছে মিথ্যা কথা বলা! আমাকে গোপন করা! তার বিদেশি ভক্তের দেয়া ফুলগাছটা হয়ে গেল কি না বেগুনি পেঁয়াজ! আমাকে বোকা পেয়েছ, না? আর তাই যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছ?'

শামীমের উত্তেজিত মুখটা দেখতে পাচ্ছে না বাণী। কেননা সে ওদিকে তাকিয়ে নেই। তার কান্নাও থেমে গেছে ততক্ষণে।

আজ বাজারে যাওয়ার বা ফেরার পথে বাগানে থেমে নিজের হাতে পছন্দমতো কিছু তরকারি তুলে নিয়ে এলেও আসতে পারে, বলেছিল শামীম। শুনেই বাণী তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, প্রবলভাবে। কিন্তু নিতে রাজি হয়নি শামীম। বাণী এখন বুঝতে পারছে, তরকারি ছাড়াও আজ শামীম আরো অনেক তথ্য, অনেক মালমশলার সন্ধান পেয়েছে সেখানে। তরকারির বাগানে।

এর পর, বাণীর উদ্দেশে, তার নির্বাচিত, দুচারটা খিস্তি নিক্ষেপ করে শামীম। মৌখিক উচ্চারণে বাণীর চরিত্র-হরণ যা তার অন্যতম প্রিয় কর্ম, যথারীতি শ্রুত হয়, বেশ কয়েকবার, ঘন ঘন, যার সঙ্গে ডেভিডের নামও যুক্ত হয় আবশ্যিকভাবে। শুধু তাই নয়। অস্থির হাতে কাচের গ্লাস থেকে মর-মর গাছটিকে আবার নিজের হাতে তুলে নেয় শামীম। তারপর ওটার আগা থেকে বেগুনি ফুলটি আর গোড়া থেকে স্বচ্ছ ও কচি পেঁয়াজের মতো নরম, গোলাকার ছোট বাল্বটি ছিঁড়ে নিয়ে ও-দুটোকে বাঁ হাতের তালুতে রাখে। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে শামীমের। তারপরেও সে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ-হাতের তালুতে রাখা জিনিস দুটোকে ভালো করে চটকায়। চটকে চটকে ওগুলো থেকে একটা গোলাপি-বেগুনি ধরনের পেস্টের মতো জিনিস তৈরি করে ফেলে। গাছটির মাঝখানের ছেঁড়া অংশটা সে আগেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল মেঝেতে। অতঃপর শামীম নিজের দুই হাতের দশটি আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের তালু থেকে বেগুনি পেস্টটি নিয়ে খাটের কোণে বসে থাকা বাণীর মুখে, ঠোঁটে, গালে, গলায়, কপালে, সামনের চুলে ইচ্ছেমতো মাখিয়ে দিতে থাকে। শেষ হলে, হাতের তালুতে থাকা অবশিষ্ট পেস্টটুকুন বাণীর হাতে ঘষে ঘষে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'একবার খেয়েই দেখো না, কেমন লাগে বেগুনি পেঁয়াজ আর আয়নায় দেখো গিয়ে নিজেকে। বেশ লাগে কিন্তু বেগুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙে তোমাকে। ঠিক তোমার বাগানের টিউলিপটির মতো।'

বাণী নড়ে না। কোনো প্রতিবাদ করে না। যে মানুষটিকে নিয়ে এতক্ষণ ধরে শামীম এত কাণ্ড করল, সে যেন বাণী নিজে নয়। বাণীকে দেখলে মনে হয়, সে কিছুই টের পায়নি, কিছুই শোনেনি, কিছুই বুঝতে পারেনি। সে কেবল তার বেগুনি টিউলিপটির কথাই ভাবছে। যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলে চলেছে বাণী। ফিসফিস করে তখনো বলছে, 'কী করে পারলে? কেমন করে এটা করতে পারলে? এত সুন্দর ফুলটা দেখেও একটু মায়া হলো না ... ?'

পরের বছর বসন্তের প্রারম্ভে প্রতিশ্রুতিমতো ডেভিডকে তার নিউ ইয়র্কের ঠিকানায় একখানা চিঠি লেখে বাণী।

...'না, সেই বেগুনি টিউলিপ আর ফোটেনি এবার। নতুন করে কোনো চারাও গজায়নি। আমার মনে হয়, তোমার বোনের আশঙ্কাটাই ঠিক। আমাদের দেশের তাপমাত্রা, আবহাওয়া অনেক বেশি উত্তপ্ত টিউলিপের জন্যে। মাটির নিচে দীর্ঘ নিদ্রার পর নতুন করে আবার প্রাণশক্তি জুগিয়ে জেগে ওঠার আগে যে বেশ কিছু সময় শৈত্যে, তুষারপাতে ডুবে থাকতে হয় টিউলিপের বাল্বগুলোকে, সেই শীতলতা, সেই ঠাণ্ডা প্রশান্তি আমাদের এখানে নেই। বড় বেশি উত্তাপ ছড়ায় এখানকার মাটি, এখানকার সূর্য। বড় বেশি গরম হাওয়া চারদিকে। পুরনো বাল্ব থেকে নতুন টিউলিপের চারা গজানো দূরে থাক, ফোটা টিউলিপ পর্যন্ত ঝরে যায়, শুকিয়ে যায় এখানে — এতটাই উষ্ণতার বাড়াবাড়ি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ষণ

বিচার চাই ধর্ষণের, ধর্ষিতার নয়

৮ মার্চ ১৯৯২। আমার সৌভাগ্য, জীবনে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বিশ্বনারী দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল সেদিন। একটা ব্যাপার লক্ষ করে প্রীত হয়েছিলাম। তা হলো পাবলিক লাইব্রেরি চত্বর থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত প্রচণ্ড রোদে নানারকম ব্যানার হাতে নিয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছিল যে হাজার হাজার মেয়ে, তাদের সিংহভাগজুড়েই ছিল খেটে খাওয়া সাধারণ মেয়ের দল। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের মেয়েরা অবশ্যই ছিল। কিন্তু আনুপাতিক হিসেবে বেশি নয়, যদিও তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সাধারণ শ্রমিক ও কর্মী মেয়েদের কারো কোলে ছিল শিশু, কেউ-বা স্তন্যদানরতা। কারো স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। অনভ্যাসবশত কারো কারো পা থেকে খুলে বেরিয়ে আসছিল স্যান্ডেল। রোজার দিনে অপুষ্ট শরীরকে এই প্রচণ্ড রোদ আর গরমের ভেতর টেনে নিয়ে যেতে যেতে কেউ কেউ রাস্তায় ঢলে পড়ছিল। সহযাত্রীরা তাদের মিছিল থেকে টেনে রিকশায় ওঠাতে চাইলে মৃদু আপত্তি করছিল তারা শীর্ণ হাত তুলে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে মেয়েদের সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থানের দৃশ্যত তেমন পরিবর্তন না হলেও একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহে ঘটেছে। মেয়েদের মধ্যে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা বেড়েছে। কোনো সমস্যার প্রতিকার বা উত্তরণের পূর্বশর্ত যেহেতু প্রতিবাদ, আর প্রতিবাদের পূর্বশর্ত যখন সমস্যাটির বিষয়ে সচেতনতা, তখন মেয়েদের মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে এই জাগ্রত চেতনা ও মুখরতাকে আমি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, সুস্থ লক্ষণ ও শুভদিনের উষালগ্ন বলেই মনে করছি। সেদিন ৫১টি সংস্থা আয়োজিত সেই মিছিল ও মিটিংয়ে যেসব প্রচারপত্র বিলি হয়েছিল, নারীপক্ষের তরফ থেকে সন্ধ্যায় মশাল মিছিলে যোগদানের আহ্বান ছিল অন্যতম। সেখানে লেখা ছিল, 'বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে এসে আজ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দেখি আমাদের দেশের নারীদের চলাচলের পরিধি ঘর থেকে কর্মস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। যদিও তা আনুপাতিক হারে খুবই কম। সেই বিস্তারও ঘটেছে মূলত সংসারের প্রয়োজনেই। নারীর অবস্থান এখন যদিও ঘরে এবং বাইরে, তা সত্ত্বেও নারীর জীবনবোধ আবদ্ধ রয়ে গেছে সেই সনাতন গণ্ডিতেই। সেই কারণেই নারীর প্রতি প্রচলিত ধারণাগুলি এখনো বহাল। নগরায়ণের প্রয়োজনে নারীর চলাচল আজ প্রসারিত সবজিবাজার থেকে সংসদ ভবনে। কিন্তু তা সম্পূর্ণই নিয়ন্ত্রিত সমাজ দ্বারা এবং সেই চলাচল সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মেনে নেওয়া হলেও সূর্যাস্তের পরে নয়। এবং সেই অন্ধকারের ভীতি নারীর বুদ্ধি এবং বিবেচনাবোধকে তার স্বচ্ছন্দ চলাচল সম্পর্কে সংকুচিত করে ফেলে। ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আমরা নারীর সীমাবদ্ধ চলাচলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' নারীপক্ষের সেই প্রতিবাদই মূর্ত হয়েছিল দিন শেষে অন্ধকার নেমে এলে মশাল হাতে মেয়েদের রাজধানীর পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে। মানুষ মানুষকে ভয় পাবে না — প্রতিটি নরনারী দিনে রাত্রে যখন যেখানে খুশি স্বাধীনভাবে নিরাপদে ঘুরে বেড়াবে, এ তো প্রতিটি সভ্য মানুষের বাঞ্ছিত স্বপ্ন, স্বাভাবিক আশা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে তো আরো ঘটে না। তবু যেটুকু স্বাধীনতা, যেটুকু নিরাপত্তা আমরা পুরুষকে দিতে পারি, তারও অনেক কম পারি মেয়েদের দিতে। তার একমাত্র কারণ মেয়েদের শরীর ও এ শরীরের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। মেয়েদের মানুষ হিসেবে নয়, শরীর হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা সকলে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। সেই শরীর পুরুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট মজবুত হলেও নিজেকে রক্ষা করার বেলায় নেহায়েত দুর্বল, এটাই প্রচলিত ধারণা। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে শরীরসর্বস্ব মেয়েরা জীবন ও জগতের বহু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ব্যাপার অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র তার শরীর তথা সতীত্ব রক্ষা করতে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত। অন্যদিকে পুরুষরা যেহেতু সমাজের সেই দুর্বলতাকে বুঝে ফেলেছে, তাদের মধ্যে যারা সভ্যতার ধার ধারে না — নিজের ইন্দ্রিয়ের কাছে যারা পুরোপুরি বন্দি, তাদের কেউ কেউ মেয়েদের শরীরের ওপর হামলা করেও দিব্যি বুক ফুলিয়ে সমাজে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কেননা দায়টা তো মেয়েদেরই। সে তার যৌবন ঢেকেঢুকে লোকচক্ষুর আড়াল করতে পারল না, পারল না তার সতীত্ব রক্ষা করতে, এটা তো তারই লজ্জা। তারই অপরাধ। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই যে নারীর সবচেয়ে বড় ধর্ম। সে ধর্ম যথাযথ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে মেয়ে, সে নিজে বা তার সমাজই স্থির করে দেবে তার ভাগ্য। কী ঘটবে তার জীবনে অতঃপর। সে কি সত্য কথাটা ফাঁস করে দিয়ে সমাজচ্যুত হয়ে একা একা সারাজীবন এ কলঙ্কময় জীবন বয়ে বেড়াবে? নাকি দুঃসহ অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে, অপরাধকে ধামাচাপা দিয়ে বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক জীবনের ভান করবে? এছাড়া তৃতীয় যে বিকল্প খোলা থাকতে পারত — যা বাঞ্ছিত, যা সুস্থ, যা স্বাভাবিক, সেই পথটি অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধীকে শনাক্ত করে শাস্তি দিয়ে অপরাধের শিকারকে বিনা শর্তে সমাজে ও পরিবারে মেনে নেওয়া, আজো, এই চোদ্দ শ সাল অথবা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এদেশে স্বপ্নের মতো শোনায়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে (প্রতিমা পাল ও সালমা চৌধুরী, চিন্তা, ১৫ মার্চ, ১৯৯২; পৃ ১৮-২৩) দেখা গেছে যে, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাদের রাতে কারখানা থেকে ঘরে ফেরার ব্যাপারটি। শতকরা ৬১টি মেয়ে পয়সার অভাবে ৫/৬ কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটে কারখানায় আসা-যাওয়া করে। যে ১৯ জন নারী শ্রমিক ছিনতাইকারীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে ১৬ জনই একা বাড়ি ফিরছিল। ফলে সম্ভব হলে ইদানীং তারা দল বেঁধে বা অভিভাবকের সঙ্গে ঘরে ফেরে রাতে। তবু ২৭ শতাংশ নারী শ্রমিক আজো একাই ঘরে ফেরে। শুধু ছিনতাইকারী নয়, ধর্ষণকারীদের আশঙ্কা মনে রেখেও জীবনসংগ্রামে লিপ্ত অল্পবয়সী এই মেয়েদের আজ রাত করে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই এই খেটে-খাওয়া মেয়েগুলো নতুন এক দিগন্ত খুলে দিচ্ছে সকল মেয়েদের জন্যে।

কাজ শেষে রাত করে ঘরে ফেরা মেয়েরা শুধু যে কারখানা বা পথের নিরাপত্তাহীনতারই শিকার তা নয়, নিজের ঘরে ফিরেও তাদের নানারকম বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। আমাদের দেশের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার গতিপ্রকৃতি এমনই যে, সংসারের প্রয়োজনে দিনের বেলায় যদিও-বা মেয়েদের বাইরে কাজে যাওয়া মেনে নেওয়া যায়, রাতের কাজকে এখনো সম্মানের চোখে দেখা হয় না। প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, এমনকি আত্মীয়স্বজনও রাত করে কাজ থেকে ঘরে ফেরা মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কে, তাদের সতীত্বের অক্ষুণ্নতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। ভাবখানা এমন যে, রাতে যা ঘটে, যা ঘটতে পারে, তা যেন দিনের আলোয় সম্ভব নয়। অন্ধকারের অবশ্যই একটা ভূমিকা রয়েছে। শুধু অন্যের চোখ থেকে আক্ষরিক অর্থেই আড়াল পাওয়ার জন্যে নয়, নিজের মনের ভেতরও নানারকম রহস্যের লুকোচুরি, আড়াল ও আবছায়া সৃষ্টির জন্যে। তবু এটা সত্যি যে, তথাকথিত চরিত্রস্খলন কেউ যদি ঘটাতেই চায়, তার জন্যে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হয় না। এসব সত্ত্বেও পোশাক কারখানায় চাকরিরত নারী শ্রমিকদের ২৮ শতাংশের মতে, এই কাজ করতে এসে সবচেয়ে বড় যে অসুবিধার সম্মুখীন তারা হয়, তা হলো রাতে কাজ করার ঘটনাটি। বিআইডিএসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী — এসব নারী শ্রমিকের মধ্যে অন্তত ৪ শতাংশ কারখানার ভেতর এবং ৫ শতাংশ বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষিতা হয়েছে। এ সংখ্যাগুলো বাস্তবে আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা এ জন্যে যে, অনুমেয় কারণে কোনো শ্রমিকই এ ধরনের ঘটনা নিজের জীবনে ঘটেছে বলে স্বীকার করেনি?

এ তো গেল পোশাক কারখানা বা অনুরূপ গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রমিক মহিলাদের কথা। এছাড়া পেশাজীবী মহিলারা যাদের রাতে কাজ করতে হয়, যারা রাতে কাজ করে না দিনে করে, অথবা করেই না, যাদের চলাচল ঘর, বাজার বা প্রতিবেশীর বাড়িতেই সীমাবদ্ধ, তারাই কি নিরাপদ?

গ্রামে-গঞ্জে গরিব অশিক্ষিত মেয়েরা তো শুধু নয়, এই রাজধানী শহরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মেয়েরাও কি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে না? বাংলা একাডেমীর বইমেলা, মহিলা সমিতির মঞ্চ, অথবা শাড়ির দোকান, কোথাও তো মেয়েরা রাতে একা চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না আজো। কেমন করে করবে? প্রতিনিয়ত চারপাশে যা ঘটছে তাতে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বৈকি!

এই তো গত মাসে কর্তব্যরত ছাত্রী নার্স কাজল রানী নিজের কর্মস্থল হাসপাতালের ছাদেই ধর্ষিতা হলো। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দিনে-দুপুরে সবার চোখের সামনে স্বাস্থ্যকর্মী গৌরী রানীকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করল বেশ কজন লোক; যারা কি না আবার একই দপ্তরের কর্মচারীও বটে। কলেজে যাওয়ার পথে উনিশ বছরের আসমা খাতুনকে অপহরণ করে নিয়ে গেল যে যুবক, জোর করে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে অবশ্য মেয়েটিকে কাবিনবদ্ধ করতে ভোলেনি সে। মায়ের সঙ্গে পাশের বাড়িতে টেলিভিশন দেখে ঘরে ফিরছিল পুতুল রানী। নিজের বাড়ির পুকুরে কুপি জ্বালিয়ে বাসন মাজছিল মীরা চক্রবর্তী। ভুলেও কি কখনো এই দুই কিশোরী ভেবেছিল কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হতে যাচ্ছে তারা? একটি টেনিস বলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের ছেলেদের বচসার শিকার হয়ে প্রাণ দিল সম্পূর্ণ নিরপরাধ সাবিনা। তার শারীরিক জখম থেকে বোঝা গেল, হত্যা করার আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল।

শুধুমাত্র কিশোরী বা যুবতীরাই নয়, এই ধরনের বিকৃত যৌনতার শিকার হচ্ছে আমাদের শিশু মেয়েরাও। দশ বছরের ফুটফুটে মেয়ে লিপি মহানন্দে কৌতূহলী চোখ মেলে দেখতে গিয়েছিল হেলিকপ্টার — প্রধানমন্ত্রী যাতে করে উড়ে এসেছিলেন তাদের লোকালয়ে। তাকে ধর্ষণ করল আর কেউ নয়, কর্তব্যরত পুলিশ, যার ওই হেলিকপ্টার পাহারা দেওয়ার কথা তখন। সাড়ে তিন বছরের শিশু মেয়ে হালিমাকে যে চারজন কামুক পুরুষ আক্রমণ করল সেদিন তাদের বয়স ছিল ১৪ থেকে ৪৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টারে দশ বছর বয়সের কাজের মেয়েকে ধর্ষণ করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে গেল যে যুবকটি তার পরনে ছিল 'ভদ্রলোকের পোশাক'।

নারীদের নিরাপত্তার জন্যে উদ্বিগ্ন, চিন্তিত ও রক্ষণশীল কেউ কেউ হয়তো বলবেন, অল্প বয়সী মেয়েরা বাইরে গেলে এমন তো হতেই পারে। অতএব ঘরে থাক — নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ঘটছে কি তাই? মেয়েরা কি নিজের ঘরেও নিরাপদ? যৌতুকের জন্যে কেন তাহলে স্বামীর ঘরে অকালে মরতে হচ্ছে শেফালী বেগম, খালেদা আর সাবিনা ইয়াসমিনদের মতো নিষ্পাপ মেয়েদের? কেন আদর্শগত বা চিন্তার অমিলের জন্যে ঘরের লোকের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণ দিতে হচ্ছে রীমা অথবা লিপিকাকে।

বাংলাদেশে মেয়েরা কতটা স্বাধীন এ প্রশ্নের উত্তরে কবি রুবী রহমান পাক্ষিক *চিহ্ন* কাগজে (১৭-৩০ ফাল্গুন, ১৩৯৮, পৃ ২২-২৩) লিখেছেন কীভাবে নানারকম স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতে সমাজে মেয়েদের পরাধীন করে রাখা হয়। তিনি বলেছেন : 'এই অভিসন্ধি কখনো রাজনৈতিক, কখনো সামাজিক আবার কখনো-বা মানবিক সম্পর্কজনিত। ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা পেয়েও নারীর স্বাধীনতা খর্ব করা হয় মানবসমাজে। ভালোবাসার নামে হাতে-পায়ে শেকল পরিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়ে কত নারীকে ঘরে বন্দি করে রাখা হচ্ছে তার হিসেব নেই।' রুবী রহমানের এ কথার আরো প্রমাণ মেলে নুরুন্নাহার কাজলের মতো ভালোবাসায় বিশ্বাসী, সহজ আবেগপ্রবণ মেয়েদের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির মধ্যে দিয়ে। ভালোবাসার নামে প্রতারণা করে তাদের শরীর ভোগ করেই ক্ষান্ত হয়নি অমানুষরা, নিষ্ঠুরভাবে নিজেদের হাতে খুনও করে গেছে সরলমনা কাজলদের। সবচেয়ে নিন্দনীয় ও দুঃখের ব্যাপার হলো এসব ঘটনার ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমগুলোর ভূমিকা। যে বিকৃত রুচিসহকারে এই সংবাদগুলো জনসম্মুখে তারা হাজির করে, তাতে অপরাধের ব্যাপারে সচেতনতা কতটা বাড়ে জানি না, কিন্তু অপরাধী যে শুধু কারাগার নয়, আমাদের চিন্তা ও ঘৃণা থেকেও রেহাই পেয়ে যায় তা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য খবরে ছবিসহ ধর্ষিতা মেয়েদের সংবাদই থাকে — ধর্ষণকারী সম্বন্ধে কখনো জানা যায় না। তাকে ধরা হয়েছে কি হয়নি সে সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব পর্যন্ত নিতে চান না আমাদের সাংবাদিকরা। সবচেয়ে বড় কথা, ধর্ষণের ঘটনাগুলো প্রাথমিকভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে এদের জীবনে কী ঘটছে, বিশেষ করে ধর্ষণকারী সাজা পেল কি পেল না, এ সংবাদ সংগ্রহ ও ঘটনাগুলো অনুসরণ করে পাঠকদের কাছে তা হাজির করা সাংবাদিকদের নৈতিক কর্তব্য হলেও তা তাঁরা পালন করেন না। অসুস্থ সামাজিক মূল্যবোধের কারণে মোট সংঘটিত ধর্ষণের একাংশই কেবল লোক জানতে পারে। সাহস করে যেসব মেয়ে তা বলতে এগিয়ে আসেন, তাঁদের প্রতি সাংবাদিকদের একটা দায় রয়েছে, যা তাঁরা প্রতিনিয়ত অস্বীকার করছেন। রঙিন কাগজে মোড়া অজস্র সাপ্তাহিকী এইসব ঘটনাকে এত মালমসলাসহকারে সুখপাঠ্য পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে এনে ফেলে যে, তাতে তাদের কাগজের কাটতি হয়তো বাড়ে ঠিকই; কিন্তু অপরাধের শিকার যে মেয়েটি তার প্রতি বড়ই নিষ্ঠুর অবিচার করা হয়। নুরুন্নাহার কাজলের মৃত্যুর পর তার বাবা মা স্বামীসহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের একটি আবেদন খবরের কাগজের পাতায় পড়ে অনেকেই হয়তো অভিভূত হয়েছেন। সেই আবেদনে তাঁরা কাগজের সম্পাদকদের কাছে মিনতি করেছিলেন তাঁদের মৃত আত্মীয়াকে সম্মানের সঙ্গে এবার পরিত্রাণ দেওয়ার জন্যে। কাজলের পরকীয়া প্রেম, মৃত্যুর পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে এমন মুখরোচক নাটকীয় উপাদান হয়ে প্রতিদিন কাগজে আসছিল যে, তা একটি করুণ মৃত্যুকে নিষ্ঠুর ও অসহনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তুলছিল। সেই অমানবিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা সাংবাদিকদের। প্রতিটি মৃত্যুই অন্তত এটুকু সম্মান হয়তো আশা করতে পারে জীবিতদের কাছে।

শুধু কি মৃতরাই সমীহ্ পাবে? যারা ধর্ষিতা, যারা নির্যাতিতা তাদের কী হবে? ধর্ষণ রোধের জন্য প্রতিটি ধর্ষণকারীর কঠিন শাস্তি হওয়া একান্ত জরুরি এবং তা হতে হবে ঘটনার পর নির্দিষ্ট একটি সময়সীমার মধ্যে। কেননা বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে অধিকাংশ সময়েই এই অপরাধীদের পেছনে এসে দাঁড়ায় অথবা সবসময়ই থাকে একটি শক্তিশালী চক্র। যত তাদের সময় দেওয়া যাবে, ততই তারা সংঘবদ্ধ হবে আর আইন ও সমাজের গলিত ফাঁকফোকর দিয়ে ততই তারা আবার পথে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। শুধু অক্ষম, অসহায় অপরাধের শিকার যারা তারা চিহ্নিত ও নিপতিত হয়ে পড়ে থাকবে মুখ থুবড়ে।

ধর্ষণকারীর শাস্তি কার্যকর করার জন্যে প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু তারও আগে অথবা একই সঙ্গে দরকার ধর্ষণ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার জনমত গড়ে তোলা। সেখানে ধর্ষিতা, সমাজনেতা, সাধারণ লোক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ, বিচারক, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যেকের একটি নিজস্ব ও দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকবে। ধর্ষণ সম্বন্ধে একটা সংজ্ঞাও এই পর্যায়ে নতুন করে ভাবতে হবে। শুধু অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা অনিচ্ছায় যৌন সম্পর্কে লিপ্ত করাই ধর্ষণ নয়। একটি মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ঘটালে স্বামী অথবা প্রেমিকও এই ধরনের দায়ে দায়ী হতে পারেন। পাশ্চাত্যে কোনো কোনো মেয়ে এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে আদালতে হাজির হয়েছেন তবে তা প্রমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়েছে।

AMARBOI.COM

পাশ্চাত্যের শিক্ষিত ও ধনী দেশগুলোতে ধর্ষণ একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। তবে সেসব দেশে এ অবাঞ্ছিত ঘটনাটির মূল্যায়ন, সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ ফলাফল আলাদা, আমাদের দেশের চেয়ে। ওখানকার শিক্ষিত ও সচ্ছল সমাজ, চলাচলের জন্যে যথোপযুক্ত ও উন্নততর যানবাহনের প্রতুলতা, আলোকিত পথঘাট, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি এমনিতেই মেয়েদের অনেকটা সাহস ও স্বস্তি জোগায়। তার ওপর ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং সর্বোপরি ধর্ষণের শিকারদের প্রতি পরিবার ও সমাজের উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েটির পরবর্তী স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সুস্থ পরিবেশ গঠনে সাহায্য করে। বিশ্ববিজয়ী বক্সার টাইসনের ধর্ষণকারী হিসেবে সাজাপ্রাপ্তি ও জামিনবিহীন কারাগারবাস এর একটি উদাহরণ, যেখানে অর্থ ও প্রতিপত্তি আইন লঙ্ঘনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেনি। টাইসন-কৃত অপরাধের অনুরূপ ঘটনা বাংলাদেশে অহরহ ঘটছে। পার্থক্য শুধু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ধর্ষণকারীকে এদেশে টাইসনের সামাজিক খ্যাতির কাছাকাছিও আসতে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ষণ এক ধরনের মারাত্মক নৈতিক লঙ্ঘন — সামাজিক ও আইনগত লঙ্ঘন তো বটেই। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যক্তিসত্তার ওপর এটি একটি ভয়ংকর লঙ্ঘন। ধর্ষণের একটি যথার্থ সংজ্ঞার যেমন প্রয়োজন, এ অপরাধের শিকার যে তাকে বা তার অবস্থাকে বর্ণনা করার ব্যাপারেও কিছু শব্দাবলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ও একমত হওয়ার প্রয়োজন। যে ধর্ষিতা, তাকে কেবল ধর্ষিতাই বলা হবে, অন্য কিছু নয়। সহানুভূতি ও সম্মান দেখাবার নামে ধর্ষণ শব্দটি পরিহার করে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তারই মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে থাকে ধর্ষিতা মেয়েটির সামাজিক ভবিষ্যৎ। শ্লীলতাহানি, সম্ভ্রমহানি, সতীত্ব খোয়া যাওয়া, ইজ্জত নষ্ট হওয়া ইত্যাদি শব্দ কোনোক্রমেই ব্যবহার করা উচিত নয় সংবাদমাধ্যমগুলোর। কেননা একটি মেয়েকে যখন জোরপূর্বক একটি অমানুষ তার নিজস্ব যৌনকর্মে ব্যবহার করে, তখন সেই মেয়েটির কেমন করে শ্লীলতাহানি ঘটতে পারে? তার সতীত্ব, তার শ্লীলতা, তার সম্মান কী করে অন্যের হাতে বন্দি? যদি কিছু ঘটে থাকে তাহলে এ অনধিকারচর্চার জন্যে মেয়েটি অত্যন্ত অপমানবোধ করবে, অসম্ভব ক্রোধান্বিত হবে, শারীরিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবে — মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হবে। তার ব্যক্তিস্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে, তার মানবিক অনুভূতির ওপর নির্দয় যথেচ্ছাচার ঘটেছে বলে। তার বেশি কিছু নয়। অক্ষত যোনি যেহেতু সততা বা পবিত্রতার সার্টিফিকেট নয়, সেহেতু এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে অপরাধের দায়ভার সারাজীবনের জন্যে নিরপরাধ মেয়েটির ওপর চাপিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, অবিবেচনাপ্রসূত ও নিষ্ঠুর আচরণ। একটি মেয়ের হাত মচকে দিলে, পা ভেঙে দিলে কিংবা কপাল ঠুকে রক্ত জমিয়ে দিলে যেমন শারীরিক নির্যাতন করা হয় তার ওপর, তার যোনির ওপর আঘাত হানলেও তেমনটি বা তার চেয়েও গুরুতর একটি দৈহিক নির্যাতন করা হয়। ধর্ষিতার কথা চিন্তা করার সময় তেমনি শারীরিক নির্যাতনের শিকার বলেই তাকে গ্রহণ করতে হবে সমাজে। তবে পার্থক্য হলো শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ওপর যে কারো হস্তক্ষেপ যেমন অবধারিতভাবেই অত্যাচার বা লঙ্ঘন, যোনির বেলায় ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এই বিশেষ অঙ্গটি প্রিয় মানুষটির কাঙ্ক্ষিত স্পর্শের জন্যেই যেহেতু তুলে রাখতে পছন্দ করে মেয়েটি, এর ওপর অযাচিত আক্রমণ ঘটলে শারীরিক কষ্ট ছাপিয়েও বাড়তি মানসিক কষ্টে ভোগে সে। তার এই কষ্টকে আরো ভারী করে সমাজের কালাকানুন আর বিকৃত মূল্যবোধ। ধর্ষিতা মেয়েটি এই অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কষ্ট পেলেও আমরা আশা করব সমাজ এ ঘটনার জন্যে তাকে কখনো দায়ী করবে না। শুধু তাই নয়, অপরাধীর শাস্তি বিধানের পর অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনের শিকার পুরুষ-নারীদের মতো ধর্ষিতাদেরও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাত্রায় অংশীদার করে নিতে হবে। ধর্ষিতার প্রতি এ ধরনের মনোভাব গড়ে তোলার মানে এই নয় যে, ধর্ষণের মতো একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধকে কম গুরুত্ব দেওয়া হলো। আইন এবং আদালত ধর্ষণকারীকে প্রচলিত ধারামাফিক অথবা আরো কঠোরভাবে বিচার করবে, শাস্তি দেবে। কিন্তু ধর্ষিতার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ অবশ্যই পাল্টাতে হবে। তবেই মেয়েরা সাহস করে বাইরে বেরোবার শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে। সমাজের অন্যান্য অপরাধের মতো ধর্ষণও ঘটবে আরো অনেককাল, হয়তো চিরকালই। কিন্তু সেই অপরাধের দায়ভার নিজের কাঁধে না চাপিয়ে অন্য দশটি অপরাধের মতোই ধর্ষণের ঘটনাকেও স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত করতে এগিয়ে আসবে মেয়েরা। তখন আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় নিয়োজিত প্রশাসক মহল যদি দুর্নীতির উর্ধ্বে উঠে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয় এবং তা কার্যকর করে আর সেইসঙ্গে সমাজ যদি ধর্ষিতাকে সহজভাবে মেনে নেয়, তাহলেই ধর্ষণের হার কমতে থাকবে। নির্যাতনের শিকার নিরপরাধ ধর্ষিতাকে চিহ্নিত করে তাকে পরিবার ও সমাজচ্যুত করে কলঙ্কময়ী আখ্যা দিলে এ ধরনের অপরাধ বাড়বে বৈ কমবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়না-কোকিলারা

একটি জাতীয় দৈনিকে একই দিনে দুটো সংবাদ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঘটনা দুটো অসাধারণ কিছু নয়। হরহামেশাই ঘটছে তা। কোনোটির সংবাদ পড়ছি খবরের কাগজে। কোনোটি জানছি লোকমুখে। ময়না বলে একটি চব্বিশ বছরের মেয়ে গত পরশু গাবতলীতে বাসের ভেতর বসে নিজের পেটে নিজে ছুরি চালিয়েছিল আত্মহত্যার প্রচেষ্টায়। কিন্তু কেন? সুস্থ একটি তরুণী ময়না। এমন নিদারুণভাবে কেন মরতে গিয়েছিল সে? ময়নাদের বাড়ি বগুড়ার গ্রামে। অভাবের তাড়নায় ছুটে এসেছিল রাজধানী শহরে। কাজের আশায়। অল্পবয়সী নিরক্ষর গরিব মেয়ে। নিজের পেট চালাবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ একটি বাসস্থানেরও দরকার তার। কোথায় পাবে তা? আশায় ভর করে ময়নারা সবসময়ই এসে ভিড় করে ভদ্র পরিবারে ঘরের কাজ করতে। তারাও লুফে নেয় ওদের—কেননা ওরা বড় প্রয়োজনীয় জীব। বড় সহজেই ওদের পাওয়া যায়। বড় বেশি সস্তা ওদের শ্রম। বড় অল্পতে ওরা খুশি। দু'বেলা দুটো ভাত, ঈদ বা পুজোয় একখানা নতুন শাড়ি, একটু হাসিমুখ আর মাস শেষে কয়েকটি টাকা। এছাড়া কীই-বা চাইবার আছে ওদের? বিনিময়ে আপনি ঘুম থেকে ওঠার অনেক আগেই ও উঠে রান্নাঘরে নাশতা বানাতে লেগে যাবে। ওর কাজ শেষ হবে না সবার ঘুমুতে যাওয়ার অনেক পরেও। নিজের পরিবারকে সে মাসের পর মাস বছরের পর বছর দেখে না। আপনার পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। আপনাদের খাওয়া-পরার দিকে যেমন দৃষ্টি তার, তেমনি সতর্কতা আপনার বাড়ন্ত সন্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারেও। কিন্তু বিনিময়ে কী পাচ্ছে তারা? আপনারা অনেকেই ওদের বিশ্বস্ততায় সন্দিহান। ফলে কুকুর-বেড়ালের মতো ওদের একা ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে অফিসে বা বেড়াতে বের হয়ে যান। এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করলে পরিষ্কার বলে দেবেন, ওদেরকে নিরাপত্তার জন্যে এটা করছেন। যা দিনকাল পড়েছে, কে না কে এসে দরজায় কড়া নাড়বে। বোকার মতো দরজা খুলে দেবে, আর সে দুর্বৃত্ত এসে চুরিটুরি করেই ক্ষান্ত হবে না—হয়তো মেয়েটির ওপরই চড়াও হয়ে বসবে। কিন্তু যুক্তির খাতিরে যাই বলুন আপনি আমি দুজনেই ভালোমতো জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসল কারণটা কী। মেয়েটিকে বন্দি করে রেখে যাচ্ছেন, কেননা তাকে আপনি বিশ্বাস করেন না। ওর নিরাপত্তার ব্যাপারটা নেহায়েতই একটি অজুহাত। যাকে বিশ্বাস করেন না ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্রের ব্যাপারে, তার ওপর নিজেদের খাওয়া-পরা, সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে কেমন করে আপনাদের আস্থা জন্মে আমার বোধগম্য হয় না। মেয়েটিকে আটকে না রেখে আপনাদের বিশেষ প্রিয় ও মূল্যবান জিনিস ও লোককেই নিরাপদ স্থানে তুলে রাখা যায় নাকি? এভাবে তালাবদ্ধ করে একটি মানুষকে ঘরে রেখে দিয়ে এই যে আপনি দিব্যি বেরিয়ে যাচ্ছেন, একবারও কি ভেবে দেখেছেন কী করবে এই মেয়েটি যদি ঘরে হঠাৎ আগুন লেগে যায়, যদি মাছ কাটতে গিয়ে ওর হাতের বড় শিরাটা কেটে গিয়ে অনর্গল রক্ত ঝরতে থাকে? যদি জানালা কেটে কোনো দুর্বৃত্ত এসে ওকে আক্রমণ করে ধর্ষণ করে? ওর নিরাপত্তা, ওর জীবনের কোনোই কি মূল্য নেই? এ অমানবিক আচরণের জন্যে সভ্য দেশ হলে আপনার কারাদণ্ড হয়ে যেত। এখানে কিছুই হয় না। হয় না, কেননা ময়নাদের পাখির মর্যাদাও দিই না আমরা — মানুষের স্বীকৃতি তো দূরের কথা।

কিন্তু এইভাবে ঘরবন্দি করে রাখলেই কি ওরা অন্তত শারীরিক নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়? না, পায় না। পায় না, কারণ তাদের যারা নির্যাতন করে তারা বাইরের কেউ নয় — ঘরেরই বাসিন্দা। ময়নার কাহিনি বড়ই পরিচিত। গৃহকর্ত্রীর অবিবাহিত ভাইয়ের লালসার শিকার হয়েছিল সে। পুরাতন সেই ফন্দি। একই রকম ধোঁকাবাজি। ময়নার শারীরিক সান্নিধ্যে আসার অভিপ্রায়ে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি ও ছলনা। কোকিলার মতো ময়নার পেটে অবধারিতভাবে সন্তানের আগমন। খুব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। যথাসময়ে গৃহকর্তা-কর্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতায় গর্ভপাত। যুবকটির ভিন্ন শহরে পলায়ন। তারপর একদিন দুপুরে বাড়ির মালিক ও পত্নীর অবর্তমানে তার চুপি চুপি প্রত্যাবর্তন এবং ময়নার ওপর বলাৎকার। না, ধর্ষণ একে তারা বলবে না। কেননা যে মেয়ে ভালোবেসে-সংসার পাতার আশায় একদিন স্বেচ্ছায় শারীরিকভাবে এই যুবকটির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, কোন্ মুখে সে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে আজ? ময়নাদের আবার কিসের মানসম্মানবোধ, কিসের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কিসের দেমাক? ফলে গৃহকর্ত্রীর ভাই স্বভাবতই এত কিছুর পরও আবার ময়নার ওপর জোর করতে সাহস পায়। মুখোশ খুলে পড়েছে তার। এবার আর ছলনা নয় — পুরোপুরি বল প্রয়োগ। ময়নাও এতদিনে বুঝে গেছে পুরো ব্যাপারটা। নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কঠিন বাস্তবতাকে চিনে ফেলেছে সে। তা সত্ত্বেও সে তার শারীরিক ও সামাজিক সামর্থ্য দিয়ে এই নতুন করে সংঘটিত অন্যায়কে রোধ করতে পারেনি। কিন্তু তার মতন করে সে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। গৃহকর্ত্রীকে তার আদরের ভাইয়ের দ্বিপ্রাহরিক কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দিয়ে। কিন্তু কি হলো এর প্রতিক্রিয়া? অতি সহজ ও অনুমেয় সে ফলাফল। ভাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। ফলে ঝিটিকে বিদায় করে দিতে চাইলেন গৃহকর্ত্রী বোনটি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে ময়নাকে বগুড়ার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু বাদ সাধল ময়না। এত সহজে গোটা সমস্যাটির সমাধান সে করতে দিল না। যেটা ছিল তার আত্মহননের চেষ্টা — সেখানে যখন বিফল হলো সে, হৈচৈ বাধিয়ে ওকে কোকিলার সমগোত্র করে তুলল খবরের কাগজের লোকজন। আমরা জানলাম আরো একটি ভীত অসহায় পাখির কথা। কোকিলা নয়, এবার ময়নার পালা। কিন্তু নিজের পেটে ছুরি চালাল ময়না? মাত্র কিছুদিন আগে গর্ভপাত ঘটেছে তার শরীরে। সেই জ্বলন্ত স্মৃতি বুকে ধারণ করেও তাকে শরীর পেতে দিতে হয়েছিল একই প্রতারকের লালসার কাছে। সেই ঘৃণা — সেই লজ্জাতেই কি? ময়নার কি ভয় হয়েছিল আবার সে গর্ভবতী হয়ে পড়বে? তাই কি পেট ফুটো করে কয়েক ঘণ্টা আগের সেই দুঃসহ মিলনের ভার থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল সে? নাকি সে পেটের দায়ে আজ যে জীবনের এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, সেই পেটটিকেই বিনষ্ট করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছিল সে? ময়না কি তার কলঙ্কিত মুখ পরিবারকে দেখাতে লজ্জা পেয়েছিল? আমি জানি না। কিন্তু ময়না, কেন এত সহজে তোমরা হাল ছেড়ে দাও? তোমার বেঁচে থাকার অধিকার, তোমার মানসম্মান কেমন করে অন্যের হাতে জিম্মি হতে পারে? তুমি ঠকেছ — কিন্তু অপরাধী তো তুমি নও। রুখে দাঁড়াবার সামর্থ্য তোমার নেই, আমি জানি। কিন্তু তাই বলে নিজেকে কেন বিনাশ করবে? তোমার সুবিচার পাওয়ার দিন খুব কাছে নয়, আমিও জানি। কিন্তু অবিচার-নির্মমতা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা তো করবে। পৃথিবীটা কি এতই ছোট যে, ওই একটি পরিবারের অমানবিকতা-নিষ্ঠুরতায় তুমি আর কোথাও বেঁচে থাকার জন্যে জায়গা খুঁজে পাবে না? অন্তত চেষ্টা করে দেখবে না একবার। মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে চলো ময়না। বাঁচতে হবে তোমাকে।

আসলে এ শুধু ময়না আর কোকিলার কাহিনি তো নয়। চারদিকে রয়েছে ওদের মতো আরো অনেক প্রাণী — টিয়া, টুনটুনি, রোকেয়া, শেফালি, লক্ষ্মী আরো কত কী। একই দিনে কাগজে পড়লাম, আমাদের দেশের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাসায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ঘরের ষোলো বছরের কাজের মেয়েটি। অবিচারের নমুনা বিশ্লেষণ না করলেও কাগজে উল্লিখিত রয়েছে, গৃহকর্তার অত্যাচারের শিকার হয়েছিল সেই ষোড়শী সুন্দরী। এর কিছুদিন আগেই অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল আরো একজন প্রভাবশালী ধনীর রাজধানীর বাড়িতে। পরশুর কাগজেই কি পড়লাম, একটি যুবতী কাজের মেয়ের কথা, যাকে বায়তুল মোকাররম ও স্টেডিয়ামের আশেপাশে মারাত্মক জখম নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, গৃহকর্ত্রীর শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে সে। তাকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো, তার নিম্নাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা। এটুকুই ছিল খবর। কিন্তু কেন এ ব্যথা নিম্নাঙ্গে? কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল এই তরুণীটির? কেন গৃহকর্ত্রী এতটা ক্ষুব্ধ হলেন তার প্রতি? কিছুই জানি না আমরা। শুধু অশুভ — শুধু অন্যায়ের গন্ধ পাই। অনুরূপভাবে আরেকটি কিশোরীকেও পাওয়া গিয়েছিল রাস্তায়, যার গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছিল গৃহকর্ত্রী। সারা গায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল মেয়েটির। কয়েক মাস আগে, খুব সম্ভবত চট্টগ্রামে, গৃহকর্তার বিকৃত লালসার শিকার হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কয়েক তলা ওপর থেকে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও নিচে লাফিয়ে পড়েছিল একটি কাজের মেয়ে। মারা সে যায়নি তৎক্ষণাৎ। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল সে, শেষ খবর যখন পেয়েছি তখন পর্যন্ত।

প্রশ্ন আমার, আমাদের দেশে সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটাই কি অমোঘ বাস্তবতা যে, এ ধরনের ঘটনা ক্রমাগত ঘটতেই থাকবে? তথাকথিত ভদ্র ঘরে যেসব মেয়েরা আসে ঘরের কাজ করতে, তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার কোনোই কি ব্যবস্থা করা যাবে না? বাইরে তো এদেশের মেয়েরা কখনোই নিরাপদ বোধ করে না — সে কারণেও অনেক মেয়ে নানান গঞ্জনা সয়েও ঘরে কাজ করতে আসে। সেই পারিবারিক পরিবেশেও পাশবিকতার শিকার হবে ওরা? এই অসহায় মেয়েগুলো একদিকে সংসারের পুরুষদের লালসার সামগ্রী হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ির স্ত্রীলোকদেরও চক্ষুশূল তারা — প্রতিমুহূর্তেই সন্দেহ, ঈর্ষা ও ঘৃণার পাত্র। দু'দিকের যুগপৎ অত্যাচার, নিপীড়ন ও অবহেলায় অনবরত পিষ্ট হয়েও মুখ ফুটে নিজের নিজের অসহায়ত্ব, নিজের গ্লানির কথা কাউকে বলতে পারে না তারা। সংসারে আশ্রিত কাজের মেয়েদের নিরাপত্তার জন্যে কিছু আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সরকার, মহিলা পরিষদ ও অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহযোগিতা দরকার। বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে ঠিকে কাজের মেয়ে দিয়েই কাজ চালাতে হবে — সার্বক্ষণিক কাজের মেয়ে রাখা যাবে না, এ ধরনের নিয়ম করার কথা ভাবা যায়। আইন বা নিয়ম চালু করলেই তা মেনে চলা হবে, অন্তত আমাদের দেশে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু অন্তত আইনে কোনো দাবি স্বীকৃত থাকলে তার বিচ্যুতি বা লঙ্ঘনে শাস্তি বিধান সহজতর হতে পারে। কাজের মেয়ে তথা গোটা নারী সমাজের ওপর শারীরিক নির্যাতনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। ঘরের কাজের মেয়েদের জন্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন তাদের সুচিকিৎসা, বার্ধক্যকালীন আর্থিক নিশ্চয়তা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকরভাবে থাকার ব্যবস্থা করা যে রকম জরুরি, তেমনি জরুরি এই মুহূর্তেই তাদের একা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা। সেদিন শেখ হাসিনা জনসভায় স্বীকার করেছেন যে, দেশের ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন রোধে ব্যর্থতার দায়ভার তাঁরও রয়েছে। আমরা আশা করব, বেগম খালেদা জিয়াও নারীসমাজের এই দুর্দিনে অনুরূপ স্বীকারোক্তি করবেন। তারপর এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ও গঠনশীল ভূমিকা রাখতে প্রথমেই ঘরের কাজের মেয়েদের কল্যাণে সত্বর কয়েকটি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সঙ্গে আমাদের গৃহকর্ত্রীদের কাছে আমার একটি সবিনয় নিবেদন। আপনারা যৌন কেলেঙ্কারিতে সর্বদা কাজের মেয়েটিকেই দায়ী করেন, নিজেরাই একটু ভালো করে ভেবে দেখুন আসল অপরাধীটি কে? আপনার স্বামী, ভাই বা পুত্রকে কোনোমতেই ফুসলে নিচ্ছে না কাজের মেয়েটি — সে সামর্থ্য বা সাহস তার নেই। আপনার ভালোবাসার পাত্রটিই উত্ত্যক্ত করছে এই খেটে-খাওয়া নিরীহ কাজের মেয়েটিকে। আপনার অগোচরে কত মিথ্যে, কত প্রতারণা যে করছে তারা, চোখ খুলে তা দেখতে বা বুঝতে চেষ্টা করুন। একজন নারী হয়ে অন্য নারীর সর্বনাশ করবেন না। ময়নাদের বাঁচতে দিন। দোষীকে শনাক্ত করুন — শাস্তি দিন। ভুলে যাবেন না — বাঁচার বড় সাধ ছিল কোকিলার। ময়নারও। আমার আপনার মতোই খিদেয় কাতর হয় ময়না-কোকিলারা। আমাদেরই মতো প্রয়োজন হয় ওদের ভালোবাসার-স্নেহের। ওদের দিকে ফিরে তাকান। হেসে কথা বলুন। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে একবার ঘুরে দেখে আসুন ওদের শোয়ার ব্যবস্থা। সেখানে যেভাবে শুয়ে থাকে ওরা, ভেবে দেখুন সেটা কতটা নিরাপদ। পরগৃহে সেখানে সে অবস্থায় আপনার বোন বা কন্যাকে আপনি ঘুমুতে দেবেন কি না।

আপনাদের সঙ্গে অবশ্য আমিও একমত। সব যৌন নিপীড়নের জন্যেই রাতের আঁধার দরকার হয় না। আত্মা ও কর্মে যারা শুদ্ধির প্রয়োজন বোধ করে না, সুযোগ তারা যেমন করে পারে সৃষ্টি করে নেবেই। কিন্তু আমরা যেন তাদের সহযোগী শক্তি না হই। আর তাই ময়নাকে যতদিন ঘরবন্দি করে রাখছেন তালা দিয়ে, সতর্ক থাকবেন তার চাবি যেন কেবল আপনার আঁচলেই বাঁধা থাকে। মনে রাখবেন, ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার-আমার সকলের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরাতির রাত্রি

বাঁশঝাড়ের ভেতর আমি শুয়ে আছি। আমার চোখের সামনে, অনেক উঁচুতে, ঝিরঝিরে বাঁশপাতাগুলো এ-ওর গায়ে গিয়ে নাড়া দিচ্ছে। অল্প অল্প হাওয়া বইছে চারদিকে। এতক্ষণে একটু একটু ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে আমার। গত এক-দেড় ঘণ্টা, নাকি তার চেয়েও বেশি, আমার কোনো বোধ ছিল না — ঠাণ্ডা-গরমের তো বটেই, বাঁচা-মরারও। জীবনে এমন বোধহীন আর একবারই মনে হয়েছিল নিজেকে, স্বামীর হাতে মার খেয়ে যেদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম ট্রেনে করে। আর কখনো ফিরে যাইনি সেখানে। আমি এখন শুয়ে আছি বাঁশবাগানের ঠিক মধ্যখানে। আকাশের দিকে মুখ করে। উদোম গায়ে, খোলা চুলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি আমি। আমার চারপাশে ঘন বন। সারি সারি উঁচু উঁচু সবুজ বাঁশগাছ। মাথার ওপর বাঁশের সরু লম্বা পাতাগুলো মৃদু হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে। কী রকম এক অদ্ভুত শনশনে শব্দ হচ্ছে সেই সঙ্গে। লোকে বলে বাঁশঝাড়ে অনেক বিষাক্ত সাপ থাকে। কিন্তু এই গভীর রাতে বাঁশবাগানের মাঝে শুয়ে থাকতে আজ আমার একটুও ভয় করছে না আর। যদিও সাপকে আমার বরাবরই ভয়ংকর মনে হয়।

আকাশের ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় এক চাঁদ। গত পরশুই ছিল পূর্ণিমা। আজকের রাতকেও পূর্ণিমা বলেই ভুল হয়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আমি চাঁদটাকে আরেকবার ভালো করে দেখে নিই। কী নির্লজ্জ, কী অবিকৃত তার চেহারা। যেন কিছুই হয়নি আজ রাতে। বাঁদিকে ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দেখি ওরা তিনজন ফিসফিস করে কী আলোচনা করছে এখন গভীর মনোযোগ দিয়ে। অঘ্রানের রাত্রি। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে বৈকি! তবু যে রকম চাদর আর মাফলারে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ওদের জড়ানো, অতটা শীত নিশ্চয়ই পড়েনি!

বাঃ! চমৎকার! সাবাস তোমাদের গতি। এরই ভেতর প্যান্ট, শার্ট, সোয়েটার, চাদর, মাফলার সব পরে নিয়েছে। একজনের মাথার ওপর টুপিও রয়েছে একখানা। ভদ্দরলোকের মতোই দেখাচ্ছে এখন ওদের। আমি একবার ওঠার চেষ্টা করে আবার শুয়ে পড়ি। ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা। পিঠে-তলপেটেও। মনে হয় না আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারব সোজা হয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁ হাতটা এনে খোলা পেটের ওপর রাখি। নাভির কাছে হাত বুলাই। মনে হয়, এ আমার শরীর নয়। অন্য কারো পেট, অন্য কারো ত্বকে হাত দিয়েছি; আস্তে আস্তে আমি খুঁজতে থাকি আমার জামা, পায়জামা, ওড়না — যেগুলো সাপের খোলসের মতো আমার শরীর থেকে একে একে খসে পড়েছিল কিছুক্ষণ আগে। আমাকে টেনেহিঁচড়ে এক রকম ছিলে ফেলেছিল ওরা পাখা ছাড়ানো মুরগির মতো। গোটানো পায়জামাটা এখনো পায়ের গোড়ালির কাছে আটকে আছে। শরীর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি ওটা। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে চারদিক। আমি বাঁশবাগানের ঘাসের ওপর নয়, রীতিমতো এক চৌকির ওপর শুয়ে রয়েছি। কী চমৎকার ব্যবস্থা! কী সুচিন্তিত আয়োজন। রীতিমতো রাজকীয়।

ওড়নাটা চৌকির ওপরেই ছিল। অন্তর্বাস ও কামিজটা ঘাসের ওপর। আমি ওগুলো দ্রুত পরে নিই। পায়জামার ফিতা বাঁধি। ওরা এখনো খানিকটা দূরে আলোচনায় মগ্ন। তিনজনের হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেটের লাল বিন্দু বিন্দু আগুন চকমক করে জ্বলছে। যেমন জ্বলছিল ঝকঝকে ছুরিটা কিছুক্ষণ আগে। গলার কাছে ওভাবে সর্বক্ষণ ছুরি ধরে রাখার কোনো দরকার ছিল না ওদের। ওরা জানত না তার আগেই আমি যুদ্ধে নতি স্বীকার করে নিয়েছি। বুঝে গিয়েছি নিজের সুস্বাস্থ্য ও গায়ের জোর নিয়ে যে বড়াই যে সাহস ছিল আমার, আজ রাতে তার কোনো দাম নেই। ওরা জানে না, ওদের সবাইকেই আমি চিনতে পেরেছি। একবার প্রায় চিৎকার করে বলে ফেলতে চেয়েছিলাম 'দুলাল, তুই?' পরক্ষণেই সামলে নিয়েছি। ছুরি দিয়ে গলার ধমনি কাটতে সামান্যই নাকি সময় লাগে। আর এই গহিন বাঁশবাগানে আমার পচা-গলা শরীরটা দু'চার দিন পর আবিষ্কারের এই সুযোগ, এই যন্ত্রণা কেন দেব গ্রামবাসীকে? আমার বৃদ্ধ বাবাকে? আমি তাই শেষ মুহূর্তে আর কোনো বাহ্যিক প্রতিবাদই করিনি। শুধু নিজের অজান্তেই যতক্ষণ পারা যায় পা দুটো যতটা সম্ভব শক্ত করে একত্রে চেপে ধরে টানটান করে শুয়েছিলাম। আমার তখন মনে হয়েছিল, একে একে খসে পড়ছে শুকনো গাছের পাতা, শীতের বিকালে এলোমেলো হাওয়ায়। আমার ঠোঁট দুটো আমায় ছেড়ে গেছে বেশ খানিকটা আগেই। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে টের পেয়েছি ভেতরে ও বাইরে ওগুলো ক্ষতবিক্ষত। অনেকটা ফুলেও গেছে। তারও আগে গেছে স্তনজোড়া। ওরা যেন হোলিখেলায় মেতে উঠেছিল ওগুলো দিয়ে। আমার শরীরটা — বাইশটি বছর ধরে, মাঝখানে তিন মাস সময় ছাড়া, যাকে অবিরত পাহারা দিয়ে রেখেছিলাম হঠাৎ যেন আর আমার রইল না। এক নারকীয় উৎসবে মেতে উঠল ওরা আমাকে নিয়ে। ওদের দাঁতগুলো সাপের দাঁতের মতো সুচালো। সাপের কামড় কখনো খাইনি কিন্তু এর চেয়ে ভয়ংকর, এর চেয়ে ধারালো নিশ্চয়ই হতো না। চৌকি, লাঠি, ছুরি, টর্চ লাইট, দড়ি সবকিছু নিয়েই ওরা প্রস্তুত ছিল। আয়োজনের ত্রুটি করেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো। তবু কী সাংঘাতিক অধৈর্য ছিল ওরা। ঘরে ঢোকার পর থেকেই আমার বুকে অন্ধকারে তিন জোড়া হাত ক্রমাগত হাতড়ে বেড়িয়েছে। বাঁশবাগানে পৌঁছানোর আগে থেকেই এটা করেছে ওরা। সবুর সয়নি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল নিঃশ্বাস নিতে পারছি না আমি। মুখটা কাপড়ে বাঁধা ছিল বলেই কি না কে জানে, আমার মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার। তারও আগে মনে হয়েছিল, দুঃস্বপ্ন দেখছি। কাপড়ে মুখ চাপা থাকা সত্ত্বেও বাঁ হাত দিয়ে আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার পাশে শুয়ে থাকা হালিমাকে জাগিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া কর্কশ হাত এসে আমার হাত দুটোকে বেঁধে দিয়েছিল দড়ি দিয়ে। আমি তখন ডান পা উঁচু করে আবার দিলাম এক লাথি হালিমার ঠ্যাংয়ে অথবা পেটে। মেয়েটি আকারে আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট। ফলে ডান পা-টা অনেকটা ওপরে উঠিয়ে তারপর বাঁ দিকে ঠেলে দিতে হয়েছিল আমায়। একটু শুধু উঃ শব্দ করে হালিমা পাশ ফিরে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে থাকল। জাগল না। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমার পা জোড়াও বেঁধে ফেলল। তারপর তিনজোড়া বলিষ্ঠ হাত আমায় চ্যাং দোলা করে মশারির বাইরে নিয়ে এলো। চৌকির পাশেই টেবিল ও চেয়ার। আমার কাগজপত্র, রেজিস্টার খাতা, সবই টেবিলের ওপর। বেরোনোর মুখে লাথি দিয়ে চেয়ারটা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। যদি পাশের ঘরে কারো ঘুম ভাঙে তাতে। কিন্তু না, চেয়ারটা পড়ল না মাটিতে শুধু একটু সরে গিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে গিয়ে বাড়ি খেল একটা! তেমন কোনো শব্দ হলো না তাতে। বাড়ির কেউ জাগল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতের আঙুল আমার চাপা দেওয়া মুখের দুপাশের গালে প্রচণ্ড শক্ত করে চাপ দিল। বুঝলাম আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে অবাধ্য না হওয়ার জন্যে। অন্য দুখানা হাত তখন আমার বুক খাবলে খেতে ব্যস্ত। দরজা খুলে আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার মুখেও শেষবারের মতো একটা প্রচণ্ড লাথি ছুড়ে দিলাম আমি দরজার পাশে ঢেউটিনের গায়ে। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হলো। টিনের গায়ে নয়, কাঠের দরজার একপাশে মৃদু শব্দ করে আমার পা দুটি নিজেই কাঠের মতো শক্ত অসাড় হয়ে রইল।

ঘরের ভেতর যতটা অন্ধকার ছিল বাইরে তেমনটা নয়। দরজা দিয়ে বেরোতেই আকাশে বড় চাঁদটি চোখে পড়ল। তিনটি শক্তসমর্থ মানুষ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। শুধু মৃত মানুষকেই এভাবে শোয়ানো অবস্থায় কোথাও নিয়ে যায় তিন বা চারজন মানুষ। নিয়ে যায় কবর দিতে। আমি কি তাহলে মরে গেছি? নাকি স্বপ্ন দেখছি? এরই মধ্যে একজন মাফলারের আড়াল থেকেও আমাকে প্রচণ্ড শাসিয়েছে। চকচকে ছুরিটি বের করে বলেছে, 'একটু শব্দ করেছিস কি একদম জবাই।'

ওরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে না পারলেও কেন নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই বুঝে গেছি। ফকফকে জোছনা চারদিকে। কাজীদের কলাবাগান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরিয়ে বালির পুকুর পার হয়ে লক্ষ্মণদের বটগাছটা ডাইনে ফেলে পুকুরের উত্তর পাশ দিয়ে ওরা আমাকে নিয়ে চলেছে। লম্বা কাশফুলগুলো পুকুরপাড়ে হাওয়ায় তিরতির করে নড়ছে, যেমন দেখেছিলাম বিকালবেলায়। ওদিকে তো কোনো লোকালয় নেই। কোথায় যাচ্ছে ওরা তাহলে? অবশেষে বাঁশবনের পাশে এনে আমাকে দাঁড় করাল ওরা। এখনো নাকে আসছে তীব্র গোবরের গন্ধ। সেই হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর থেকেই গন্ধটা পাচ্ছি। এতক্ষণে গন্ধের উৎস কোথায় বুঝতে পারলাম। কাল ক্লিনিক থেকে ঘরে ফেরার পথে আমার সাইকেলটা ডেবে গিয়েছিল ভাঙা রাস্তার বাঁ পাশের খাদে। ওখানে জমে থাকা একগাদা গোবরের ছিটা এসে পড়েছিল আমার সাদা পায়জামার পায়ের কাছটিতে। রাতে ধুলে শুকাবে না বলে পায়জামাটা আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিলাম চেয়ারের ওপরে। ওরা সেই সাদা পায়জামাটা দিয়ে আমার মুখ বেঁধে এনেছে। গোবরের গন্ধে আমার রীতিমতো বমি আসছে এখন।

হিড়হিড় করে ওরা আমায় টেনে নিয়ে গেল বাঁশঝাড়ের ভেতর। একটা চৌকি পাতা রয়েছে সেখানে। দুজন এগিয়ে এসে আমাকে চৌকির ওপর ঠেলে ফেলে দিল। আয়োজনের কোনো ত্রুটিই রাখেনি ওরা। ওদের সকলের মুখ আর মাথা মাফলারে জড়ানো। কিন্তু গলার আওয়াজে একজনকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। গত মাসেই রাস্তায় আমাকে সাইকেল ধরে থামিয়েছিল সে, 'এই ডাক্তার আপা, আপনার ব্যাগে কী আছে?'

'ওষুধ আছে। পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতির জিনিস আছে। খাবার স্যালাইন আছে, ব্লাড প্রেসার মেশিন, থার্মোমিটার ...। কিন্তু আপনি আমাকে এভাবে রাস্তায় সাইকেল ধরে থামালেন কেন?'

'আমার একটা পদ্ধতি দরকার। কনডম কেমন করে ব্যবহার করতে হয় দেখিয়ে দেবেন ডাক্তার আপা?'

'আমি ডাক্তার না, ডাক্তারকে চাইলে ক্লিনিকে যাবেন। আর কনডমের ব্যবহার তো আমি আপনাকে দেখাতে পারব না। আপনার স্ত্রীকে বলবেন আমাকে ডাকতে। তা না হলে তাকে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝিয়ে দেব।' তবু সাইকেল ছাড়ে না সে। আমি দেখি আমার প্রথম কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আত্মরক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করি তখন। একটুও ঘাবড়াই না। তৃতীয় বা শেষ পদ্ধতি অর্থাৎ লোকজনকে চিৎকার করে ডেকে এনে কোনো ফল হবে না। জানি, আমাকে এ গ্রামেই কাজ করতে হবে।

'আচ্ছা, আপনার মতো মানুষ যদি এমন ব্যবহার করে আমার সঙ্গে অন্য ছেলে-ছোকরারা, সন্ত্রাসীরা কী করবে? আপনি সাংবাদিক মানুষ। ছেলেপুলেদের ইংরেজি শেখান। আপনার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী। আপনি কেন এ রকম করছেন? আমি কী দোষ করেছি?'

'সত্যি কথা বলব? তোমাকে দেখলেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই।'

এসব ঘটে যাওয়ার পরও আবার কয়েকবারই দেখা হয়েছে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে। আসতে যেতে। কখনো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত নাড়িয়েছে, কখনো দু-চার কথা অথবা কুশল বিনিময় করেছে। লোকটিকে ভয়ংকর অথবা সাহসী কোনোটাই মনে হয়নি আমার।

ওর সম্পূর্ণ মুখটা আমি ভালো করে দেখিনি। কিন্তু গলার স্বর শুনে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া ওর দাড়ি-গোঁফও টের পেয়েছি, চারদিকে মাফলার জড়ানো থাকা সত্ত্বেও।

দুলালের উপুড় করা মুখ থেকে অবশ্য মাফলারটা ঝটকা মেরে খুলে ফেলেছিলাম আমি। ডান হাত দিয়ে ওটি দূরে ছুড়ে ফেলতে গিয়ে প্রায় বলে ফেলেছিলাম, দুলাল, তুইও শেষ পর্যন্ত — কিন্তু বলিনি। একটা শব্দও মুখ দিয়ে বেরোয়নি আমার। ছেলেটা চন্দ্রার কাছে কোথায় মিলিটারিতে কাজ করে। মাঝে মাঝে আসে গ্রামে। ছোট ছোট চুল। ফর্সা গায়ের রং। ক্লিন শেভ করা মুখ। একটু বখাটে প্রকৃতি। আমাকে দুবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। 'তোর চাইতে আমার বয়স কত বেশি জানিস।'

'আমরা সমবয়সীই হব। শুনেছি তুমি আমি একই বছর এইচএসসি পাস করেছি।'

'পাগল! সে তো অনেক পরে। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি অনেক আগে। তারপর বিয়েও হয়েছিল একবার। তুই পিচ্চি ছেলে। আমার পেছনে লাগছিস কেন রে?'

যাই বলি না কেন, আমার বড্ড বাড় বেড়েছিল। কাউকেই ভয় করতাম না। এই চাকরিটা নেওয়ার পর থেকে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে করতে মনে হয়েছিল, সমস্ত পৃথিবীটা আমার মুঠোর ভেতর। আমার পরিশ্রম ও ক্ষমতা সবটাই ব্যয় করে আমি অনবরত কাজ করেছি। আর তা করতে গিয়ে যেসব বাধা-বিপত্তি এসেছে আমি ভাবতাম, আমি ভালো করেই জানি তা কেমন করে মোকাবিলা করতে হয় — ঠেকাতে হয়। তাছাড় এরা তো সকলেই আমার পরিচিত। সুখে-দুঃখে গত তিন বছর ধরে এদের সঙ্গেই মিলেমিশে আছি। ওদের ভয় কী? আমার এই অহংকার, এই তেজ বোধহয় বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আর তাই এভাবে বাঁশঝাড় থেকে আমাকে পাগলা কুকুরের মতো দৌড়ে পালাতে হচ্ছে এখন। ওরা আমার পিছু নেয়নি। থামাতে চেষ্টা করেনি। আমি জানি, আমাকে আর প্রয়োজন নেই ওদের। আমি যত দূরে চলে যাই তত ভালো ওদের। কিন্তু আমি এখন কোথায় যাব?

সেই টিন আর মাটির পরিচিত ঘরে? যে ঘরের বড় ছেলে বিছানায় ঘুমন্ত স্ত্রী আর কন্যা রেখে প্রতিবেশী দুবন্ধুর সঙ্গে তাদেরই বসতবাড়ির একটি ঘর থেকে আমাকে তুলে নিল বাঁশজঙ্গলে? কিন্তু এখনো অনেক রাত বাকি। ঘরে না গিয়ে উপায় কী আমার? আর তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার গৃহকর্ত্রী আমার মুখে সব শুনে সেই যে অজ্ঞান হয়েছে, এখনো দাঁতে দাঁত লেগে পড়ে রয়েছে। বড় পুত্রবধূ শিশুকন্যাটিকে বুকে টেনে নিয়ে চুপ করে বসে আছে খাটের কোনায়। বাড়ির বড় ছেলের দেখা নেই। বৃদ্ধ গৃহকর্তা আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, 'তুমি এখন কী করতে চাও মা? বাড়াবাড়ি করবে? নাকি আমার ওপর ছেড়ে দেবে? আমার এই নিরপরাধ বউটি, নাতিনটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে ক্ষমা করো মা। নিজের বাড়িতে তোমাকে থাকতে দিয়ে রক্ষা করতে পারিনি। আমি ওই পাষণ্ডটিকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেব। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব।' বৃদ্ধ কাঁদতে শুরু করেন আমার হাত ধরে। তার দুই কন্যা আমার চোখের দিকে তাকায় না। মার শুশ্রূষায় ব্যস্ত।

আমি কিছু না বলে আবার আমার সেই পুরনো ঘরে ফিরে যাই। বাড়িওয়ালার ছোট মেয়ে হালিমা এখনো তেমনি করে ঘুমোচ্ছে। ও কিছুই জানে না — কত কিছু ঘটে গেল এই রাতে। মাটির ঘরের এ পাশের বেড়া গোল করে কাটা। ওটা দিয়েই তাহলে ঢুকেছিল ওরা — অথবা একজন। লেপামোছা মাটির মেঝেতে অনেকগুলো পায়ের দাগ।

চেয়ারটা এখনো বাঁকা হয়ে আছে। আমি ভাবতে শুরু করি, কী করব আমি এখন। ভাবতে ভাবতে হালিমার পাশে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। সারা শরীরে ব্যথা, বসে থাকা শক্ত। একবার মনে হয় এখুনি গিয়ে খুব ভালো করে গোসল করে নিই। তারপর চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকি হালিমার সঙ্গে। ঘুম থেকে উঠে ভাবব ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। অন্যান্য শনিবারের মতোই সাপ্তাহিক মিটিংয়ে চলে যাব অফিসে সকাল ন'টায়। কাউকে জানতে দেব না কী হয়েছে। কারো কৌতূহল, কারো করুণার পাত্রী হব না। যে ঘরে, যে পরিবারের সঙ্গে দুটো বছর ধরে আছি, কাল রাত এগারোটা পর্যন্তও অন্যদের সঙ্গে যার পাশে বসে টেলিভিশন দেখেছি, তাকেই যখন আবার আবিষ্কার করতে হয় বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে, তখন আর কোথায় পালাব আমি? ভাবতে ভাবতে ঘামে স্বেদে ভেজা কাপড় জামাগুলো একে একে খুলে ফেলি গা থেকে। ওগুলোকে দলা পাকিয়ে লাথি দিয়ে ছুড়ে মারি চৌকির নিচে। একটা পেটিকোট ও ব্লাউজ পরি আলনা থেকে নিয়ে। সর্বাঙ্গে ব্যথা। বুক ও পেটের চামড়ার ওপর চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত শরীরটাই ক্ষতবিক্ষত। গোসল করার ইচ্ছাটা আপাতত দমন করি। আমি শুনেছি, গোসল করলে সমস্ত আলামত মুছে যেতে পারে। কিন্তু আমি কি সেই সব চিহ্ন ধরে রাখতে চাই? আমি কী করব সেটাই যেন বুঝে উঠতে পারছি না। এসব ঘটনা সবসময় কাগজেই পড়েছি। কখনো দেখিনি বা শুনিনি আশপাশের পরিচিত কারো জীবনে ঘটতে। মা যদি আজ বেঁচে থাকত, আমার দশা দেখে হার্টফেল করত।

একটা হলুদ রঙের তাঁতের শাড়িতে কোনোমতে নিজেকে জড়াই। শহর থেকে এখানে আসার পর থেকে শাড়ি পরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরলেও কেবল ঘরে। শাড়ি পরে বাইরে বেরিয়ে আমি দেখেছি। প্রশংসার নামে কেউ কেউ লোভী চোখে তাকায়। তার চেয়ে এই ঢিলেঢালা লম্বা সালোয়ার-কামিজই ভালো — এটাই মনে হতো আমার। চলাফেরায়ও অনেক সুবিধা তাতে। কিন্তু শেষ রক্ষা তো হলো না এতেও।

হালিমার পাশে বিছানায় বসে বালিশটা পিঠের নিচে দিয়ে গাটা একটু এলিয়ে দিই। এতকিছুর পরও পোড়া চোখে ঘুম আসছে দেখে অবাক হই। এক-দেড় ঘণ্টা পর যখন চোখ খুলি, দেখি সকাল হয়ে গেছে। ঘুমোনোর আগে যেমন শুনেছিলাম, জেগেও শুনি বাড়ির ভেতরে নিচু স্বরে একটানা আহাজারি চলছে। যেন কেউ মারা গেছে।

আমি আর দেরি করি না। কাল রাতে বাড়িওয়ালাকে বলেছিলাম সকাল হলেই আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু আজ সকালে উঠে আমি ঠিক করলাম অন্য কোথাও না, অন্য কারো কাছে না, সোজা অফিসেই যাব আমি। সেখানে গিয়ে শান্তিদাকে সব খুলে বলব। শুধু শান্তিদাকে। হ্যাঁ, এই একটি লোকের কথাই বারবার মনে হচ্ছে এখন। শান্তিদাই আমায় বলে দেবেন কী করব আমি।

আমি তাড়াতাড়ি অফিসে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ি। সাইকেল, ব্যাগ, রেজিস্টার খাতা কোনোকিছু না, খালি হাতে আজ অফিসে যাচ্ছি আমি। হালিমা তখনো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ওর ডান হাতটা মশারির বাইরে শূন্যে ঝুলছে। বেরোনোর আগে আমি ওর হাতটা বিছানার ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিই। যেতে যেতে মাথায় হাত দিয়ে টের পাই, বাঁশের শুকনো ভাঙা পাতাগুলো আমার এলোমেলো চুলের ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে পড়েছে। বাঁ হাত দিয়ে তা পরিষ্কার করতে করতে অফিসের সামনে এসে দাঁড়াই। লোকজন চলাফেরা করতে শুরু করেছে এরই ভেতর। আমার মনে হচ্ছে সকলেই আমাকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে।

আমি জানি, অনেক সকালে অফিসে চলে আসেন শান্তিদা। অফিসের নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে। এসে সব কাগজপত্র দেখেন। লেখাজোকার কাজ সেরে নেন অন্যরা আসার আগেই। কিন্তু আজ এখনো আসেননি শান্তিদা। আমি অফিস ঘরের সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসে থাকি। শান্তিদা যেদিক দিয়ে আসবেন সেদিকে তাকিয়ে থাকি একদৃষ্টিতে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। রাস্তা দিয়ে লোকজন যেতে যেতে আমার দিকে তাকায়। এখন পর্যন্ত কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি। কিন্তু প্রত্যেকের চোখেই জিজ্ঞাসা-কৌতূহল। এত সকালে অফিসের সামনে সিঁড়িতে বসে থাকলে লোকে অবাক হবে বৈকি। হ্যাঁ। ওই তো আসছে শান্তিদা। সেই পরিচিত হাঁটা। হাতে ব্রিফকেস। কিন্তু শান্তিদার মুখ আর মাথাও ঠিক ও রকম করে মাফলারে ঢাকা কেন? এটা শান্তিদা তো? আমি প্রায় ভয়ে চিৎকার করতে চাই। শান্তিদা কাছে এসে বলেন, ‘সাঈদা, তুই? এত সকালে?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখেন শান্তিদা। তার ভুরু কুঁচকে আছে।

'সাঈদা? কী হয়েছে তোর?'

আমার চুল থেকে একটা বাঁশপাতা তুলে মাটিতে ফেলতে ফেলতে আমি শান্তিদার দিকে তাকাই। মাফলারে ঢাকা মুখটা আরো ভালো করে দেখার ইচ্ছা হয় আমার।

শান্তিদা ডাকে, 'সাঈদা?'

আমি বলি, 'শান্তিদা, আমি এখন থানায় যাব। আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোছনা করেছে আড়ি

আনন্দধারায় প্লাবিত ভুবন। চারদিকে মহোৎসব। সংগীত, বাদ্য, নৃত্য, খাওয়া-দাওয়া। রং-বেরঙের পোশাকে সজ্জিত শিশু, বালক-বালিকা, তরুণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অসীম পুলকে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। দখিনা হাওয়ার লুটোপুটি। মাতামাতি। তাজা ফুলের গন্ধে ম-ম করছে চারদিক। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, নীল, মিসিসিপি, আমাজন কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে আনন্দ ছড়িয়ে। ময়না, টিয়া, দোয়েল, রবিন অনবরত শিস দিচ্ছে। কিন্তু কেন? কিসের এই উৎসব? এত আনন্দের উৎসটা কী?

সৌরজগতের মহাসম্রাট সূর্য ও প্রাণচঞ্চলা পরম লাবণ্যময়ী পৃথিবীর একমাত্র সন্তান ষোড়শী পূর্ণিমা যাবে আজ প্রণয়ী চন্দ্রের সঙ্গে প্রথমবারের মতো মিলিত হতে। আনন্দ তাই বাঁধ মানে না। প্রচণ্ড তোলপাড়। হুলস্থূল। অপরূপ সাজে সজ্জিতা ধরিত্রী তাই উন্মুখ, বিমোহিত।

পূর্ণিমাকে ঘিরে সখীরা আলাপচারিতায় মেতে ওঠে। ঘনিষ্ঠতম সহচরী প্রকৃতির গাছগাছড়া থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে তাজা ও সুমিষ্ট ফল কুড়িয়ে এনেছে পূর্ণিমার দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য। গোলাপ, জবার সূক্ষ্ম রেণু ঘষে প্রভাতী শিশির আর চন্দনের সঙ্গে যোগ করেছে মুখমণ্ডলে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে। বান্ধবীদের অনুরোধে ধবল গাইয়ের ননীমাখা দুধে হলুদের পরশ মাখিয়ে স্নান সমাপন করে পূর্ণিমা। তার কোমর অবধি কালো কোঁকড়া চুলে গন্ধরাজ আর নারকেলের তেল মাখিয়ে দেয় প্রকৃতি। মৌমাছি ও প্রজাপতি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে মধু। মধুর সঙ্গে ননী আর সতেরো রকম ফলের রস মিশিয়ে তৈরি করা হয় বিশেষ এক পানীয়, যা পান করে পূর্ণিমার মসৃণ মোলায়েম কণ্ঠ আরো মধুর, আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে চন্দ্রের কাছে। মিহি তাঁতে বোনা নরম রেশমি ফুলেল পোশাকে অপরূপ হয়ে ওঠে পূর্ণিমা। তার খোঁপায় গুঁজে দেয় প্রকৃতি মস্ত বড় এক সূর্যমুখী। চোখের পাতার ওপর অপরাজিতার নির্যাস। গায়ে ছড়িয়ে দেয় সাত মহাদেশের সাতটি সেরা ফুল থেকে আহরিত আতর। গালে গোলাপের আভা, গলায় সপ্ত রঙের ফুলের মালা।

পরম তৃপ্তিতে পূর্ণিমা বাইরের দিকে তাকায়। এতো ভালোবাসাও রয়েছে সবার মনে তার জন্যে? শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষে আজ গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতা। প্রতিটি ফুলগাছে একসঙ্গে ফুটে উঠেছে বর্ণিল পুষ্পরাজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশ পরিপূর্ণ নীল। নেই এক ফোঁটা মেঘ। পিতা সূর্য মুখ টিপে হাসছে। পরিতৃপ্ত গর্বিত পিতা তার কন্যার এই মাহেন্দ্রক্ষণে, এই বিশেষ সন্ধিলগ্নে অশেষ শুভেচ্ছা জানায়। সর্বংসহা পরম স্নেহশীল জননী পৃথিবী বুকে জড়িয়ে ধরে পূর্ণিমাকে।

'খুব সাবধানে যাবি পূর্ণিমা। তোর মঙ্গল হোক। সুখী হ'মা। আনন্দে থাক।'

মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে উষ্ণ আলিঙ্গন করে অতঃপর রওনা হয় পূর্ণিমা চন্দ্রের উদ্দেশে। পৃথিবীর শেষ সীমান্ত পর্যন্ত আসে প্রকৃতি। আসে বনানী। আসে টগর, হাওয়া, প্যারাকিট, কোকিল, ময়না, দোয়েল।

এরপর যেতে হবে একা পূর্ণিমাকেই। সখীরা কাঁদে। পূর্ণিমার হৃদয়েও তোলপাড়। এতদিনের চেনা ভুবন ছেড়ে নতুন এক জগতে, নতুন এক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে পূর্ণিমা। শঙ্কা তো স্বাভাবিক। তবু এরই ভেতর আছে এক অবর্ণনীয়, অভূতপূর্ব উত্তেজনা। আছে উন্মাদনা, আকর্ষণ। অজানারে জানতে গিয়ে প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভে কাতর পূর্ণিমা বিদায় জানায় শেষ সহযাত্রীদের। এবারকার এই শেষ পথটুকু চলতে হবে তাকে একা, সম্পূর্ণ একা।

দিনের শেষ সায়াহ্নে সূর্য অস্ত গিয়েছে। ফিরেছে দিন শেষে নিজের ঘরে। চন্দ্র তখনো পর্যন্ত প্রিয়াসঙ্গলাভের প্রস্তুতিতে আপন কক্ষেই বিচরণ করছে। চারদিকে তাই সাময়িকভাবে আলোর অপর্যাপ্ততা। একটু একটু ভয় বোধ করছে পূর্ণিমার। তবু আশায় ভর করে, মনে আনন্দ সঞ্চার করতে চেষ্টা করে সে। পূর্ণিমা জানে আর কিছুক্ষণ পর চন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণিমার মিলন ঘটলেই জোছনায় ভেসে যাবে পৃথিবী। খিল খিল করে হাসতে থাকবে প্রকৃতি, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, অতলান্তিক, প্রশান্ত, ভূমধ্যসাগর ও আরব সাগর। নদীতে জোয়ার আসবে। জেলেরা মহোৎসবে মেতে উঠবে। ব্যবসায়ীরা পাল তুলবে বজরায়। প্রেমিক-প্রেমিকা মিলনের বাসনায় জোছনাকে আমন্ত্রণ জানাবে। উজ্জ্বল আলোতে গোলাকার শুভ্র সুদর্শন চন্দ্রকে দেখে আপ্লুত হবে শিশু। মায়েরা সান্ত্বনা দিয়ে শিশুকে শোনাবে, 'আয়, আয়, চাঁদমামা, টিপ দিয়ে যা।' যদিও তারা ভালো করেই জানে, পূর্ণিমাকে ছেড়ে চাঁদ কখনোই আসবে না শিশুর কপালে টিপ দিয়ে যেতে। পায়ে পায়ে এগোয় পূর্ণিমা। বুক ঢিপ ঢিপ করছে তার। কিছুটা শঙ্কা, কিছুটা উত্তেজনায়। আর তো এতটুকু পথ। এসে পড়ল বলে পূর্ণিমা।

কিন্তু হায়! হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সাদা-কালো মেঘ এসে সুবিশাল নীল আকাশটাকে মুহূর্তে ঢেকে ফেলল। ভয়ংকর গর্জন করে মেঘ ডেকে উঠল। একনাগাড়ে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। আসলে পূর্ণিমার জীবনের এই মুহূর্তটির জন্য অসীম আগ্রহে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল আরো একজন। সে আর কেউ নয়। স্বয়ং শনি দেবী। হিংসুটে শনি পৃথিবীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো ক্ষমা করতে পারেনি। শনির বাসনাসিক্ত আবেদনে সূর্যের সাড়া না দেওয়ার কারণ হিসেবে শনি বরাবরই পৃথিবীর প্রতি সূর্যের দুর্বলতাকেই দায়ী করে এসেছে। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলে, নাম বদলে নেচে গেয়ে হেসে সূর্যকে পৃথিবী এমন পাগল না করলে কী সাধ্য ছিল তার শনিকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার? ধিক পৃথিবী, ধিক। শনি প্রবল ক্ষোভে, অভিমানে, বেদনায় পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। কত রং কত ঢং কত নাম। ধরিত্রী, ধরা, পৃথিবী, ধরণী, জগৎ, ভুবন, বসুন্ধরা — আরো কত কী? অথচ শনি! সে একা, অদ্বিতীয়। তার দ্বিতীয় নাম যেমন নেই তেমনি নেই দ্বিতীয় সত্তা। অন্ধকারে থাকে বলে অন্ধকারেই প্রিয়জনকেও টেনে নিতে চায় সে। সূর্যের উজ্জ্বল আলো আর বেশি খোলামেলা অভিব্যক্তি শনির সান্নিধ্যে, তপস্যায় ক্ষীণ হয়ে আসবে, আনন্দে পরিতৃপ্তিতে বসবাস করবে দুজনে অন্ধকার রাজত্বে। এই এতটুকু স্বপ্নই তো ছিল শনির। কিন্তু পৃথিবীর জন্য তা ঘটতে পারল না। পৃথিবীর প্রেমে মাতোয়ারা সূর্যদেব শনিকে প্রত্যাখ্যান করল। এ অপমান কী করে সইবে শক্তিমান শনি। ফলে সূর্য পৃথিবী কাউকে না পেয়ে তাদের সন্তানের ওপর প্রতিশোধ নেওয়াই ঠিক করেছে শনি।

আর তাই তার দুই সহচর, রাহু আর গ্রহণ, পথের ক্রান্তিতেই অপেক্ষা করছিল পূর্ণিমার জন্যে। শনির নির্দেশে গ্রহণ এসে চন্দ্রকে আড়াল করে দাঁড়াল। নিমেষে অন্ধকার নেমে এলো। পথভ্রান্ত পূর্ণিমা যখন ভয়ে দিশেহারা, রাহু এসে গ্রাস করল তাকে। কুমারী, অধরা পূর্ণিমার সর্বাঙ্গে রাহু রেখে দিলো তার বাসনার চিহ্ন। পূর্ণিমার রেশমি পোশাক সহস্র টুকরোয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। সমস্ত শরীর দলিত-মথিত। পূর্ণিমার নরম মসৃণ গালে, ওষ্ঠে রাহুর পাশবিক দংশনের রক্তচিহ্ন। রাহু আর গ্রহণ পালাক্রমে চন্দ্রকে পাহারা আর পূর্ণিমাকে ধর্ষণ শেষে একসময় পালিয়ে গেল গহিন বনে। শনির জাদুমন্ত্রে এতক্ষণ ধরে চন্দ্র কিন্তু ভাবছিল সে মিলনের আগে কেবল নিয়ে নিচ্ছে এক স্বল্পকালীন সৌন্দর্যনিদ্রা। ঘুম ভেঙে সামনে পূর্ণিমার এই লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে চন্দ্র চিৎকার করে ওঠে। পূর্ণিমা কোনো কথা না বলে চন্দ্রের দুই গালে বসিয়ে দেয় দুটো চড়। তারপর দুই হাত দিয়ে, হাতের নখ দিয়ে চন্দ্রকে ক্ষতবিক্ষত করে পূর্ণিমা জানতে চায়, এ কেমন প্রেমিক সে, যে পারে না দস্যুর হাত থেকে প্রেমিকাকে রক্ষা করতে অন্তত একটু সাহস দেখিয়ে এগিয়ে আসতে? কোনো কথা বলে না চন্দ্র। সেই থেকে চন্দ্রের মুখে স্থায়ী হয়ে থাকে এবড়ো-থেবড়ো কালিমা, যাকে পৃথিবীর সকলে 'চাঁদের কলঙ্ক' বলে জানে। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে প্রতি সন্ধ্যায়। চন্দ্রের সকল কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে পূর্ণিমা সেই অবস্থাতেই তক্ষুনি ফিরে আসে মাতৃআলয়ে। ক্রন্দনরতা পৃথিবী নিঃশর্তভাবে পরম মমতায় কন্যাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ঘরে তুলে আনে। সূর্য আর পৃথিবী কারোরই বুঝতে অসুবিধা হয় না এ কার কারসাজি। সূর্যদেব প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে। এরপর চার দিন চার রাত্রির সমপরিমাণ সময় পার হয়ে যায়। না উদিত হয় সূর্য। না চন্দ্র। রাগে, দুঃখে, অপমানে পৃথিবী আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণিমার জীবনের দুই প্রধান পুরুষই স্বেচ্ছায় অন্তরীণ হয়ে থাকে।

ফলে চারদিকে থিক থিক করে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও এক ফোঁটা আলোর আভাস নেই। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে জনগণ। আলোর উত্তাপের অভাবে দিশেহারা লোকজন মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা আর হতাশায় ভুগতে থাকে। দলে দলে লোকে আত্মঘাতী হতে শুরু করে। সমুদ্রে, নদীতে উথাল-পাথাল ঢেউ নেই — নেই জোয়ার-ভাটা। আকাশে নীলিমাকে ঢেকে রেখেছে ঘনকালো মেঘ। একনাগাড়ে চলছে বৃষ্টি আর ঝড়। একে একে ঢলে পড়ছে সব শস্যক্ষেত্র, ফুল, গাছ, বৃক্ষ। পাখির কূজন থেমে গেছে। মরা গাছে বসে ঝিমুচ্ছে কোকিল। কণ্ঠে নেই তার গান। প্রজাপতির ডানার রং খসে পড়েছে। সব ফুল ঝরে পড়ার আগে রংহীন সাদা হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে স্যাঁতসেঁতে ভিজে।

এ অবস্থায় পৃথিবী হন্যে হয়ে পড়ে সূর্যের দরবারে। সূর্য আর চন্দ্রকে কিছু করতেই হবে। তা নইলে পুরো জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। চন্দ্র সূর্য দুজনেরই এক কথা। একমাত্র পূর্ণিমাকে স্থির করে দিতে হবে শনি, রাহু আর গ্রহণের শাস্তি। তাদের মৃত্যুদণ্ড কীভাবে কার্যকর করা হবে। পূর্ণিমা যদি তা করে, তাহলেই আবার সূর্য উদিত হবে। আলোয় ঝলমল করবে পৃথিবী। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে আবার উদ্ভাসিত হবে চন্দ্র।

পৃথিবী নিরুপায় হয়ে ছুটে যায় বিধ্বস্ত পূর্ণিমার কাছে। প্রতিকার চায় কন্যার কাছে। 'কঠিনতম শাস্তি দে মা, পাষণ্ডদের। ওদের হত্যার মধ্যে দিয়ে তোর প্রতি অপরাধের যোগ্য বিচার হোক, সৌরজগৎ-সংসার বেঁচে যাক।'

কিন্তু পূর্ণিমা চায় না এত সহজে ওদের মুক্তি দিতে। তার কাছে শাস্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু একবার নয়, বারংবার হতে হবে সেই মৃত্যু। আর জীবিতাবস্থায়ও ধুঁকে ধুঁকে মরবে তারা।

পিতা সূর্যকে ডেকে পূর্ণিমা সোজা জানিয়ে দেয়, শনির শাস্তি কী দেবে সেটা তোমার ব্যাপার। আমি তাতে নাক গলাব না; কিন্তু রাহু আর গ্রহণের শাস্তি আমি স্থির করেছি। একমাত্র এভাবে এটা কার্যকর হলেই আমি রাজি। কন্যা পূর্ণিমার বিশদ পরিকল্পনা শুনে সূর্য বললেন, তথাস্তু।

চন্দ্রও নিঃশর্তভাবে তা অনুমোদন করল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আলো ফুটে উঠল। উদিত হলো সূর্য ও পরে চন্দ্র। অন্ধকারে বসবাসকারী শনির শাস্তি হলো নীরবে নিজ কক্ষপথে ক্রমাগত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা। আর সেই থেকে সৌরজগতের সকল প্রাণীর সব অন্যায়, অবিচার, ব্যর্থতার জন্যে দায়ী হয়ে রইল শনি। অশুভের প্রতীক বলেই চিহ্নিত হয়ে রইল সবার মনে।

রাহু ও গ্রহণকে বন থেকে খুঁজে বের করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। পূর্ণিমার ইচ্ছায় ওরা পাবে একটি মানবজীবন ও লক্ষ কোটি কীটের জীবন।

একটি দীর্ঘ মানবজীবন অন্ধকার কারাগারে ওদের বাস করতে হবে। আলোর মুখ দেখবে মাসে মাত্র একবার, যেদিন পূর্ণিমা যাবে চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হতে। চন্দ্র আর পূর্ণিমার মিলনে জোছনার সৃষ্টি হবে। আর জোছনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন ভেসে যাবে পৃথিবী। লোহার গরাদ ভেদ করে লম্বা লম্বা ফালি ফালি জোছনা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকবে ওদের শীত স্যাঁতসেঁতে কারাগারে। সেই রাতে শুধু পূর্ণিমা আর চন্দ্রের মিলনই ঘটবে না, পৃথিবীজুড়ে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন ঘটবে সেই জোছনাপ্লাবিত রাতে। কারাগারে নির্জন ঠাণ্ডা কুঠুরিতে বসে ওরা দূর থেকে শুনতে পাবে প্রেমিক-প্রেমিকার খিলখিল হাসি, কানাকানি, ফিসফিসে প্রেমালাপ, শুনবে বসন পতনের শব্দ, চুড়ির আওয়াজ, মিলনের ধ্বনি। ওরা কারাগারে বসে তখন ক্রমাগত ছটফট করবে। তারপর আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে জ্যোৎস্না সরে যাবে। আরেকটি পূর্ণ মাসের জন্য অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে ওরা। এভাবেই কেটে যাবে ওদের মানবজীবন। আর মৃত্যুর পর?

মৃত্যুর পর ওরা দুজনেই কোটিবার জন্ম নেবে এক বিশেষ শ্রেণীর পুরুষ কীট হিসেবে। ওদের জীবন হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র আট থেকে দশ সপ্তাহ বাঁচবে ওরা; কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটে যাবে ওদের সঙ্গিনীর খোঁজে। সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করতে। নারী বন্দনায়। কত সহস্র আকুতি-মিনতি করবে ওরা নারী কীটের কাছে।

অধিকাংশ সময়েই নারী কীট সাড়াও দেবে না সেই ডাকে। এই বিশেষ কীটদের নারীটির দেহের ওজনের তুলনায় পুরুষ কীটগুলোর দেহ হবে খুবই ছোট। শতকরা এক থেকে দুই ভাগ মাত্র। নারী কীটের সূক্ষ্ম মসৃণ পর্দার মতো ঘরের দরজায় এসে রংবেরঙের হাত-পা নাড়িয়ে এই দুই পুরুষ কীট অনবরত বাদ্যযন্ত্র বাজানোর চেষ্টা করবে, অঙ্গভঙ্গি করে নারীটিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস পাবে; কিন্তু নারী কীট ওদের দিকে ভালোমতো নজর দেওয়ার আগেই অধিকাংশ সময় তাদের মৃত্যু হবে। ওদের স্বল্প আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে নারীর মন জোগাতে জোগাতেই; সে নারী তাদের হয়তো লক্ষ করবে না। লক্ষ করলেও হয়তো তাদের অগ্রাহ্য করে অন্য কোনো পুরুষ কীটকে সম্মতিসূচক জবাব দেবে। ওদের অবজ্ঞা করে ওদের সামনেই অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে। আর যদি কখনো রাহু বা গ্রহণ কীটের ডাকে সাড়া দেয়ও, সঙ্গমের চরম মুহূর্তে সেই নারী কীট তাদের প্রেমিককে হঠাৎ ভক্ষণ করতে শুরু করবে। মিলন শেষে তাই আর পুরুষ কীটের অস্তিত্ব থাকবে না। পুরো দেহ চলে যাবে নারী কীটের পাকস্থলীতে। নারী কীটটি অবশ্য একবার পুরুষ ভক্ষণ করলে পুনরায় আর পুরুষ সঙ্গকাতর হবে না। পূর্ণিমার সেই অভিশাপ থেকেই মাকড়সা প্রজাতির জন্ম। অন্ধকারে, নির্জন, পরিত্যক্ত জায়গায় পৃথিবীর সর্বত্র যে আজো মাকড়সার বসবাস সেটার শুরু পূর্ণিমার অভিশাপেই। রাহু আর গ্রহণের শাস্তির মধ্য দিয়ে। জোছনার আলো তাই কখনো পৌঁছে না মাকড়সার জালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতৃত্ব

মা হওয়া কি মুখের কথা?

না, মুখের কথা মোটেও নয়। খুব কঠিন একটি কাজ মা হওয়া। আমার মাকে ছোটবেলা একটা গান গাইতে শুনতাম : 'শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা, মা হওয়া কি মুখের কথা?' একই গান মা'র মুখে শুনে-শুনে একদিন হঠাৎ দেখি আমার ঠাকুমা স্বয়ং গুনগুন করে গেয়ে উঠেছেন, 'শুধু প্রসব করলেই হয় না ব্যথা, মা হওয়া কি মুখের কথা?' আমি তখন অনেক ছোট। কিন্তু ঘটনাটি নাটকীয় মোড় নেওয়ার জন্যে খুব স্পষ্ট মনে পড়ে সে দিনটির কথা। ঠাকুমার মুখে মায়ের গাওয়া গানের এই ধরনের শব্দের বিকৃতিতে (সম্পূর্ণই অনিচ্ছাকৃত) মা একেবারে রেগে আগুন। বড় ঘর থেকে দৌড়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে সোজা ঠাকুমার কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিল — 'মা, আপনি না মা? কেমন করে তাহলে বলেন প্রসব করলেই হয় না ব্যথা? ব্যথা তাহলে হয় কিসে?' ঠাকুমা থতমত খেয়ে যান। নিজের ভুল টের পেয়ে কিছুটা বিব্রতও। আমি তখন সব কথা তেমন বুঝিনি। পরে নিজে সন্তান প্রসব করার পর, বাচ্চা বড় করার পর আজ মনে হয়, বুঝে হোক না বুঝে হোক মা-ঠাকুমা যে গান গেয়েছিলেন দুজনের গানের কথাই ঠিক ছিল। শুধু সন্তান প্রসব করলেই মায়ের দায়িত্ব যেমন সম্পন্ন হয় না, সন্তান প্রসবের শারীরিক যন্ত্রণাই মায়ের একমাত্র যন্ত্রণাও নয়। জীবনভর সন্তান সম্পর্কিত আরো অনেক শারীরিক-মানসিক ব্যথা সইতে হয় মাকে। তবু আমার মা-ঠাকুমা যে প্রবল উৎসাহে মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্য, স্বার্থত্যাগ ও তিতিক্ষা বর্ণনায় এতটা মুখর ছিলেন, তা পরোক্ষে বুঝি নিজেদের কিছুটা হলেও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই। বোঝাবার জন্যে যে, মায়ের জীবন এমনই হয়। শাশ্বত মাতৃভূমিকায় নিজেকে সঁপে দেওয়াই তাই বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়া জীবনের আর কোনো পরিণতির কথা তাঁরা ভাবতে পারতেন না। আরো পরে আজ বুঝি — শুধু প্রসব করাই মা হওয়ার জন্যে যদিও যথেষ্ট নয়, তবু কেবল এই চিরন্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটির ভেতর দিয়ে যাওয়ার জন্যেও প্রতিদিন কত শত নারী প্রাণ হারাচ্ছে।

জগৎজুড়ে প্রতি মিনিটে ৩৮০ জন নারী সন্তানসম্ভবা হচ্ছে। এর ভেতর প্রায় অর্ধেকই, অর্থাৎ ১৮০টি গর্ভধারণ অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা অপরিকল্পিত। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (১১০টি) গর্ভধারণ কোনো না কোনো জটিলতার মুখোমুখি হয়। আর কমপক্ষে চল্লিশটির সমাপ্তি ঘটে গর্ভপাতে। মৃত্যু হয় অন্তত একজনের। এক মিনিটের এই হিসাব যদি কাউকে নাড়া দিতে অসমর্থ হয়, তার জন্যে রয়েছে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যার একটা নমুনা। ওই যে প্রতি এক মিনিটে একজন নারী মাতৃত্বজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করছে, তার মোট সংখ্যা বছরে ৫৮৫ হাজার। পূর্ণবয়স্ক নারীদের এক-তৃতীয়াংশই ভুগছে মাতৃত্বজনিত কোনো বিশেষ অসুবিধে বা প্রসব-পরবর্তী জটিলতায়। পাঁচ কোটিরও বেশি নারী এই ধরনের শারীরিক জটিলতায় প্রতিবছর নিদারুণ স্বাস্থ্যসংকটে পড়ে। প্রতিবছর সাড়ে সাত কোটি অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের সমাপ্তি ঘটায় নারী। এর ভেতর পঞ্চান্ন হাজার গর্ভপাতই (প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে) ঘটে অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অশিক্ষিত প্রশিক্ষণহীন গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার অথবা দাইয়ের মাধ্যমে। সন্তানের জন্মের সময় মা ও শিশুর যে মৃত্যু ঘটে, তার এক-তৃতীয়াংশই রোধ করা যায় গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকে লক্ষ রাখলে।

বাংলাদেশে প্রতি একশো হাজার জীবিত শিশুর জন্মের জন্যে ৪৫০ জন নারীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তার মানে প্রতিবছর শুধু মা হতে গিয়ে বিশ হাজারেরও বেশি নারী প্রাণ হারাচ্ছে। কোনো কোনো আফ্রিকান দেশে প্রতি একশো হাজার জীবিত শিশুর জন্মের জন্যে এক হাজার মাও মারা যায়। অথচ উন্নত দেশে মারা যায় প্রতি একশো হাজার জীবিত শিশুর জন্মের জন্যে গড়ে শূন্য থেকে ২৭ জন নারী। উন্নয়নশীল সমাজে প্রধানত তিনটি কারণে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি হয় : (১) নারীদের ভগ্নস্বাস্থ্য ও অপুষ্টি, (২) উন্নতমানের প্রসূতি-স্বাস্থ্যসেবার বিশেষ করে প্রসবকালীন জরুরি ব্যবস্থার অভাব, (৩) বারবার গর্ভধারণ। প্রতিটি গর্ভধারণই যেহেতু একটি মেয়ের জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি বয়ে আনে, যেদেশের মেয়েরা যত ঘন ঘন এবং যত বেশিবার গর্ভবতী হয়, সেদেশের মেয়েদের মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা তত বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকায় গর্ভধারণ ও প্রসবসংক্রান্ত মৃত্যুর আশঙ্কা তত বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকায় গর্ভধারণ ও প্রসবসংক্রান্ত কারণে আজীবন মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে প্রতি ষোলো জনে একজন, এশিয়ায় প্রতি পঁয়ষট্টি জনে একজন, উত্তর আমেরিকায় প্রতি তিন হাজার সাতশোতে একজন এবং উত্তর ইউরোপে প্রতি দশ হাজারে একজন। বাংলাদেশে মাতৃত্বজনিত কারণে সারাজীবনে মৃত্যুর ঝুঁকি উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অন্তত একশো গুণ বেশি। জরুরি প্রসূতি-সেবার অভাব শুধু মায়ের মৃত্যু নয়, সেইসঙ্গে মৃত্যু বয়ে আনে নবজাত সন্তানেরও। প্রতিবছর আশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাখ মৃত সন্তান জন্ম নেয় অথবা জন্মের অব্যবহিত পর নবজাতকের মৃত্যু ঘটে কেবল পর্যাপ্ত প্রসূতি-সেবার অভাবে।

মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ তিনটি দেরি। (১) সিদ্ধান্ত নিতে দেরি : এর অন্যতম কারণ পরিবারে নারীর নিচু অবস্থান। তার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। স্বামী-শাশুড়ির মতো ব্যক্তিরাও প্রসূতি মরণাপন্ন না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে নেওয়ার কথা ভাবে না। এছাড়া খরচ, দূরত্ব, যানবাহনের দুষ্প্রাপ্যতা, হাসপাতালের প্রতি অনাস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামিও সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার জন্যে দায়ী থাকে। (২) হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি : এই দেরি হয় প্রধানত রাস্তাঘাটের অবস্থা (যানজট, পাকা রাস্তার অভাব), যানবাহনের সংকট ও অর্থের অভাবজনিত কারণে। (৩) হাসপাতালে নেওয়ার পর প্রয়োজনীয় ও জরুরি সেবা পেতে দেরি : এটা ঘটে হাসপাতালের গাফিলতি, মানসম্পন্ন সেবাদানের ব্যর্থতা ও দক্ষ স্বাস্থ্যসেবকের অপ্রতুলতার কারণে। এছাড়া অতি অল্প বয়সে বা অনেক বেশি বয়সে, অথবা অতি ঘন ঘন কিংবা অনেক বেশিসংখ্যক সন্তান ধারণ করা মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

যেসব শারীরিক জটিলতার কারণে প্রসূতি মায়ের মৃত্যু ঘটে তা হলো, প্রসবের পর অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত, একলাম্পশিয়া (উচ্চ রক্তচাপ, প্রসূতি মায়ের হাতে-পায়ে জল আসা ও খিঁচুনি), গর্ভপাতের জটিলতা, যোনিপথে প্রসবের প্রতিবন্ধকতা, সেপসিস এবং সহিংসতা। বাংলাদেশে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর ১৪ শতাংশ ঘটে পারিবারিক (বিশেষ করে স্বামী কর্তৃক) সহিংসতার কারণে এবং এক-চতুর্থাংশ মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর কারণ গর্ভপাতের জটিলতা। প্রতিবছর সাত লাখ তিরিশ হাজার গর্ভপাত ঘটানো হয়। এর ভেতর প্রায় অর্ধেকই ঘটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অদক্ষ-অশিক্ষিত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে। এ সংখ্যা আরো ভয়াবহ বড় মনে হবে যদি ভাবা যায় পনেরো থেকে চুয়াল্লিশ বছরের সকল নারীর মধ্যে প্রতি এক হাজারে আটাশজন এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে প্রতি সাতটি জন্মের জন্যে একটি করে গর্ভপাত ঘটছে এবং মোট মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর এক-অষ্টমাংশই ঘটছে গর্ভপাতের জটিলতায়। ঐচ্ছিক গর্ভপাতের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ গর্ভনিরোধক ব্যবহার না করা (জগৎজুড়ে ১২ থেকে ১৫ কোটি বিবাহিত নারী সন্তান না চাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে কোনো গর্ভনিরোধক ব্যবহার করছে না) এবং গর্ভনিরোধক ব্যর্থতা (প্রতিবছর আশি লাখ থেকে তিন কোটি গর্ভধারণ ঘটে গর্ভনিরোধকের ব্যর্থতার কারণে)। সন্তানবতী হতে না চাওয়া সত্ত্বেও গর্ভনিরোধকের ব্যবহার না করার মূল কারণ যৌন সম্পর্ক বা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সমাজেই নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ অথবা অনুপস্থিত। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে ২০-৫০ শতাংশ নারী জীবনে কখনো না কখনো জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয় বলে জানা গেছে।

ফলে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু রোধ করতে হলে তিনটি সুবিন্যস্ত স্তরে নারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণাঙ্গ সেবা দিতে হবে এবং নিরাপদ মাতৃত্বের প্রতি একটি বিশেষ সহমর্মিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে আপামর জনসাধারণের মধ্যে।

প্রাথমিক (তাৎক্ষণিক) স্তর : এই পর্যায়ে প্রসূতি নারীর জন্যে গর্ভকালীন সেবা, প্রসবের সময় দক্ষ ও জরুরি তত্ত্বাবধান ও প্রসব-উত্তর সেবাদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে। গর্ভকালীন অন্তত তিনবার এবং জটিলতা দেখা দিলে আরো ঘন ঘন স্বাস্থ্য-সেবাদানকারীর সাহায্য নিতে হবে। এ সময় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যাবে গর্ভজাত শিশুর বেড়ে ওঠার ধরন এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের বিভিন্ন জটিলতা সম্পর্কে। গর্ভবতীর যদি রক্তস্বল্পতা বা উচ্চ রক্তচাপ থাকে অথবা অন্য কোনো শারীরিক অসুবিধে হয়, সন্তানের অবস্থান যদি জরায়ুতে এমন থাকে যে স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা কম, সেক্ষেত্রে আগের থেকেই হাসপাতালে বা ক্লিনিকে যাওয়ার মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি নেওয়া যায়। এছাড়া প্রসবকালীন সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড খেতে দেওয়া, টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়া, মূত্র পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া, ডায়াবেটিস হয়নি—মূত্রে অ্যালবুমিন যাচ্ছে না। যদি যায়, সে ব্যাপারে সত্বর ব্যবস্থা নেওয়া, যাতে ভূমিষ্ঠ শিশু ও মায়ের মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয়ে না যায়।

মাতৃত্বজনিত অধিকাংশ মৃত্যুই ঘটে প্রসবকালীন জটিলতায়। প্রসবের সময় প্রয়োজনে যাতে জরুরি সেবা দেওয়া যায় তার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা করা দরকার আগে থেকেই। গর্ভকালীন পুরো সময়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে প্রসব-পূর্বকালে হঠাৎ জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই নিকটবর্তী হাসপাতালে বা ক্লিনিক যেখানে সিজারিয়ান সার্জারি করা যায় এবং রক্তদানের ব্যবস্থা আছে তার ঠিকানা সংগ্রহ ও ভর্তির পদ্ধতি আগে থেকে জেনে রাখা, রক্তের গ্রুপ মেলানো আত্মীয়কে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে রাখা (প্রয়োজনে মহল্লা থেকে সাহায্য নিয়ে) ও যানবাহনের ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। চিকিৎসালয়ে গেলে জরুরি ভিত্তিতে প্রসব-সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা থাকা একান্ত জরুরি।

AMARBOI.COM

এসবই সম্ভব সামাজিক সচেতনতা ও প্রবল জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে, জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ ও চাহিদা উদ্রেক করার মাধ্যমে, নাগরিক মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকার মাধ্যমে। প্রসব-উত্তরকালে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা খুবই জরুরি। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর নিশ্চয়তা প্রদান, উষ্ণ রাখার ব্যবস্থা, তার নাভির পরিচর্যা ও মাকে ভিটামিন ক্যাপসুল ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। গর্ভকালীন ও প্রসব-সেবা ছাড়াও এই প্রাথমিক স্তরেই গর্ভপাতে ইচ্ছুক নারীদের নিরাপদ গর্ভপাতের ব্যাপারে পরামর্শ ও গর্ভপাত-সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গর্ভপাতের পরপরই পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়াও জরুরি।

দ্বিতীয় (অন্তর্নিহিত) স্তর : নিরাপদ মাতৃত্বের নিশ্চয়তা বিধানে কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসূতি-সেবার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়। গর্ভনিরোধক দ্রব্যের প্রতুলতা নিশ্চিতকরণ ও গর্ভনিরোধের ব্যাপারে বিস্তারিত পরামর্শদান ও তথ্যের সরবরাহ জরুরি। সকল নারী ও পুরুষ যেন নিজেদের পছন্দমতো ও তাদের জীবনের সঙ্গে মানানসই জন্মনিয়ন্ত্রক-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকার ও বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। সন্তান ধারণ ও প্রসব কেবল নারীর জন্যে নির্ধারিত থাকলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত পুরুষ ও নারীর যৌথ উদ্যোগে ও সক্রিয় সহযোগিতায়। অথচ কার্যত এর সিংহভাগের দায়িত্ব একা মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী ও ডাক্তারদের নারীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সহমর্মী ও যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতি লালন করার মানসিকতা গড়ে তোলা দরকার। 'উইমেন ফ্রেন্ডলি' হাসপাতালে গেলে প্রসূতি নারীর শারীরিক অবস্থা লক্ষ করে কেউ কটাক্ষ বা বিরূপ মন্তব্য করবে না, সেবাদানে অহেতুক বিলম্ব ঘটাবে না অথবা কোনো অবহেলা/শৈথিল্য দেখাবে না। এসবের বিরুদ্ধে কঠিন নীতিমালা গ্রহণ ও তা কার্যকর করা দরকার। হাসপাতাল চত্বরে আসা একটি নারীরও জরুরি প্রসূতি-সেবা পেতে বিলম্ব হবে না — এ নিশ্চয়তা দিতে হবে। এছাড়া সফল জন্মনিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ মাতৃত্বের পূর্বশর্ত হিসেবে আসে শিশুমৃত্যুর হার রোধ করা। প্রতিটি টিকাদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা, নিয়মিত ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো, পেটের অসুখ ও নিউমোনিয়ার ব্যাপারে সচেতনতা ও জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা শিশুমৃত্যু বন্ধ করার জন্যে খুবই জরুরি।

এছাড়া দ্বিতীয় স্তরের ব্যবস্থামালা বা কর্মসূচির মধ্যে আসে ভবিষ্যৎ মায়েদের জন্যে উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রজনন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল ও সুস্থ মা হতে পারে — নিরাপদ মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের তাদের শারীরিক বিকাশসহ গর্ভধারণ, প্রসব, জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌন রোগ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করলে ভবিষ্যতে তারা দায়িত্বশীল নাগরিক হতে পারে, যত্নবান স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-মাতা হতে পারে।

অল্প বয়সে বিবাহ ও সন্তান ধারণের কুফল প্রতিটি কিশোর-কিশোরী ও তাদের মা-বাবাকে বোঝানো জরুরি, যাতে বিয়ে এবং প্রথম সন্তান ধারণকে বিলম্বিত করা যায়। কিছু কিছু বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নববিবাহিতদের টার্গেট করা অনেক সময়েই ফলপ্রসূ হয় না। অন্তত প্রথম গর্ভধারণের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দেরি হয়ে গেছে। অনেক মেয়েই বিয়ের রাতে বা অব্যবহিত পরেই প্রথম গর্ভধারণ করে ফেলে এবং সন্তান গ্রহণ করার আগে যে নিজের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে লক্ষ রাখা দরকার, সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। ফলে বিয়ের আগেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার আগেই, তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান দরকার। আজকাল ব্র্যাকসহ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে কিশোর-কিশোরীদের যৌনশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে।

তৃতীয় (মৌলিক কাঠামোগত) স্তর : এ পর্যায়ে আসবে একটা সামাজিক বিপ্লব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সমান অংশগ্রহণ, তার সামগ্রিক ক্ষমতায়নের নিশ্চয়তা। এর জন্যে দরকার নারীর উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সমাজের অনুকূল পরিবেশ। যতদিন না নারী তার অধিকার বুঝতে শিখবে, জানতে শিখবে তার মৌলিক অধিকার, স্বীকৃতি দেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে তার সমান অংশগ্রহণের, ততদিন তাকে সংসারের ও সমাজের দশজনের দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে। নারী সেদিনই নিজের শরীরের দায়িত্ব নিজে নিতে পারবে, আর কেউ না এগিয়ে এলেও নিজেই নিজের সন্তানের জন্ম দিতে হাসপাতালে চলে আসবে, যেদিন তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা আসবে, তার মৌলিক অধিকার নিয়ে সে সচেতন ও মুখর হবে। তবে সুশীল সমাজের মানুষ হয়ে আমরা আশা করব সেই নিদারুণ দিন কখনো আসবে না, যেদিন প্রয়োজন হবে এসব করবার জন্যে নারীকে একা হাসপাতালে প্রবেশ করতে। পারিবারিক, সামাজিক, মানবিক যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসে একটি প্রাণের জন্মলগ্নে, সৃষ্টির যন্ত্রণায় কাতর নারীটির পাশে অবশ্যই থাকা দরকার তার দরদি, সহমর্মী ও সচেতন প্রেমিক অথবা সাথীটির।

মাতৃত্বজনিত মৃত্যু রোধ করা জরুরি কর্তব্য শুধু মানবিক কারণে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেও বটে। জন্মদান প্রক্রিয়াটিকে যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলয় থেকে তুলে এনে একটি সামাজিক দায়িত্ব — জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে এ ব্যাপারে মনোভাব পাল্টাতে বাধ্য। এছাড়া ভুলে গেলে চলবে না, একটি মায়ের মৃত্যু গোটা পরিবারে মারাত্মক অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বিপর্যয় ডেকে আনে। মা যদি উপার্জনক্ষম হয় তাহলে তো কথাই নেই। সংসারে তার আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গৃহিণী মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ কন্যা বা সকল কন্যার, কখনো কখনো কন্যা-পুত্র সকলেরই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অসময়ে মায়ের মৃত্যুতে মেয়েরা স্বাভাবিক শিশুকাল/কিশোরকাল ভুলে গিয়ে সংসারের হাল ধরে। পিতারও কর্মস্থলে যেতে প্রায়ই দেরি হয়, অনুপস্থিতির হার বাড়ে, কাজের মনোযোগে অনিয়ম হয়। ছোট বাচ্চাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষায় অবহেলা ঘটে। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ের অসময়ে মৃত্যু দুই বছরের সন্তানদের মৃত্যুঝুঁকি তিন থেকে দশ গুণ বাড়িয়ে দেয়। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাবার মৃত্যু ঘটলে দশ বছরের অনূর্ধ্ব বাচ্চাদের মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ছয়টি বেড়ে যায়। বাবার মৃত্যু কন্যাসন্তানদের মৃত্যুর ওপর অবশ্য বিশেষভাবে বা ভিন্নভাবে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না, ছেলেমেয়ে দুজনেই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাবার মৃত্যুতে। বাবার চেয়ে মায়ের মৃত্যুতে ছোট সন্তানদের জীবনসংশয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি ঘটে। মায়ের মৃত্যু হলে দশ বছরের অনূর্ধ্ব ছেলেদের মৃত্যুর হার বেড়ে যায় হাজারে ৫০টি ও কন্যাসন্তানদের জন্যে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় হাজারে ১৪৪টি।

এছাড়া গর্ভকালীন অপুষ্টি ও অবহেলার কারণে পৃথিবীজুড়ে শতকরা ২০টি শিশু জন্ম নেয় স্বল্প ওজন নিয়ে। এইসব শিশুর পরবর্তীকালে শারীরিক ও মানসিক বেড়ে ওঠায় প্রায়ই প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এর মানে পৃথিবীতে প্রতিবছর দুই কোটি শিশু জন্ম নেয় স্বল্প ওজন (২.৫ কেজির কম) নিয়ে। অর্থনীতির ওপর এ যে কী ভয়ানক চাপ ফেলে, তা অনেকেই তলিয়ে দেখে না। এ ক্ষতি অনেক সময়েই আর পুষিয়ে নেওয়া যায় না। ভবিষ্যতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালেও অনেক ক্ষেত্রেই এটা থেকে যায় অপূরণীয়।

নিরাপদ মাতৃত্বের ব্যবস্থার অভাবে শুধু মায়েদের মৃত্যুই ঘটে না, অনেক মা-ই আজীবন পঙ্গু ও অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে। যেসব স্থায়ী অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধকতা মাতৃত্বজনিত কারণে মেয়েদের পঙ্গু করে রাখে, তার মধ্যে জরায়ুর বাইরে বেরিয়ে পড়া, ফিস্টুলা (প্রজননালী ও মূত্রনালীর ভেতর ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রস্রাব নির্গত হওয়া), সহবাসে প্রদাহ, তলপেটে যন্ত্রণা উল্লেখযোগ্য। এর ভেতর ফিস্টুলার (ভেসিকো ভেজাইনাল ফিস্টুলা) মতো শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণাদায়ক দুরবস্থা ও করুণ পরিণতির বোধহয় কোনো তুলনা নেই। এই বিশেষ শারীরিক অবস্থার মোকাবিলা করে গ্রামে-গঞ্জে, এমনকি শহরেও কত নারী যে স্বামী-পরিজন পরিত্যক্তা হয়ে অমানবিক জীবনযাপন করছে, নিজেকে সর্বদা নোংরা, অপবিত্র ও তুচ্ছ ভেবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে তার খবর কেউ রাখে না। প্রতিবছর আশি হাজার মেয়ের যোনিতে ফিস্টুলা হচ্ছে এবং বর্তমানে দশ লক্ষ মেয়ে এই মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অনেকেই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারত। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং অদক্ষ দাইয়ের হাতে ঘরে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে বাংলাদেশের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রজননতন্ত্রে সংক্রামক রোগের শিকার হয়। অনেকেই মারা যায় টিটেনাসে, যা গর্ভকালে দুটি মাত্র ইনজেকশন দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রসব-পরবর্তীকালে প্রজননতন্ত্রে সংক্রামক রোগের আরেকটি উৎস অপরিচ্ছন্ন ও জীবাণুযুক্ত ন্যাকড়া ব্যবহার করা, ঘন ঘন নিজেদের পরিচ্ছন্ন না করা, নিয়ন্ত্রিত স্নান না করা। প্রসবের জটিলতায় এত মৃত্যু, এত স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আজো বাংলাদেশে মাত্র ৪ শতাংশ সন্তান জন্ম নেয় হাসপাতাল বা ক্লিনিকে। বাকি সবাই জন্ম নেয় ঘরে। জন্মদান যতই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হোক না কেন, এটা অনস্বীকার্য যে, শতকরা অন্তত ১৫টি প্রসবের ক্ষেত্রে গর্ভবতীর বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়, যার জন্যে তার উপযুক্ত সরঞ্জাম ও একজন দক্ষ স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর প্রয়োজন হয়। প্রতিটি গর্ভধারণই জীবনের ঝুঁকি বয়ে আনে। বিশেষ করে জরুরি প্রসূতি-সেবাদানের ব্যবস্থা যেখানে নেই সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঝুঁকি আরো বেশি। নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি বছর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশসহ বেশ কিছু দেশে এখনো যে গড় আয়ুতে তারা পুরুষের পেছনে পড়ে রয়েছে তার অন্যতম কারণ মাতৃত্বজনিত কারণে অতিরিক্ত মৃত্যু ও নারীর প্রতি যুগ-যুগান্তরের অবহেলা ও অবিচার।

আর তাই বাংলাদেশের বহু আলোচিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচিতে মায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্বের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে দাতাগোষ্ঠীর চাপে পড়ে শুধু সুন্দর নথিপত্র তৈরি করলেই চলবে না, বাস্তবেও তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আর সেটা সম্ভব শুধু স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন করেই নয়, গোটা সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের মাধ্যমে, নারীর প্রতি মনোভাবে ও তাদের মূল্যায়নে আমূল পরিবর্তন এনে — নারীর মৌলিক অধিকারে স্বীকৃতিতে, তার সামগ্রিক অবস্থানের উন্নয়নে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচিতে বর্ণিত অঙ্গীকার ধরেই তাই বলতে পারি — 'No new discoveries are needed to save the lives of women from death due to pregnancy related causes... The same women who contribute to 42 percent of the labor force of a country faces death and disability in the very process that brings forth life... The need is for nurturing a sociocultural movement that reduces maternal mortality as a woman's right, and also enhances woman's self esteem and status...The improvement of Bangladesh women's health is not just a social and moral necessity. It is also an economic inperative.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টির রহস্য : নারী ও পুরুষ

জীবজগতে যৌন ও অযৌন এই দুই রকম বংশবৃদ্ধির প্রচলন থাকলেও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে যৌন প্রজননই বেশি দক্ষ ও কার্যকর পদ্ধতি বলে বিবেচিত। যদিও এটা সর্বজনবিদিত যে, যৌন প্রজননকে সার্থক করে তোলার জন্যে যে শক্তি, সম্পদ, ধৈর্য ও সময় ব্যয় করা হয়, তাতে এই প্রজনন যথেষ্ট ব্যয়বহুল ব্যাপার।

মানুষসহ বৃহত্তর প্রাণিকুলের মধ্যে পুরুষ ও নারীর ভেতর যৌনমিলন ঘটাবার জন্যে যে দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া বিদ্যমান, একজনের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবার জন্যে সেই বিশেষ একজনের ভেতর নিজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবার জন্যে অন্যজনের যে আকুতি বা আর্তি, যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা বা বিশেষ লীলাখেলা, তা যেমন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তেমনি ব্যয়সাধ্য এবং কখনো কখনো ঝুঁকিপূর্ণও বটে। তা সত্ত্বেও যে কারণে যৌন প্রজনন অযৌন বিভাজনের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকৃত, তা হলো যৌন প্রজননে পুরুষ ও নারীর দুটি ভিন্ন জিনস একত্রে মিলিত হয়ে নতুন প্রাণী সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি সৃষ্ট প্রাণই হয় স্বতন্ত্র ও অভিনব। শুধু পরিবার পরিবারে ভিন্নতা নয়, একই মা-বাবার প্রতিটি সন্তানই একজন থেকে আরেকজন আলাদা। এর ফলে প্রতিটি প্রজন্ম যে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব লাভ করে, তাতে হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোনো বিশেষ বা ভয়ংকর রোগবালাই অথবা কোনো বড় ধরনের জলবায়ুর হেরফেরে সম্পূর্ণ প্রজন্ম একসঙ্গে বিনষ্ট বা নির্মূল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না, যে বিনাশ অযৌন বিভাজনে সৃষ্ট অভিন্ন জিনসের প্রাণীদের বেলায় ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

তাছাড়া নারী বা পুরুষ কারো জিনসের কোথাও যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, যৌন প্রজননের ফলে অন্যপক্ষের সুস্থ জিনসের সাহায্যে পরবর্তী প্রজন্মে তা সারিয়ে নেওয়া বা মেরামত করিয়ে নেওয়া সম্ভব। ফলে মা-বাবার একজনের মধ্যে কোনো অসুস্থ বা অস্বাভাবিক জিন যদি থাকেও, তবু সন্তান সেটা নাও পেতে পারে যদি মা-বাবার অন্যজনের মধ্যে সেই বিশেষ জিনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুস্থ ও সঠিক থেকে থাকে। একইরকমভাবে, কখনো কখনো আবার একজনের বিশেষ কোনো ভালো জিন অন্যজনের ভালো জিনের সঙ্গে মিলে আরো বেশি ভালো, উন্নততর ও শক্তিশালী জিনের জন্ম দিতে পারে পরবর্তী প্রজন্মে, যা তার বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, অথবা বিশেষ কোনো বিষয়ে বা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেধা বা প্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে পারে (অবশ্য এর উল্টোটিও যে একেবারে ঘটছে না, তা নয়)।

ফলে সুস্থ ও সবল প্রজন্ম গড়ার ক্ষেত্রে যৌন প্রজনন নিঃসন্দেহে অযৌন বিভাজনের চাইতে শ্রেষ্ঠতর, অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী ও অনেক বেশি দক্ষ প্রক্রিয়া। এত বেশি টেকসই ও উন্নততর পদ্ধতি বলেই শত ঝামেলা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এবং যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হলেও হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্যেও যৌন সংযোগ ও যৌন প্রজনন বহাল তরিয়তে আজো বেঁচে আছে : বেঁচে আছে, নারী-পুরুষের আকর্ষণের মূল উপাদান হিসেবে, তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও আবেগ প্রকাশের বৃহত্তম মাধ্যম হিসেবে, জীবজগতের সবচেয়ে প্রগাঢ় আনন্দ ও তৃপ্তির উৎস হিসেবে।

কিন্তু যৌন প্রজননের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর যে ভূমিকা, তাদের যে আগ্রহ বা অগ্রাধিকার অথবা পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের নিজস্ব যে ধ্যান-ধারণা বা প্রত্যাশা, তার রকম বা প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকৃতি থেকে আহরিত কিছু তথ্য থেকে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বলা যায়।

পুরুষ বরাবরই তার নিজস্ব বংশবৃদ্ধি ও বংশের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যস্ত। নারী ব্যস্ত সন্তানের কল্যাণ কামনায় : যেটা করলে বা যেভাবে করলে তার ভবিষ্যৎ সন্তান সুস্থ, শক্তিশালী ও দীর্ঘজীবী হবে, নারী সেটাই করবে। সে নিজের চেয়ে সন্তানের কথা — বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বেশি ভাবে। অর্থাৎ সৃষ্টির রহস্য খুঁজলে আরেকবার নতুন করে প্রমাণিত হবে, পুরুষ স্বার্থপর ও নারী কল্যাণময়ী, নিঃস্বার্থপ্রাণ।

নিচের বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকী থেকে সংগৃহীত জীবজগতের কিছু উদাহরণ থেকে ওপরের কথাগুলোর সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব।

ক. মাছির (কাটা ফলের ওপর উড়ন্ত বিশেষ ধরনের মাছি) কথাই ধরা যাক। পুরুষ ও মেয়ে-মাছি একবার সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পর মেয়ে-মাছি তার শরীরের গুপ্ত পকেটে প্রায় পাঁচশো শুক্রাণু জমা করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না মিলনের জন্যে তার নিজস্ব ডিম্বকোষ তৈরি হচ্ছে, সে এই শুক্রাণুগুলো ধরে রাখতে পারে। তবে পরবর্তী সঙ্গমে প্রাপ্ত শুক্রাণু অনায়াসে আগেরগুলোর জায়গা দখল করে নিতে পারে। সেটা পুরুষ-মাছি ভালো করেই জানে। আর তাই নিজের জিনস রক্ষা ও তার পবিত্রতার নিশ্চয়তা দান করতে পুরুষ-মাছি তার বীর্যের সঙ্গে প্রায় ষাট রকম বিভিন্ন প্রোটিন ঢেলে দেয় মেয়ে-মাছির শরীরে। প্রথমত এগুলো তার নিজস্ব বীর্যকণাকে খাদ্য ও শক্তি জোগায় নিষেক-ক্রিয়ার সফলতা নিশ্চিত করার জন্যে।

দ্বিতীয়ত, এ প্রোটিনগুলো মেয়ে-মাছিটির যৌনাকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রাখে, যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী না হয়। এর মধ্যে কোনো কোনো প্রোটিন আবার বাধ্য করে স্ত্রী-মাছিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ডিম্বকোষ তৈরি করে ফেলতে, যাতে তার শরীরে সংরক্ষিত শুক্রাণুর সঙ্গেই অবধারিতভাবে তার মিলন ঘটে।

সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হলো, এই প্রোটিনগুলো অন্য মাছির শুক্রাণুর জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঠিক বিষের মতো। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের শুক্রাণু নিধনের এই যুদ্ধে বেচারা স্ত্রী-মাছিটিও সম্পূর্ণ রক্ষা পায় না। কেননা এই বিশেষ ধরনের বিষকর প্রোটিন তার নিজের শরীরেও কিছুটা বিষক্রিয়া ঘটায়। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে, নিজে বেঁচে থাকার তাগিদেও নারী-মাছিগুলো এক বা দুই পুরুষের চাইতে বেশি পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় না। একই জিনিস ঘটে এক ধরনের বন্য বিড়ালের মধ্যেও। সঙ্গমের পর পুরুষ-বিড়ালটি সার্বক্ষণিকভাবে পাহারা দিয়ে রাখে স্ত্রী-বিড়ালটিকে — যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়ে-বিড়ালটি যৌনতাড়িত থাকে। এই পাহারা দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য। মেয়ে-বিড়ালটি যাতে অন্য কোনো পুরুষ-বিড়ালের সঙ্গে মিলিত হতে না পারে এবং তার শুক্রাণু দিয়েই নিশ্চিতভাবে যাতে জন্ম নেয় শিশু বিড়াল। নিজের বংশের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার পর সে চলে যায়। তখন অন্য পুরুষ-বিড়াল তার সঙ্গিনীর কাছে এলেও সে আর আগের মতো সাড়া করে না।

খ. ব্যাঙ প্রজাতির ভেতর দুই রকম পুরুষ রয়েছে। এক রকম পুরুষ তাদের সঙ্গিনীদের যৌনমিলনে আহ্বান করার জন্য অনুচ্চ ও সংক্ষিপ্ত ডাক দেয়। অন্য পুরুষ-ব্যাঙের ডাক হয় অনেক চড়া ও লম্বা। দেখা যায়, প্রথম ধরনের পুরুষরা আশপাশ থেকে ক্রমাগত ডাক দিলেও মেয়ে-ব্যাঙরা তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ছুটে যায় দূরের সেই উঁচুলয়ের দীর্ঘস্থায়ী ডাকের দিকেই। প্রথম-প্রথম বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন হয়তো এই শেষোক্ত পুরুষ-ব্যাঙের বাহ্যিক পৌরুষালী চমকই এই আকর্ষণের মূল কারণ। পরে তারা এই দুই রকম পুরুষ-ব্যাঙের শুক্রাণু নিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে ল্যাবরেটরিতে স্ত্রী-ব্যাঙের ডিম্বাশয়ের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে মিশিয়ে দুই রকম ব্যাঙাচির সৃষ্টি করলেন। দেখা গেল, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে অনুচ্চ ও সংক্ষিপ্ত ডাকের ব্যাঙের প্রজন্ম, লম্বা ও উঁচু স্বরে ডাকিয়ে পুরুষ-ব্যাঙের প্রজন্মের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়া সার্থক ও সুস্থ ব্যাঙাচি জন্ম নেওয়ার হারও এই শেষোক্ত দলে অনেক বেশি। ফলে কোনো পুরুষ-ব্যাঙের ডাকে নারী-ব্যাঙ সাড়া দেবে, তা স্থির করা হয় পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণে ও টিকে থাকার লড়াইয়ে কোন পুরুষ-ব্যাঙের শুক্রাণু বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে, তার ওপর।

গ. একই রকমভাবে মাছির মধ্যেও এক প্রজাতি রয়েছে, যাদের পুরুষদের চোখ দুটো মুখমণ্ডলে লাগানো থাকে না। দুটি সরু কাঠির ডগায় সেগুলো সামনের দিকে ঝোলে স্প্রিংয়ের মতো। এই কাঠি বা স্টিকগুলো কারো কারো ছোট হয়, কারো কারো অনেক লম্বা। দেখা যায়, স্ত্রী-মাছিগুলো লম্বা স্টিকের পুরুষদের প্রতিই বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় ও তাদের সঙ্গে মিলিত হতে সর্বদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মুখ হয়ে থাকে। এই বিশেষ প্রজাতির মাছিদের মধ্যে আবার পুরুষদের চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশি। অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করলেন। এটা তো সর্বজনবিদিত যে, পুরুষদের বীর্যে 'এক্স' ও 'ওয়াই' দুই রকম ক্রোমোজোমই থাকে। আর মেয়েদের শরীরে থাকে শুধু 'এক্স' ক্রোমোজোম। 'এক্স'-এর সঙ্গে 'এক্স' ক্রোমোজোমের মিলন ঘটলে কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। অন্যদিকে 'এক্স'-এর সঙ্গে 'ওয়াই' মিললে জন্মে ছেলে-সন্তান। অর্থাৎ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। বাবার ক্রোমোজোমই সেটা ঘটায়।

এই বিশেষ প্রজাতির পুরুষ-মাছিদের বীর্যের 'এক্স' ক্রোমোজোমগুলো বড়ই স্বার্থপর। তারা 'ওয়াই' ক্রোমোজোমকে ক্রমাগত আক্রমণ করে পরাস্ত করে দিতে থাকে। ফলে সঙ্গমের পর দেখা যায়, বীর্যে খুব কমসংখ্যক 'ওয়াই' ক্রোমোজোমই রয়েছে অথবা একেবারেই নেই। পরিণতিতে কেবল কন্যা-মাছিরই জন্ম হয়। পুরুষ-মাছিগুলো এটা করে তার আধিপত্য বিস্তার ও পৌরুষত্ব প্রমাণ করতে। সেইসঙ্গে এই আশা বা আকাঙ্ক্ষাও থাকে যে, অল্প পুরুষ থাকলে একা বহু স্ত্রীসঙ্গ উপভোগ করা যাবে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার কারণে এ গোটা প্রজাতিই ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুরুষ মাছির অভাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে তাই এগিয়ে আসে স্ত্রী-মাছি। লম্বা স্টিকের যে পুরুষ-মাছিগুলোকে মেয়ে-মাছিগুলো বিশেষ পছন্দ করে এগিয়ে যায়, দেখা যায় তাদের বীর্যের 'ওয়াই' ক্রোমোজোমগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী, মজবুত ও সাহসী। 'স্বার্থপর এক্স' ক্রোমোজোমের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে তারা। ফলে মেয়ে-মাছিগুলো 'লং স্টিক আইড' মাছির কাছে শুধু সৌন্দর্যের নেশায় মত্ত হয়ে ছোটে না, পরবর্তী প্রজন্মের নিশ্চয়তা দিতে অর্থাৎ কন্যা-মাছির সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-মাছির জন্মও যাতে সম্ভব হয় সে জন্যই যায়।

ঘ. এটা সকলেরই জানা যে, কোকিলরা অন্য পাখির বাসায় গিয়ে ডিম পেড়ে আসে। আমাদের দেশে যদিও প্রধানত কাকের বাসাতেই ডিম পাড়তে যায় কোকিলরা, জাপানিজ কোকিলরা যায় তিন রকম পাখির বাসায় ডিম ছেড়ে আসতে। কেননা একেক কোকিলা একেক রকম ডিম পাড়ে। পরজীবী এই স্ত্রী-পাখিদের অনেক ছলাকলা করতে হয় অন্য পাখিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজের সন্তানদের বড় করিয়ে নিতে। গড়ন, রং ও আকৃতিতে তার ডিম যাতে আলাদা করা না যায় তার জন্যে উপযুক্ত ঘর খুঁজে হন্যে হয়ে বেড়ায় কোকিলরা। কারণ একবার যদি অন্য পাখিগুলো টের পায় এগুলো তার নিজের ডিম নয়, সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেবে মাটিতে। তা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কোকিলা তাই খুঁজে বেড়ায় এমন এক নীড়, যেরকম নীড়ে সে নিজে বড় হয়েছিল। পুরুষ কোকিলের কিন্তু কোনো বাছবিচার নেই, মাথাব্যথাও নেই। তিন রকম কোকিলার মধ্যে যাকে সামনে পায় তার সঙ্গেই সে মিলিত হতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। একবারও ভেবে দেখে না কোথায় খুঁজে পাবে তার স্ত্রী-সঙ্গী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপযুক্ত ঘর, যেখানে তাদের সন্তান বড় হবে। সৌভাগ্যবশত কোকিল প্রজাতির ডিমের রং, আকৃতি, গড়ন সবই আসে মায়ের কাছ থেকে। বাবার কোনো ভূমিকা নেই। মা তাই তার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির বলে ঠিক জায়গায় ডিম রেখে আসে। তা না হলে কোকিল বলে সুমিষ্ট কণ্ঠের এই পাখিটিকে বোধহয় আর দেখাই যেত না।

ঙ. স্ত্রী ফুলের সঙ্গে বাতাস, মৌমাছি বা অন্য কোনো পতঙ্গবাহিত সঠিক পুরুষ রেণুর মিলন ঘটলেই ফলের জন্ম হয়। হাওয়া ও কীটপতঙ্গ কত রকম গাছ থেকে কত রকম রেণুই না বয়ে আনে। কেমন করে তাহলে সঠিক মিলন ঘটে? আসলে স্ত্রী ফুলের গায়ে এমন একটি স্বচ্ছ ও সরু পর্দা রয়েছে, যা দিয়ে সে কঠিন রেণুকে ঠিক চিনতে পারে। চেনার পর তাকে জাপটে ধরে রাখে সেই পর্দা। বাড়তি ও অনাকাঙ্ক্ষিত রেণুগুলো তখন ঝরে পড়ে শূন্যে। এ বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে নির্বাচিত ও সংগৃহীত রেণু সুস্থ ফসলের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। কেননা ভুল বা অত্যধিক রেণু জমা হলে কাঙ্ক্ষিত ফল তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে প্রকৃতিতে, যা পরিষ্কার প্রমাণ করে দেবে সন্তানের মঙ্গল ও সুস্থ প্রজন্ম তৈরি স্ত্রী-জাতির সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। তার একান্ত ব্যক্তিগত আচরণ, পছন্দ-পছন্দের অনেকটাই সেই চিন্তার চারপাশে ঘোরে। অন্যদিকে পুরুষের প্রধানত দুটি লক্ষ্য। এক. যত বেশি ও যতরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ স্ত্রী-সঙ্গ উপভোগ করা যায়। দুই. নিজের বংশ বা জিনসের বিস্তার ঘটানো ও তার পবিত্রতা রক্ষা করা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরিত্রী

'The sexes coevolve through time, just as do predators and prey.' —*William R. Rice*

পর পর তিনবার পিতৃগৃহে ফিরে এসেছে খাদিজা। প্রথমবার বিয়ের ছয় মাস পরে একা, খালি হাতে। দ্বিতীয়বার বিয়ের চার বছর পরে, কোলে তিন বছরের ছেলে।

তৃতীয়বার বিয়ের এগারো বছর পরে সঙ্গে দশ বছরে ছেলে, আট বছরের মেয়ে, চারটে মুরগি, একটি দুধেল গাইসহ বাছুর, দুটি ছাগল। প্রথম ও দ্বিতীয়বার বাবার ঘরে বেশিদিন টিকতে পারেনি খাদিজা। সংসারের খরচ জোগাতে গায়ে-গতরে শক্তসমর্থ মা চলে গেছে শহরে। ধনীর গৃহাঙ্গনে ঘরকন্নার কাজ আর রান্না করে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকা প্রৌঢ় অসুস্থ স্বামীর অন্ন জোগাতে হয় তাকেই। এই বাপের ঘরে খাদিজা বেশিদিন থাকেই-বা কী করে? তার ওপর তার স্বামী ও শাশুড়ি কদিন যেতে না যেতেই এসে ধরনা দেয়। বলতে শুরু করে বড় ভুল হয়ে গেছে তাদের। এরপর আর মারধর করা হবে না খাদিজাকে। চেয়ারম্যান ও গ্রামের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকের সামনে প্রতিজ্ঞা করে স্বামী, এখন থেকে তাকে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া দেবে। চোখ মুছতে মুছতে খাদিজা আবার স্বামীগৃহে ফিরে যায়। শরীরের নানা জায়গায় আঘাতের ক্ষতগুলো তখনো ভালো করে শুকায়নি। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরই আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অনর্থক মারধর, অশ্লীল অভিযোগ, চেঁচামেচি।

খাদিজা মনস্থির করে ফেলেছে। এবার আর কিছুতেই ফিরে যাবে না সে। মুরগি কেনার টাকা অনেক আগেই শোধ হয়ে গিয়েছে। ডিম, দুধ ও গোবরের ঘুঁটে বিক্রি করে গাই-বাছুর ও ছাগলের ঋণও নিয়মিত পরিশোধ করে আসছে। সামনের ঈদে একটি ছাগল বিক্রি করে দিয়ে আরো দুটো ছোট ছোট ছাগল কিনবে খাদিজা। ছেলেমেয়ে দুটো ওখানে স্কুলে যেত। এখানে তাদের আবার নতুন করে ভর্তি করিয়ে দেবে। খাদিজা নিজে পড়ালেখা করতে পারেনি। সে চায় তার ছেলেমেয়ে অনেকদিন পড়াশোনা করবে। তার প্রৌঢ় পিতা এতদিনে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনেক জবুথবুও হয়ে গিয়েছে। নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাতটা নিজে ফুটিয়ে নিতেও পারে না আজকাল। মা এখনো শহরে কাজ করে। খাদিজার ইদানীং দু'পয়সা আয় হয় হাতের কাজ করেও। বাবাকে এখন সে বরং কিছু সাহায্যই করতে পারবে। তবে এই পশুপাখি, পুত্রকন্যা নিয়ে শ্বশুরালয় ত্যাগ খুব সহজ কাজ ছিল না খাদিজার জন্য। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে সে তার জগৎ সাজিয়েছে গত ছ'বছর ধরে, তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া এটা কোনোমতেই সম্ভব হতো না।

খাদিজার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তার বয়স চোদ্দ। তার বাপ-মা জেনেশুনেই বিয়ে দিয়েছিল যে, জামাই এর আগে আরো একটি বিয়ে করেছিল। সে ঘরে এক ছেলেও রয়েছে কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেছে, তালাক হয়ে গেছে সেই বউয়ের সঙ্গে। বউ ছেলেসহ অন্য গাঁয়ে পিত্রালয়ে থাকে। মাত্র এক হাজার টাকার যৌতুকের বিনিময়ে এর চেয়ে ভালো পাত্র কোথায়ই বা পাওয়া যাবে? দেখতে-শুনতে ভালো। কন্যার নিরাপত্তা ও সাধ-আহ্লাদের নিশ্চয়তা এর চাইতে বেশি কেমন করে দিতে পারে বৃদ্ধ পিতা। তাছাড়া শুনতে খারাপ লাগলেও পাত্রস্থ হলে একটি উঠতি বয়সী মানুষের মুখে অন্ন জোগানোর দুশ্চিন্তাও তো কমে। এ দুর্দিনে সেটুকু সাশ্রয়ও কি কম? মা-বাবাকে চিন্তামুক্ত করতে খাদিজাও আর আপত্তি করেনি। করলেও কিছু আসত যেত না। তাই নির্ধারিত দিনে বয়সে দ্বিগুণ লোকটির সঙ্গে খাদিজার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খাদিজা দেখে, একজন নয় দুজন স্ত্রী আছে তার। তাদের কারো সঙ্গেই স্বামীর আইনত তালাক হয়নি। একজন পুত্রসহ থাকে বাপের বাড়ি, অন্যজন স্বামীর আপন চাচাতো বোন, থাকে বাড়িতেই। কখনো চাচার ঘরে, কখনো এই ঘরের ওই পাশের চৌকিতেই। সেই ঘরেও, দুটি সন্তান। এখনো আগের দুই পত্নীর সঙ্গে রাতবাস ঘটে তার স্বামীর খেয়ালখুশিমতো, অথচ বছরে প্রায় ছয় মাসই তার কোনো রোজগার থাকে না। ভাড়াটে মজুর হিসেবে এর বেশি কাজ জোগানো সম্ভব হয় না তার। যেটুকু বিষয়-আশয় ছিল তা বেচে বা বন্ধক দিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত সে। খাদিজা সব দেখেশুনে বিয়ের রাতে কেঁদেকেটে চোখ ফোলায়। তার শাশুড়ি তাকে সান্ত্বনা দেয়। মেয়েদের জীবন এমনই। এত কিছু ভাবতে হয় না। ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে স্বামী ও সন্তানের সেবা করে যাওয়াই একমাত্র পথ।

খাদিজা তৃতীয়বার ঘর ছাড়ে যখন তার স্বামী শরিয়তের বিধান পূর্ণ করতে চতুর্থবার বিয়েতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। একটা কথা সে কোনোমতেই বুঝে পায় না, যে লোক নিজের খাবার ঠিকমতো জোগাড় করতে পারে না, তার এতগুলো বউয়ের সাধ হয় কেন? কেনই বা দরকার এতগুলো সন্তানের।

দুই

'দরকার, কেননা পুরুষ বরাবরই তার নিজস্ব বংশবৃদ্ধি ও বংশের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যস্ত। নারী ব্যস্ত সন্তানের কল্যাণ কামনায়। যেটা করলে বা যেভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে তার ভবিষ্যৎ সন্তান সুস্থ, শক্তিশালী ও দীর্ঘজীবী হবে, নারী সেটাই করবে। সে নিজের চেয়ে সন্তানের কথা — বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বেশি ভাবে। অর্থাৎ আমার বিচারে সৃষ্টির রহস্য খুঁজলে আরেকবার নতুন করে প্রমাণিত হবে, পুরুষ স্বার্থপর ও নারী কল্যাণময়ী নিঃস্বার্থপ্রাণ।'

এ পর্যন্ত বলে ড. মার্টিন স্মিথ থামলেন। গতকালই তিনি এসেছেন এ গাঁয়ে। একটি এনজিওর সঙ্গে এসেছেন তাদের নানান কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে নারীর স্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন প্রকল্প দেখবেন বলে। এছাড়া তাঁর নিজস্ব গবেষণার কিছু মালমসলা সংগ্রহও উদ্দেশ্য ছিল। স্মিথ মূলত রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিনের ডাক্তার হলেও তাঁর গবেষণার বিষয় প্রাণিজগতের যৌন আচরণগত বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। আজ দুপুরে স্থানীয় থানা হেলথ কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে এলাকার ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সামনে তিনি গবেষণার বিষয় সহজবোধ্য করে পরিবেশন করার চেষ্টা করছিলেন।

তিন

ড. মার্টিন স্মিথের আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। নিকটবর্তী শহর ও গ্রাম থেকে অনেক লোক এসেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কেউ একনজর দেখতে, কেউ কেউ পরামর্শ নিতে। মিটিং এত দীর্ঘ হওয়ায় অপেক্ষার ক্লান্তি তে অনেকেই ফিরে গেছে। কিন্তু সেই দুপুর থেকে ঠায় বসে আছে এক তরুণ দম্পতি। প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরের এক শহর থেকে এসেছে তারা মোটরসাইকেলে। ড. স্মিথের সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই ফিরে যাবে না। তারা শুনেছে, ড. মার্টিন স্মিথ সন্তানধারণে অক্ষম দম্পতিদের পরামর্শ দেন। অবশেষে দীর্ঘ সভাশেষে ড. স্মিথ বেরিয়ে আসেন।

অপেক্ষমাণ দম্পতিটিকে নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করলেন পাশের ছোট ঘরটিতে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শিক্ষিত। ভদ্রমহিলা কলেজে পড়ান, ভদ্রলোক ব্যাংকে চাকরি করেন। 'আপনাদের সমস্যা কী?'

'পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে। সন্তান হয় না। অনেক চেষ্টা করেছি। চিকিৎসা করিয়েছি। লাভ হয়নি।' স্বামী বলেন।

'ডাক্তারি রিপোর্টগুলো আছে সঙ্গে?'

'সব আছে।' যত্নসহকারে সংরক্ষিত মোটা ফাইলটা এগিয়ে দেয় স্বামী। ড. স্মিথ মনোযোগ দিয়ে সেগুলো দেখেন। পাতার পর পাতা উল্টান।

স্বামী-স্ত্রীকে চা খাবার আমন্ত্রণ জানান। বিনীতভাবে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

'হ্যাঁ, সবই তো বুঝলাম। তেমন কোনো অসুবিধা তো দেখছি না কারো মধ্যেই। তবু কেন এমন ঘটছে সেটাই প্রশ্ন।'

'আমাদেরও তো জিজ্ঞাসা সেটাই।' আবারও স্বামীটি বলে।

'এমন তো হতে পারে বিশেষ সময়টি মিস করছেন আপনারা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, না, সেটা অন্য ডাক্তারও বলেছিল। শুধু ক্যালেন্ডারের দিন হিসাব করে নয়, থার্মোমিটারে শরীরের তাপ মেপে মেপেও আমরা চেষ্টা করে গেছি। ফল হয়নি।'

'আপনারা হয়তো বেশি টেনশন করেন এ নিয়ে। দুশ্চিন্তা একদম ঝেড়ে ফেলুন। রিল্যাক্স।'

'তাও করে দেখেছি। সন্তানের জন্য কী না করেছি আমরা। কয়েকবার ভ্রমণে বেরিয়েছি। থাইল্যান্ড পর্যন্ত গিয়েছি একবার।'

'কার বেশি আগ্রহ সন্তানে? আপনার না আপনার স্ত্রীর?'

'দুজনেরই। তবে আমারই বোধ হয় বেশি। কি বলো?' স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকায়।

'আমিও খুব সন্তান চাই। মা হতে চাই। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। ভীষণভাবে চাই।' যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে মেয়েটি। পরে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি একটু ডাক্তারের সঙ্গে একা কথা বলতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' একটু অপ্রস্তুত হয়ে স্বামীটি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'ডাক্তার, আমি আপনাকে একটা সত্য কথা বলব। আপনি অনেক বড় মানুষ। অনেক কিছু জানেন। তার ওপর আপনি বিদেশি। আমাকে চেনেন না। তাই আপনাকে বলতে পারছি।'

'আমি সন্তান চাই। কিন্তু আমার স্বামীর নয়।'

'সে কি? কেন? আপনি তাকে ভালোবাসেন না?'

মেয়েটি মাথা নিচু করে পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটে।

'আমি জানি, আমি সত্যি আমার স্বামীকে খুব ভালোবাসি। সে বড় ভালো মানুষ। প্রকৃত সজ্জন।'

'সজ্জন হলেও তার জন্য রোমান্টিক প্রেম না থাকতে পারে। তার সঙ্গে যৌনসঙ্গে আপনি আনন্দ পান?'

'পাই।'

'তাহলে অসুবিধা কী?

'ওকে আমার সুস্থ মনে হয় না। সাত-আটটা অসুখ ওর। হাঁপানি, পেপটিক আলসার, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেসার। এছাড়া বিভিন্ন এলার্জি তো রয়েছেই। তার ওপর দিনে তিন-চার প্যাকেট সিগারেট খায় ও। সারারাত কাশে। এত ভালোবাসে আমায়, কিন্তু আমার কথা শোনে না। ওর বাবা-কাকা দুজনেই মারা গেছেন ফুসফুসের ক্যান্সারে। ওর দাদুও অল্প বয়সে মারা গেছেন শুনেছি। তিনি নাকি সবসময় কাশতেন। আমার শাশুড়ির ভয়ানক ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার। স্বামী খাওয়া-দাওয়ায় দারুণ অনিয়মিত। ওর কোলেস্টেরল তিনশোরও বেশি। তবু প্রতিদিন মাংস খাবে। আমি ওর সন্তান চাই না। সে সন্তান বেশিদিন বাঁচবে না। বাঁচলেও ওর মতো অসুস্থ হবে।'

'তাকে সে কথা জানিয়েছেন?'

'ঠিক ওভাবে নয়। তবে সিগারেট, মাংস খাবার ব্যাপারে সতর্ক করেছি।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তারপর?'

'কিছু লাভ হয়নি।'

'এখন কী করতে চান?'

'শুনেছি কতরকম পদ্ধতি বেরিয়েছে বিদেশে। আমরা কি একটি সন্তান পেতে পারি না? অন্য কোনোভাবে?'

'মানে?'

'মানে আমার গর্ভেই হলো। কিন্তু স্বামীর সন্তান নয়। একটি সুস্থ সন্তান চাই আমি।' ড. স্মিথ উঠে দাঁড়ান। পায়চারি করেন খানিকক্ষণ।

'এ দেশে ওরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া আপনি বিবাহিত। আপনার স্বামী স্টেরাইল নন। এক্ষেত্রে মেডিকেল এথিক্সের ব্যাপারটিও রয়েছে।'

একটু থেমে ড. স্মিথ আবার বলেন, 'আপনি অন্য কোনো চিন্তা করেছেন কখনো?'

'কী রকম?'

'এই স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্য কাউকে খুঁজে নেওয়ার, যার সন্তান ধারণ করতে আপনি আগ্রহী হবেন?'

'না, না, কখনো নয়, ওকে আমি সত্যি ভালোবাসি। ওর সঙ্গেই সারাজীবন কাটাতে চাই, আপনি জানেন না ও কত ভালো মানুষ।'

ডাক্তার স্মিথ কী বলবেন ভেবে পান না।

'পোষ্য সন্তান নেওয়ার কথা ভেবে দেখেছেন কখনো?'

'দেখেছি। কিন্তু আমার স্বামীর তাতে মত নেই।'

ড. স্মিথ জানেন, এই দম্পতিকে সাহায্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তবু হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো একটা চিন্তা তাঁকে উজ্জীবিত করে তোলে। এই একটু আগেও তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর গবেষণার জন্য কোনো উপকরণই সংগ্রহ হলো না এখানে।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনক-জননী

পেটের অসহ্য ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জুলেখা। তখন ভেবেছিলেন খাবার কোনো গোলমাল পেট নাড়া দিয়েছে। আরেকটু কম হলে নিজেই একটা বড়ি খেয়ে পড়ে থাকতেন। কাউকে বলারও দরকার পড়ত না। কিন্তু বেদনাটা প্রচণ্ডতার দিক দিয়ে যেমন, অভিনবত্বের দিক দিয়েও কেমন নতুন মনে হয়েছিল জুলেখার কাছে। ফলে ভয় পেয়েছিলেন। হাসপাতালে আসার কথা অবশ্য তখনো ভাবেননি। কিন্তু সারাদিন পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে মঈনুদ্দিন স্ত্রীর চোখে-মুখে কী দেখলেন কে জানে? খোকাকে ডেকে বললেন, 'একটা রিকশা ডাক। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।' রাস্তায় যেতে যেতে প্রথমে জানতে চাইছিলেন জুলেখা কেন হাসপাতালে যাচ্ছেন। মঈনুদ্দিন ফিসফিস করে যা বলেন, তাকে সাপের হিসহিস শব্দের চাইতেও শীতল ও ভয়ংকর মনে হলো জুলেখার। মঈনুদ্দিনের সন্দেহ যদি সত্যি হয়? প্রৌঢ় স্বামীর শীর্ণ হাতটি চেপে ধরে জুলেখা বললেন, 'আমার বড় ভয় করছে গো। তখন তোমাকে এত করে বললাম! মঈনুদ্দিন নীরব, অবসন্ন। ফাঁকা দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। হাসপাতালে আসার পর ব্যথাটা আরো বেড়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ পরই বিছানায় শুয়ে চিৎকার শুরু করলেন জুলেখা। ডাক্তার ছুটে এসে একটা বড়ি দিলেন খেতে! কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর যখন তাতে ব্যথা কমল না একটুও, বাধ্য হয়ে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিলেন। একটু পরই সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে ঘুম নেমে এলো দুচোখে।

পরদিন জেগে উঠে ব্যথাটা কম মনে হলো জুলেখার। তাই স্বভাবতই মন কিছুটা প্রফুল্ল। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য! দুপুর না গড়াতেই নতুন মারাত্মক লক্ষণটি স্পষ্ট হতে লাগল। ব্যথাটা ক্রমে পেটের নিচের দিকে সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল জুলেখার। ভাবতে চাইলেন শরীর থেকে আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রণাটা। ঘটলও তাই। ব্যথা অনেকটা কমল কিন্তু শ্রাবণের মতো অবিরল উষ্ণ ধারা সর্বাঙ্গ নাইয়ে দিতে লাগল জুলেখার। বাথরুম থেকে বের হতে তার মনে হলো পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে আসছে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করেও জুলেখার মনে হলো না কয়েক হাত দূরের বেডটিতে আর কখনো ফিরে যেতে পারবেন। জুলেখা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে চাইলেন, কথা ফুটল না। মৃত্যুকে উপলব্ধি করা গেল যে। ছেলেমেয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখগুলোকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন একবার। ওপারে যেতে যেতে শেষ মুহূর্তে মনে হলো কে যেন তাঁকে দু'হাতে জাপটে ধরছে। চোখ খুলতে পারছিলেন না। অবসন্ন জুলেখার মনে হলো মৃত্যুর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু জুলেখার মৃত্যু হলো না। যখন চোখ খুললেন, বাইরে দুপুরের কটকটে রোদ্দুর। দেখলেন তাঁর বিছানার চারপাশে অনেক ভিড়। ডাক্তার, নার্স, দাইদের উদ্বিগ্ন মুখমণ্ডল। পাশের বেডের রোগিণীও উঠে বসেছিল খাটের ওপর। জুলেখা লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল টানাটানি শুরু করেন। ডাক্তার জানতে চান, কেমন লাগছে! ঘাড় কাত করে কুশল জানাতেই নার্সকে কী আদেশ করে বেরিয়ে যান ডাক্তার। নার্স একটা ওষুধ খাইয়ে ঘুমোতে বলে চলে যায় অন্য রোগীদের কাছে। আর জুলেখা আবার ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের কোণের বেডটিতে শুয়ে কাতরাতে থাকেন।

বিকালে মঈনুদ্দিন এলেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে। জুলেখার আশ্চর্য ফ্যাকাশে মুখ দেখে বড় মেয়ে সালেহা ডুকরে কেঁদে উঠল। বড় ছেলে খোকা বেরিয়ে গিয়ে আঙুর ও ডাব নিয়ে এলো। একটু পর ক্লান্ত জুলেখা ছেলের হাতের আঙুর খেতে খেতে চোখ বুজলেন।

রাতে ব্যথাটা আবার বাড়ল। এবারের কষ্টটা আগের দিনের চাইতেও অসহনীয় মনে হলো। জুলেখা আবার চিৎকার শুরু করলেন। ডাক্তার এলেন। নার্স এলো। ওষুধ দিল। ঘুম এলো। আরেকটা রাতের পুনরাবৃত্তিতে ওয়ার্ডের রোগিণীরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল।

পরদিন ভোরে পাশের বেডের অল্পবয়সী সন্তান-সম্ভাবনাময়ী মেয়েটি হেসে বলল, 'কাল রাতে সবার সামনে কী সব যে বলছিলেন আপনি! আমরা লজ্জায় মরি। স্বামীকে অমন গালাগাল করছিলেন কেন?'

জুলেখা মাথা নিচু করেন। যদিও এসব কোনো কথাই এখন আর মনে নেই তাঁর। শুধু মনে পড়ে যন্ত্রণার তীব্রতায় নীল হতে হতে একটা ক্ষুধিত মুখ, দুটি তৃষাতুর চোখ চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে দেখেছিলেন জুলেখা। কিন্তু সেজন্য স্বামীকে বকাবকি করেননি। তার এই কষ্টের লজ্জাকর কারণ কেমন করে খুলে বলবেন ওই কন্যার বয়সী মেয়েটির কাছে? অতএব জুলেখা চুপ করে রইলেন। তবে ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উত্তাপ কিছুটা কমে এলেও মঈনুদ্দিনের প্রতি ঘৃণার পারদের খুব একটা নিম্নগতি নিজের মধ্যে লক্ষ করলেন না। কাপুরুষ, অক্ষম আর কাকে বলে!

সেদিন মঈনুদ্দিন আসতে পারেনি। রোজ রোজ অফিস থেকে এ সময় ছুটি পাওয়া যেতে পারে না জুলেখা জানেন। তাই এ নিয়ে মন খারাপ করেননি। কিন্তু স্বামী আসেনি এজন্য উৎফুল্ল হওয়ার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবু জুলেখা খুশি হয়েছিলেন খোকাকে একা ঘরে ঢুকতে দেখে। মঈনুদ্দিনকে হয়তো সত্যি সত্যিই আজ সইতে পারতেন না। কিন্তু খোকার মুখ এমন গম্ভীর কেন? ফলের ঝোপাটা শব্দ করে শেলফের ওপর রেখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোকা পাশের টুলটিতে বসে পড়ল। আর কোনো ভূমিকা না করেই বলে বসল, 'ছিঃ মা! এসব কী করতে গেলে তোমরা! ছোট ছোট কতগুলো ভাইবোন রয়েছে। ওদের কথাও কি একবার মনে পড়ল না? যদি কিছু হতো তোমার।'

জুলেখার মাথাটা এমন ঝুঁকে পড়ছে কেন? খোকা—যে খোকাকে জন্ম দিতে এই হাসপাতালেই এমনিভাবে দুটো রাত কষ্টে ছটফট করতে হয়েছে, সেই খোকা আজ তার মাকে উপদেশ দিচ্ছে, তিরস্কার করছে বিশেষত এ ব্যাপারে? পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কোনোই কি উপায় নেই! হে খোদা! এ কী শুনলাম আমি? জুলেখার চোখ-মুখ-কান গরম হয়ে জ্বালা করতে লাগল। তিনি জানেন, খোকার কথিত ছোট ভাইবোনদের দুরবস্থার আশঙ্কাটা নিতান্তই বানানো। আসলে খোকা বলতে চায় ছেলেমেয়েরা বড় হলে মা-বাবাদের এমন কিছু করতে নেই, যাতে তারা অন্যের কাছে লজ্জা পেতে পারে। কিন্তু কোত্থেকে এ খবর জানতে পেল খোকা? ডাক্তার তো মাত্র আজ সকালে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন, সেইসঙ্গে বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ। নিশ্চয়ই খোকার কোনো মেডিকেলের বন্ধু বলেছে ওকে। জুলেখার আবার মনে হলো মৃত্যু ত্বরান্বিত করা কত কঠিন। খোকা আজ বেশিক্ষণ বসল না। কথাবার্তায়ও খুবই সংক্ষিপ্ত, যার প্রায় সবটাই উপদেশমূলক, অভিভাবকসুলভ। একসময় জুলেখা বললেন, 'কাল অপারেশন। বড্ড ভয় করছে রে। কে জানে তোদের আবার দেখতে পাব কি না।'

খোকা কিন্তু আশ্চর্য, বিচলিত হওয়া দূরে থাক, এতটুকু প্রতিক্রিয়াও দেখাল না এ ব্যাপারে। বলল, 'ডিএন্ডসি আসলে কোনো অপারেশনই নয়। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। খারাপ লাগে শুধু ইচ্ছা করে কষ্টটা গায়ে লাগালে।'

খোকা চলে গেলে অনেকক্ষণ মড়ার মতো পড়ে রইলেন জুলেখা। একসময় একটা চাপা হাসি কানে আসতেই মুখ না ফিরিয়ে শুধু চোখ ঘুরিয়ে জুলেখা দেখলেন, মেয়েটির স্বামী এসেছে। খাটের এক কোণে বসে শায়িতা স্ত্রীর শূন্যে উত্থিত বিশাল পেটে হাত বুলাতে বুলাতে কী যেন বলছে আর দুজনে মিলে হাসছে। জুলেখা একটা যন্ত্রণার আভাস পেলেন বুকে, যা মুহূর্তে জন্ম দিল এক ঝলক স্মৃতির।

'ছেলে না মেয়ে হবে বলো তো?' একটা তরুণীর কণ্ঠস্বর, যা জুলেখার ছিল বিশ বছর আগে।

'মেয়ে। টুকটুকে সুন্দর, ঠিক তোমার মতো একটা মেয়ে।' ত্রিশ বছরের এক যুবক বলেছিল।

'না' জুলেখার পছন্দ হয়নি কথাটা, বলেছে 'ছেলে হবে, তুমি দেখো। ছেলে হলেই ভালো। বড় হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে। আর এত খাটতে হবে না তোমায়।'

এর পরই প্রসঙ্গ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। কার মতো দেখতে হবে সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাগত সন্তান এই নিয়ে খুনসুটিতে মেতে গেছে এক তরুণ সুখী দম্পতি, দারিদ্র্য যাদের তখন অনবরত আশা আর স্বপ্ন দেখাত। জুলেখা ওদের দিকে পেছন দিয়ে অন্যদিকে মুখ করে শুলেন। অনেকক্ষণ। যখন চিৎ হলেন দেখলেন খানিক আগের চপলতা শেষে ওরা এখন গম্ভীরভাবে খুব মনোযোগসহকারে কী সব আলোচনা করছে। একটু পরেই জুলেখার কাছে ওদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু স্পষ্ট হলো। ছেলেটির এক দৃষ্টিতে জুলেখাকে নিরীক্ষণ আর মেয়েটির ঘন ঘন তাঁকে লক্ষ করে বকে যাওয়া থেকে জুলেখা বুঝলেন ওরাও সব জেনে গেছে। কোথায় যাবেন জুলেখা? কোথায় গেলে এ পোড়ামুখোর প্রসঙ্গ আর উঠবে না?

মঈনুদ্দিনের ওপর রাগটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। শুধু কি এখন? সারাজীবনের অক্ষম পুরুষ এই মঈনুদ্দিন। প্রথম বয়সেও কি কম জ্বালিয়েছে তাঁকে? বড় খোকা পেটে এসেছে যখন টের পেলেন জুলেখা তখন সে কী লজ্জা! ছি! ছি! মুখ দেখানোরও উপায় ছিল না কাউকে। অবৈধ ছিল না যদিও, তবু এ মাতৃত্বে লজ্জা আর দৈন্য ছিল, যা জুলেখার নিদারুণ মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। ফলে, তখনো মরে যেতে মন চাইত মাঝে মাঝে। এখন অবশ্য বোঝেন, সে বয়সটাই মরণচিন্তাকে রোমান্টিক করে তোলে। তা না হলে সে অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে আজ তো জুলেখার পচে-গলে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ভাবিরা তখন কী পরিমাণ তামাশা করত তাঁকে নিয়ে। যার ভেতর ঠাট্টার আবরণে খোঁচাই প্রচ্ছন্ন ছিল। মঈনুদ্দিন এসবের কোনোই খবর রাখতেন না। বিয়ের যৌতুকের টাকায় মহানন্দে শহরে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। জুলেখা তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে চিঠি লিখেছিলেন। জানিয়েছিলেন, 'না খেয়ে থাকব সেও ভালো, তবু আমাকে এ লজ্জা থেকে বাঁচাও। আমার সম্মান তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন আব্বা।' মঈনুদ্দিন তখন বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন শহরে। এ জন্যও এখনো মাঝে মাঝে জুলেখাকে খোঁটা দিতে ভোলেন না। তখন যদি জুলেখা এমন ভাবাবেগে পরিচালিত না হয়ে আরো ক'টি মাস মুখ বুজে অপেক্ষা করতেন, মঈনুদ্দিন একটা ভালো কাজ জুটিয়ে ধুমধাম করে তাকে ঘরে তুলে আনতে পারতেন। জুলেখার সবুর সইল না বলেই এভাবে সারাটা জীবন গোটা সংসারকে পচে মরতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জুলেখার এই একটিমাত্র ভুলের জন্য সংসারের অভাব-কষ্ট কোনো কিছুতে কখনো হা-হুতাশ বা দুঃখ করার উপায় ছিল না মঈনুদ্দিনের সামনে। একে একে সব কথাই মনে পড়ছে জুলেখার। আর একা একা জ্বলছেন, ফুঁসছেন, উত্তপ্ত হচ্ছেন।

মাথার চুলে পাক ধরেছে জুলেখার। ছোট ছেলেটির বয়স ছয়। বড়টির উনিশ। এ অবস্থায় এ ধরনের কিছু কল্পনা করতে পারেন! প্রথম লক্ষণকে তাই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বয়সের স্বাভাবিক নিয়ম ওটা। দ্বিতীয় লক্ষণকে আমল না দিতে নিজের জন্য বিশেষ রুচিকর খাবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবেই চলেছে তিন-চার মাস। কিন্তু তারপর আর গোপন থাকেনি। মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। দশ হাত শাড়ির আবরণ ভেদ করে যখন জুলেখার ইঙ্গিতবহনকারী উদর ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, তখন লজ্জায়, দুঃখে, আশঙ্কায় সত্যি কেঁদে ফেলেন। এ নিদারুণ দারিদ্র্যে আরেকটি প্রাণের সংযোজন যে কী ভয়ংকর, ভাবতেও শিউরে উঠেছিলেন জুলেখা। নিজের এই জটিল অবস্থার সামগ্রিক যন্ত্রণায় স্বামীকে সঙ্গী করে পেতে চেয়েই জুলেখা এ অঘটন ঘটালেন! অসীম সহনশীলা জুলেখার চোখের জল মঈনুদ্দিনকে বিচলিত করল। তারপর যা করলেন, তারই জন্য জুলেখার আজকের এই দুর্ভোগ। মঈনুদ্দিন নামক লোকটির জন্মই বুঝি হয়েছিল জুলেখার জীবনে কষ্ট সৃষ্টি করার জন্য।

জুলেখা ভাবলেন পরশু রাতে প্রসব করতে গিয়ে পাশের বেডের যে মেয়েটি মারা গেল, যার শোকে তার অল্পবয়সী স্বামীটিকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখলেন জুলেখা, সে না মরে যদি তার স্থলে জুলেখা নিজে মরতে পারতেন কতই না ভালো হতো। প্রথম সন্তান জন্ম দিতে এসেছিল মেয়েটি। ফলে আশা-আনন্দের সঙ্গে ভয়ও ছিল। বয়সী বলেই হয়তো জুলেখার কাছে ঘুরে ঘুরে আসত প্রজাপতির মতো তাজা মেয়েটি। জুলেখা তাকে অভয় দিতেন, নানান গল্প করতেন। মেয়েটি নিশ্চিন্ত মনে চলে যেত। কে জানত মৃত্যু ওর এত কাছে ছিল। আশ্চর্য! চেহারাটাও এতটুকু বদলায়নি — মৃত্যুর দিনেও নয়। অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার সময়ও জুলেখার কাছে দোয়া চেয়েছিল মেয়েটা। জুলেখা তো প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন। তবু কেন জীবন নিয়ে ফিরে এলো না মেয়েটি?

পরদিন বিকালে মঈনুদ্দিন এলেন ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে হাতে ধরে। মঈনুদ্দিনের প্রতি ঘৃণার আধার তখন টইটম্বুর। একটা নাড়া লাগলেই পড়ে যাবে এ অবস্থা। এ সময় মঈনুদ্দিন ঘরে ঢুকলেন। জুলেখা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন। ইচ্ছা হচ্ছিল, মঈনুদ্দিনের দেওয়া সমস্ত কষ্ট-লজ্জা-যন্ত্রণা সঙ্গে দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেন। চিৎকার করে বলতে চাইছিলেন, আমার রক্ত, শক্তি, সুস্থতা ফিরিয়ে দাও। কিন্তু কিছুই বললেন না। চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

অজ্ঞান করা ওষুধটার গন্ধ এখনো শরীরে ভেসে বেড়াচ্ছে টের পেলেন, যদিও অপারেশন হয়ে গেছে সকালেই। ছেলেমেয়ে দুটির দিকেও একবার তাকালেন না জুলেখা। ওরা অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল। মঈনুদ্দিন বললেন, 'সালেহা তোমার জন্য কী তৈরি করে দিয়েছে দেখো। মেয়েটা কেবল কাঁদে। বলে, মাকে ছাড়া বাড়িটাকে আর সইতে পারি না।'

জুলেখা মুখ ফেরালেন। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলেন বিছানায়। আর কোনো কথা না বলে, কারো দিকে না তাকিয়ে, কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারটা খুলে ছেলেমানুষের মতো গপগপ করে খেতে শুরু করলেন। ছেলেমেয়ে দুটি বিস্মিত। একদৃষ্টিতে তারা মার দিকে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। মঈনুদ্দিন স্তব্ধ, বিষণ্ন। পাশের বেডের মেয়েটি এ সময় এগিয়ে আসে পরিস্থিতির স্বাভাবিকত্ব রক্ষার্থে। বাচ্চা দুটোকে কাছে ডেকে ওদের হাতে যেই দুটো কমলা তুলে দিয়েছে মেয়েটি, অমনি চৈতন্য হলো জুলেখার। মুখ-হাত দুটোই থেমে গেল একসঙ্গে। ছোট ছেলেটিকে নিজের কাছে ডেকে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন জুলেখা। উদ্গত অশ্রুকে আড়াল করতে করতে মুখ বিকৃত করে শব্দ করেন, 'উঃ!' মঈনুদ্দিন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'খুব কি কষ্ট হচ্ছে জুলেখা?' জুলেখা মাথা নাড়িয়ে সায় দেন। সত্যি তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পেটে নয়। অন্য কোথাও। কোথায় ঠিক বুঝতে পারেন না জুলেখা।

ছেলেটিকে ছেড়ে দিতেই সে এক লাফে দূরে সরে যায়। জুলেখা চেয়ে চেয়ে দেখেন নিজের সন্তানদের। তার রক্ত হেঁটে, নেচে, লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখে পাংশুটে জুলেখা তাঁর অসুস্থতা ভুলে যান কিছুক্ষণের জন্যে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর এক অদ্ভুত কথা মনে হয়। আচ্ছা, ওটা বেঁচে থাকলে কার মতো হতো দেখতে? খোকা, কামাল, সালেহা, বেণু না লিলির মতো? নাকি ওদের কারো মতো নয়? জুলেখা অথবা মঈনুদ্দিনের মতো? একটু পরেই জুলেখার খেয়াল হলো। কী সব উদ্ভট ভাবছিলেন এতক্ষণ! জুলেখা লজ্জা পেলেন এবং হাসলেন। স্বামীর দিকে এবার চোখ ফেরালেন, দেখলেন, এ কদিনেই মঈনুদ্দিন অনেকটা শুকিয়ে গেছেন। স্বামীর ক্লান্ত ম্লান মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে জুলেখা বুঝলেন, সংসারের ভেতর-বাইরের ভার কী দারুণভাবে চেপে বসেছে তাঁর ওপর। জুলেখা বললেন, 'কাল বাড়ি যাব। জানো, মনে হয় কতকাল বাড়ি ছেড়ে আছি। এখানে আমার সময় কাটে না একটুও।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই তাকে পাগল বলে

মার কথাতে অতিশয়োক্তি ছিল সন্দেহ নেই। তবু তার মন্তব্যটা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে মুন্সীগঞ্জ শহরের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা সকলেই জানেন এই ছোট্ট শহরটা, আক্ষরিক অর্থেই, বোঝায় পাগলে। এ ধারা চলে আসছে বহুকাল থেকেই। বায়োজ্যেষ্ঠরা যাঁরা এখনো জীবিত, তাঁরা সবাই বলে থাকেন, এমনটিই তাঁরা দেখে আসছেন বরাবর। মা বলত, পৃথিবীতে যত পাগল আছে, তাদের সবাইকেই নাকি তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার মুন্সীগঞ্জ শহরে আসতে হবে। এছাড়া তাদের পরিত্রাণ নেই। মা নাকি এ গল্প শুনেছে কার কাছে, সে আবার শুনেছে কোন সাধুর মুখে। এটা অভিশাপ, নাকি মুক্তি, বলা শক্ত।

পৃথিবীর সব পাগলই এখানে আসে কি না জানি না, এমনকি ঢাকা বিভাগের পাগলদের সহস্র ভাগের এক ভাগও কখনো মুন্সীগঞ্জে এসেছিল কি না তাও কেউ বলতে পারে না। তবে এটা নিঃসন্দেহে সত্য, হরেক রকমের অজস্র পাগলের আখড়া ছিল বিক্রমপুরের একমাত্র শহর মুন্সীগঞ্জে। আমরা ছেলেবেলায় নিত্যনতুন পাগল দেখতাম শহরের রাস্তাঘাটে। তাদের বিচিত্র ব্যবহার, কথাবার্তা, মুদ্রাদোষ অথবা পোশাক-আশাক আমাদের ছোটদের বিস্তর আনন্দ দিত। কখনো কখনো আবার ওদের কোনো কোনো ঘটনায় ভয়ানক ভয়ও পেতাম আমরা। এমনকি কেউ কেউ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেও চিৎকার করে জেগে উঠত মাঝে মাঝে। তা সত্ত্বেও পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় স্কুলে-পাঠশালায় সত্যয় মিথ্যে মিলিয়ে অনেক মজাদার গল্প, এমনকি কখনো বেশ লোমহর্ষক কাহিনিও চালু ছিল ওদের নিয়ে। একবার মনে আছে, ঘুম থেকে উঠে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, উঠানের কোণে রাখা আমার পুতুল-বিয়ের রান্না করার যাবতীয় হাঁড়িকুড়ি, খুন্তি, থালাবাসন একেবারে লাপাত্তা। একটি ভাঙাচোরা পাত্রও পড়ে নেই সেখানে। আমি তো হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গেছি ততক্ষণে। দেখতে দেখতে জানা গেল, শুধু আমার হাঁড়িপাতিল নয়, এ-পাড়া ও-পাড়ার প্রতিটি বাড়ি থেকেই বাইরে রাখা যাবতীয় খেলনা, হাঁড়িপাতিল, কাঠের পুতুল, কাঠের ঘোড়া সম্পূর্ণ অদৃশ্য রাতারাতি। ঘরে ঘরে শিশুদের কান্নাকাটি-আহাজারি। ছোট্ট শহর। মুহূর্তে রটে গেল সমস্ত শহরে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলনা উধাও হয়ে যাওয়ার কাহিনি। এই রহস্যময় চুরির গল্প। যে শোনে, সে-ই অবাক। বাচ্চাদের হাঁড়িকুড়ি কে চুরি করবে? দুপুরের পরে হঠাৎ শোনা গেল, শ্রীপল্লীর শান্তিকুটিরের বারান্দায় ছালা পাগলীর সংসারসামগ্রী রাখার মুখ-বন্ধ ছালাটির ভেতর থেকে পুলিশ আবিষ্কার করেছে শত শত ছোট ছোট হাঁড়িপাতিল, খেলনা, পুতুল। শুধু এক রাতে হানা দিয়ে মনের আনন্দে এসব সংগ্রহ করেছে ছালা পাগলী। পুলিশ যখন তার হাতের লাঠি দিয়ে ছালার ব্যাগ থেকে শিশুদের খেলনাগুলো বের করছে, ছালা পাগলী তখন সবে চান সেরে ভেজা ছালা গায়ে তার আস্তানায় ফিরেছে। পুলিশের সঙ্গে তখন রীতিমতো মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় লম্বা লম্বা জটাধারী জবজবে ভেজা ছালা পাগলীর। সে এক দৃশ্য বটে।

মুন্সীগঞ্জ শহরটা আসলে অনেকটা দ্বীপের মতো। এখানকার যেসব জায়গা বাইরের জগতের সঙ্গে এ শহরটির যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে, সে স্থানগুলো সবই নদী দিয়ে ঘেরা। অন্য কোথাও যেতে হলে নদী পেরোতেই হয়। এখনকার দিনের মতো কোনো সেতু ছিল না তখন অন্য কোনো শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে। সেতুর স্বপ্ন যদিও দেখতাম সকলেই। যখনকার কথা বলছি, তখন নৌকা, লঞ্চ ছাড়াও প্রতিদিন বড় বড় স্টিমার ভিড়ত জাহাজ-ঘাটে। শীতকালে, ঘন কুয়াশায়, মধ্যরাতে দূর থেকে জাহাজের এই ভোঁ ভোঁ শব্দে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যেত আমাদের। কখনো কখনো ভয় পেয়ে গেলে মা বলত, ও কিছু নয়। বরিশালের গাজী এতক্ষণে ছাড়ল বোধ হয় গুদারাঘাট, অথবা গোয়ালন্দের স্টিমার এই বুঝি এলো ঘাটে।

সারাদিন ধরেই চলত জলযানের এই যাওয়া-আসা — এই ছোট্ট বিচ্ছিন্ন শহরটাতে। আর তাদের এই অব্যাহত বিচরণের সুযোগেই হয়তো এখানে নেমে পড়ত অথবা এ জায়গা থেকে উঠে পড়ত এইসব বিচিত্র ধরনের পাগলরা। মুন্সীগঞ্জ শহরে অবশ্য কিছু পাগল ছিল, যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তারা আর কোথাও যেত না। ঘুরেফিরে এখানেই থেকে যেত। যেমন ছালা পাগলী, অন্ধ পাগলী, কেষ্ট পাগল। ছালা পাগলীর কথা তো আগেই বলেছি। সারা গায়ে একখানা ছালা ছাড়া কোনো পোশাক পরত না ছালা পাগলী। তবে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল সে। প্রতিদিন অন্তত দু'বার করে চান করত, আর ভেজা ছালা আস্তে-আস্তে তার গায়েই শুকোত। চোখের মণির ওপর সাদা পর্দা-পড়া আর সমস্ত মুখে বসন্তের গভীর দাগে ভরা অন্ধ পাগলী তার যাবতীয় সঞ্চয় অর্থাৎ খুচরো পয়সাগুলো সবসময় তার মুখের ভেতর রেখে দিত, কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে। আর কেষ্ট পাগল তো হঠাৎ হঠাৎ মধ্যরাতে উঠান থেকে চিৎকার করে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। জোরে জোরে মাকে ডেকে বলত, 'খুড়িমা, খুড়িমা, ভাত কই? খিদা লাগছে।' কোনো কারণে তখনো পর্যন্ত মায়ের খাওয়া যদি না হতো, তাহলে দেখা যেত হঠাৎ করে সে রাতে মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাতের খিদে একদম চলে গেছে। কেষ্টকে খাইয়ে প্রবল তৃপ্তির সঙ্গে মুড়ি চাবাতে চাবাতে মা আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করত বাতের ব্যথায় রাতে ভাত না খাবার যাবতীয় উপকারিতার কথা। আর যেদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আসত কেষ্ট পাগল, সেদিন কেষ্টর কপালে জুটত হয় ঠাণ্ডা অথবা পান্তা ভাত, না হয় মুড়ি কিংবা চিঁড়া। কেষ্ট, ছালা পাগলী আর অন্ধ পাগলীর মতো আরো বেশ কয়েকটি স্থানীয় ও স্থায়ী পাগল থাকলেও মুন্সীগঞ্জের বেশির ভাগ পাগলকেই দেখা যেত মাত্র কিছুদিনের জন্যে এখানে আসতে এবং তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করতে। ওরা যে কোথা থেকে আসত, আবার হঠাৎ একদিন কোথায় হারিয়ে যেত, তা কেউ বলতে পারে না। তবে প্রায় তীর্থস্থানের মতো করে পাগলদের মুন্সীগঞ্জ সফরের কারণেই হোক, আর এত বেশি পাগলের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসের কারণেই হোক, এ শহরের বাসিন্দারা পাগলদের প্রতি সত্যিকার অর্থেই অনেক বেশি উদার, সহনশীল ও সংবেদনশীল।

বিভিন্ন জলযানের নিত্য আসা-যাওয়ার কল্যাণে শুধু তো পাগল নয়, মাথাছাড়া গলদা চিংড়ি, সাগর কলা, ফুলকপি, আলু, লাউ, দুধ, পান — মুন্সীগঞ্জের আরো কত কী যে চলে যেত বাইরে! বরফকল থেকে আনা টাটকা বরফে ঢাকা বিশাল চিংড়িগুলো চাঙ্গারি ভর্তি করে বাইরে চলে গেলে মুন্সীগঞ্জের বাজারে পড়ে থাকত কেবল ওদের লম্বা লম্বা ঠ্যাংসহ বড় বড় মাথাগুলো। মাছের মূল অংশ অর্থাৎ ধড়টা ব্যতীত মাছের মাথাগুলোকে কেউ আর চিংড়ি বলতে রাজি হতো না তখন, তা যত বিশালই হোক না কেন তাদের আকৃতি, অথবা যত সুস্বাদুই লাগুক না কেন গরম গরম ভাতের সঙ্গে মাখানো চালের গুঁড়ো দিয়ে ভাজা মচমচে লালচে ঘিলুর সেই মস্তিষ্ক। ওটা তখন শুধুই ইচা। অর্থাৎ ইচার মাথা। পরে শুনেছিলাম, মাথাগুলো অতি সহজে পচে যায় বলেই এই শিরশ্ছেদ, আর সেই কারণেই কেবল স্থানীয়দের ভাগ্যে জুটত ওই অংশটুকু (তাও যথেষ্ট মূল্যের বিনিময়ে), অন্য কোনো কারণে নয়। শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ন্যায্য হিস্যা অনুযায়ী ভাগবাটোয়ারার ব্যাপার এটা ছিল না মোটেই। বুঝি, এ সবকিছুই চলে পণ্যের স্বাভাবিক আদান-প্রদানের — লাভ-লোকসানের অঙ্ক মিলিয়ে। অন্য কোনো বিবেচনা সেখানে স্থান পায় না।

কিন্তু পাগলদের ব্যাপারটা? ওদের এই আসা-যাওয়া, বিশেষ করে মুন্সীগঞ্জের প্রতি পাগল সম্প্রদায়ের এই যে বিশেষ দুর্বলতা বা পক্ষপাতিত্বের বিষয়টা সকলেই লক্ষ করে থাকেন, এর কারণ কিন্তু কারো বোধগম্য হয় না। অর্থনীতি বা রাজনীতির কোনো সূত্রে তা মেলে না। এমন কিছু অবস্থাপন্ন লোকের বসবাস এখানে নেই যাদের আকর্ষণে, যাদের বাড়িতে বিনে পয়সায় খাওয়া-পরার লোভে ওরা দলে দলে ভিড় করতে পারে এ শহরে। কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা রাষ্ট্রীয় নিয়মের শিথিলতাও কোনো পাগলের কপালে জোটে না এখানে। বরং অতি বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন পাগলের ভিড়ে এখানকার পুরনো পাগলরা মাঝে মাঝে বিরক্তিই বোধ করে, এমনকি কখনো কখনো বিদ্রোহীও হয়ে ওঠে। ওদের ভাবখানা যেন, পুরান পাগলে ভাত পায় না, নতুন পাগলের আমদানি? বিশেষ করে শীতের বা বর্ষার রাতে শোবার জায়গা নিয়ে পাগলদের মধ্যে অথবা পাগল-ভিক্ষুকের মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারির সংবাদও খুব ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় এখানে। এই সময় ভিক্ষুক আর পাগলের পার্থক্য প্রায়ই মুছে যেত। দুজনের পরিচয়ই তখন কেবল গৃহহীন, শীতার্ত অথবা সিক্ত। আর তাই মারামারির শাস্তি হিসেবে একই রশিতে বেঁধে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হতো ইদ্রিস পাগল আর কুঞ্জলাল ভিখারীকে। পরে অবশ্য দুজনকেই আবার ছেড়ে দেওয়া হতো। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হলো রাঙা পাগলী। সারা শহরে রীতিমতো হৈচৈ বাধিয়ে। রাঙা কিন্তু পাগলীর আসল নাম নয়। কেউ জানে না তার সত্যিকারের নাম। কিন্তু তার দৈহিক সৌন্দর্য আর তারুণ্য দেখে কারো মুখ ফসকে হয়তো বেরিয়ে এসেছিল শব্দটা, যা সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে যেতে সময় লাগেনি। শোনা যায়, শুদ্ধ উচ্চারণে ছোট ছোট বাক্যে কথা বলে পাগলী। তার কথা শুনে কেউ কেউ তাকে ওপার বাংলার লোক বলে পর্যন্ত ঠাহর করেছে।

ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। বয়স আনুমানিক কুড়ির কোঠার মাঝামাঝি। কোলে হলদে রঙের জামা গায়ে আট-দশ মাসের একটা ফুটফুটে মেয়ে। মাথা-ভরা নরম কালো চুলের গাবদা-গোবদা শিশুটিকে সবসময় কোলে করে রাখে, কৃচিৎ কোল থেকে নামালেও সর্বক্ষণ দু'হাত দিয়ে আগলে রাখে তাকে—সন্তান ছেড়ে এক পা নড়ে না রাঙা পাগলী। পরনে তার লাল চেক চেক সুতি শাড়ি। এক প্যাঁচ করে পরা। কালো-সাদায় ছাপা মলিন ব্লাউজ গায়ে। শাড়ির নিচে ঈষৎ ময়লা সাদা সায়া হাঁটতে গেলে ঝলাক ঝলাক করে বেরিয়ে আসে। বাঁ হাতে লোহা আর তামা দিয়ে প্যাঁচানো এক মোটা বালা। ডান হাতে একটা লাল রঙের পলার চুড়ি। খালি পা। পুরোটাই ধূলিমাখা। চুলগুলো গাঢ় বাদামি রঙের। কোঁকড়ানো — উসকোখুসকো — শলা শলা। পেছনে টেনে নিয়ে একটা হাত খোঁপায় বাঁধা। দীর্ঘদিন চিরুনি পড়েনি, ধোয়া হয়নি, বুঝতে সময় লাগে না। সবসময় সে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাকে পায় তাকেই যা বলে, তার অর্থ হলো, বড় বেশি দামি এক জিনিস খোয়া গেছে তার। সেটার সন্ধানেই এই দূরযাত্রা। কোথা থেকে সে এসেছে, কী সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না। কী নাম তোমার?

খুকি।

খুকি কী?

খুকি।

তোমার মেয়ের নাম কী?

দেবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবী কি?

খুকি।

তোমার বাড়ি কোথায়?

ঘরে।

ঘর কোথায়?

গ্রামে। জোড়া তালগাছ আর মস্তবড় পুকুর সেখানে।

গ্রাম কোথায়?

মুক্তারপুরে।

কোন জেলায়?

পূর্ব বাংলায়।

শোনা যায়, প্রথম প্রথম গোয়েন্দা পুলিশের নজরে পড়েছিল রাঙা পাগলী। পার্শ্ববর্তী দেশের গুপ্তচর কি না সন্দেহ হয়েছিল তাদের। কিন্তু কিছুদিন তার পেছনে ঘুরঘুর করে, আর সার্বক্ষণিকভাবে তার চলাফেরা-কথাবার্তা অনুসরণ করে করে তারা নিশ্চিত হয়, রাঙা পাগলী আর যাই হোক, দেশের নিরাপত্তার জন্যে মোটেও হুমকি নয়। তাদের এই বিবেচনা আর সিদ্ধান্তের ফলে পুলিশ ব্যারাকে ফিরে যায় আর রাঙা পাগলীর পেছনে ছুটতে থাকে স্থানীয় কয়েকজন, যাদের খুব সুনাম ছিল না আশপাশে। তখন এক সন্ধ্যায় কাদের ডাক্তার, মহেশ উকিল আর মুনীর মাস্টার এসে আমাদের বাসায় হাজির দেন। প্রবলভাবে বাবা-মাকে চেপে ধরেন রাঙা পাগলীকে অন্তত কয়েক দিনের জন্যে আমাদের বাসায় স্থান দেওয়ার জন্যে। অল্পবয়সী, দেখতে সুন্দর মেয়ে। পাগল হলেই বা কী? রাতে-বিরাতে এভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কী থেকে কী হয়ে যাবে, তাতে সবারই দুর্নাম হবে বাইরের লোকজনের কাছে। তাছাড়া পাগলীর চেহারা, চলন-বলন, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ভালো ঘরের মেয়ে। তাকে স্বগৃহে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার। শহরের নেতারা সেদিন আমার মা-বাবাকে কথা দেন, খবরের কাগজের মাধ্যমে সংবাদ ছাপিয়ে অতি শিগগিরই তারা মেয়েটির পরিচয় বের করে আনবেন এবং তাকে তার বাড়িতে পৌঁছুবার, অথবা অন্য কোথাও নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করবেন। মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপারই তো। মার খুব ইচ্ছে হলেও বাবার নিষেধের ইশারায় তার আর জিজ্ঞেস করা হয় না, এতো সামান্য অনুরোধটার জন্যে, মাত্র এই কয়েকদিনের ব্যাপারটির জন্যে তিন নেতার বাড়ি ঠেঙ্গিয়ে আমাদের বাড়িতেই কেন আসতে হলো তাদের। আরো অনেক অনুচ্চারিত প্রশ্নের মতো এটিও নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল, আর আমাদের বাড়ির ঢাকা-বারান্দাটায় রান্নাঘরের পাশের চালাঘরটিতে কন্যাকোলে এসে ঢুকল রাঙা পাগলী।

তোমার বাড়ি কই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তারপুরে। পুকুরপাড়ে জোড়া তালগাছের পাশে।

তুমি কী খোঁজো?

খুকি।

এই তো তোমার কোলে খুকি।

রাঙা পাগলী তখন আড় চোখে তার কোলের সন্তানকে দেখে। তারপরে চোখ ফিরিয়ে বলে, 'আরেক খুকি।'

'কোঁকড়া চুলের খুকি', বলে কন্যার সোজা সোজা চুলগুলো টেনে টেনে দেখায় পাগলী। অর্থাৎ এই সোজা চুলের কন্যা নয়, অন্য এক খুকিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে, যার চুল কোঁকড়ানো। পাগলের কথার — তাদের মুখে উচ্চারিত সব কিছুর আক্ষরিক অর্থ খুঁজলে চলে নাকি? কত কিছু বলে তারা! কত রকম কল্পনা! সবকিছুরই কি অস্তিত্ব থাকে?

কখনো কখনো নিজের সঙ্গে একা একাই কথা বলে রাঙা পাগলী। নিজে নিজেই হাসে, কখনো কাঁদেও। প্রথম রাতেই আমার মায়ের সঙ্গে এক চোট হয়ে যায় তার। শোবার আগে ওর ঘরের ভেতর থেকে বাইরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে সবে মা আমাদের বড় ঘরে ঢুকতে উদ্যত হয়েছে। খপ্ করে মার ডান হাতটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাঙা। ভয়ে চোখ দুটো ইয়া বড় বড় হয়ে পড়েছে তার। কিছু বুঝতে না পেরে মা আমাদের ডাকে। বেশ জোরেই। ততক্ষণে রাঙা পাগলী মাকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে, ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখাকে প্রবলভাবে ভয় পায় সে। হয়তো কখনো এ ধরনের কোনো অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। মা আর কোনো কথা না বলে ওর ঘরের, মানে ঢাকা-বারান্দার দরজার খিল খুলে দেয়। তারপর কপাট দুটো আলগা করে ভেজিয়ে রাখে। দরজার ফাঁক দিয়ে ঘর থেকে এক ফালি আকাশ দেখা যায় তখন। সঙ্গে সঙ্গে চিকন হাসি ফুটে ওঠে রাঙার। পরিতৃপ্তির। বিজয়ের। মাটিতে বিছানায় বসে বসে নিশ্চিন্তে কন্যাকে বুকের দুধ খাওয়াতে শুরু করে সে, মায়ের সামনেই।

একদিন মা আমাদের ডেকে বলে, রাঙা নাকি মাকে বলেছে, রাঙার মা আর বাবা তাকে মুক্তারপুর থেকে নিয়ে এসে একা একা ঘরে অন্ধকারে আটকে রেখেছিল অনেকদিন, তাই বন্ধ ঘরকে সে এত ভয় পায়। সে আরো বলেছে, আমাদের মা নাকি খুব ভালো। কেননা মা রাঙার ঘরের দরজা বন্ধ করে না।

তোর বরের নাম কী রে?

জানি না। বলব না।

তোর মেয়ের বাবা কোথায়?

বারাসতে।

তোর বাড়ি কোথায়?

মুক্তারপুরে। জোড়া তালগাছ আর পুকুরের পাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতঃপর রাঙা মুক্তারপুরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। জানায়, এত দূর থেকে সে এখানে এসেছে কেবল মুক্তারপুরে যাবে বলেই। কে একজন তাকে বলেছে, মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে মুক্তারপুর কাছেই। সে যখন এসব কথা বলে, তখন পুরোপুরি সুস্থ মনে হয়। পাগলামির কোনো চিহ্ন থাকে না, আচরণে, কথায়-বার্তায়।

মুক্তারপুরে কাদের বাড়ি যাবে তুমি? মুনীর মাস্টারের সরাসরি প্রশ্ন। মোক্তারবাড়ি। এক জোড়া তালগাছ আর মস্তবড় পুকুর আছে সেখানে।

কী নাম মোক্তারের?

মুক্তা...। না, না, নাম বলতে নেই।

এক বিকেলে স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে রাঙা পাগলীকে পাঠানো হলো মুন্সীগঞ্জের অদূরবর্তী মুক্তারপুর নামক বাণিজ্যিক শহরতলিতে। কিন্তু সন্ধ্যার পর বিমর্ষ মুখে ফিরে এলো দলটি, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে। রাঙা কিছুই চিনতে বা মনে করতে পারে না সেখানকার। সব দেখেশুনে, কথা বলে কারো মনে হয়নি কখনো এখানে ছিল রাঙা। স্থানীয় কেউই তাকে চিনতে পারে না, বা এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা জানে না। রাঙার কথিত অথবা কল্পিত মুক্তারপুর যে এটা নয়, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিন্ত হয়। তার বর্ণিত জোড়া তালগাছ আর মস্তবড় পুকুরসহ তেমন কোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায়নি, যাকে সামান্য পরিচিতও মনে হয় রাঙার। পরদিন মুন্সীগঞ্জের নিজস্ব প্রতিবেদক পরিমল ভট্টাচার্জির কল্যাণে দৈনিক সংবাদে ফলাও করে রাঙা পাগলীর ছবিসহ খবর ছাপা হয়। সেইসঙ্গে আর্জি পেশ করা হয় যদি কেউ এই মেয়েটিকে চেনেন, বা তার পরিবারের বা আত্মীয়স্বজনের কোনো খবর দিতে পারেন, তাহলে দয়া করে নিম্নলিখিত জায়গায় যোগাযোগ করুন। খবরের শিরোনাম ছিল, 'কে এই রাঙা পাগলী?' শুরুটা ছিল এ রকম :

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুন্সীগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর। গত কয়েকদিন যাবৎ মুন্সীগঞ্জ শহরে যাবতীয় গুঞ্জন যাকে ঘিরে, সেই গৌরবর্ণা তরুণী, শিশুকন্যা কোলে রাঙা পাগলী (এটি তার সঠিক নাম নয়), সর্বক্ষণ তার কথিত অপর কন্যাকে এবং এককালীন বাসস্থান মুক্তারপুর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সংবাদটি প্রকাশের পর আরো একটি দিন কেটে গেছে। আজো প্রতিদিনের মতো ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত রাঙা পাগলী তার আরেক কন্যা এবং মুক্তারপুর জায়গাটি খুঁজে বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় অন্য দিনের মতোই মুখ কালো করে ব্যর্থ মনে বাসায় ফিরেছে — বাসায় মানে আমাদের বাড়ির ভেতরকার ঘেরা বারান্দায়। চুপচাপ সেখানেই বসে আছে সে মেয়ে কোলে নিয়ে। সেদিন মুন্সীগঞ্জের বরফের কলে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তাই বরফ তৈরি হয়নি। ফলশ্রুতিতে মুন্সীগঞ্জের কাঁচাবাজার ছেয়ে যায় বড় বড় গলদা চিংড়ি আর বিশাল বিশাল ইলিশ মাছে। জলের দামে বিক্রি হয় সেসব মাছ। বাড়িতে বাড়িতে আজ উৎসবের আমেজ। সব কাজ ফেলে সবাই ব্যস্ত মাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোটা, মসলা বাটা আর রান্না করার কাজে। আমাদের ঘরেও আসে বেশ কয়েকটি ইলিশ আর গলদা। খবর পেয়ে কমলাঘাট থেকে ছুটে আসে নয়ন মাসি, যে ভালোটা মন্দটা খেতে বড়ই পছন্দ করে। এরকম দিন এলে নয়ন মাসি বেজায় খুশি। ইচ্ছেমতো এবং প্রচুর পরিমাণ মাছ কিনে নিয়ে যায় বাড়িতে। নয়ন মাসির কোনো ছেলেপুলে নেই। মাছ কুটতে কুটতে রাঙার ফুটফুটে শিশুকন্যাটির দিকে চোখ পড়ে নয়ন মাসির।

হাত ধুয়ে এসে অবলীলায় বলে বসে, 'আমাকে দিয়ে দে তোর মেয়েকে। আমি খুব যত্ন করে মানুষ করব ওকে।'

কথাটা বলে যেই মেয়েটিকে কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছে নয়ন মাসি, রাঙা পাগলী মেয়েকে টেনে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। রাতের অন্ধকারের পরোয়া করে না সে। মা এগিয়ে এসে ওকে থামাবার চেষ্টা করে। ঝটকা মেরে মার হাত সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় পাগলী। ওর গায়ে তখন অসুরের মতো শক্তি। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। নয়ন মাসি রীতিমতো বিব্রত। হাতে-পায়ে ধরে রাঙাকে কোনো মতে এনে বসায় পাটিতে। মাও তিরস্কার করে নয়ন মাসিকে। তবু সে রাতে রাঙা কিছুই খায় না। মেয়েকে বুকে চেপে ঠায় বসে থাকে ঘরে। মা বলে, রাতে যতবার জেগেছে, দেখেছে, মূর্তির মতো ঘুমন্ত মেয়ে কোলে বসে আছে রাঙা পাগলী।

পরদিন সকালে উঠে তাকে আর দেখা যায় না। চারদিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও রাঙা পাগলীর সন্ধান পাওয়া যায় না। যেমন হঠাৎ করে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় সে। এখানে যে এতদিন ছিল, তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত রেখে যায়নি কোথাও, শুধু কন্যার ঝুঁটি বাঁধার জন্যে ব্যবহৃত ছোট্ট একটি গোলাপি ফিতা ছাড়া। রাঙা পাগলী সত্যি সত্যি চলে গেছে। কোথায়, কেউ জানে না। হয়তো তার সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজে — হয়তো মুক্তারপুরে তার পুরাতন বাসস্থানের উদ্দেশে, যেখানে এক জোড়া তালগাছ আর এক মস্তবড় পুকুর রয়েছে।

রাঙা পাগলী চলে যাওয়ার ঠিক তিনদিন পর এক হাতে একটি বুজানো ছাতা আর আরেক হাতে সাত-আট বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা গায়ে, স্যান্ডেল পায়ে এক লোক এসে দাঁড়ায় আমাদের উঠানে। লোকটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, হালকা গড়ন, শ্যামলা গায়ের রং। তার মাথাভর্তি কালো কুচকুচে তৈলাক্ত চুল টানটান করে পেছনের দিকে আঁচড়ানো। ছাতার সঙ্গে বাঁ হাতে 'সংবাদ'-এর সেই সংখ্যাটি ভাঁজ করে রাখা, যেখানে খবরের সঙ্গে রাঙা পাগলীর দুটি বড় বড় ছবি ছাপা হয়েছে। রাঙা পাগলীর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করে লোকটি। জানায়, তার কন্যাও এত দূর থেকে এসেছে শুধু একনজর তাকে দেখার জন্যে, যাচাই করার জন্যে, তার বাবা যা বলেছে, সত্যি সত্যিই ওটা তার হারিয়ে যাওয়া মা কি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঙা পাগলী চলে গেছে শুনে লোকটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে উঠানে। মা তাড়াতাড়ি তাকে একটা জলচৌকি এনে দেয় বসতে। লোকটি নড়ে না। জলচৌকিতে বসারও কোনো আগ্রহ দেখায় না। বারবার শুধু একটি কথাই বলতে থাকে, একটিই আফসোস তার, যার অর্থ হলো, এত কাছে এসেও আবার সে চলে গেল! দেখা হলো না! ওকে যে জিজ্ঞেস করা হলো না সেই প্রশ্নটা, যা তাকে প্রতিদিন কুরে কুরে খায়। কেন সে তার মায়ের সঙ্গে সেদিন চলে গিয়ে আর ফিরে এলো না কখনো, অথচ যে মা কি না তাদের পছন্দের বিয়েটা পর্যন্ত মেনে নেয়নি দু'বছরেও! হঠাৎ একদিন সেই মায়ের বুকে মাতৃস্নেহ উথলে উঠল বলে, আর কথা নেই বার্তা নেই দুই হাঁড়ি মিষ্টি হাতে নিয়ে মেয়ের বাড়িতে উদয় হলো বলেই সব ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে চলে যেতে হবে?

সবাইকে বিষণ্ন করে দুম াসের ঘুমন্ত শিশুকন্যাকে সে কথা দিয়ে গেছিল সেই বিকেলেই ফিরে আসবে। কিন্তু কোথায়? আর কখনো ফেরেনি। বরং কাউকে কিছু না বলে চোরের মতো রাতের অন্ধকারে ওদের গোটা পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল অন্য পাড়ে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে লোকটা। নীল ফ্রক পরা সাত-আট বছরের মেয়েটিকে কেমন বিব্রত দেখায়। বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে সে। আমরা সবাই দেখি, মেয়েটির ফর্সা কপালে, মুখে, গালে, চোখের পাতার ওপরে হাওয়ায় উড়ে উড়ে এসে পড়ছে গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়ানো চুল। তোমার নাম কী?

আসমা।

তোমার আরেক নাম বুঝি খুকি? না, ওইটা আমার আকিকার আগের নাম।

বাবার নাম?

মুক্তাদীর।

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

মুক্তারপুরে।

কোন জেলায়?

ফরিদপুরে।

তোমাদের বাড়িতে এক জোড়া তালগাছ আর মস্তবড় পুকুর আছে?

তালগাছ একটাই। আরেকটা মইরা গেছে বড় বন্যার সময়। পুকুর আছে।

আর তোমার মা?

নাই। পালায়ে গেছে।

সেদিন বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝি, প্রথমবারের ঘর ছাড়া তার স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। অর্থাৎ ঘর ছাড়ার মতলব নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেনি সে। কিন্তু দ্বিতীয়বার? কখন ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল রাঙা পাগলী? তখন নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন অনালোকে দীর্ঘ দিনরাত্রি কেটেছিল তার; তখন নয়, যখন অন্য আরেক পুরুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল তার; তখনো নয়, যখন সেই অন্য পুরুষ তার অঙ্গ ছুঁয়েছিল; কিন্তু যখন আরেকটি শিশু নাড়ি কেটে তার শরীর বেয়ে নেমে এসেছিল, যখন সেই সদ্যোজাত প্রাণীটির কচি হাত তাকে স্পর্শ করেছিল, আর ওই ছোট্ট নরম ঠোঁট দুটি তার বক্ষ শুষেছিল। যখন একটি নবজাতক কন্যার মুখ-দর্শন, হারিয়ে যাওয়া আরেক কন্যার বিচ্ছেদকে অসনীয় করে তুলেছিল — রাঙা পাগলী তার ফেলে আসা কন্যার খোঁজে ঘর ছেড়েছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ব-ইচ্ছায় জন্মদান

পিল

নারী আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় ষাটের দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ির আবিষ্কার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। যৌনতা ও সন্তানধারণ, নারীর যে-দুটি বিষয়কে পুঁজি করে আদিকাল থেকে নারীকে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার করা হচ্ছে, সেই যৌনতাকে সন্তানধারণ থেকে আলাদা করার সুযোগ করে দিয়েছে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি বা 'পিল'। যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা ও যৌনসুখ উপভোগ করা মানুষের অতি স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা। এই অতি মৌলিক ও জৈবিক বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে নারীর অবধারিত পরিণতি যে সন্তানধারণ, সন্তান প্রসব আর সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ নয়, এই সত্য যেদিন অন্তরে ধারণ করল নারী, সেদিন সে তার বহুমাত্রিক রূপ ও ক্ষমতা সম্পর্কে আরো সচেতন, আরো আস্থাশীল হয়ে উঠল। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'-র মতো অবমাননাকর প্রাচীন শ্লোকের অসারতা প্রমাণ করতে সমর্থ হলো নারী বিবিধ বিষয়ে তার পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে। প্রকৃতির কাছে, ভবিতব্যের কাছে নিজেকে সঁপে না দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মজীবনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সে নিজের হাতে গ্রহণ করতে শিখল। নারী তার কর্মক্ষমতা ও ভূমিকা বিস্তার করার সুযোগ পেল। সন্তানধারণ যেহেতু নারীর একক ক্ষমতা ও দায়িত্ব, যতদিন সে নিজে এ বিষয়টির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে না পেরেছে, ততদিন শুধু মাতৃত্বজনিত ব্যাপারেই নয়, জীবন ও জগতের আনুষঙ্গিক অন্য অনেক বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্যেও তাকে পুরুষের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছে। পিল অবশেষে তৈরি করে দিল স্বাধীন মানুষ হিসেবে নারীর পথচলার জন্য প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত মসৃণ এক রাস্তা।

যৌনতাকে প্রজনন থেকে আলাদা করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই। জন্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টার ইতিহাস তাই স্বভাবতই সুদীর্ঘ। বাইবেলের সর্বপ্রথম পরিচ্ছেদ জেনেসিসে শীর্ষসুখের আগেভাগে শিশ্ন-অপসারণের উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিশরের মেয়েরা অ্যাকাসিয়া পাতার সঙ্গে মধু যোগ করে অথবা জীবজন্তুর মল থেকে সাপোজিটরি তৈরি করে জরায়ুতে স্থাপন করত গর্ভরোধের প্রচেষ্টায়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিসে অলিভ অয়েলের সঙ্গে সিডার তেল মিশিয়ে মলম তৈরি করে তা জরায়ুর ভেতর ব্যবহার করত মেয়েরা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দার্শনিক অ্যারিস্টটল বীর্য নির্মূল করার জন্যে বিভিন্ন রকম তেল ও মলম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। খ্রিস্টের জন্মের কয়েক বছর পর থেকেই রোমান লেখক ও দার্শনিকরা জন্মরোধে যৌনসম্পর্ক পরিহারের গুণগান করতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাসানোভা লেবুর অর্ধেক খোসা জরায়ুর ভেতর প্রতিস্থাপন করে জন্মরোধের প্রচেষ্টা চালান। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বিশেষ এক ধরনের কাপড় অথবা মাছের অন্ত্রনালি দিয়ে তৈরি কনডম ও ডায়েফ্রাম ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

১৮২৭ সালে বিজ্ঞানীরা নারীর শরীরে ডিম্বাশয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এরপর আরো দুই দশক লাগে ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর মিলনে ভ্রূণ সৃষ্টির সঠিক রূপরেখা নির্ণয় করতে। এর আগে পর্যন্ত মনে করা হতো পুরুষের বীর্য নারীর শরীরে সঠিকভাবে প্রবেশ করলেই সন্তান উৎপাদিত হয়। ভ্রূণের শরীর গঠনে নারীর কোনো অবদান তখন পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল না। নারীকে তখন মনে করা হতো শুধু সন্তানধারণ করার একটা আধার। ডিম্বকোষ ও নিষেকক্রিয়া আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রজননপ্রক্রিয়ার সঠিক রূপটাই শুধু উদ্‌ঘাটিত হলো না, সন্তান-জন্মে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ও সমান অংশীদারিত্বের সঠিক চিত্রটাও প্রকাশিত হলো। এই সময় থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও দ্রুত অগ্রগতি শুরু হলো। সঙ্গমের পর প্রক্ষালনের মাধ্যমে বীর্যমুক্ত হওয়ার উপযোগী বিভিন্নরকম পরীক্ষামূলক তরল পদার্থে বাজার ছেয়ে গেল। এসব দ্রব্য সহজভাবে ব্যবহারের জন্যে সিরিঞ্জও আবিষ্কৃত হলো।

১৮৩৮ সালে জার্মান ডাক্তার ফ্রেডেরিক ওয়াইল্ড দুই মাসিকের অন্তর্বর্তী সময়টাকে জরায়ু ঢেকে রাখার জন্যে একরকম পাতলা ও ছোট পর্দা আবিষ্কার করেন যা জরায়ুর 'ঘোমটা' বা 'টুপি' বলে পরিচিত ছিল তখন। ১৮৩৯ সালে চার্লস গুডইয়ার রাবার প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটালে একে একে বাজারে আসে রাবারের তৈরি কনডম, আইইউডি, ডায়েফ্রাম। ১৮৮৬ সালে লন্ডনে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রক সাপোজিটরি তৈরি হতে শুরু হয়। কুইনাইন ও কোকো বাটার দিয়ে তৈরি এই সাপোজিটরির কার্যকারিতা একবারে মন্দ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় পর্যন্ত বিলাতে এই সাপোজিটরি খুবই প্রচলিত ছিল। প্রাক-শিল্পবিপ্লবকালে, বিশেষ করে তিরিশের দশকের ভয়ানক মন্দাকালে আমেরিকান মেয়েরা বিভিন্ন গাছগাছালি থেকে আহরিত দ্রব্যাদি দিয়ে তৈরি তরল পদার্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যে নিজেদের বীর্যমুক্ত করার চেষ্টা করতেন।

১৮৯০ সালে বিজ্ঞানীরা প্রথম মানুষের শরীরে হরমোন জাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। ১৯০৫ সালে এর নামকরণ হয় হরমোন — যা গ্রিকশব্দ 'hormao' (উত্তেজিত বা উদ্দীপ্ত করা) থেকে এসেছে। ভুয়া ও অনিরাপদ খাদ্য ও ওষুধ থেকে জনগণকে রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় স্থাপিত হয় ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যবর্তী সময়টাতে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে জাপান ও অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, মেয়েদের দুই মাসিকের মধ্যবর্তী খানিকটা সময়ে যৌনসম্পর্ক পরিহার করলে প্রাকৃতিকভাবেই জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাদের উদ্ভাবিত 'rhythm method' আজো পৃথিবীতে জনপ্রিয়, যদিও হিসেব-নিকেশ করা 'এই নিরাপদ সময়' জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়।

১৯২৮-২৯ সালে আবিষ্কৃত হয় মেয়েদের শরীরের প্রধান দুটি হরমোন — প্রজেস্টেরন ও এস্ট্রোজেন। এই হরমোন দুটির অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন প্রজনন-বিজ্ঞান ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই হরমোন দুটির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি বা পিলের উদ্ভব হয়। পিল ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নির্গমনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যেহেতু ভ্রূণের সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন একটিমাত্র শুক্রাণুর সঙ্গে একটি ডিম্বাণুর মিলন, কোটি কোটি শুক্রাণু ধ্বংস করার চেয়ে একটি ডিম্বাণুর প্রতিরোধ করা অনেক বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ। পিলের কার্যকারিতা তাই প্রায় শতকরা একশো ভাগ।

পিল আবিষ্কারের কাহিনি বলার আগে এর পেছনে যাঁদের মৌলিক ও নিরলস অবদান রয়েছে সেই কয়েকজন ব্যক্তির নাম না করলে নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির আবিষ্কার একটি সফল ও সমবেত প্রচেষ্টার গল্প। একজন অসাধারণ মানুষের জীবন-আহরিত অভিজ্ঞতাসঞ্চিত এক বিশাল ও মহৎ স্বপ্নের গল্প। এই মানুষটি স্বপ্ন দেখতেন মাথাধরার বড়ি অ্যাসপিরিনের মতো সহজভাবে একটা 'পিল' খেয়ে নারী একদিন তার জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন যে-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নারী, তাঁর নাম মার্গারেট সেঙ্গার (১৮৭৯-১৯৬৬)। মার্গারেট বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি জানতেন না ঠিক কীভাবে কী উপায়ে এটা সম্ভব হবে। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন জন্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মেয়েদের নিজেদের হাতে নিতে হবে। মার্গারেটের স্বপ্ন-বাস্তবায়নের অর্থ জুগিয়েছিলেন তাঁর সহযোদ্ধা সহস্বাপ্নিক ক্যাথরিন ম্যাককরমিক (১৮৭৫-১৯৬৭)। আর জন্মনিরোধ-পিল আবিষ্কারের জন্যে তাঁরা যাঁকে পেয়েছিলেন, সেই মেধাবী বিজ্ঞানীর নাম গ্রেগরি পিনকাস (১৯০৩-১৯৬৭) জন্তুর ওপর গবেষণায় পিনকাসের আবিষ্কার মানুষের শরীরেও যে কার্যকর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়েছিল সেই সাহসী চিকিৎসক-গবেষক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন রোমান ক্যাথলিক ডাক্তার জন রক (১৮৯০-১৯৮৪)। এ ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে ও কম খরচে প্রজেস্টেরন তৈরির সাফল্য এনে সহযোগিতা করেছিলেন প্রফেসর রাসেল মার্কার। এরপর দুই ওষুধের কোম্পানি সার্ল ও সিন্টেক্স-এর দুই গবেষক যথাক্রমে ফ্র্যাঙ্ক কোল্টন ও কার্ল জেরোসি ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে মুখে খাবার-উপযোগী কৃত্রিম প্রজেস্টেরন তৈরি করে এই দুই ওষুধের কোম্পানির জন্য 'জাদুর বড়ি' তৈরির পথ উন্মুক্ত করে দেন। তাতে দেখা যায়, পিল-আবিষ্কারের জন্যে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এক অভূতপূর্ব মিলন ঘটেছিল বেশ কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির, যাঁদের যৌথ প্রচেষ্টার সুফল ভোগ করছে আজ বিশ্বের সিংহভাগ নারীকুল।

নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের কর্নিং শহরে এক খেটে-খাওয়া আইরিশ ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মার্গারেট সেঙ্গার। তিনি চোখের সামনে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মাকে যক্ষ্মা রোগে মারা যেতে দেখেন। মার্গারেটের বয়স তখন মাত্র উনিশ। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেন, এগারোটি জীবিত ও সাতটি মৃত সন্তান প্রসব করার ধকল ও ক্লান্তিতে তাঁর মায়ের শরীর এতটাই অবসন্ন ছিল যে যক্ষ্মার মতো মহাব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর একবারেই ছিল না। মায়ের কফিন সামনে রেখে বাবাকে উদ্দেশ করে কঠিনভাবে বলতে দ্বিধা করেননি মার্গারেট, 'তুমিই এর জন্যে দায়ী, আমাদের মা এতগুলো সন্তান ধারণ করার জন্যেই এভাবে অসময়ে মরে গেল।'

মায়ের জীবনের পুনরাবৃত্তি নিজের জীবনে ঘটতে দেবেন না — এই ব্যাপারে মনস্থির করে মার্গারেট কর্নিং ছেড়ে নিউইয়র্ক শহরে চলে আসেন। সেখানে নার্সিংয়ে পড়াশুনা শেষ করে একটি ক্লিনিকে কাজ নেন। নিউইয়র্ক শহরের অনেক গরিব ও অভিবাসী মেয়ে আসত সেই ক্লিনিকে। অল্প বা বিনা পয়সায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গোপনে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় কেউ কেউ এসে উপস্থিত হতো এই ক্লিনিকে। অবাঞ্ছিত সন্তান ধারণ করতে-করতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত এইসব নারীর সেবা করতে গিয়ে মার্গারেট স্থির করেন তাঁর বাকি জীবন তিনি ব্যয় করবেন মেয়েদের এই চূড়ান্ত ভোগান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার কর্মকাণ্ডে। ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত ও তিন সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-সন্তান ঘর সংসারের চেয়ে তিনি প্রাধান্য দেন জন্মনিয়ন্ত্রণে মেয়েদের কর্তৃত্ব স্থাপনের বিভিন্ন প্রকল্পে। মার্গারেটই প্রথম 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' (birth control) শব্দটি চালু করেন। তিনি Women Rebel (প্রতিবাদী নারী) নামে মেয়েদের জন্যে একটি কাগজ বের করেন। সেখানে লিখতে শুরু করেন কোন কোন সময় মেয়েদের গর্ভবতী হতে নেই, যেমন — অসুস্থতায় অথবা অভাবের সময়। যদিও এইসব দুর্যোগকালে গর্ভরোধ করার জন্যে মেয়েরা কী করবে সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো পন্থার উল্লেখ করেননি মার্গারেট। তা সত্ত্বেও অশ্লীলতার অভিযোগে 'কমস্টক আইনে' তাঁর কাগজটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে কমস্টক আইন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। অ্যান্থনি কমস্টক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৮৪৪-১৯১৫) আমেরিকার গৃহযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী এক সৈনিক। ১৮৬০ দশকের দিকে নিউ ইয়র্ক শহরে এসে রীতিমতো চমকে যান কমস্টক। শহরের আনাচে-কানাচে যৌনকর্মীদের অবাধ আনাগোনা। রাস্তায়, দেয়ালে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির খোলামেলা বিজ্ঞাপন। এসব দেখেশুনে গোঁড়া খ্রিস্টান কমস্টকের চোখ ছানাবড়া। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, এইসব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও সামগ্রীর খোলামেলা বিজ্ঞাপনই সমাজের স্খলন, ব্যভিচার ও পতিতাবৃত্তির জন্যে দায়ী। তিনি কেবল স্থানীয় পুলিশদের যৌনকর্মী ও যৌন ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারে সহযোগিতা করেই ক্ষান্ত হন না, ১৮৭২ সালে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে রচনা করেন এক দলিল। একদিন সকালে সেই দলিলটি নিয়ে ওয়াশিংটন গিয়ে কংগ্রেসে সেটা পেশ করেন বিল হিসেবে। এই বিলের সারমর্ম হলো : জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ও পদ্ধতি অত্যন্ত অশ্লীল, অবক্ষয়ী ও ব্যভিচারের প্ররোচক। ফলে সমাজের ক্ষতিকর এইসব পদ্ধতি বা দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, বিতরণ বা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

১৮৭৩ সালে আমেরিকার কংগ্রেস কমস্টক বিলটি পাস করে আইনের মর্যাদা দেয়। শুধু তা-ই নয়, এই আইনটির আদলে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আরো কড়া আরো কঠিন সব আইন প্রণয়ন শুরু হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে কড়া আইন ছিল কানেক্টিকাট ও ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে। কানেক্টিকাটের আইন অনুযায়ী কোনো বিবাহিত দম্পতিও যদি তাদের শোয়ার ঘরের নিভৃতিতে কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তার জন্যেও তাদের অন্তত এক বছর কারাদণ্ডের শাস্তি হতে পারে।

AMARBOI.COM

কমস্টক-আইনের আওতায় ফেলে মার্গারেট সেঙ্গারের কাগজটিই শুধু বন্ধ করে দেওয়া হয় না, মার্গারেটের নামেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। জেলে বসে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয় বলে মার্গারেট দেশ ছেড়ে বিলাতে পালিয়ে এসে সেখানে বসে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কাজ শুরু করেন। ১৯১৫ সালে অ্যান্থনি কমস্টক মারা যান। কিন্তু তাঁর প্রণীত আইন বহাল তবিয়তে দাপটের সঙ্গে আমেরিকায় রাজত্ব করতে থাকে।

১৯১৬ সালে মার্গারেট নিউইয়র্কে ফিরে এসে তাঁর বিরুদ্ধে জারিকৃত মামলার মোকাবিলা করেন। শুনানির পর মার্গারেটের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে কমস্টক-আইনের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে নতুন এক কাগজ বের করেন তিনি, যার নাম Birth Control review। একই বছর তিনি তাঁর এক বোন ও মেয়েবন্ধুকে নিয়ে আমেরিকার প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক খোলেন নিউ ইয়র্ক শহরের ব্রুকলিনে। এই প্রথমবারের মতো আমেরিকার মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরাসরি জানার ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার সুযোগ পান।

কিন্তু ক্লিনিকটি খোলার মাত্র দশ দিনের মাথায় ওখানে হামলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিকটি জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া ক্লিনিকে মজুত যত কনডম ও ডায়েফ্রাম ছিল, সব বাজেয়াপ্ত করা হয়। মার্গারেট তখন উপায় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে স্থানীয় ক্লিনিক ও ডাক্তারখানাগুলোতে লুকিয়ে লুকিয়ে ইউরোপ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রী এনে সরবরাহ করা শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরেই গোপনে ইউরোপ থেকে ডায়েফ্রাম আমদানি করার অপরাধে মার্গারেটকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই মামলাতেও মার্গারেটের জয় হয়। শুধু তা-ই নয়, বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে চিকিৎসার খাতিরে পরিমিত পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রীর আমদানি বৈধ বলে রায় দেওয়া হলো। মার্গারেট আবার তাঁর জন্মনিয়ন্ত্রণ-ক্লিনিকের কাজ শুরু করেন।

১৯১৭ সালে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এই সময় বস্টনে মার্গারেটের বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে নিজে থেকে আলাপ করতে এগিয়ে আসেন আরেক অসাধারণ নারী ক্যাথরিন ম্যাককরমিক। তাঁদের এই বন্ধুত্ব ও যৌথ কর্মপ্রকল্প আজীবন স্থায়ী হয়েছিল। শিকাগোর এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ক্যাথরিন এমআইটি থেকে প্রাণবিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে বিয়ে করেছিলেন ধনকুবের স্ট্যানলি ম্যাককরমিককে। কিন্তু বিয়ের দু-বছর পরেই ক্যাথরিনের স্বামী মারাত্মক মানসিক রোগ স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বোধশক্তি অনেকটাই হারিয়ে ফেলেন। যেহেতু এই অসুখটি বংশানুক্রমিক, ক্যাথরিন আজীবন সন্তানহীন থাকার সংকল্প নেন। মার্গারেটের সঙ্গে আলাপের পর মার্গারেটের বহুদিনের লালিত সেই 'জাদুর বড়ি'-র স্বপ্নে ক্যাথরিনও বিমোহিত হন যে বড়ি খেয়ে মেয়েরা তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের জন্ম রোধ করতে পারবে। ক্যাথরিন যেহেতু প্রাণবিজ্ঞানে পড়াশুনা করেছেন, তিনি জানতেন পোলিওর টিকা ও জীবাণু-ধ্বংসকারী বিভিন্ন ফলপ্রসূ ওষুধের মতো মার্গারেটের স্বপ্নের আবিষ্কারও সম্ভব। এমন একটা সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ-পিলের স্বপ্ন দেখতেন মার্গারেট ও ক্যাথরিন, যখন আমেরিকায় কালো লোকেরা ভিন্ন বাথরুম, ভিন্ন স্কুল, বাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত ভিন্ন আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হতো, যখন আমেরিকায় মেয়েরা ভোট দেওয়ার অধিকার পর্যন্ত অর্জন করেনি। মার্গারেট ও ক্যাথরিন দুজনেই অবশ্য মেয়েদের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলনেও সোচ্চার ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯২০ সালে অবশেষে ভোট দেওয়ার অধিকার পেল আমেরিকান নারী, যেখানে অন্যান্য কয়েকটি দেশের মেয়েরা এ মৌলিক অধিকারটি আরো আগেই অর্জন করেছিল।

মার্গারেট ও ক্যাথরিন জন্মনিয়ন্ত্রণ-ক্লিনিকে কাজ করে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা দুজনেই খুব হতাশ। কেননা সেই প্রাচীন, অকার্যকর অথবা বিদঘুটে এবং অস্বস্তিকর সব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যেই মেয়েদের আজো সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। ডায়েফ্রাম যদিও খুবই কার্যকরী, কিন্তু যেহেতু মেয়েরা নিজেরা তা শরীরে স্থাপন করতে পারে না, ডাক্তারের সাহায্যে গোপনাঙ্গে তা সংস্থাপনের বিড়ম্বনা ও শরমে জর্জরিত নারীদের আর কোনো নতুন পন্থার সন্ধান দেওয়া যাচ্ছে না। মার্গারেটের 'স্বপ্নের বড়ি' বুঝি স্বপ্নেই থেকে যাবে।

অবশেষে ১৯১৫ সালে মার্গারেটের সঙ্গে দেখা হয় গ্রেগরি পিনকাসের। পিনকাস তখন খুবই নামকরা বিজ্ঞানী। কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে তাঁর অবস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা বেকায়দায়। ১৯৩৪ সালে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে প্রথম টেস্টটিউবে খরগোশের বাচ্চা তৈরি করে সমস্ত পৃথিবীতে হইচই বাধিয়ে দিয়েছিলেন রাশিয়া থেকে আগত ইহুদি ইমিগ্র্যান্ট পরিবারের সন্তান পিনকাস। ততদিনে অ্যালডাস হাক্সলির *ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড* বাজারে সাড়া ফেলে দিয়েছে। লোকেরা পিতৃপরিচয়হীন, মনুষ্যত্বহীন টেস্টটিউব শিশুর ভয়ংকর সামাজিক প্রভাবের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত। ফলে পিনকাসের এত বড় আবিষ্কার সুনামের চেয়ে বিতর্কেরই জন্ম দেয় বেশি। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি চলে যায় পিনকাসের। তখন তিরিশের দশকের ভয়ানক মন্দা চলছে পুরো আমেরিকায়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে একটা জীবিকার আশায় এখানে-সেখানে ধরনা দিতে শুরু করেন পিনকাস। এই সময় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে খণ্ডকালীন পড়াবার একটি চাকরি দেন বস্টনের অদূরবর্তী উরস্টার শহরের ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া দুই বন্ধু মিলে নিকটবর্তী উরস্টার শহরের সুজবেরিতে একটা গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থের অভাবে পিনকাস বিজ্ঞান-গবেষণা ছাড়াও নিজেদের গবেষণাগার ও বাথরুম পরিষ্কারের কাজটাও নিজের হাতেই করতে থাকেন। ঠিক তখুনি তাঁর পরিচয় হয় মার্গারেট সেঙ্গারের সঙ্গে। মার্গারেটের ধারণা হয় পিনকাসই পারবেন এ কাজটি করতে। এর আগে মার্গারেট ও ক্যাথরিন দুজনেই ঠিক করেছিলেন যথাযথ যোগ্য ব্যক্তির দেখা না মিললে শুধু গবেষণার জন্যে গবেষণা করার টাকা জোগাবেন না ক্যাথরিন। পিনকাসও খুবই আগ্রহের সঙ্গে প্রকল্পটি গ্রহণ করতে রাজি হন। মার্গারেট তখন ক্যাথরিনকে সঙ্গে করে এনে পিনকাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

এর চার বছর আগে ক্যাথরিনের স্বামী মারা গেছেন এবং ক্যাথরিন তার স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। পিনকাসের সঙ্গে কথা বলে ক্যাথরিনও মনে করলেন এ কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথরিন চল্লিশ হাজার ডলারের প্রাথমিক চেকটি লিখ দিলেন পিনকাসের গবেষণার জন্যে। যদিও এটি এই 'জাদুর বড়ি' প্রকল্পের জন্যে ক্যাথরিনের অনেক চেকের একটি চেক, তবু এটা সত্য যে তখনকার দিনে চল্লিশ হাজার ডলার অনেক টাকা। শুধু টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না ক্যাথরিন। পশ্চিম উপকূলের তাঁর বাসস্থানের পাট গুটিয়ে তিনি সোজা চলে এলেন পিনকাসের গবেষণাগারের কাছাকাছি, যাতে সার্বক্ষণিকভাবে এই গবেষণার কাজ তদারকি করতে পারেন। ততদিনে পিনকাস জানতেন প্রজেস্টেরন ইনজেকশন দিলে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুর নির্গমন (ওভুলেশন) রোধ করা যায়। তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই জীবজন্তুর ওপর গবেষণা করে প্রমাণ করলেন প্রজেস্টেরন ইনজেকশন দিয়ে ওভুলেশন বন্ধ করে গর্ভরোধ করা সম্ভব।

কিন্তু মার্গারেটের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এখনো দরকার আরো দুটি জিনিসের। এক, পিনকাসের এই গবেষণা যে মানবদেহে কার্যকর তার নিশ্চয়তা, দুই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে খাবার প্রজেস্টেরন আবিষ্কার। পিনকাস একজন মৌলিক গবেষক হলেও পেশাগতভাবে ডাক্তার নন। ফলে মানবদেহে গবেষণা চালাবার অনুমতি বা যোগ্যতা তাঁর নেই। তিনি তাই শরণাপন্ন হলেন ড. জন রকের। যদিও প্রগতিশীল মনোভাব ছিল রকের, তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে তিনি এতটাই রক্ষণশীল ছিলেন যে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ভর্তির বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। কিন্তু এই রক-ই ম্যাসাচুসেটসে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রীর বিক্রির অনুমতি চেয়ে মার্গারেটের উত্থাপিত পিটিশনে অন্য বিশিষ্ট পনেরোজন চিকিৎসকের সঙ্গে নিজেও সই করতে দ্বিধা করেননি। রক-ই ছিলেন এই দলের একমাত্র রোমান ক্যাথলিক। রক যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁর গির্জার পাদ্রি তাঁকে একটা কথা বলেছিলেন যা সারাজীবন ছায়ার মতো সঙ্গী হয়েছিল রকের। তিনি বলেছিলেন, 'জন, সব সময় বিবেকের কথা শুনো। নিজের বিবেককে কারো কাছে জিম্মা রেখো না।' বিবেকের কথা শুনেই পাঁচ সন্তানের জনক জন রক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। বিবেকের কথা শুনেই গ্রেগরি পিনকাসের প্রস্তাবে রাজি হন রক।

সেই সময় বস্টনে একটি মেয়েদের ক্লিনিক চালাতেন রক। বহু জায়গা থেকে মেয়েরা আসত সেখানে চিকিৎসার জন্যে। প্রধানত সন্তানধারণে অসমর্থ মেয়েরাই আসত গর্ভধারণে সক্ষমতা অর্জনের আশায়। পিনকাসের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পের কাজ অতি গোপনীয়তার সঙ্গে করে যেতে হয় রককে। ম্যাসাচুসেটসে তখনো জন্মনিয়ন্ত্রণ যেহেতু আইনত সিদ্ধ নয়, এই গবেষণাকালে রক ও পিনকাসকে এমন ভাব দেখাতে হয় যেন তারা বন্ধ্যত্ব ঘোচাবারই চেষ্টা করছেন, যদিও গবেষণায় ব্যবহৃত মহিলাদের বা তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে গবেষণায় অংশগ্রহণ করার সম্মতিপত্র গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঠিক যেভাবে সেই সম্মতিপত্রগুলো লেখা হয় তা আজকের বিচারে যথেষ্ট পরিষ্কার বা নৈতিক বলে দাবি করা যাবে না।

রক তাঁর সীমিতসংখ্যক নারীর ওপর গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, পিনকাসের আবিষ্কার মনুষ্যদেহেও সমান প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রজেস্টেরন ওভুলেশনকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে জন্মরোধ করতে সক্ষম। কিন্তু এফডিএ থেকে প্রজেস্টেরনকে জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি হিসেবে ব্যবহারের ছাড়পত্র পাওয়ার আগে আরো বড় আকারের গবেষণা দরকার, যা আমেরিকায় সম্ভব নয়। তা ছাড়া মনুষ্যদেহে এই বড় গবেষণাটি করার জন্যে রক ও পিনকাসকে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হলো এ জন্যে যে, তখন পর্যন্ত মুখে খাবার-উপযোগী সস্তা দামের কৃত্রিম প্রজেস্টেরনের উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলেন পেনস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী রাসেল মার্কার। মার্কার বিভিন্ন গাছপালা থেকে মালমসলা নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রজেস্টেরন বানাতে সক্ষম হন। যথেষ্ট পরিমাণে ও কম খরচে প্রজেস্টেরন তৈরি করার জন্য নানারকম উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করতে করতে মার্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেক্সিকোতে একরকম মিষ্টি আলুর খোঁজ পান যা তাঁর আশা পূরণ করে। কিন্তু এই প্রজেস্টেরন কেবলমাত্র ইনজেকশনে সক্রিয়। মুখে খেলে এর কার্যকারিতা থাকে না। মার্কারের কৃত্রিম উপায়ে প্রজেস্টেরন তৈরির কাজকে তখন আরো এগিয়ে নিয়ে যান দুটি ওষুধ কোম্পানির দুই বিজ্ঞানী, যাঁরা ভিন্ন ভিন্নভাবে কৃত্রিম উপায়ে মুখে খাবার-উপযোগী প্রজেস্টেরন তৈরি করেন। আমেরিকার ওষুধের কোম্পানি সার্লের ফ্র্যাঙ্ক কোল্টন ও মেক্সিকোর ওষুধ কোম্পানি সিন্টেরক্সে কার্ল বোরাসি কৃত্রিম যে প্রজেস্টেরন তৈরি করেন তা মুখে খাবার উপযোগীই শুধু নয়, প্রাকৃতিক প্রজেস্টেরন থেকে আটগুণ বেশি শক্তিশালী। তাঁদের তৈরি প্রজেস্টেরন দিয়েই এই দুই কোম্পানি পরীক্ষামূলকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি তৈরি করে, যা রক ও পিনকাস তাঁদের বড় গবেষণায় ব্যবহার করেন। যেহেতু আমেরিকায় এই গবেষণা সম্ভব নয়, তাই ১৯৫৬ সালে পোর্তোরিকোতে গিয়ে এটা করা হয়। ফলাফল শতকরা একশ ভাগ গর্ভরোধ। রাতারাতি পৃথিবীতে তোলপাড় পড়ে যায়। কিন্তু রক ও পিনকাস হঠাৎ আবিষ্কার করেন, সার্লের তৈরি প্রজেস্টেরন পিলে কেমন করে যেন অতি সামান্য পরিমাণ এস্ট্রোজেনের অস্তিত্ব রয়ে গেছে। সার্ল অতঃপর সম্পূর্ণ এস্ট্রোজেনমুক্ত খাঁটি প্রজেস্টেরন বড়ি বানিয়ে দিলে তা পুনরায় ব্যবহার করে রক ও পিনকাস নিশ্চিন্ত হন যে, যদিও দুটো বড়িই গর্ভরোধে সমান কার্যকর, সামান্য এস্ট্রোজেনের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে প্রজেস্টেরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমাবার সহায়ক। ফলে আজও অধিকাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িতে প্রজেস্টেরনের সঙ্গে থাকে সামান্য এস্ট্রোজেন।

১৯৫৭ সালে সার্ল ওষুধের কোম্পানি পিলকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি হিসেবে নয়, মেয়েদের মাসিক নিয়মিত করার চিকিৎসার জন্যে ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে। সরাসরি জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি বাজারজাত করা সমাজ কতখানি গ্রহণ করবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তখন। এফডিএ অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক নিয়মিতকরণে হরমোন পিলের ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়। সার্লের ধারণা হয়েছিল, গর্ভরোধের জন্যে প্রতিদিন ওষুধ খেতে মেয়েরা রাজি হবে না। কিন্তু সার্ল এবং পৃথিবীর অন্য সবাইকে স্তম্ভিত করে হঠাৎ আমেরিকাজুড়ে মহামারীর মতো দেখা দেয় মাসিকের গণ্ডগোল। হাজার হাজার মেয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে ধরনা দেয় পিলের প্রেসক্রিপশনের জন্যে। দেখা যায়, দু-বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পাঁচ লাখ মেয়ে পিল ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। কারো বুঝতে বাকি থাকে না, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যেই এই পিল ব্যবহৃত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ১৯৫৯ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট আইজেন-আওয়ার ঘোষণা দেন — জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সরকার বা রাজনীতির কোনো বিবেচ্য বা করণীয় বিষয় নয়। তিনি আরো বলেন, এ ব্যাপারে সরকারের কোনো দায়িত্ব বা মাথাব্যথাও নেই। ১৯৬০ সালে সার্লের অনুরোধে এফডিএ পিলকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি হিসেবে ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এটি প্রথম সুস্থ শরীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রেসক্রিপশন ওষুধ-ব্যবহারের অনুমতিপত্র। জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়িই একমাত্র ওষুধ যা চিকিৎসার জন্যে নয়, কেবল সামাজিক প্রয়োজনে বাজারজাত হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে অনুমতি পাওয়ার দুই বছরের মধ্যেই বারো লাখ মহিলা পিল ব্যবহার শুরু করেন। পাঁচ বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ লাখে। ততদিনে সার্ল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের পরিমাণ খানিকটা কমিয়ে আরো উন্নতমানের পিল তৈরি করতে শুরু করেছে যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম। ষাট দশকের শেষের দিকে সাতটি ওষুধের কোম্পানি পিল তৈরি শুরু করে এবং তাদের মোট বিক্রির পরিমাণ ১৫০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। ততদিনে আমেরিকায় এক কোটি বিশ লাখ মেয়ে পিল ব্যবহার শুরু করেছে এবং পিল ততদিনে সবচেয়ে জনপ্রিয় জন্মনিরোধক পদ্ধতি বলে পরিচিতি পেয়েছে। দেখতে দেখতে আমেরিকার এক-চতুর্থাংশ দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণে পিলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পিলের উদ্ভাবন ঘটে আমেরিকার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের সময়ে। বর্ণবাদ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিপক্ষে গণবিক্ষোভ ও নাগরিক অধিকার-আদায়ের আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ষাটের দশকের আগে পুরো এক যুগ ধরে আমেরিকার ঘরমুখী সন্তানমুখী হওয়ার যে অদম্য এক স্রোত প্রবাহিত ছিল, যা ঐতিহাসিকভাবে 'Baby Boom' বলে পরিচিত, তা কিছুটা থিতু হয়ে আসতে শুরু করেছে তখন। পঞ্চাশের দশকে সেখানে বিবাহের হার সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দেয়। যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় মেয়েদের মধ্যে খুব অল্প বয়সে বিয়ে করার হিড়িক পড়ে যায়। তখন সেখানকার জন্মের হার ভারতের জন্মের হারকে পিছনে ফেলে দিতে চায়। আমেরিকার মূলধারার সংস্কৃতিতে তখন প্রচণ্ডভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, গৃহ এবং স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করাই আমেরিকার মেয়েদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এবং একমাত্র গতি। গণমাধ্যমগুলো তখন ফলাও করে প্রচার করছে, আঁটোসাঁটো ফিটফাট নারীসুলভ পোশাক পরে সুন্দর পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে আমেরিকান গৃহবধূরা যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানদের যত্ন করছে, তখন কম্যুনিস্ট-সমাজে রাশিয়ায় মায়েরা তাদের সন্তানদের সরকার পরিচালিত অন্ধকার ও মলিন ডে-কেয়ার সেন্টারে ফেলে রেখে ঢিলেঢালা ধূসর পোশাক পরে অসুখী মুখে কলকারখানার কাজে যাচ্ছে। এ ধরনের অপপ্রচারে দেশ তখন একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-ফেরত স্বামীর সঙ্গে চুটিয়ে সংসার করে পরপর চার-পাঁচটি সন্তান জন্ম দিয়ে রান্নাবান্না ঘর-সংসার করতে করতে আমেরিকান গৃহবধূরা তখন ক্লান্ত-বিধ্বস্ত। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার, তারা জানত, তখনো তারা আরো বিশ-ত্রিশ বছর সন্তান-উৎপাদনে সক্ষম। নিজেদের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বস্তির কথা চিন্তা করে আমেরিকান মেয়েরা তখন খুবই বিব্রত, হতাশ ও চিন্তিত।

ততদিন বেটি ফ্রিডেনের 'ফেমিনিন মিস্টিক' বাজারে চলে এসেছে। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিল-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে একবারে লুফে নিল আমেরিকার নারীকুল। আস্তে আস্তে তা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। মেয়েরা হঠাৎ আবিষ্কার করল, ইচ্ছে করলেই তারা মানুষ বানাবার মেশিনের পরিচয় থেকে নিজেদের বের করে নিয়ে আসতে পারে। পুনঃপুন সন্তানধারণের কারণে এতদিন কর্মজীবী নারীরা যথেষ্ট দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না, ছোটখাটো কাজেই সীমাবদ্ধ থাকতে হতো তাঁদের। পিলের আবিষ্কার নারীমুক্তির দরজা খুলে দিল। যেহেতু সন্তান জন্মের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নারীর হাতে এখন, পুরুষের মতো নারীও তার কর্মজীবন নিয়ে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়িত করতে শিখল। লেখাপড়া, ডিগ্রি ও পেশার মাঝখানে অথবা পরে সে কখন ক'টা সন্তান ধারণ করবে অথবা আদৌ সে সন্তানবতী হবে কি না — এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ এসেছে তার। পিল আবিষ্কারের কুড়ি বছরের ভেতর ৬০% সন্তান-উৎপাদনে সক্ষম আমেরিকান নারীদের কর্মজীবী হতে দেখা যায়। এ ছাড়া ছোট পরিবার ও স্বামী-স্ত্রী দুজনের রোজগারের ফলে অনেক সংসারেই নেমে আসে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও স্বস্তি। আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের ফলে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণও বেড়ে যায়।

১৯৬৬-১৯৬৭ সালে পিলের সাফল্য যখন আকাশছোঁয়া, তখন একে একে পিলের যৌথ জননী মার্গারেট সেঙ্গার ও ক্যাথরিন ম্যাককরমিক এবং পিলের পিতা গ্রেগরি পিনকাস মৃত্যুবরণ করেন। প্রথম জীবনে ব্যক্তি নারীর দুর্দশায় পিলের স্বপ্ন দেখলেও শেষজীবনে এসে মার্গারেট ও ক্যাথরিন উভয়েই পৃথিবীর জনসংখ্যা স্ফীতির কারণেও পিলের উপযোগিতার কথা ভেবেছেন।

মার্গারেট, ক্যাথরিন ও পিনকাসের মৃত্যুর পর শুধু বেঁচে থাকেন জন রক, যিনি পিলকে রোমান ক্যাথলিকদের কাছে গ্রহণীয় করার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে শুরু করেন। ভ্যাটিকানের অনুমতি পাওয়ার আশায় জন রক পিলকে একটি প্রাকৃতিক পন্থা (যেহেতু মেয়েদের শরীরের স্বাভাবিক হরমোন দিয়ে পিল তৈরি) বলে অভিহিত করেন যা 'নিরাপদ সময়'-কে দীর্ঘায়িত করে কেবল। কিন্তু এত প্রচেষ্টার পরও ভ্যাটিকান জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িকে অনুমোদন করে না। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অননুমোদিত থাকলেও আশির দশকের মধ্যে আমেরিকার ৮০% ক্যাথলিক মহিলা পিল ব্যবহার শুরু করেন এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশেরও কম ক্যাথলিক পাদ্রি পিল গ্রহণ করাকে প্রকাশ্যে অনৈতিক কাজ বলে দাবি করেন।

পিলের ব্যবহার শুধু যে রোমান ক্যাথলিক সমাজেই বিতর্কের সৃষ্টি করে তা নয়, কিছু নারীবাদীও পিলের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান, জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন মেয়েদের একতরফা দায়িত্ব হবে? পুরুষ কেন তার ভার নেবে না? তাঁরা মেয়েদের স্বাস্থ্যের ওপর জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হন। বলতে থাকেন, কতগুলো পুরুষ বিজ্ঞানী ও আইনপ্রণেতা গুটিকয়েক লোভী ও অবিবেচক ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মেয়েদের জীবন ও স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তাঁদের আপত্তির প্রেক্ষাপটে পিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপত্তাজনিত কংগ্রেসনাল শুনানিতে নারীপক্ষের অভিযোগ ও পরামর্শগুলো গভীরভাবে বিবেচনা করা হয়। এর ফলে আরো অল্প পরিমাণ এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন সংবলিত পিল বাজারজাত হয়, যা অনেক বেশি নিরাপদ ও যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম। এ ছাড়া পিলের প্যাকেটে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি যোগ করা হয়।

নারীবাদীরা ছাড়াও পিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়। ততদিনে তারা তাদের নাগরিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার এবং বেশ খানিকটা সফলও। পিলকে তারা 'Black Genocide' বলে অভিহিত করেন। গরিব অঞ্চলের ক্লিনিকগুলোতে পিলের যথেচ্ছ ব্যবহারকে তারা সুচিন্তিতভাবে বর্ণবাদ ও কালো মানুষের সংখ্যা হ্রাসের অভিসন্ধিতে সুপরিকল্পিত গণহত্যা বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু অতি উৎসাহী নারীবাদী বা বর্ণবাদবিরোধীদের আপত্তি আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসে। উভয় দলই মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসেন নারীর বৃহত্তর কল্যাণে বর্ণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যরোধে পিল ক্ষতিকর নয়, বরং তা গঠনমূলক ভূমিকাই রাখতে পারে।

পিলকে নিয়ে অন্য যে বিতর্ক তা পিল ব্যবহারকারীর শারীরিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপার। প্রাথমিকভাবে আবিস্কৃত পিলের তুলনায় আজকের পিলে প্রজেস্টেরনের পরিমাণ মাত্র এক-দশমাংশ এবং এস্ট্রোজেনের পরিমাণ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। ফলে এ পিল গ্রহণকালে দৈনন্দিন অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রকোপ ও পরিমাণ খুবই অল্প। মেয়েদের স্বাস্থ্যে পিলের প্রভাব নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু বড় আকারের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা করা হয়েছে। চল্লিশ বছর ধরে এই সব গবেষণার ফলকে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, পিল সার্বিকভাবে বেশ নিরাপদ একটি ওষুধ। নব্বইয়ের দশকে এসে তাই এফডিএ জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলকে নিরাপদ বলে অ্যাখ্যায়িত করেছে। কোনো কোনো গবেষণায় অবশ্য দেখা গিয়েছে যে, পিল ব্যবহার করার সময়ে স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সারের হার এবং রক্ত জমাট বাঁধার ও স্ট্রোকের হার কিছুটা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এইসব পিল ব্যবহারকারীদের একই সময়ে ধূমপান করতেও দেখা গিয়েছে। আর ধূমপানের সঙ্গে ক্যান্সারের বা স্ট্রোকের সম্পর্ক আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ বছর আগে পিল ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন এমন বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের ওপর আরেকটি বিশাল গবেষণায় দেয়া যায়, পিল ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদি তেমন কোনো স্বাস্থ্যগত কুফল নেই। পিল মৃত্যুর হার বা আয়ুর ওপরও কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে ডিম্বাশয়ের ও জরায়ুর দেয়ালের ওপরের স্তরের (endomatrium) ক্যান্সাররোধে পিলের একটি উপকারী ভূমিকা রয়েছে।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ছাড়াও পিলের আরেকটি সুফল হলো মাতৃত্বজনিত জটিলতায় স্বাস্থ্যহানি, অপুষ্টি ও মৃত্যুর হার কমানো। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে মেয়েদের শতকরা কুড়ি ভাগের মৃত্যু ঘটে মাতৃত্বজনিত কারণে, সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ নারী-নিয়ন্ত্রিত জন্মনিরোধপন্থা পিলের গুরুত্ব অপরিসীম। পিলের কার্যকারিতার সঙ্গে তুলনীয় রয়েছে আর মাত্র দুটি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি : এক) যৌন সম্পর্ক পরিহার; দুই) অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বন্ধ্যাত্বকরণ। প্রথমটি অবাস্তব, দ্বিতীয়টি ঘটায় স্থায়ী জন্মরোধ, যা সবসময়ে গ্রহণীয় নয়। তাই পিল আজো অদ্বিতীয় ও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণে প্রায় একশ ভাগ কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও পিল যেহেতু যৌনসংক্রামক ব্যাধি রোধে পুরোপুরি অক্ষম, জগৎজুড়ে এইডসের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে আজ শুধু পিল-ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্কের জন্যে যথেষ্ট নয়। সঙ্গে কনডম ব্যবহার অপরিহার্য।

ষাটের দশকে আমেরিকায় বর্ণবিরোধী নাগরিক-স্বাধিকার-আন্দোলন ও ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুদ্ধবিরোধী যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, পিল-আবিষ্কারের পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে এসে যোগ হয়েছিল নারী-আন্দোলনের আরেকটি অধ্যায় যা যৌনবিপ্লব বলে পরিচিত। যৌনবিপ্লবের মূল কথা হলো, মেয়েরা পুরুষদের মতোই যৌন আনন্দ পেতে সক্ষম এবং পুরুষদের মতোই যৌন চাহিদা রয়েছে। তারা এটাও জানাতে সক্ষম হয়, অবিবাহিত মেয়েদেরও যৌনক্ষুধা রয়েছে এবং অবিবাহিত পুরুষদের মতোই তাদেরও তা মেটাবার অধিকার আছে। এ ধরনের কথা এর আগে জনসম্মুখে কেউ স্বীকার বা প্রকাশ করত না। নারীবাদীদের কাছে এই যৌনবিপ্লব নিজের শরীরকে জানা, বোঝা এবং তার নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। রক্ষণশীলদের কাছে এই যৌনবিপ্লব ব্যভিচার ও নৈতিক অধঃপতনের শামিল। প্রাচীনপন্থীরা মনে করতেন, পিল যেহেতু ১০০% জন্মরোধে সক্ষম, এই বস্তুটি অবিবাহিত মেয়েদের যৌন সচল রাখতে এবং বিবাহিত মহিলাদের বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করবে। তাঁরা ভয় করতেন, এই যৌন স্বাধীনতা সমাজ ও পরিবারের ভিত ভেঙে দেবে। অবক্ষয় নেমে আসবে চারদিকে। পিনকাস ও রক বহুভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রযুক্তি মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে না। সমাজে যে আচরণ বা প্রবৃত্তি আগেও প্রচলিত ছিল তা চোখের সামনে বের করে আনতে সাহায্য করেছে।

তবে এটাও সত্য বিয়ে এবং মাতৃত্বের জয়গানে মুখর পঞ্চাশের দশকের সমাজ ষাটের দশকে এসে অবিবাহিত জীবনযাপন ও যৌন অনুসন্ধান-আনন্দযজ্ঞে ভীষণভাবে মেতে উঠেছিল। অনেকের কাছেই তখন বিয়ে, সন্তান, ঘর-সংসারের চাইতে নিজেদের স্বাধীন যৌনজীবন, ডিগ্রি, পেশা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হিউ হাফনারের playbay পত্রিকা বের হয় তখন। হেলেন গার্লি ব্রাউনের Sex and Single Girl বইতে থাকে কর্মজীবী নারীদের যৌন-স্বাধীনতার গুণগান ও কলাকৌশলের বর্ণনা। ব্রাউন লিখেছেন, 'বিয়ে হলো একটা বীমার মতো যার প্রয়োজন কেবল জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়টাতে। জীবনের ভালো সময়গুলোতে স্বামীর দরকার নেই।' তাঁর মতে স্বামীর দরকার নেই, কিন্তু প্রেমিকের দরকার আছে এবং সেই প্রেমিক ধনী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাধিক হলে আরো ভালো হয়। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা অবশ্য আজো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি যে, ষাটের দশকের যৌনবিপ্লব কি পলের আবিষ্কারেরই উত্তরাধিকার, নাকি তা ঘটনাচক্রেই একসঙ্গে ঘটেছে। কেউ কেউ এ কথাও মনে করেন যে, শুধু পিল নয়, পঞ্চাশ দশকের Baby Boom এবং ষাটের দশকের বর্ণবাদ ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সম্মিলিত ফসল এই যৌনবিপ্লব।

পৃথিবীতে আজ ছয় থেকে নয় কোটি মেয়ে পিল ব্যবহার দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৪৫ সালের পরে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান মেয়েদের আশি শতাংশ জীবনের কোনো না-কোনো সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে পিল ব্যবহার করেছে। ষাটের দশকে এক জনপ্রিয় লেখক পিলের গুরুত্বকে সভ্যতার ইতিহাসে আগুন ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। নব্বইয়ের দশকে বিলাতের সাপ্তাহিক পত্রিকা The Economist পিলকে আধুনিক জগতের সপ্ত-আশ্চর্যের এক আশ্চর্য বলে অভিহিত করেছেন, 'ব্যক্তি মানুষের জন্য এটি একটি ছোট্ট পদক্ষেপ, কিন্তু মনুষ্যজাতির জন্যে এটি একটি বিরাট উলম্ফন।' সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি বা পিলের আবিষ্কার বাজারে শত শত কার্যকরী বড়ির সঙ্গে আরেকটি বড়ির সংযোজন মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করতে, তাদের চিন্তা ও চেতনাকে শাণিত করতে এই ছোট্ট পিলটির অবদান অপরিসীম। পিল আবিষ্কারের মাধ্যমে কি আশ্চর্যভাবে বদলে গিয়েছে মেয়েদের অবস্থা ও অবস্থান, নারীপুরুষ নির্বিশেষে মানুষের জীবনে ঘটেছে এক বিশাল গুণগত পরিবর্তন। সভ্যতা নিঃসন্দেহে এগিয়ে গিয়েছে অনেকখানি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো কয়েকটি 'পিল'

'কখন তোমাকে ঘেন্না করতে শিখলাম আমি? ঠিক কখন? যে তোমাকে আমি দিনে দিনে, প্রতি বসন্তে একবার করে সাজাতাম, সেই তোমাকে কখন ঘেন্না করতে শিখলাম? অথচ সেই লোকটা প্রতিবার তোমাকে নিয়ে নারকীয় তৃপ্তি পেতে তোমার প্রশংসা করত যখন, তখন তোমাকে আরো ভালোবাসতাম। আরো সাজাতাম। তা হলে তোমাকে ঘেন্না করতে শিখলাম কখন? অমূল্য যখন কোলে এলো, তখন? অতুল যখন কোলে এলো, তখন? অনিমা, অনিমা যখন কোলে এলো, তখন? সাত-দুগুণে চোদ্দো বছরে আরো কতগুলো কোলে এলো যখন, তখন? না, তা নয়। প্রতিবার তোমাকে বেশি করে ভালোবেসেছি আমি। নাকি অমূল্য স্কুল ছেড়ে দিল, গাঁজা খেতে শিখল, বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, চুরি করে হাজত খাটল, আর এখন চোখের ওপর ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেখতে পারবে না বলে দুদিন বাড়ি নেই যখন, তখন?...কখন তোমাকে ঘেন্না করতে শিখলাম তা হলে? ঠিক কখন? ঠিক কখন? ঠিক কখন?'

ওপরের কথাগুলো ষাটের দশকের এক প্রখ্যাত গল্পকারের একই দশকের শুরুতে লেখা 'আরো কয়েকটি পুতুল' গল্প থেকে উদ্ধৃত। বলা বাহুল্য, আমার এ লেখার শিরোনামটিও সেখান থেকেই ধার করা। বহু সন্তানের জননী যৌবনাতিক্রান্ত সরোজিনী, যাঁর স্বামী মনমোহন উপার্জনে যথেষ্ট সক্ষম নন এবং কর্তৃত্বে অপারগ, যাঁর সংসারে নিদারুণ দারিদ্র্য, যাঁর সন্তানেরা বাউণ্ডুলে হয়ে পড়েছে, যাঁর আইএ-ফেল ছোট ছেলে একশ টাকার চাকরি পেয়ে আহ্লাদে ফুর্তিতে বড় ভাইকে ফেলেই বিয়ে করতে যাচ্ছে, — আজ নিজের সঙ্গে, নিজের শরীরের সঙ্গে, নিজের জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে চাইছেন। ওদিকে বড় পুত্র অমূল্যকে ফেলে রেখে ছোট পুত্র অতুলের বিয়েতে যেতে কিছুতেই মন চাইছে না মনমোহনের। কিন্তু কোথায় অমূল্য? ক্ষোভে দুঃখে অপমানে আর অভিমানে অমূল্য পালিয়েছে বাড়ি ছেড়ে। এখন করেন কী মনমোহন? গল্পকারের ভাষায়, 'ওদিকের দরজার কাছে চৌকির ওপরে কী যেন একটা দেখলেন মনমোহন। ছায়া। ছায়া। নাকি অমূল্য? ও যাই হোক, ও অমূল্য। ছুটে ওর কাছে গেলেন মনমোহন। ওকে এমনি করে রেখে যাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। ওকে নিয়েই যাই। রুমাল পেতে অমূল্যকে তাতে বাঁধলেন মনমোহন। সবটা অমূল্য ঢুকল না। হাত দুটো বেরিয়ে রইল। তারই একটা হাত থেকে আরো দশটা অমূল্য বেরিয়ে এসে দুজনের গলা ধরা ঝুলতে লাগল। আর একটা হাতে একটা মুগুর খোঁজা, সেটা দুজনের বুকে পড়তে লাগল।'

এই প্রতীকী গল্পকে সাদামাটা দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গনে টেনে নামালে আমরা দেখব, মনমোহন-সরোজিনী দুজনেই নিশ্চিত তাঁদের সার্বিক দুরবস্থার জন্যে এতগুলো সন্তানের জন্মই দায়ী এবং তার জন্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়কে দোষারোপ করছেন মনে-মনে। ভাবটা এমন, যেন একে অন্যকে প্রলোভিত না করলে, 'লোভ দেখিয়ে আঁধারের পাঁকে টেনে নিয়ে না গেলে এমনটি হতো না।' যৌনমিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে সন্তানের জন্ম, এ-অনিবার্যতাকে মেনে নিয়েছেন তাঁরা দুজনেই। বস্তুত এ-গল্প সমাজবাস্তবতার চিহ্ন। গেল শতকে আমাদের সাহিত্যের প্রধান উপাদান ছিল দারিদ্র্য। শিল্প ও সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল অনটন ও বৃহৎ পরিবার। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা দেখি দারিদ্র্য এখনো যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান সমাজে। তবে দারিদ্র্যের পরিসর না কমলেও তার প্রকোপ নিশ্চয়ই কমেছে। অনাহারে মৃত্যু কিংবা ক্ষুধাজনিত ক্লিষ্ট কঙ্কালসার চেহারায় শিশু অথবা তাদের পিতামাতা যত্রযত্র তেমন চোখে পড়ে না আর। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গত অর্ধ শতাব্দীর পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যও এর জন্যে অবশ্যই দায়ী।

নারী-নিয়ন্ত্রিত জন্মনিরোধে তথা নারীর স্বাধিকার ও স্বাবলম্বিতা অর্জনে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি বা 'পিলের' ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি অব্যবহিত পূর্বের রচনাটিতে। সন্দেহ নেই, ষাটের দশকের পিলের আবিষ্কার নারী-আন্দোলনের সাফল্যের এক বিরাট জয়যাত্রা। যৌনতাকে প্রজনন থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ এনে দিয়েছে 'পিল', যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নারীর নিজের হাতে। পিল বাজারজাত হওয়া অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বা পুরুষ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির, যেমন কনডম ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহ প্রদানের সমার্থক নয়। বরং এটি নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী একটি অভিনব পন্থা, যা ভবিষ্যতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আরো অনেক রকমের হরমোনজাতীয় পছন্দসই জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি আবিষ্কারের পটভূমি।

মেয়েদের শরীরের দুই হরমোন, এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের সমন্বয়ে তৈরি গতানুগতিক পিলকে ভিত্তি করে আজ বাজারে বিভিন্নরকম জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে, যার সবগুলো আবার মুখে খাওয়ার বড়িও নয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মিনি পিল, একটানা পিল, পরদিন সকালের পিল, গর্ভপাতের পিল ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে হরমোনভিত্তিক চামড়ার ওপরে লাগাবার জন্যে প্যাচ, ডিপোপ্রভেরার মতো ইনজেকশন, যোনিতে প্রতিস্থাপনযোগ্য রিং। ছিল নরপ্ল্যান্ট নামক চামড়ার নিচে বসাবার ক্যাপসুল।

হরমোনজাতীয় সব জন্মনিরোধক সামগ্রী, সেটি পিলই হোক অথবা প্যাচ ইনজেকশন বা আইইউডি-ই (ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ডিভাইস অথবা জরায়ুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে প্রতিস্থাপিত যন্ত্র) হোক, গর্ভ নিরোধ করে কিন্তু অভিন্ন উপায়েই। সাধারণত চার রকমভাবে গর্ভ সঞ্চারে বাধা দেয় এই হরমোনসামগ্রী :

১. ওভুলেশন, যা ডিম্বাশয় থেকে প্রতি মাসে একটি করে পরিণত ডিম্বাণুর বেরিয়ে আসাকে বোঝায় — তা রোধ করে। মেয়েদের ডিম্বাণুর সঙ্গে পুরুষের শুক্রাণু মিললেই যেহেতু সন্তানের জন্ম হয়, ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বেরুতে না পারলে গর্ভধারণ সম্ভব নয়। তবে কখনো কখনো হরমোনজাতীয় গর্ভনিরোধক সামগ্রী ওভুলেশনকে পুরোপুরি বন্ধ করতে সমর্থ হয় না। সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অন্যান্য উপায়েও তারা গর্ভসঞ্চারে বাধা দেয়।

২. জরায়ুর ভেতরে যে তরল পদার্থ থাকে, তা এইসব গর্ভনিরোধে ব্যবহৃত হরমোনের প্রভাব খুব ঘন হয়ে পড়ে, যার ফলে শুক্রাণু সহজে সাঁতরে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছাতে পারে না।

৩. যদি অলৌকিকভাবে শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন ঘটেও যায় (সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ওভুলেশেন হয়েছে ধরেই নিতে হবে), তা হলেও হরমোন গর্ভনিরোধকের উপস্থিতিতে গর্ভসঞ্চার ঘটবে না এ জন্যে যে, জরায়ুর দেয়াল যেখানে সন্তান বেড়ে উঠবে, তা এই হরমোনের প্রভাবে যথেষ্ট মাংসল, ভারী ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না সন্তান ধারণের সামর্থ্য অর্জন করার জন্যে।

৪. পিল বা হরমোনজাতীয় গর্ভনিরোধক সামগ্রীর উপস্থিতিতে ফেলোপিয়ান টিউব ঠিকমতো কাজ করে না। ফেলোপিয়ান টিউব হলো সেই দুটি টিউব, যার মধ্য দিয়ে ডিম্বাণু এসে থাকে। গর্ভনিরোধক হরমোনের প্রভাবে এই টিউব স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করতে পারে না। ফলে ডিম্বাণু যদি নির্গত হয়ও ডিম্বাশয় থেকে, তা শুক্রাণুর সঙ্গে মেলার তেমন সুযোগ পায় না।

গতানুগতিক দৈনন্দিন জন্মনিয়ন্ত্রন বড়ি ছাড়াও আজকাল বাজারে হরমোনের তৈরি বিভিন্নরকম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো সবই মেয়েদের জন্যে তৈরি। কোনো কোনোটি মেয়েরা নিজেরাই নিতে পারে, কোনোটার জন্যে লাগে স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের সাহায্য। আবার সব পদ্ধতি সব দেশে পাওয়া না-ও যেতে পারে, অথবা অনুমোদিত না-ও হতে পারে। এসব পদ্ধতিই মেয়েদের শরীরের স্বাভাবিক হরমোনের ওঠানামা বিঘ্নিত করে। ফলে এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারের আগে ডাক্তারের পরামর্শমতো এর উপযোগিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন। নিচে এমনি কয়েকটি পিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

মিনি পিল : মিনি পিল বলতে সাধারণত প্রজেস্টেরন-সমেত জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির কথা বোঝায়। এ ধরনের বড়িতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এস্ট্রোজেন থাকে না এবং যে স্বল্পপরিমাণ প্রজেস্টেরন থাকে, তা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে কোনোমতে যথেষ্ট। এ বড়ি দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্যে বিশেষ উপযোগী। এস্ট্রোজেনের মতো প্রজেস্টেরন দুধ শুকিয়ে দেয় না, যার ফলে দুধের পরিমাণ এবং গুণগত মান প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। যেসব মহিলা এস্ট্রোজেনের প্রতি স্পর্শকাতর, অথবা যাদের কোনো কারণে এস্ট্রোজেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণ করা বারণ, তারা এই মিনি পিল বেছে নিতে পারেন। এর কার্যকারিতা গতানুগতিক জন্মনিরোধ বড়ির চেয়ে খানিকটা কম (৯৭%)। তবে যেহেতু সার্বিকভাবে 'মিনি পিলে'র কার্যকারিতা প্রসবোত্তীর্ণ সময়ে খুব কম নয়। এই পিলের প্রধান সমস্যা মাঝেমধ্যে অসময়ে মাসিকের মতো, কিন্তু পরিমাণে কম, রক্তক্ষরণ। শুধু প্রজেস্টেরন-সমেত 'মিনি পিল' ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে তৈরি (সিনথেটিক) অল্প পরিমাণের এস্ট্রোজেনসহ (৩০-৪০ মিলিগ্রাম) এক ধরনের প্রজেস্টেরনের 'মিনি পিল'ও পাওয়া যায় বাজারে। 'মিনি পিল' ব্যবহারকারীদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রকোপ অনেক কম গতানুগতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি ব্যবহারকারীদের তুলনায়। এর কারণ এস্ট্রোজেনের অনুপস্থিতি বা স্বল্পমাত্রার এস্ট্রোজেনের উপস্থিতি।

একটানা পিল : ইদানীং কোনো কোনো দেশে আরেকরকম জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি বেরিয়েছে, যা খেলে মেয়েদের বছরে মাত্র চারবার মাসিক হবে। এ বড়ির উপাদান গতানুগতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির মতোই। তবে প্রতি মাসের শেষদিকে হরমোনবিহীন চিনির বা ভিটামিনের যে-সাতটি পিল থাকে, তা এখানে অনুপস্থিত। তার বদলে এগারো সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন এস্ট্রোজেন-প্রজেস্টেরনসহ জন্মনিরোধ-বড়ি খেয়ে যেতে হবে। গতানুগতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির বেলায় মেয়েরা পরপর ২১ দিন হরমোন বড়ি খায়। তারপর সাতদিন খায় চিনি বা ভিটামিনের বড়ি, যার ভেতর কোনো হরমোন থাকে না। আর এই শেষোক্ত বড়ি খাওয়ার সময়েই হরমোনের অভাবে জরায়ুর গায়ে বেড়ে ওঠা মাংসল দেয়াল ভেঙে পড়ে এবং মাসিকের আবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘমেয়াদি জন্মনিরোধ বড়ির বেলায় যেহেতু এগারো সপ্তাহ ধরে হরমোনসহ জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি খেয়ে যেতে হবে, এই পুরো সময়টায় ব্যবহারকারীর কোনো মাসিক হবে না। এগারো সপ্তাহ পরে এক সপ্তাহ হরমোনবিহীন চিনির বড়ি বা ভিটামিন বড়ি খাবেন তাঁরা, যখন মাসিক হবে। এখন প্রশ্ন এবং দুশ্চিন্তা হলো, বারো মাসে তেরো বারের বদলে এই চারবার মাসিক কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর? আমেরিকার ইস্টার্ন ভার্জিনিয়া মেডিক্যাল স্কুলে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মহিলাদের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে, একটানা পিলের কার্যকারিতা যেমন গতানুগতিক পিলের মতোই প্রায় একশ ভাগ নির্ভরযোগ্য, তেমনি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও এই দুই পিলের ভেতর একটার চেয়ে আরেকটা বেশি নিরাপদ বা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ রক্ত জমাটবাঁধা বা স্ট্রোকের যে বাড়তি কিছুটা আশঙ্কা জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ির সঙ্গে সম্পৃক্ত, এই একটানা বড়িতেও একইরকম আশঙ্কা রয়েছে। তবে যেহেতু এই বড়ির প্রচলন বাজারে নেহাতই নতুন, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া এখনো জানার সুযোগ হয়নি। প্রতি মাসে মাসিকের উৎপাতে যাঁরা বড়ই বিব্রত, তেমন অনেক মহিলা এই ধরনের বড়িকে (আমেরিকার বাজারে 'সিজনাল' বলে খ্যাত) স্বাগত জানিয়েছে। যেসব নারী মাসিকের সময়ে বিশেষভাবে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও তীব্র ব্যথার শিকার হন, তাঁদের জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণে ডাক্তাররা নিজেরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইদানীং উৎসাহ দিচ্ছেন। তা ছাড়া বিজ্ঞানীরা এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, প্রাকৃতিক উপায়ে যে মাসিক হয় মেয়েদের, যা একটা ঋতুচক্রের পুনরাবৃত্তি এবং শরীরে কতগুলো হরমোনের বিশেষ নমুনায় ওঠানামার ফল, জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি ব্যবহারকারী মেয়েদের মাসিকের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। যেসব মেয়ে হরমোনজাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ খান, তাঁদের এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের ওঠানামা তেমন ঘটে না মাসের বিভিন্ন সময়ে। কৃত্রিম উপায়ে পুরো মাসেই প্রায় একইরকম মাত্রায় সেসব হরমোন থেকে যায় রক্তে (অবশ্য ইদানীং এমনও কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি আবিস্কৃত হয়েছে, যা মাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রার হরমোন সরবরাহ করে নারীদেহে)। ফলে স্বাভাবিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে যে ওভুলেশন (ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুর বেরিয়ে আসা) ঘটে মেয়েদের শরীরে, হরমোন জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি খেলে সেই ওভুলেশন ঘটে না। তাই মাস শেষে পিল ব্যবহারকারী মেয়েদের যে রক্তপাত ঘটে, তা ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলনের ব্যর্থতায় 'জরায়ুর কান্না' বা ভ্রূণের অনুপস্থিতিতে পুষ্ট জরায়ুর ঝরে পড়া নয়। কৃত্রিম উপায়ে হঠাৎ হরমোন বন্ধ করে দেওয়ায় প্রজেস্টেরনের অভাবে জরায়ুর দেয়াল ভেঙে পড়ে কেবল। তাই কোনো কোনো বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের মত—এই কৃত্রিম রক্তপাত বছরে তেরোবার না চারবার হলো, তাতে হয়তো তেমন কিছু আসে যায় না। কেবল মানসিক স্বস্তি তৈরি করা অথবা সবকিছু স্বাভাবিক আছে বলে এক ধরনের নিশ্চয়তা ও নিরাপদ বোধের জন্য দেওয়া ছাড়া, জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি ব্যবহারকারীদের মাস শেষের নির্ধারিত মাসিকের সঙ্গে প্রাকৃতিক মাসিকের খুব বেশি মিল নেই। এ ছাড়া যারা খেলোয়াড়, নৃত্যশিল্পী, পর্যটক, কিংবা যাদের ধর্মীয় বা পেশাগত কারণে যাত্রা অনিবার্য তাদের ক্ষেত্রে এই একটানা জন্মনিরোধ-বড়ি বেশ সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

এ ছাড়া কোনো কোনো গবেষক ইদানীং এমন প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন যে, মেয়েদের প্রতি মাসে মাসিক হওয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা রয়েছে কি না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এমনও দেখিয়েছেন যে, সারা জীবন ধরে ঘটে যাওয়া মোট মাসিকের সংখ্যার সঙ্গে কোনো কোনো ক্যান্সার, বিশেষ করে স্তনের ক্যান্সারের একটা যোগাযোগ রয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন উন্নত দেশের মেয়েদের, যাঁদের প্রথম মাসিক হয় কম বয়সে, কিন্তু রজঃনিবৃত্তি ঘটে বেশি বয়সে, যাঁরা নিঃসন্তান, এক বা দুই সন্তানের জননী, যাঁরা দীর্ঘদিন সন্তানকে স্তন্যদান করেন না, তাঁদের তুলনায় উপজাতীয় অথবা অনুন্নত দেশের নারীদের মোট মাসিকের সংখ্যা অনেক কম। শেষোক্ত নারীদের প্রথম মাসিক দেরিতে আসে এবং মাসিক বন্ধও হয় অপেক্ষাকৃত আগে (এর সঙ্গে তাদের পুষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক)। এ ছাড়া বহু সন্তানের জননী হওয়ায় এবং সন্তানদের দীর্ঘদিন স্তন্যদান করায় তাঁদের মাসিকের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম হয়। আর এইসব নারীর, যাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসিকের সংখ্যা কম, তাঁদের মধ্যে স্তনের ক্যান্সারের প্রকোপও কম দেখা যায়। এর আগেও অনুরূপ গবেষণায় দেখা গেছে যে, যৌনসচল ও জননীদের তুলনায়, চিরকুমারীদের (যেমন নান বা সন্ন্যাসিনী) মধ্যে স্তনের ক্যান্সারের আধিক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বহু অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা হলো, প্রতিটি ওভুলেশনের (যার পরিণতিতে মাসিক স্রাব হয়) সময়, প্রচুর এস্ট্রোজেন তৈরি হয় ডিম্বাশয়ে। আর রক্তে এই অতিমাত্রার এস্ট্রোজেনের উপস্থিতিই স্তন-ক্যান্সারের আধিক্যের কারণ।

মাসিকবিহীন পিল (লাইব্রেল) : অবশেষে ২০০৭ সালের মে মাসে এসেছে বাজারে সেই পিল, যা খেলে শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণই হবে না, মাসিকও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। ওয়াইয়েথ ফার্মাসিউটিক্যালস বাজারজাত করেছে এ অভিনব পিলটি। এই পিলে অতি অল্পমাত্রায় এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন থাকে এবং তা প্রতিদিন খেতে হয়। এফডিএ ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে এ পিলকে। যেসব মেয়েরা মাসিকজনিত যন্ত্রণা ও নানাবিধ অসুখে ভুগছে, তাদের জন্যে এ পিল বেশ উপকারী। এ ছাড়া এমন মহিলার সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা কর্মোপলক্ষে অথবা জীবনযাত্রার কারণে মাসিকের মোকাবিলা করতে চান না। অনেকে অবশ্য মাসিকহীনতাকে অস্বাভাবিক বা অপ্রাকৃতিক ভেবে এই পিলকে অগ্রাহ্য, নাকচ বা পরিত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, গতানুগতিক পিল খাবার পরে মাস শেষে যে মাসিকের মতো রক্তপাত হয়, সেটা প্রাকৃতিক মাসিকের সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। প্রাকৃতিক মাসিক হয়, ওভুলেশনের (ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুর নির্গমন) পর শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণু মিলে ভ্রূণের জন্ম দিতে না পারার কারণে জরায়ুর পর্দা ছিঁড়ে রক্তপাত। আর আটাশ দিন হরমোন পিল খাওয়ার পর কয়েকদিন হরমোন পিলের বিরতি দেওয়ায় break through রক্তপাত হয়। সেটা প্রাকৃতিক মাসিক নয়। ফলে শিক্ষিত নারীরা আজ অনেকেই ভাবে, এই অস্বাভাবিক নকল মাসিকের আসলে কোনো প্রয়োজন রয়েছে কি না নারী জীবনে। অযথা অসুবিধা, অস্বস্তি ও হয়রানি থেকে কেউ কেউ মুক্তি চায়, মাসিকজনিত যন্ত্রণা বা বিশেষ অসুবিধা না থাকলেও। প্রায় আড়াই হাজার নারীর ওপর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে কিছু বিচ্ছিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া গতানুগতিক পিলের সঙ্গে লাইব্রেল সব ব্যাপারেই তুলনীয়। তবে যেহেতু বাজারে সদ্য এসেছে, আরো অনেক বছর লাগবে জানতে ও বুঝতে যে দীর্ঘ ব্যবহারেও পিল পুরোপুরি নিরাপদ ও কার্যকরী কি না।

পরদিন সকালের পিল বা প্ল্যান-বি পিল : নামটা যদিও 'পরদিন সকালের পিল' অথবা 'মর্নিং আফটার পিল', এর মানে এই নয় যে যৌনমিলনের পরদিন সকালেই এটা খাওয়া জরুরি। এই পিলের আবিষ্কার হয়েছে এই কারণে যে, কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে অথবা আবেগের তাড়নায় কোনোরকম জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি ছাড়া যৌনমিলন ঘটে গেলেই যাতে অনিবার্যভাবে গর্ভধারণকে মেনে নিতে না হয়। যৌনমিলনের তিন দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই এই বড়ি খেতে হবে, যাতে গর্ভসঞ্চার না ঘটে। পরদিন সকালের পিলে খুব বেশিমাত্রার এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন থাকে, যা গর্ভধারণের উপযোগী নয়। যেহেতু এটি একটি জরুরি ব্যবস্থা মাত্র এবং মাত্রাতিরিক্ত হরমোন দিয়ে তৈরি, এ-বড়ি খেয়ে নিয়মিত গর্ভনিরোধ করার কথা ভাবা একান্তই অনুচিত। কোনো কোনো দেশে এ-বড়ি 'জরুরি জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি' বলেও পরিচিত।

নিউইয়র্কের পমোনা শহরের বার ল্যাবরেটরিতে তৈরি 'প্ল্যান-বি' বলে খ্যাত এই ওষুধ আমেরিকায় আজ যত বিতর্কের সূচনা করেছে, কম ওষুধই তা করেছে। এর প্রধান কারণ 'প্ল্যান-বি' বা 'পরদিন সকালের পিল'কে প্রেসক্রিপশনের আওতা থেকে বের করে নিয়ে খোলাবাজারে বিক্রি করার অনুমতি নিয়ে মতানৈক্য। আমেরিকার ওষুধ-নিয়ন্ত্রক এফডিএ-র কিছু বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা মত দিয়েছিলেন যে, এই ওষুধ যথেষ্ট নিরাপদ এবং যেহেতু এটি জরুরি অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রহণ করা আবশ্যক, একে সহজলভ্য করার জন্যে প্রেসক্রিপশনের বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা প্রয়োজন। তাঁরা মনে করেন, এই জরুরি পিল সহজলভ্য হলে গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা ও মোট সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাবে। অন্য উপদেষ্টাদের মতে, এই ওষুধের জন্যে প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন না হলে, এর যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে, বিশেষ করে কিশোরীদের মধ্যে, যারা অপরিকল্পিতভাবে অথবা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রায়শই তাৎক্ষণিকভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। এই বিতর্কের সূত্র ধরে সম্প্রতি এফডিএ-র এক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন, যিনি 'প্ল্যান-বি' প্রেসক্রিপশনের বাইরে রাখার কট্টর সমর্থক ছিলেন। 'প্ল্যান-বি' এই নামটাই প্রমাণ করে, এই পদ্ধতি সাধারণ এবং সব সময় ব্যবহারের উপযোগী কোনো পদ্ধতি নয়। 'প্ল্যান-এ' বা প্রাথমিক পদ্ধতি কোনো কারণে ব্যর্থ হলে, তা তাড়াহুড়ো বা যৌনতাড়নায় কাতর হয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্যেই হোক, অথবা কনডম ফেটে যাওয়ার জন্যেই হোক, কিংবা ধর্ষণ বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে অননুমোদিত যৌন সম্পর্কের (ইনসেস্ট) কারণেই হোক, 'প্ল্যান-বি' হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বা শেষ সম্বল জন্মনিয়ন্ত্রক, যা কেবল জরুরি অবস্থার জন্যে প্রযোজ্য।

আমেরিকার মতো দেশে যেখানে গতানুগতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি এখনো প্রেসক্রিপশনের আওতায়, সেখানে এত বেশিমাত্রার হরমোনসহ ওষুধ খোলা কাউন্টারে বিক্রির জন্যে অনুমতি দেওয়া কতটা যুক্তিপূর্ণ, তা ভাবার বিষয়। এ অনুমতি অল্পবয়সী মেয়েদের শরীর ও মনের ওপর একটা বাড়তি চাপ প্রয়োগ করবে বলে অনেকের ধারণা। এই বয়সে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে, নারীদের ওপর সব সময়ই একটা চাপ থাকে পুরুষের আগ্রহ-অনুসারে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যে। সম্ভাব্য গর্ভসঞ্চারের ভীতি এবং সময়মতো গর্ভনিরোধ সামগ্রীর অপ্রতুলতা এই দাবিকে সব সময় না মানার পক্ষে কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। তাছাড়া কনডম ব্যবহার অনিচ্ছুক, প্রচণ্ড হরমোন-তাড়িত যৌনসম্ভোগে আকুল কিশোররা 'প্ল্যান-বি'র প্রতুলতা টের পেলে মেয়েদের ওপর মানসিক বোঝা চাপিয়ে দেবে এই বলে যে, রক্ষাকবচ হিসেবে 'পরদিন সকালের পিল' তো রয়েই গিয়েছে। তা ছাড়া কনডম ব্যবহারে পুরুষকে বাধ্য করা, তার যৌনাচারের (একগামিতার) প্রতি অবিশ্বাস বা কটাক্ষ বলেও তারা খোঁটা দিতে শুরু করবে। এর ফলে এইচআইভি ও এইডসের যুগে যখন কনডম ব্যবহার একান্ত জরুরি, 'প্ল্যান-বি' হয়তো তার বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

কিশোরীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ও মাত্রাতিরিক্ত হরমোন থেকে তাদের রক্ষা করার উপায় হিসেবে ওষুধটির বিক্রির নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন কেউ কেউ। যেমন সতেরো বছরের নিচে ছেলে বা মেয়ের কাছে এ ওষুধ বিক্রি না করা। অথবা কাউন্টারের পেছনে ফার্মাসিস্টদের আওতায় ওষুধটি রাখা, যাতে গ্রাহককে এসে তা চাইতে হয়। যদিও পরদিন সকালের এই পিলকে যথেষ্ট নিরাপদ বলা হচ্ছে, এটা এখনো ভালোমতো জানা যায়নি — কোনো কারণে গর্ভরোধ করতে ব্যর্থ হলে, এই পিলের প্রভাবে গর্ভজাত সন্তানের কোনো ক্ষতি হবে কি না। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে আরেকরকম 'পরদিন সকালের পিল' খেয়ে যে মহিলারা গর্ভরোধে ব্যর্থ হয়ে সন্তান প্রসব করেছেন, তাদের সন্তানের কেউ কেউ বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছে, কারো বা পরবর্তীকালে ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিলতা দেখা দিয়েছে। 'প্ল্যান-বি'-তে সাধারণত দুটো বড়ি খেতে হয়। যৌনমিলনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তা খেতে হয়, তবে যত তাড়াতাড়ি তা খাওয়া সম্ভব, তত বেশি কার্যকর হয় তা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খেতে পারলে সবচেয়ে ভালো। 'প্ল্যান-বি' ছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরকম 'পরদিন সকালের পিল' পাওয়া যায়। আমেরিকার অঙ্গরাজ্যগুলোর নিয়ম-কানুন যেহেতু সব সময় কেন্দ্রীয় নিয়ম দিয়ে পরিচালিত হয় না, এফডিএ প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমতি না দিলেও সাতটি অঙ্গরাজ্যে অনেক আগেই এই ওষুধ প্রেসক্রিপশনবিহীন বিক্রির ছাড়পত্র পেয়েছে। এখন অবশ্য এফডিএও অনুমতি দিয়েছে। তবে তা সতেরো বছরের অনূর্ধ্বদের জন্যে নয়। গতানুগতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ি যেভাবে কাজ করে, 'পরদিন সকালের বড়ি'ও সেভাবেই কাজ করে। বিশেষ করে এই বড়ি শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণের বেড়ে ওঠার জন্যে আবশ্যক জরায়ুতে বিদ্ধ হওয়াতে বাধা দেয়। গর্ভধারণ হয়ে যাওয়ার পর এ-বড়ি ব্যবহার করলে তা আর কার্যকর হয় না।

গর্ভপাতের পিল (যেমন আরইউ ৪৮৬) : এ-ধরনের ওষুধে সাধারণত দুরকম বড়ি থাকে, যা গর্ভসঞ্চারের পর আট সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত করতে সক্ষম। প্রজেস্টেরন-বিরোধী প্রথম বড়িটি (মিনি প্রিস্টোন) খাওয়ার পর তা শরীরের প্রজেস্টেরন হরমোনের কার্যাবলি প্রতিরোধ করে। প্রজেস্টেরন হলো সেই হরমোন, যা গর্ভসঞ্চার হলে জরায়ুকে যথেষ্ট পরিমাণের মাংসল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিশালী করে তোলে, যাতে সেখানে শিশুটি সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে। প্রজেস্টেরনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণে প্রথম পিলটি খাওয়ার পর জরায়ুর দেয়াল ও বাঁধন ভেঙে পড়তে শুরু করে। এই বড়ি খাওয়ার দেড় থেকে দু-দিনের মধ্যে অন্য আরেকটি বড়িকে (মিসোপ্রোস্টল) যোনির ভেতর প্রবেশ করাতে হয়, যেটা প্রস্টাগ্লেন্ডিন জাতীয় হরমোন। এ-বড়ি জরায়ুর সংকোচন (কন্ট্রাকশন) বাড়িয়ে দেয় এবং ভ্রূণকে জরায়ু থেকে উৎখাত করে। গর্ভপাতের বড়ি সব সময় ডাক্তারের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করতে হয়। কেননা, কোনো কারণে (যার সম্ভাবনা খুবই কম) পুরো গর্ভপাত যদি না ঘটে, তাহলে এ-বড়ির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে যেতে পারে গর্ভজাত সন্তানের ওপর। সে ক্ষেত্রে এ ব্যর্থ রাসায়নিক গর্ভপাতকে অপারেশনের মাধ্যমে কার্যকরী করে তুলতে হবে। এ ছাড়া গর্ভপাতের বড়ি খেলে অনিয়ন্ত্রিত ও প্রবল রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে, যার ফলে মেয়েদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। ফলে কোনোভাবেই এ-ওষুধ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ব্যতীত গ্রহণ করা উচিত নয়।

সপ্তাহে এক দিন পিল (যেমন আর ২৩২৩) : সপ্তাহে এক দিন ৫ মিলিগ্রাম সিনথেটিক প্রজেস্টেরন হরমোন পিল খেয়ে গর্ভনিরোধ সম্ভব। জন্মনিরোধে এর উপযোগিতা যাচাই করা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, কিন্তু এই পিলের অন্যান্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যাচাই করা এখনো শেষ হয়নি। সুস্থ আটাশজন নারীর শরীরে মোট ১৩৮ ঋতুচক্রের জন্যে এই ওষুধ ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, এ সময় কোনো গর্ভসঞ্চার হয়নি। প্রধান উপসর্গ হলো অনিয়মিত রক্তস্রাব, মাথাধরা ও ওজন বৃদ্ধি। অন্য একটি গবেষণায় চুয়াল্লিশজন নারীর দেহে এটি প্রয়োগ করে দেখা গেছে, রক্তে সুগার, কোলেস্টেরল বা ট্রাই-গ্লিসারাইডের পরিমাণও বাড়ায় না এই ওষুধ। প্রতিদিনের বদলে সপ্তাহে এক দিন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে অনেক নারীই স্বাগত জানিয়েছেন।

সেন্টক্রোমেন : সপ্তাহে এক দিন হরমোনবিহীন পিল : ভারতের সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (লক্ষ্ণৌ) আবিষ্কৃত সেন্টক্রোমেন 'সহেলী' ও 'সেন্ট্রন' ট্রেড নামে ভারতে বাজারজাত। সেন্টক্রোমেন এস্ট্রোজেন বা প্রজেস্টেরনের মতো কোনো স্টেরয়েড হরমোন দিয়ে তৈরি নয়। এটি একটি সিনথেটিক রাসায়নিক পদার্থ, যেটির রাসায়নিক আকৃতি কিছুটা স্টেরয়েড হরমোনের মতো। সেন্টক্রোমেন ওভুলেশন বন্ধ করে না। কিন্তু ভ্রূণের জরায়ুতে বিদ্ধ হওয়া এবং তার বেড়ে ওঠা রোধ করে। তিরিশ মিলিগ্রাম সেন্টক্রোমেন প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে দুদিন এবং পরের সপ্তাহে কেবল একবার গর্ভনিরোধের জন্যে যথেষ্ট। অসময়োচিত মাসিক বা কখনো-কখনো ফোঁটা-ফোঁটা রক্তপাত ছাড়া অন্য কোনো জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণত হয় না সেন্টক্রোমেন ব্যবহারের ফলে।

হরমোনজাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ মুখে খাবার বড়ি দিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতিদিন মনে করে পিল খাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড়ম্বনা এড়াতে, মুখে ওষুধ গ্রহণ করার আপত্তিতে, খরচ কমাতে অথবা জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে, আজ বাজারে 'পিল' ছাড়াও বিভিন্নরকম হরমোনের তৈরি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পাওয়া যায়। নিচে সংক্ষেপে সেসব কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হলো—

এক. *প্রজেস্টেরন ইনজেশকন (ডেপোপ্রভেরা) :* ডেপোপ্রভেরা বলে খ্যাত সিনথেটিক প্রজেস্টেরন দিয়ে তৈরি জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন দীর্ঘমেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অনিয়মিতভাবে অল্প অল্প রক্তপাত এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এ ছাড়া বেশকিছু অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন কোনো কোনো ডেপোপ্রভেরার গ্রহীতারা। তিন মাসে একটি করে ইনজেকশন জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে যথেষ্ট এ পদ্ধতিতে।

দুই. *চামড়ার নিচে দীর্ঘমেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্যাপসুল (নরপ্ল্যান্ট) :* এ পদ্ধতিতে হরমোনের জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ চামড়ার নিচে ছয়টি ছোট ছোট ম্যাচের কাঠির মতো ক্যাপসুলের মাধ্যমে শরীরে সরবরাহ করা হতো। স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কোনো ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞরা অপারেশনের মাধ্যমে এটিকে চামড়ার নিচে বসিয়ে দিতেন। এই ক্যাপসুল বা পাম্প থেকে অল্পমাত্রায় হরমোন অবিরত বেরিয়ে আসত আপনাআপনি। ফলে গ্রহীতার নিজের থেকে কিছু করতে হয়নি। তবে নরপ্ল্যান্ট ব্যবহারের সঙ্গে অনিয়মিত মাসিকসহ বেশকিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সংশ্লিষ্টতা আবিষ্কৃত হয়েছে। নরপ্ল্যান্ট ক্রমাগত পাঁচ বছর ধরে কাজ করে যেতে সক্ষম। তবে এই পদ্ধতি বর্তমানে আর বাজারজাত করা হয় না। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্য পদ্ধতি বেছে নিতে হচ্ছে। তবে নরপ্ল্যান্টের পরিবর্তে বাজারে এসেছে এখন ছয়টির বদলে একটি ম্যাচের কাঠির মতো চামড়ার নিচের ক্যাপসুল, যা তিন বছর পর্যন্ত কার্যকরী।

তিন. *হরমোন-সমেত আইইউডি অথবা যোনি-রিং :* হরমোন-সমেত আইইউডি ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে জরায়ুতে স্থাপন করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অন্যদিকে হরমোনসহ যোনির রিং নিজে নিজেই ব্যবহার করা চলে। শরীরের ভেতরে ব্যবহারযোগ্য এই দুইরকম জিনিসই বাজারে পাওয়া যায়। যোনির রিং তিন সপ্তাহ পর বের করে নিতে হয়, আবার মাসিকের পর নতুন একটি ঢোকাতে হয়। হরমোন-সমেত আইইউডি কয়েক বছর ধরে কাজ করতে পারে।

চার. *হরমোনের প্যাচ :* (অর্থোএভরা) এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের তৈরি চামড়ার ওপরে ব্যবহারযোগ্য একরকম প্যাচ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মেয়েরা শরীরের যে-কোনো জায়গায় চামড়ার ওপর বসিয়ে গর্ভনিরোধ করতে পারেন। সপ্তাহে মাত্র একবার প্রায় দুই ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ছোট্ট কাপড়ের টুকরোর মতো প্যাচটি চামড়ার ওপর বসিয়ে রাখতে হবে। প্যাচের পেছনে আঠার মতো পদার্থ থাকে, যা প্যাচটিকে শরীরের সঙ্গে আটকে রাখে। স্নান করা, সাঁতার কাটা, খেলাধুলাসহ প্রাত্যহিক স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুতেই বাধা নেই। প্যাচ থেকে হরমোন আস্তে আস্তে বেরিয়ে চামড়ার ভেতর দিয়ে শরীর প্রবেশ করে। এক সপ্তাহ পরে পুরনো প্যাচটি ফেলে দিয়ে একটি নতুন প্যাচ বসাতে হয়। পরপর দিন সপ্তাহ প্যাচ ব্যবহার করার পর এক সপ্তাহ প্যাচ ব্যবহার করা হয় না, যার ফলে তখন মাসিক হয়। খাবার বড়ি যোনি-রিং ছাড়া এটাই একমাত্র বাজারজাতকৃত হরমোন তৈরির জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যেটা মেয়েরা নিজেরা ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চামড়া থেকে তোলার সময় সামান্য ব্যথা পাওয়া ও জন্মনিয়ন্ত্রণ-বড়ির অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া প্যাচের বিশেষ কোনো অসুবিধার কথা জানা যায় না।

পাঁচ. *হরমোনের স্প্রে ও জেল* : এখনো বাজারে আসেনি, কিন্তু গবেষণা করে সফল হওয়া গেছে এমন হরমোনের তৈরি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে স্প্রে ও জেল। ইনহেলার পাম্পের মতো হরমোন স্প্রে করে, অথবা হরমোনের তৈরি ক্রিম বা জেলি ত্বকের ওপর প্রয়োগ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এই পদ্ধতি খুব শিগগিরই বাজারজাত করবে অস্ট্রেলিয়ান একটি কোম্পানি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যবহৃত গতানুগতিক হরমোন 'পিল' ছাড়াও হরমোনভিত্তিক যেসব বড়ি ও অন্যান্য উপকরণ বাজারে চালু রয়েছে বা শিগগির চালু হতে যাচ্ছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো ওপরে। এগুলোর প্রধান সমস্যা ও সুবিধাগুলো সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ-রচনায় কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রতি সমর্থন যেমন দেখানো হয়নি, মানগত দিক দিয়ে কোনো বিশেষ পদ্ধতি যে অন্য পদ্ধতির চাইতে উন্নততর, এমন কথাও বলা হয়নি। প্রচলিত ও আশু সম্ভাবনাময় সব হরমোনভিত্তিক জন্মনিরোধকেরই উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে কেউ যদি ইচ্ছা করে, তাহলে পছন্দমতো ও ব্যক্তি-স্বাস্থ্যের সঙ্গে উপযোগী সম্ভাব্য একটিকে বেছে নিতে পারে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, যখনই কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কোনো তৃতীয় পক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবহৃত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই অনেক অপব্যবহার ঘটে এবং অনেক সময় জোরজবরদস্তিও চলে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলার অভিপ্রায়ে অথবা পরিবার পরিকল্পনার টার্গেট রক্ষা করতে ব্যক্তি-নারীর সুবিধা বা স্বাস্থ্যকে অনেক সময় অস্বীকার করা হয়। অন্যদিকে যে পদ্ধতিগুলো নারীরা নিজে নিজে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে, যেমন — পিল, প্যাচ বা যোনির রিং, সেখানে অপব্যবহার ও জোরাজুরির আশঙ্কা কম থাকে। জন্মনিরোধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও বলা যায়, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় নারীকে তার যোগ্য অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা ও ঝুঁকিগুলো খোলাখুলি আলোচনা করে গ্রহীতা ও চিকিৎসকের যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, কোনটি ব্যক্তি-নারীর জন্যে সবচেয়ে উপযোগী অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদৌ উপযোগী কি না।

নারী-নিয়ন্ত্রিত জন্মনিবারণের পিল আবিষ্কার নিঃসন্দেহে নারী-মুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করেছে। নিজের ইচ্ছায়, নিজ গৃহের নিভৃতিতে, কোনো ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর সরাসরি হস্তক্ষেপ ব্যতীত খাবার বড়ির মাধ্যমে গর্ভরোধ করার সামর্থ্য অর্জন করে নারীসমাজ নির্ধারিত বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পেরেছে। নারীর অধিকার আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথযাত্রায় 'পিলে'র আবিষ্কার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিরাট মাইলফলক, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কথার মানে এই নয় যে, নারীর স্বাধীনতা অর্জনে 'পিল' ছাড়া অন্য সব আন্দোলন বা অবদানকে কোনোভাবে খাটো করে দেখা যায়। আসলে নারীর স্বাধিকার আন্দোলন বিবিধ পথ ধরেই তার মন্থর অথচ নিরন্তর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এদের কোনোটির ভূমিকাই আরেকটির বিকল্প নয়। আসলে বিভিন্ন সূত্র থেকে উৎসারিত এবং বিভিন্ন দিকে ধাবিত এই সব আন্দোলনের স্রোত শেষ পর্যন্ত এক জায়গাতেই এসে মিশেছে, একটি মূলধারাকেই প্লাবিত করেছে, যা নারীকে একজন মানুষের সার্বিক অধিকার ও সম্মান অর্জনে সাহায্য করেছে এবং অবিরাম করে যাচ্ছে। নারী-নিয়ন্ত্রিত জন্মনিরোধ-প্রক্রিয়ার আবিষ্কার, পুরুষকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অঙ্গীকার নয়। বরং তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি নতুন সংযোজন মাত্র। এইচআইভি ও এইডসের যুগে এই সত্যি অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে, পিলের মাধ্যমে নারী নিজের হাতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করতে সমর্থ হলেও এইচআইভি বা এইডস থেকে নিরাপদ থাকতে কনডমের বিকল্প নেই। এইচআইভি-র সংক্রমণ থেকে হরমোন-নিয়ন্ত্রিত কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণই কাউকে নিরাপত্তা দেয় না। এ ছাড়া বাইরে থেকে সরবরাহকৃত এসব হরমোন (যা দিয়ে পিল তৈরি হয়) কোনো কোনো নারীর শরীরে দীর্ঘমেয়াদি বা স্বল্পমেয়াদি কোনো ক্ষতিকর প্রভাব যে ফেলবে না, এ কথাও হলফ করে বলা যাবে না। দীর্ঘকালীন পিল ব্যবহারের সঙ্গে রক্তের জমাটবাঁধা ও স্ট্রোকের প্রকোপ বৃদ্ধির আভাস পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে এখনো অনবরত গবেষণা করে যাচ্ছেন। এসব গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী চিকিৎসক ও গ্রহীতা উভয়ে মিলে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন, হরমোনজাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা তার পক্ষে উচিত অথবা উচিত নয় এবং তা গ্রহণীয় হলে কোন বিশেষ ধরনের উপকরণ তার জন্যে বেশি উপযুক্ত। যেহেতু একই ওষুধের প্রতি একইরকমভাবে সকলে প্রতিক্রিয়া করে না, প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিন্নভাবে যাচাই ও বাছাই করে দেখতে হবে, কোন্ বিশেষ পদ্ধতি তার জন্যে সবচেয়ে উপযোগী, আর এ ব্যাপারে তাকে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারেন তার চিকিৎসক অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণ-বিশেষজ্ঞ।

একটি গল্প দিয়ে আমার এই লেখা শুরু করেছিলাম। একটি চলচ্চিত্রের খণ্ডাংশ দিয়ে শেষ করছি। বহু বছর আগে তপন সিংহের এক অনবদ্য ছবি দেখেছিলাম। নাম 'আপনজন'। সবটা ছবি মনে নেই, কিন্তু এটুকু মনে আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগতিক বিচারে সম্পৃক্ত নয় তেমন কিছু অসম চরিত্র, যারা সমাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে এসেছে, যাদের কেউ গৃহজীবী ও বৃদ্ধ, কেউবা জীবনযুদ্ধে বিপন্ন রাস্তায় পোড় খাওয়া যুবক, শেষ পর্যন্ত এক গভীর ও অভিনব মানববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বোঝা যায়, আসলে 'আপনজন' কারা — যারা আত্মার আত্মীয়, তারাই। জগৎ জীবনের বিচারে অর্থাৎ কেবল জন্ম কিংবা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ সম্পর্কের মানুষজনই নয়। সেই আপনজন ছবিতে এক বৃদ্ধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ছায়া দেবী। যতদূর মনে পড়ে, এক অপেক্ষাকৃত তরুণ দম্পতির ঘরে একটি সন্তানের পর বহু বছর আর কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় ছায়া দেবীর প্রশান্ত মন্তব্য ছিল, রামপ্রসাদ বা বিবেকানন্দের নির্দেশানুযায়ী বিবাহের বেশকিছু বছর পর তারা অর্থাৎ এই দম্পতিটি নিশ্চয়ই তাহলে ভাইবোনের মতো জীবনযাপন শুরু করেছেন এখন। সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, সুস্থ-সবল তরুণ দম্পতির আরো সন্তান জন্ম না হওয়ার মানে যে কেবল যৌনসম্পর্ক স্থগিত করাই নয়, সেটা সেই সহজ-সরল সেকেলে বৃদ্ধার পক্ষে জানার কথা ছিল না। কেননা, তখন বিবাহিত জীবন ও যৌনসম্ভোগের অনিবার্য পরিণতি যে ক্রমাগত সন্তানলাভ, এ-সত্য প্রায় সব নারীই মেনে নিত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে নানা অসামর্থ্য দেখা দেয় শরীরে। হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ায় তখন যৌন তাড়নাও প্রশমিত হয়ে আসে। যৌন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। তখন হয়তো বা দীর্ঘদিনের বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী আর তেমন যৌন সচল থাকেন না। আরো বয়স বাড়লে হয়তো বা একসঙ্গে বেড়ে ওঠা সহোদর-সহোদরার মতোই বিস্তীর্ণ জীবনের বহু যৌথ অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিতে আঁকড়ে ধরে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে অযৌন-জীবনই কাটান অনেকে, যেমনটি আশা করেছিলেন ছায়া দেবী। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, যতদিন তারা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, আবার শারীরিক ভালোবাসা উপভোগেও আগ্রহী ততদিন পিলের মতো জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীই নারীকে সুযোগ করে দেয় তার যৌন-জীবনকে প্রজননের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করতে। তবে এই সুযোগ ও সুবিধাগুলো যাতে স্বাধীনভাবে এবং নিজের পছন্দ ও কল্যাণ-অনুযায়ী তাঁরা বেছে নিতে পারেন, তার নিশ্চয়তা দরকার।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, গত দশকে আমাদের সাহিত্য ও শিল্পের প্রধান উপাদান যেখানে ছিল দারিদ্র্য ও বহু-সন্তানময় যৌথ পরিবার, এ-শতকে সেখানে হয়তো কেন্দ্রীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হয়েছে, নারীর অবস্থানগত সচেতনতা এবং অর্থনীতিতে ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ — এক কথায় সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন। ষাটের দশকের আবিষ্কৃত 'পিলে'র হাত ধরে সারা বিশ্বে যে বৈচিত্র্যময় জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী আজ সহজলভ্য হয়েছে, তার সঙ্গে এই নারী-প্রগতির সম্পর্ক কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গর্ভপাত : নারীর ব্যক্তিগত ও একক সিদ্ধান্ত

সাম্প্রতিক একটি জরিপে জানা গেছে, প্রতি বছর সারা দেশে গড়ে ৮ লাখ মহিলা গর্ভপাত-উত্তর নানা জটিলতায় মারা যায়। অর্থাৎ এরকম প্রতি একশজন মহিলার মধ্যে একজন মহিলা মারা যাচ্ছে। শোকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে জানা গেল, তেরোশো গর্ভপাতকারী মহিলার মধ্যে ৯০ শতাংশ মহিলারই প্রবল রক্তপাতসহ অসম্পূর্ণ গর্ভপাত ঘটে। পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায়, মোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশি মহিলার গর্ভপাত অদক্ষ হাতুড়ে ডাক্তারদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেসব মহিলা গর্ভপাত ঘটায় তাদের অধিকাংশের বয়স ত্রিশের নিচে, তারা স্বল্পশিক্ষিত ও স্বল্প আয়ের। কিছুদিন আগে ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত এক অবিবাহিত ছাত্রী গোপনে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ অপারেশন ও প্রবল রক্তক্ষরণের ফলে মারা যায়। অনুসন্ধান করে জানা যায়, রাজধানীর অভিজাত অঞ্চলের একটি ক্লিনিকে যে মহিলা নিজেকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে গর্ভপাত অপারেশন করেছিল, সে আসলে ক্লিনিক মালিকের নিকটাত্মীয়, ডাক্তার নয়।

গর্ভপাতের জন্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বদলে হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার প্রধান কারণ তিনটি : (১) গর্ভপাত সর্বকালে সর্বত্র প্রচলিত থাকলেও এখন পর্যন্ত আমাদের মতো দেশে সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিতে ব্যাপারটি স্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ফলে সব সময়েই একটি গোপনীয়তা, একটা আড়ালের প্রয়োজন হয়। বিবাহিত মহিলার চেয়ে অবিবাহিত মেয়েদের জন্যে এই রাখঢাকের দরকার আরো বেশি। তাদের অপরাধবোধ পর্বতসমান। (২) আর্থিক অসংগতির জন্যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ক্লিনিকে গিয়ে গর্ভপাত করানো অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। (৩) অবিভক্ত ভারতের মান্ধাতা আমলের একটি আইনের ধারা এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রচলিত, যার ফলে ক্লিনিক বা হাসপাতালে গর্ভপাত করাবার জন্যে স্বামীর নাম ও তার সম্মতির প্রয়োজন হয়। এই বাধ্যবাধকতা থাকার দরুন স্বামীবিহীন মেয়েদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়। স্বামী হিসেবে একটি নাম খাতায় রেজিস্ট্রি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই স্বামীটি হয় কাল্পনিক অথবা তার প্রদত্ত নামটি সঠিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম নয়। ফলে মেয়েটির স্বাস্থ্যগত বা আইনগত কোনো সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে স্বামীটির টিকিটিও দেখা যায় না।

গর্ভপাতের বিপক্ষে দেশে ও বিদেশে যারা সোচ্চার তারা সাধারণত দুই ধরনের লোক — (১) প্রধানত ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে একে মেনে নিতে পারেন না অনেকে; (২) ভ্রূণের যেহেতু আত্মসমর্থনের ক্ষমতা নেই, অথচ সে জীবন্ত এবং তার বেশ কিছু বোধের ক্ষমতা রয়েছে, অতএব একদল অতিমানব তাদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়ে মায়ের জীবন, তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করেন। গর্ভপাত কখনো পরিবার পরিকল্পনার রুটিন পদ্ধতি বলে বিবেচিত হতে পারে না — গর্ভরোধের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলোর বিকল্প এটা নয়। এটি একটি অবাঞ্ছনীয় ঘটনা, এটি একটি জরুরি ব্যবস্থা এবং কেবলমাত্র জরুরি ভিত্তিতেই একে প্রয়োগ করা হবে। গর্ভধারণের মতো প্রাকৃতিক একটি ঘটনা ঘটে গেছে একমাত্র এই কারণে সামর্থ্য, আগ্রহ বা প্রয়োজন ছাড়াও একটি নতুন প্রাণ সংযোজন করতেই হবে জীবনে — এ বাধ্যবাধকতা সমাজের জন্যে যেমন কল্যাণকর নয়, ব্যক্তি হিসেবে একটি নারীর জন্যেও তা অবমাননাকর এবং সমাজে তার গভীর অবমূল্যায়ন ও অসহায়ত্বেরই স্বাক্ষর বয়ে আনে তা। অনিচ্ছা, দুর্ঘটনা, অপরাধ অথবা অসতর্কতায় যে প্রাণের সূচনা, যা পরিবারে বা সমাজে কাম্য নয়, যার আগমন সুখকর নয় মাতা-পিতা উভয়ের জন্যেই, যা মায়ের জীবনে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করে, সে-প্রাণ চিকিৎসাবিদ্যায় উল্লিখিত নিরাপদ সময়সীমার মধ্যে বিনষ্ট করার অধিকার প্রতিটি নারীর থাকা উচিত। এ সিদ্ধান্ত নারীর এবং শুধুমাত্র নারীরই হতে হবে। স্বামী, প্রেমিক, বন্ধু অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের তাতে সহযোগিতা থাকলে ভালো, কিন্তু তাদের অবগতি বা সম্মতির বাধ্যবাধকতা থাকা চলবে না। গর্ভধারণ যেহেতু যুগ্ম-কর্মের ফসল, পুরুষসঙ্গী তার নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক দায়িত্ব বহন করবে — এটাই স্বাভাবিক ও কাম্য। গর্ভপাতের মতো একটি জটিল ও হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত নিতে সংবেদশীলতার সঙ্গে পুরুষটি যদি তার নারী সাথীটিকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে, এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তটা নিতে হবে মেয়েটিকেই। গর্ভধারণ, প্রসব, স্তন্যদানের মতো দায়িত্বগুলো পরিপূর্ণভাবে এবং সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রধানত যেহেতু গ্রহণ করতে হয় তাকে, সে ছাড়া গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত আর কেউ নিতে পারে না, নেওয়া উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমা দুটি দেশে গর্ভপাত সম্পর্কিত আইনের সাম্প্রতিক দু-একটি পরিবর্তন, যা বর্তমান সময় ও পরিস্থিতির সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ, উল্লেখ না করে পারছি না। বিভক্ত অবস্থায় পশ্চিম জার্মানিতে আইনগতভাবে গর্ভপাত একমাত্র সম্ভব হতো — (১) যদি ডাক্তারের মতে এই গর্ভাবস্থা বা প্রসব মায়ের জীবন সংশয় করে; (২) যদি গর্ভের সন্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিক বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়; অথবা (৩) যদি এই গর্ভাবস্থা সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক গভীর কোনো সংকট বা সমস্যার সৃষ্টি করে। পূর্ব জার্মানিতে অবশ্য ইচ্ছে করলেই কেউ গর্ভপাত করতে পারত। এখন দুই জার্মানি একত্রিত হয়ে যাওয়ায় এক দেশে দুই নিয়ম যেহেতু প্রযোজ্য হতে পারে না, সম্প্রতি নতুন একটি আইন পাশ হয়েছে যা সমগ্র জার্মানিতে কার্যকর হবে। সেটা হলো গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত এখন থেকে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকার বা ডাক্তারের কারো নয়, একমাত্র মহিলার নিজের। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার প্রথম তিন মাসে যে-কোনো মহিলা চাইলে গর্ভপাত ঘটাতে পারে; একমাত্র শর্ত — তাকে এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে, যে-পরামর্শের একমাত্র উদ্দেশ্য এ প্রক্রিয়া থেকে নারীটিকে বিরত করা এবং বিকল্প ব্যবস্থার জন্যে সুপারিশ করা। গর্ভপাতের এই আইনের সঙ্গে অবশ্য আরো একটি আইন পাশ হয়েছিল যা নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, প্রতিটি জার্মান শিশুর জন্যে কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান হবে। গর্ভপাত সম্পর্কে এ নতুন ব্যবস্থায় সরকার ও ডাক্তাররা খুশি এই জন্যে যে, তাদের আর এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটিতে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে না, মেয়েরাই সে দায়িত্ব বহন করবে। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ ইতিমধ্যে গরিব মেয়েদের মধ্যে বিনে পয়সায় গর্ভপাত সম্পর্কিত পরামর্শ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করছে। কেননা তারা মনে করে, মেয়েরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই পরামর্শ নিতে আসে গির্জায় কেবলমাত্র নিয়মটুকু রক্ষা করতে। ফলে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ মনে করে, বিনা পয়সায় গর্ভপাত সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকারান্তরে গর্ভপাতের সহযোগী শক্তি হিসেবেই কাজ করবে যা তারা ধর্মীয় কারণে অনুমোদন করতে পারে না।

যা-ই হোক, মেয়েদের ইচ্ছায় গর্ভপাত ঘটবে — এ আইন পাশ হওয়ার পর কয়েকটি মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় একটি সংস্থা এই বিশেষ আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোর্টে ইনজাংশন দিয়েছে। তারা দাবি করেছে, এই সংশোধিত আইন জার্মানির সংবিধানবহির্ভূত। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গর্ভপাতের ব্যাপারে নিয়মকানুন ভিন্ন। সম্প্রতি আদালতে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যে গর্ভপাতবিষয়ক আইনেরই কিছুটা রদবদল হয়েছে। ওখানকার আইনের ধারায় একটি মেয়েকে এ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাওয়ার আগে কতগুলো শর্ত মেনে চলতে হতো। (১) প্রথমত তাকে সমাজকল্যাণ সংস্থা বোঝাতে চেষ্টা করে গর্ভপাতের চেয়ে সন্তান প্রসবের বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক সুবিধাগুলো। তাকে এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে ভূমিষ্ঠ সন্তানের দায়িত্ব সে অনায়াসে সমাজকল্যাণ সংস্থা অথবা সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। (২) গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর আরো বাড়তি ২৪ ঘণ্টা তাকে অপেক্ষা করতে হবে তার মতের স্থিরতা যাচাই করার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৩) যদি আঠারো বছরের নিচে বয়স হয় মেয়েটির, তা হলে তার মা-বাবার অনুমতির প্রয়োজন হয়; তবে বিশেষ জরুরি অবস্থায় (ধর্ষণ বা অবৈধ পারিবারিক যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে) মাতাপিতার মতামতকে অহেতুক বাড়াবাড়ি বলে বিবেচিত হলে বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। (৪) ব্যাপারটা স্বামীকে অবগত করাতে হবে (একমাত্র যে ক্ষেত্রে স্বামীর অজ্ঞাতে গর্ভপাত সম্ভব, তা হলো যদি স্ত্রী প্রমাণ করতে পারে এ অবগতির জন্যে তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে বা তা করা হতে পারে)। পেনসিলভেনিয়ার সাম্প্রতিক আইনের পরিবর্তনের ফলে ওপরে উল্লিখিত সবগুলো নিয়মই বহাল রাখা হয়েছে। শুধু স্বামীর অবগতির শর্তটা তুলে নেওয়া হয়েছে। কেননা কোর্টের মতে স্বেচ্ছায় যদি মত না দেয়, তা হলে স্বামীর অবগতির ব্যাপারটা আইনে জুড়ে দেওয়ার ফলে গর্ভপাত ঘটাবার সম্ভাবনা একটি মেয়ের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের তুলনায় আমেরিকায় সামাজিক ও আইনগতভাবে গর্ভপাতের ব্যাপারে নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ একটু বেশি কড়া। তা সত্ত্বেও সেখানকার কোনো কোনো অঞ্চলে স্বামীর অবগতির ব্যাপারটিকে আইন থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশেও অনুরূপ নিয়ম হওয়া একান্ত জরুরি। গর্ভপাত একটি মেয়ের জন্য কোনো সুখকর ঘটনা নয় — শরীর ও মন দুই দিক বিবেচনা করেই। তা সত্ত্বেও কোনো মহিলা যখন এই যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এই ব্যাপারটি তার স্বাস্থ্যের জন্যে যদি ঝুঁকিপূর্ণ না হয়, তা হলে সে ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত — গর্ভধারণ ও গর্ভপাত দুটি প্রাকৃতিক ও শারীরিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেই মেয়েদের গভীর আবেগের সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। যে গর্ভপাত করতে মনস্থির করেছে সে তা করবেই। আইনকানুন, পুলিশ, আদালত, ধর্ম, শাস্তির ভয় কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারবে না। গর্ভপাতের নিয়মকানুনে শিথিলতা কোনো সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বয়ে এনেছে এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না। কেননা কোনো দেশ বা সমাজ শুধু নয়, ব্যক্তিগতভাবেও কেউ এ পদ্ধতিকে গর্ভরোধের সাধারণ ও স্থায়ী উপায় বলে বিবেচনা করে না। তবে যখন এর প্রয়োজন রোধ করা যায়, তখন প্রচলিত আইনের মাধ্যমে সহজভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সেটি ঘটানো যদি সম্ভব না হয়, তখন মানুষ বিকল্প উপায়ে তা করার চেষ্টা করে যা অহেতুক মেয়েদের জীবন সংশয়াপন্ন করে তোলে। গর্ভপাতের ব্যাপারে অযথা জটিলতা ও কড়াকড়ি প্রকারান্তরে সমাজের কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। আমেরিকার National Abortion Federation ঠিকই বলেছে, These hurdles will be responsible for an increase in delayed and therefore riskier abortion procedures. মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মকানুন রোধ করতে এবং সভ্যতার স্বার্থে গর্ভপাতের ব্যাপারে তাদের একক সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। খাদ্যগ্রহণ থেকে শুরু করে চিকিৎসার অধিকার, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যাপারে এদেশে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার। তাদের স্বাস্থ্য, তাদের কল্যাণ, তাদের বিকাশের কথা বিবেচনা করে গর্ভপাত সম্পর্কে সুস্থ আইনকানুন ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন — যাতে করে ত্রুটিপূর্ণ এই পদ্ধতির সুযোগ নিতে গিয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার সম্ভাবনাময় তরুণীকে অকালে প্রাণ হারাতে না হয়। (বাংলাদেশে গর্ভপাত বৈধ না হলেও 'মাসিক নিয়মিতকরণ'-এর নামে এটি এখন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে ও আইনগত জটিলতা এড়াতে সক্ষম)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যায় ভোরের শিশির

কাল ছিল রোববার।

হলদিয়ের মতো পাড়াগাঁয়ে রোববার-সোমবারের পার্থক্য বড় বেশি নেই। পার্থক্য নেই গীতার কাছেও। কাল তাই কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে অভ্যাসমতো বাসি কাপড় ছেড়ে উঠোনে গোবরের ছড়া দিয়ে ননদ সন্ধ্যাকে যখন জাগাতে গিয়েছিল গীতা, একবারও তার মনে হয়নি গতকালটি কোনো দিক দিয়ে অন্যদিনের চাইতে আলাদা হতে পারে।

শোয়া বড় খারাপ সন্ধ্যার। সবে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। কাপড়চোপড় একেবারে ঠিক থাকে না যখন ঘুমোয় সে। আর তাই ভোরবেলা মাঘমণ্ডলের ব্রত করতে তাকে জাগিয়ে দিতে হবে একমাত্র বৌদিকেই। নিজের বিশ্রীভাবে শুয়ে থাকা সম্পর্কে এত বেশি সচেতন সন্ধ্যা যে মাকেও তার ভয়ানক লজ্জা। আরো একটি কারণেও বৌদিকে বেশি পছন্দ এ ব্যাপারে। গীতা জানে শীতকালে ঘুম থেকে ওঠা কি রকম আলস্যকর। আর তাই সে সন্ধ্যাকে একবারে উঠিয়ে দিতে চেষ্টা করে না কখনো। একটু একটু করে তাড়া দিতে থাকে নিজে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই। আস্তে আস্তে লেপের মায়া কাটাতে অত কষ্ট হয় না, অথচ মা তা করবে না কখনো। যখন থেকে ডাকতে শুরু করবে মা, বিছানা থেকে উঠে পড়া পর্যন্ত মার হাত থেকে মুহূর্তের জন্যও নিস্তার নেই।

মাঘমণ্ডলের ব্রত, যমপুকুরের ব্রত, তারাব্রত, শিবরাত্রি — কত ব্রত-কত উপোস করেছে গীতা নিজেও। গীতার মার ধারণা ছিল, গভীরভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন, এ কয়েকটি মৌলিক ব্রতপালন প্রতিটি হিন্দু নারীর অবশ্য কর্তব্য। মনে আছে, মা তাকে বলেছিল, যমপুকুরের ব্রত করা হয় মা-বাবা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির আত্মার শান্তির জন্যে। যমদূতকে খুশি করাই উদ্দেশ্য এ ব্রতের। ব্রতকথার যে-গল্প তাতে গীতা জেনেছে, বধূ এ ব্রত না করায় শাশুড়িকে কী রকম জলতেষ্টায় কাটাতে হয়েছে স্বর্গে। অথচ শীতের সকালে উঠোনের কোণে কাটা আধ হাত লম্বা পুকুরের চারপাশে বসানো মাটির তৈরি পশুপাখিগুলোকে দূর্বা ভিজিয়ে জল খাওয়াতে খাওয়াতে গীতা কোনো দিন বুঝতে পারেনি তার জীবন্ত মা-বাবা অথবা অদেখা অজানা শ্বশুর-শাশুড়ির স্বর্গে জলতেষ্টা নিবারণের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক। অথবা শিবরাত্রির উপোস করে শিবলিঙ্গে দুধ ঢেলে, ফুল বেলপাতা দিয়ে শিবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো বরের প্রার্থনা করে আসলেই কজন তা পেয়েছে, গীতা তা ভেবেছে বহুবার। কথিত আছে শিবরাত্রিতে উপোস করে ঘুমিয়ে পড়া মহাপাপ। কেননা সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বয়ং শিব এসে পা টিপে দেবে তোমার। তাতে যে পাপ হবে তার তুলনায় সখীদের সাথে উপোস-ক্লান্ত শরীরটাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখার কষ্ট কিছু নয়। এসব কথাই একসময় অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করত গীতা। অথচ ব্রতকথার সাথে জীবনের পালা মেলাতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে সে — নিজের জীবনে এবং চারপাশে পরিচিত অন্য সব জীবনেও। তাই আগেকার সেই প্রগাঢ় আস্থা আর নেই। গীতার আজকাল মনে হয়, মানুষ কী চায়, কত গভীরভাবে চায়, তা পেতে কতখানি সচেষ্ট সে — এ সবের তেমন কোনো মূল্যই নেই। জীবনের স্বাভাবিক গতি কী নিয়ে আসে তোমার জন্যে এবং তুমি তাকে কীভাবে গ্রহণ কর, তার ওপরেই নির্ভর করছে তোমার সুখ, অ-সুখ, যন্ত্রণা, আনন্দ স-ব কিছু। গীতা জানে, এই প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে সে। তাই সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে জীবনের চিরন্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত গতির কাছে। কেটে যাচ্ছে একটার পর একটা দিন-রাত্রি-দিন।

ঘুম থেকে উঠে চাদর গায়ে দিয়ে গাঁদা ফুল ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে পুকুরঘাটে তখন চলে গিয়েছিল সন্ধ্যা। গাঁয়ের আরো দু-চারটি মেয়ে আগেই জমা হয়েছিল ঘাটে। বাড়ির ঠিক পেছনেই পুকুর। উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে গীতা শুনতে পাচ্ছিল, ওরা সুর করে মাঘমঙ্গলের ব্রতের কথা বলছে। উঠোনের কোণে মালতী ফুলের গাছে ছোট ছোট অজস্র সাদা ফুলের সমাহার। মালতী গাছের গুঁড়ির চারপাশের সামান্য ঘাসের চাকতিটিতে দু-তিন রকমের গাঁদা ফুল — রাজ গাঁদা, পেতি গাঁদা, রক্ত গাঁদা। মার বড় দুঃখ ছিল গীতাদের বাসার মাটিতে রাজ গাঁদা ফোটে না একেবারে। রাজ গাঁদার চারা লাগালেও ছোট পেতি গাঁদা ধরে তাতে। পুজোর ফুল তুলতে সকালবেলা গীতা আর বেরোয় না আজকাল। ও কাজটি সন্ধ্যার জন্যে বাঁধা। যেমন ছিল গীতার জন্যে একদিন, সেই কাকভোরে উঠে ফুলের ডালা নিয়ে ছোটাছুটি। 'এই দেখ মা, কী সুন্দর-কী মস্ত বড় একটা গন্ধরাজ পেয়েছি আজ! ও মা, দেখ না।'

রান্নাঘরে চুলোর পাশে বসে ছিল গীতা। পাটখড়ির আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে। জল ফুটছিল চুলোয় টগবগ করে। দূর থেকে ভেসে আসা সন্ধ্যার গলার সাথে সুর করে বিড়বিড় করে বলছিল গীতা 'ওঠো, ওঠো, সুয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।'

সদ্য ঘরে-তোলা আখের তোয়াকের তৈরি চা খেতে বড় পছন্দ সুনীলের। চায়ের প্রতি এমনিতে তেমন কোনো আসক্তি নেই তার। হাতের কাছে এলে খেলাম, এমন একটা ভাব। তবে শীতকালে সব কিছুই অন্যরকম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দোকানে যাওয়ার আগে খাঁটি তোয়াকের তৈরি গরম চা কার না ভালো লাগে! শখ বল, আয়েশ বল, সুনীল এ রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলা গীতার হাতের এক কাপ চা খেতে উদগ্রীব হয়ে থাকে।

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসে গীতার একটু অসুবিধেই হয়েছিল। নিরাশ হয়ে সে লক্ষ করেছে চায়ের পর্ব এ বাড়ি থেকে একেবারে নির্বাসিত। দু'দিন কোনোমতে চুপ করে থাকার পর সুনীলকে কথাটা না বলে পারেনি গীতা। শাশুড়ি তো শুনে তক্ষুণি টিপ্পনী কেটে বলেছেন, 'আর কি? শহরের মেয়ে ঘরে এসেছে। এখন আমাদের কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরতে হবে ঘরে।'

সুনীলের মায়ের মুখের ভাষাটা একটু কড়া, তবে গীতা জানে, মনে বেশ ভালোই তিনি। প্রথমদিন তিনিই গীতাকে চা করে খাওয়ান। সে কবেকার কথা! এখন তো মাঝে মাঝে শাশুড়ি নিজেও চা খান গীতার সাথে। পছন্দও করেন মনে হয়। তবে তা স্বীকার করে না কখনো। 'কই গো বৌ! আজ আমার জন্যেও একটু চায়ের জল ফুটিও তো দেখি! গলাটা কেমন ভার ভার করেছে। যদি ভালো লাগে একটু।'

গীতা ভালো করে আদা দিয়ে আখের গুড় আর বেশি দুধের চা করে দেয় শাশুড়িকে। খুব পরিতৃপ্তির সাথে তা পান করেন তিনি। সন্ধ্যাও ভাগ বসায় মাঝে মাঝে। এমনকি দু'বছরের সন্টুও। বলতে গেলে এই শীতের সকালে চায়ের আসরে এ সংসারের সবক'টি প্রাণী জড়ো হয় একসঙ্গে। অথচ গীতার বিয়ের আগে এই শহুরে প্রথা একেবারে অনুপস্থিত ছিল এ বাড়িতে।

গতকালও সন্ধ্যা ব্রত সেরে ঘরে ফেরার পর ওরা একত্র বসে খাচ্ছিল রান্নাঘরের বাইরে উঠোনে বসে। আর তখনি এলো তারা। এই সাতসকালে অতিথি আসার কথা নয় এ বাড়িতে। অবাক হয়েছিল ওরা। তবু গীতার একবারও মনে হয়নি, দিনটি অন্যান্য দিনের চাইতে আলাদা হতে পারে।

বাড়িতে সরাসরি না ঢুকে গোয়ালের পেছন থেকেই পুরুষ কণ্ঠে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাড়িতে কেউ আছেন?'

চায়ের গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুনীল।

'কে?'

'আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্টের লোক। আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

সুনীল শশব্যস্তে বেরিয়ে এসেছিল।

'আসুন! আসুন।'

সুনীলের ইশারা মতো গীতা ও সন্ধ্যা ততক্ষণে ভেতরের ঘরে চলে গিয়েছিল। নাতি কোলে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সুনীলের মা। সুনীল অতিথিদের অভ্যর্থনা করে বসার জন্যে মোড়া এগিয়ে দেয় উঠোনে। গীতা ও সন্ধ্যা ঘর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে শহর থেকে আসা প্যান্ট-শার্ট পরা লোক দুটোকে দেখার জন্যে। কিন্তু ওরা মোড়া টেনে বসেছে গীতাদের দিকে ঠিক পেছন ফিরে। ফলে কেবল কথাই শোনা যাচ্ছে তাদের, মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যাচ্ছে না।

গীতার তখন আবার মনে হয়েছিল সব কিছু কেমন বদলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আগে মুন্সীগঞ্জে তাদের বাসায় কেউ এলে — সে পরিচিত-অপরিচিত পুরুষ-মেয়েমানুষ যেই হোক না কেন — প্রথমে যার চোখে পড়ত সেই অভ্যর্থনা করে অতিথিকে ঘরে নিয়ে বসাত। তারপর প্রয়োজনমতে বাবাকে বা মাকে ডেকে দেওয়া হতো। অথচ আজকাল সেই একই বাড়িতে বাইরের কেউ এলে সব সময় দরজা খুলে দাঁড়াবে ছোট ভাই খোকন অথবা বাবা নিজে। দু'জনের কেউ ঘরে না থাকলে মা। ননী, শোভা, গীতার অন্যান্য বোনেরা গীতার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত! এছাড়াও আরো কত পরিবর্তন হয়েছে মুন্সীগঞ্জে তাদের পাড়াতে গীতার স্মরণকালেই। পাড়ার বিরাট পুকুরটির দু'টি বাঁধানো ঘাটে একসময় ছেলেমেয়েরা চান করত একসাথে দল বেঁধে। চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গরমের দিনগুলোতে বেলা পড়লে গা ধোওয়ার যে পরিতৃপ্তি-যে মহানন্দ, তা মনে হলে এখনো গা শিহরিত হয়ে ওঠে গীতার। সন্ধ্যা লাগার আগে আগে পিতলের কলসি নিয়ে চুপি চুপি ঘাটের দিকে পা বাড়াত গীতা। ননী, শোভা সাহায্য করত মার দৃষ্টি এড়িয়ে কেটে পড়তে। গা ধোয়ার ব্যাপারে আপত্তি ছিল না মার। আপত্তি করত মা এতক্ষণ ধরে অবেলায় জলে পড়ে থাকার জন্যে। সর্দিকাশি লেগে যাবে এই ভয়। খালি কলসি উপুড় করে পেটের ঠিক তলায় ধরে ঠাণ্ডা জলে ভাসতে গীতার মনে হতো পৃথিবীতে তার চেয়ে সুখী কেউ নেই। আলতো আলতো হাওয়া — উঁচু করে খোঁপা করে চুল না ভেজাবার সতর্কতা — সমবয়সীদের কাছ থেকে সারা দিনের যত গোপন কথা আবিষ্কার — সে-সব দিনগুলো স্বপ্নের মতো মনে হয় আজ।

পুকুর, বাগান, বাড়ি সব ছেড়ে ঘোষরা চলে যাওয়ার পর নতুন যে মালিক এলো সেখানে, সে বাড়ি সংলগ্ন ঘাটটিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলল। তার বাড়ির মেয়েরা সেখানে চান করবে বলে। পুকুরের ও-পাড়ের অন্য ঘাটটা খোলা রইল আর যারা ব্যবহার করতে চায় তাদের জন্যে। কোনো নির্দেশ নয়, কোনো লিখিত বা প্রচারিত নিয়ম জারি নয়, তবুও লেখা শর্তের মতো আস্তে আস্তে সেই পরিচিত খোলা ঘাটটির ব্যবহারের নমুনা পালটাতে শুরু করল। মেয়েরা খুব সকালে অথবা বেলা পড়লে চান করতে যায় সেখানে। ছেলেরা অন্যান্য সময়। হল্লা করে জল ছিটিয়ে ছেলেমেয়েরা একত্রে চান করে না আর। আরো দিন গেলে গীতার বিয়ে হওয়ার আগেই ওরা দেখেছে, পাড়ার অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের মেয়েরা খোলা ঘাটে চান করতে আর একেবারে আসে না! যাদের সাথে পুকুরের মালিক পরিবারের খুব সদ্ভাব, তারা যায় বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘাটে। বাকি কেউ কেউ নিজেদের বাড়ির ভিতরে চান করে তোলা জলে। গীতারা অবশ্য তখনো পুকুরে যেত। ননী, শোভা বোধহয় তাও যায় না আর আজকাল। গীতা ঠিক জানে না। অনেক দিন ওদের সাথে দেখা হয়নি তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলথ ডিপার্টমেন্টের লোকদের সাথে সুনীলের স্বল্প আলাপেই গীতা বুঝতে পেরেছিল কী উদ্দেশ্যে আসা তাদের। চোদ্দ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের সধবা মহিলাদের নাম রেজিস্টার করছিল ওরা। গীতার ডাক পড়েছিল একটু পরেই। ঘোমটা আরেকটু বড় করে টেনে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল গীতা। সিগারেটটা দাঁতে চেপে ভদ্রলোক কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে গীতার দিকে মুখ তুলে তাকান। সে কি! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না গীতা। 'আনিস ভাই!' বিস্ময়ে আনন্দে গীতা টের পায়নি, প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল সে।

'আরে গীতা!' সিগারেটটা জুতোর তলায় ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে আনিস।

'তাই তো! তাই তো, তোর তো হলদিয়েতেই বিয়ে হয়েছিল! কী কাণ্ড বল দেখি। একেবারে মনে ছিল না আমার।'

কিছুক্ষণ কেটে যায় ওদের স্মৃতিচারণে। আনিসদের বাড়ি গীতার বাপের বাড়ির খুব কাছে। একই পাড়ার অন্য মাথায়। আনিসের বাবা উকিল। ছোটবেলা বাবার সাথে কতবার তাদের বাড়িতে গিয়েছে গীতা! আধময়লা কাগজের ফাইলটি বগলদাবা করে প্রতি সকালে আনিস ভাইদের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকত বাবা। চৌকির কোণে রাখা কাঠের বাক্সের সামনে গিয়ে বসত চটি জোড়া খুলে রেখে। নাকের ডগায় চশমা ফেলে সারাক্ষণ যেন বসে বসে কী লিখত বাবা। আর মাঝে মাঝে কিসের ছাপ মারত কাগজে। বেলা দশটা নাগাদ আনিস ভাইয়ের বাবার পিছু পিছু কাচারিতে চলে যেত বাবা। ফিরত সেই বিকেলে। তখনই গীতা দেখেছে আনিস ভাইয়ের মা এবং বোনদের। বাইরে খুব একটা বেরোত না তারা। চাকর বাজার করে দিত — চা করত। গীতা লক্ষ করেছে আনিস ভাইয়ের বাসায় সকলে ঘরে স্যান্ডেল বা খড়ম পরে থাকে-খালি পায়ে হাঁটে না কেউ। আর কি আস্তে আস্তে কথা বলে সবাই! ওদের কারো সাথে কাউকে কখনো কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া করতে দেখেনি গীতা। এ বাড়ির ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র আনিস ভাই-ই। জোরে জোরে কথা বলত সে। পড়তে-পড়তে চিৎকার করে গান গেয়ে উঠত। বৈঠকখানা ঘর থেকে ভুরু কোঁচকাতেন তার বাবা। সেদিকে কোনো খেয়াল করত না আনিস ভাই। হা হা করে পাড়া কাঁপিয়ে হাসত।

সেই একটি দিনের কথা গীতা কোনো দিন ভুলবে না। ততদিনে আনিস ভাই, মঞ্জু আপা, সবাই ঢাকা চলে গিয়েছে পড়তে। হাসি আপার বিয়ে হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। আনিস ভাইদের বাড়ির ঠিক সামনেই রাস্তার ওপারে ছিল বিরাট একটা মাঠ। গত বছর মুন্সীগঞ্জে গেলে গীতা অবশ্য দেখে এসেছে সেই মাঠে বিস্তর বাড়িঘর উঠে গেছে এখন। গীতাদের গরু এবং বাছুরকে সে-মাঠে বেঁধে দিত ওরা ঘাস খাবার জন্যে। সেই বিকেলে গীতা গিয়েছিল গরুকে ঘরে আনতে। সাধারণত গরু-বাছুরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বেঁধে দেওয়া হতো বাছুর এসে যাতে গরুর দুধ না খেয়ে ফেলতে পারে। বিকেলে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বাছুরকে আলাদা করে আগে নিয়ে যাওয়া হতো। যাতে করে সন্তানের মায়ায় গরু কোনো ঝামেলা না-করে সুড়সুড় করে ঘরে চলে আসে পিছু পিছু। এই কৌশল এমন মোক্ষম ছিল যে বাবা যেদিন ব্যস্ত থাকত, গীতা অথবা শোভা একাই আসত গরু নিয়ে যেতে। কখনো কোনো অসুবিধা হতো না। সেদিন বিকেলে কিন্তু গীতাকে অবাক করে গরু প্রচণ্ড লাফান শুরু করল খুঁটি খুলে দেওয়ার পরপরই। কিছুতেই দড়ি ধরে রাখতে পারছিল না গীতা। প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যাতে হাত ফসকে বেরিয়ে না যায় খুঁটি। দু-চারবার এ রকম যে না ঘটেছে তা নয়। কিন্তু পরের ইতিহাস দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ানক। কারো বাড়ির কলাগাছে বেহায়ার মতো মুখ দেওয়া, ধবলীর নালিশ, চারদিকে খোঁজাখুঁজি, খোঁয়াড় এবং সবশেষে এক গাদা পয়সা গচ্চা দিয়ে গরু ফিরিয়ে আনা। মরিয়া হয়ে গীতা যখন অনুনয় করছে ধবলীকে থামতে, তখন বড় বড় পা ফেলে দেবতার মতো এগিয়ে এসেছিল একটি লোক রাস্তার ওপার থেকে। দূর থেকে চিনতে পারেনি গীতা। কাছে এসে লোকটি যখন গীতার হাত থেকে খুঁটি কেড়ে গরুটার দড়ি ধরে টান দিয়েছিল, এভাবেই চিৎকার করে উঠেছিল গীতা, 'আনিস ভাই!'

'হ্যাঁ', আনিস তখন প্রাণপণে গরুটাকে সামলাতে চেষ্টা করছে। 'তোরা কি পাগল নাকি? এসব কি মেয়েমানুষের কাজ? গায়ের জোরের একটা ব্যাপার আছে তো! না কি?'

গরু নিয়ে আনিস বক বক করতে করতে গীতাদের বাসার দিকে যাচ্ছিল। আর গীতা — চৌদ্দ বছরের গীতা আনিসের পাশাপাশি চলতে চলতে বিকেলের পড়ন্ত রোদে প্রাণভরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। ওদের মালপাড়ার কাস্তের আকারের অঞ্চলটির মাঝামাঝি এসে গিয়েছে তখন ওরা। এখানটাই মুন্সীগঞ্জ শহর আর তার পরবর্তী গ্রামের সীমানা। মালপাড়ার ঠিক পাড় ঘেঁষে ধু ধু মাঠে নানান ফসল। যতদূর দেখা যাচ্ছিল কেবল কড়াইশুঁটি। ঘন কালো সবুজের সেই ক্ষেত থেকে এক অদ্ভুত তাজা গন্ধ আসছিল। গীতা কিন্তু সুবাস নিচ্ছিল অন্য কিছুর। আনিস ভাইয়ের জামায়, চুলে, না কোথা থেকে কী-রকম যেন একটা মিষ্টি গন্ধ। ঢাকায় গেলে মানুষ এত সুন্দর হয়ে যায়? গায়ের রং, স্বাস্থ্য, চুলের স্টাইল — গীতা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'কী দেখছিস?'

'আচ্ছা আনিস ভাই, ঢাকাটা কেমন? খুব সুন্দর?'

'সুন্দর আর কি? অনেক লোক, গাড়ি, বড় বড় দোকান-পাট, দালান! কেন, তুই কখনো ঢাকা যাসনি?'

'না। বাবা বলেছে এবার অষ্টমী পুজোর সময় নিয়ে যাবে।'

সুনীলের মা ততক্ষণে নারকেলগুঁড়ো, ঘি আর চিনি-মাখা মুড়ির সাথে চা এনে দিয়েছেন অতিথিদের। বাড়ির কথা জানতে চায় গীতা। বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরটা বেশি ভালো যাচ্ছে না। বয়স হয়েছে। আজকাল কাচারিতে যেতে পারে না ঠিকমতো। এসব গীতার অজানা ছিল না। কিন্তু খোকন কুলগাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে, এটা কিন্তু কেউ লেখেনি তাকে। আনিস নিশ্চিন্ত করতে চায় গীতাকে। দু-চার দিনের ভেতরই প্লাস্টার খুলে ফেলবে। কোনো চিন্তার কারণ নেই। গীতার বোনদের খবর ঠিকমতো বলতে পারল না আনিস। তবে গত সপ্তাহে যখন মুন্সীগঞ্জে গিয়েছিল, গীতার মার সাথে দেখা হয়েছিল আনিসের। ননীর বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজছে তারা, এ-কথা বলেছে গীতার মা।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে গীতাকে প্রশ্ন করে আনিস, 'আচ্ছা তুই তো স্কুলে যেতিস। মনে পড়ে মিনুর সাথে একই ক্লাসে পড়তিস। তাহলে তো পড়তে-লিখতে নিশ্চয়ই জানিস তুই।'

গীতা কিছু বলার আগেই আহত বাঘিনীর মতো হয়ে ওঠেন সুনীলের মা। 'তা কেন জানবে না বাবা? এই গাঁয়ের সবার চিঠিপত্র বৌ-ই তো লিখে দেয়।'

খুশি হয় আনিস। 'তাহলে তো খুব ভালো হলো। তোকে আমাদের কাজে একটু সাহায্য করতে হবে গীতা। আমাদের ক্লিনিকে মেয়েদের একান্তই প্রয়োজন। একজন মাত্র নার্স আছে আমাদের সাথে। আপনি কি বলেন রহমান সাহেব?'

'সে তো নিশ্চয়ই!'

এতক্ষণে কিছু বলতে পেরে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন সঙ্গের ভদ্রলোক। বেঁটেখাটো, গোঁফওয়ালা ভদ্রলোককে বেশ অমায়িক মনে হয় গীতার। আশ্চর্য, এতক্ষণ তার দিকে একবার তাকিয়েও দেখেনি সে! রহমান সাহেব কিছুটা সংশয়, কিছুটা সংকোচের সাথে আনিসকে মনে করিয়ে দেন, এ ব্যাপারে গীতার স্বামী এবং শাশুড়িরও অনুমতি নেওয়া দরকার।

সুনীল এবং তার মাকে রাজি করাতে বেগ পেতে হয়নি আনিসদের। বেলা দুটো থেকে পাঁচটা — তিন ঘণ্টার জন্যে আগামীকাল স্কুলঘরে যে-ক্লিনিক বসবে, তাতে মেয়েদের সেকশনে উপস্থিত থাকতে হবে গীতাকে কর্মী এবং গ্রহীতা দুই হিসেবেই।

অনেক ভোরে আজ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গীতার। আস্তে জানালার পাট দুটো খুলে বাইরে তাকিয়ে সময় নির্ণয় করতে চেষ্টা করছিল সে। সূর্য ওঠেনি তখনো। ভেজা সবুজ ঘাসে সাদা আর কমলা রঙের অপূর্ব সমন্বয়। মনে পড়ে এমনি সকালে মল্লিকদের বকুলতলায় ফুল কুড়োবার কাড়াকাড়ি। এত ভোরে উঠেও দীপালির সাথে পাল্লা দিয়ে পারা যেত না। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে পড়ল গীতার চোখে-মুখে। মনটা হঠাৎ করে এক অদ্ভুত প্রশান্ত ভালো লাগায় ভরে গেল তার। সুনীলের দিকে ফিরে তাকায় গীতা। পাশ-বালিশটা জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে সুনীল। গতকাল রাতে সুনীলের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে গীতার। সবকিছু ভাগ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে নিয়তির পুতুল করা সব ব্যাপারেই সুনীলের। গীতা নিজেও আজকাল ভাগ্য মানে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন আগের মতো হাতছানি দেয় না আর। তবে সে যা চায় তা যদি অনায়াসলভ্য হয়, তাহলে তাকে পাওয়ার জন্যে হাত বাড়াবার কুণ্ঠা বা আলস্যও তার হয় না। কিন্তু মুশকিল হলো সুনীলের পরামর্শ বা সায় ছাড়া কোনো কিছু করতেই অভ্যস্ত নয় গীতা। নতুন বা অজানা-অচেনা কোনো পদক্ষেপ নিতে দারুণ সংশয় সুনীলের। সে ছোট থেকে বড় যে-কোনো ব্যাপারেই হোক না কেন! তাই সুনীলের কাঁধে কোনো দায়িত্ব বা সমস্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না গীতা। সে জানে স্বামীর যে বলিষ্ঠতা বা মনোবল থাকলে তা করতে পারে মেয়েরা, সুনীলের তা নেই। অথচ সে তো এমন ছিল না। ভাবতে অবাক লাগে, এই সুনীলই রাতারাতি কর্মস্থল ও বাসস্থান হারিয়ে গীতার হাত ধরে শহরের পথে নেমে বলেছিল একদিন, 'দুঃখ করো না। আমরা আবার ফিরে আসব এখানে। তোমার শাড়ি, গয়না সব হবে আবার।'

না, আর হয়নি। আর কোনোদিন ওসব হয়নি গীতার। তার জন্যে দুঃখ নেই তার। জীবনকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ, মা বরাবর এ-কথা বলেছে। আফসোস করে লাভ কী? না, গীতা শাড়ির জন্যে, গয়নার জন্যে, এমনকি তার অতি প্রিয় ছোট রেডিওটার জন্যেও দুঃখ করে না। দুঃখ করে সুনীল আর আগের মতো ভবিষ্যতের কথা ভাবে না বলে।

প্রাত্যহিক কাজগুলো শেষ করতে বেশি সময় লাগে না গীতার। আজ যেন দিন আর এগোয় না। কতবার যে সে সন্ধ্যাকে পাঠিয়েছে পাশের বাসায় সময় জানতে, তার হিসেব নেই। রান্না শেষে সকলকে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে নিজে খেতে বসেছিল যখন গীতা, তখন বেলা প্রায় একটা। এমনিতে তেমন ক্ষিদে ছিল না। তারপর পাছে দেরি হয়ে যায়, গীতা ভালোমতো খেতে পারল না। পুজোতে বাবার দেওয়া কমলা রঙের চওড়া-পাড়ের তাঁতের শাড়িটা পরে চুল আঁচড়ে একটা এলোখোঁপা করে নিল। কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পরতে আয়না থেকে চোখ সরিয়ে ঘুমন্ত ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল একবার। একেবারে সুনীলের মতো দেখতে হয়েছে ছেলেটা। এত দুষ্টু, এত ছটফটে। অথচ যখন ঘুমোয়, কেমন অসহায় মনে হয় ওকে। মায়া লাগে মুখটার দিকে তাকালে। সন্টু ঘুম থেকে উঠলে ওকে দুধ দিতে যেন ভুল না হয়, সন্ধ্যাকে বারবার একথা মনে করিয়ে দেয় গীতা। বেরোবার মুখে শাশুড়িকে বলতে গেলে তিনি মনে করিয়ে দেন যে আজ হাটের দিন। সুনীলের ফিরতে দেরি হবে। ফলে বিকেলে গরুর দুধ দুইতে হবে শাশুড়ি-বধূকেই। গীতা সে-কথা ভোলেনি। শাশুড়িকে নিশ্চিন্ত করে পথে বেরোয় গীতা। দুটো বাজার খুব বেশি দেরি নেই। সুনীলের মা সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন পাশের বাসার মাস্টারের ছেলে দীপুকে। এই ভরদুপুরে রাস্তায় একা বেরোনো ঠিক নয়।

মধ্য আকাশে সূর্য তখন। আখক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপালের ঘোমটাটা আরেকটু লম্বা করে টেনে দেয় গীতা। বিরাট নৌকোর মতো কড়াই-এ আখের রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে তখন। ধোঁয়া এবং লোকজনের কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন। সুন্দর মিষ্টি তোয়াকের গন্ধ চারদিকে। গীতা প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার উত্তেজনা টের পাচ্ছে বুকের টিপটিপিতে। দুপুরের এলোমেলো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আখক্ষেতের ভিতর দিয়ে। মরা পাতাগুলো আখের গায়ে লেগে কী রকম অদ্ভুত শনশন শব্দ তুলছে। 'বৌদি, তুমি কখন ফিরবে? ঠাকুমা বলেছে তোমাকে নিয়ে আসতে হবে আমার।'

দীপুর বয়স দশের বেশি হবে না। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে গীতা বুঝতে পারল সদ্যলব্ধ দায়িত্বে পুরোপুরি নিষ্ঠাবান সে। গর্বিত তো বটেই। তবু গীতা ওর আনন্দ নষ্ট করতে দ্বিধা করল না আজ।

'তোকে আর আসতে হবে না। আমি জানি না কখন আমি যেতে পারব। এখানকার কেউ একজন পৌঁছে দেবেন আমায়।'

মুখটা কালো হয়ে গেল দীপুর। তা আরেকটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে খেলার সাথীদের পেলে, ভাবে গীতা।

স্কুলঘরে ঢুকতেই আনিসের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। টেবিল ছেড়ে এসে দরজা থেকে গীতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় আনিস একটা ঘরে। সেখানে সাদা শাড়ি পরিহিতা এক মহিলা কী যেন বলছিলেন আর এঁকে এঁকে দেখাচ্ছিলেন ব্ল্যাকবোর্ডে। ঘরে আরো আট-দশজন মহিলা — দু'চারজনকে চেনে গীতা। এ গ্রামেরই। আনিস মুখ ঢেকে ফিসফিস করে বলল, 'এখানের লেকচার শেষ হলে বাইরে আসিস আমার কাছে। অনেক কাজ আছে তোর জন্যে।'

আধ ঘণ্টার মতো সময় ধরে মহিলা মানবজন্মের ইতিহাস এবং তা প্রতিরোধের কলাকৌশল ব্যাখ্যা করলেন। গীতা বুঝতে পারল এই মহিলাই আনিসের বর্ণিত সেই নার্স। তার কথা শুনতে শুনতে গীতা শুধু অবাক হয়ে ভাবছিল এত দিন-ক্ষণ সবকিছুর সঠিক সমন্বয়ে এত জটিলতার ভেতর দিয়ে যেভাবে মানুষের জন্ম, তাতে কেমন করে এতবার সন্তানধারণ সম্ভব একজনের!

আনিস যে-কাজ দিয়েছিল গীতাকে তা খুব শক্ত নয়। সারাদিন ধরেই একজন দু'জন করে গ্রামের মহিলারা আসছিল ক্লিনিকে। গীতা তাদের নাম, বয়স, স্বাস্থ্য, সন্তানের সংখ্যা এবং আরো কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর ছাপানো খাতার নির্ধারিত জায়গায় তুলে রাখছিল।

বেলা সাড়ে চারটের পর ক্লিনিকে আর কেউ এলো না। প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিংবা উপদেশ, পরামর্শ বা প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে গ্রামের মহিলারা সবাই যে যার ঘরে পিরে গিয়েছে ততক্ষণে। আনিস, সেই মহিলা নার্স, ডাক্তার রহমান ছাড়াও আরেকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন শহর থেকে — যাঁর নাম শহীদুল ইসলাম! ওরা সবাই মিলে বসে সেদিনের কার্যাবলি নিয়েই কথা বলছিল। গীতার অস্বস্তি লাগতে থাকে এদের আলোচনার মাঝখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুপচাপ বসে থাকতে।

'আমি তাহলে এখন আসি আনিস ভাই?'

'সে কি? বস। এত খাটলি। একটু চা খেয়ে যা।'

'না থাক।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অন্যান্য সবার কাছে বিদায় নিয়ে আনিসের পিছু পিছু আবার পথে নামে গীতা। কতক্ষণ কোনো কথা না বলেই পাশাপাশি পথ চলে ওরা।

'গীতা!'

'কি?'

'কিছু মনে না করলে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'বলুন।'

উৎসুক হয়ে আনিসের দিকে তাকায় গীতা। যে-প্রশ্ন অতঃপর আনিস করেছিল তা কিছুক্ষণ আগে সেই নার্সেরও প্রশ্ন ছিল। যে-কথা তাকে বলতে বাধেনি, তা আনিসকে বলতে লজ্জা পায় গীতা।

অতঃপর আনিস নিজেই আবার প্রশ্ন করে,

'তোর ছেলেটার বয়স কত?'

'দুই।'

'আরো অন্তত দু'-এক বছরের ভেতর তোর আর ছেলেপুলে না হওয়াই ভালো। তোর এবং ছেলের দু'জনের জন্যেই।'

'আমি তার কী করব? সে যে আমার কোনো কথাতেই কান দেয় না। সব ভাগ্যের হাতে ছেড়ে বসে আছে।'

'সে কি!'

যে-কথা গীতা কোনো দিন কাউকে বলেনি, আজ তা আনিসকে কী করে বলবে সে? বিয়ের পর থেকে প্রতিমাসের নির্ধারিত কয়েকটি দিন যে মর্মান্তিক দুঃস্বপ্নের মতো আসে, যে-অনিশ্চয়তা যে-দুর্ভাবনার প্রতীক্ষায় দিনগুলো কাটে তার, সেটা কেমন করে সে প্রকাশ করবে আনিসের কাছে? আনিস কিন্তু তবু প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

'এ অন্যায়। দারুণ অন্যায়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ মেয়েরা যতদিন না পাচ্ছে, কিছু হবে না এ দেশের। কি দারুণ অবিচার! সমস্ত যন্ত্রণা সমস্ত কষ্ট সইবে তারা — অথচ...'

আনিসের কথাগুলো স্বগতোক্তি মনে হয় গীতার কাছে। শেষের দিকে কী বলছিল আনিস গীতা ধরতে পারে না। অস্বস্তিবোধ করতে থাকে সে। আলোচনা পালটাতে চায় তাড়াতাড়ি।

'মিনু এখন কোথায়, আনিস ভাই?'

'ও তো লিবিয়াতে। মঞ্জু আপার কথা মনে আছে? ওরা আছে নিউ ইয়র্কে। দুজনেই ডাক্তারি করে প্রচুর পয়সা কামাচ্ছে। হাসি আপারা কাপ্তাইয়ে। দুলাভাই পড়াচ্ছেন টেকনিক্যাল স্কুলটাতে। ওরাও শিগগিরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌদি আরবে চলে যাবে।'

'আপনি বিদেশে গেলেন না?'

'না, কোথায় আর গেলাম!'

'যেতে চান?'

'এক সময় চাইতাম। এখন আর সময় নেই।'

অতঃপর আনিস হঠাৎ করে পেছন ফিরে চলতে শুরু করে। 'চল, তোকে একটা জিনিস দেখাব।'

আনিস যেখানে নিয়ে গেল গীতাকে সেটা তার জন্যে নির্ধারিত দু'দিনের বাসস্থান। স্কুল থেকে খুব দূরে নয়। স্যুটকেস থেকে সবার ছবি বের করে দেখায় আনিস গীতাকে। ইস! মঞ্জু আপা কী মোটাই না হয়েছে। ছেলেটি কিন্তু ভারি মিষ্টি।

'কী নাম ওর?'

'রেমন্ড। শুধু নামেই নয়! বাংলা বলতে পারে না এক বর্ণ। এ জন্যে মা-বাবার খুব যে একটা দুঃখ আছে মনে হয় না।'

মিনু গীতারই বয়সী। ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর ঝকঝকে লাল গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে। হঠাৎ গীতা প্রশ্ন করে — 'আপনি বিয়ে করেননি আনিস ভাই?'

'না, সময় পেলাম কোথায়?'

তাইতো। বিয়ে করার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সময় দরকার বৈকি! তবে তা পায় বুঝি একমাত্র ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীরাই। গীতা তো কিছু ভাবারও সময় পায়নি। জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় গীতা। মোটা মোটা লোহার শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে চোখ মেলে ধরে। রোদ পড়ে আসছে। শীত শীত হাওয়া। মনে হচ্ছে দূরে ক্ষেত থেকে কে যেন কাকে ডাকছে চিৎকার করে। আসলে এমন মাঝে মাঝেই মনে হয় গীতার। বোধহয় শূন্য মাঠের বাতাসের শব্দ — বোধহয় অন্য কিছু। কেমন যেন একটা হাহাকার চারদিকে। হাওয়াতে সর্বক্ষয়ী শূন্যতা। গীতা তো জানত এ কেবল হয় বসন্তেই। সেই ফাল্গুন মাসের কথা কেমন করে ভুলবে সে? মা বলে নিয়তি। কিন্তু গীতা গিয়েছিল শুধুমাত্র দীপালির চুল বেঁধে দেওয়ার জন্যই। দীপালিকে দেখতে এসেছিল নারায়ণগঞ্জ থেকে। যেমন আসত মাঝে মাঝেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ফিরে যেত তারা। কেউ খবর দিত-কেউ দিত না। গীতা ভালো চুল বাঁধে বলে মেয়ের সম্বন্ধ এলে মায়েরা সব সময়ই গীতাকে ডাকত চুল বেঁধে দিতে। অথচ সেদিন কে জানত ছেলেপক্ষের একজনের চোখ পড়েছিল গীতার দিকে। দীপালিকে দেখতে এসেছিল যে-ছেলে, তার জন্যে নয় — তারই একজন বন্ধুর জন্যে। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে সম্বন্ধ পেতে বসেছিল সরাসরি সুনীলরা। গীতার মা-বাবা তখনো গীতার বিয়ে নিয়ে তেমন ভাবছিল না। ম্যাট্রিকটা অন্তত পাশ করবে — এ শুধু গীতা নয়, তার বাবাও চেয়েছিল। অথচ হঠাৎ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ওলটপালট হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী বোঝাল ভালো বংশের ছেলে, গেঞ্জির হোসিয়ারিতে ভালো মাইনের চাকরি, নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে থাকবে মেয়ে — এ কি যখন-তখন আসে? নিয়তি। কোথায় গেল সেই হোসিয়ারি? কোথায় টানবাজার? বিয়ের এক বছরের মাথায় স্ত্রীর হাত ধরে সুনীলকে ফিরে আসতে হয়েছিল তার পৈতৃক বাসভবন হলদিয়ায়। তখনো গীতা জানত না, সঙ্গে নিয়ে এসেছে রক্ত-মাংসের একটি প্রাণী — সন্টু যার নাম। এর পরের জীবন সবটাই তো একটানা কাগজের মতো সাদা। বিয়ের পর প্রথম দু'মাস হলদিয়াতেই কেটেছিল গীতার। তখন কিন্তু তার এমন নিঝুম মনে হয়নি জায়গাটিকে। মুন্সীগঞ্জ শহর হলেও প্রায় গ্রামেরই মতো। তাছাড়া তখন গীতার চোখে-মুখে সোনালি স্বপ্ন। সে জানত হলদিয়ায় বেশি দিন নেই সে। সুনীল তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। নির্দিষ্ট দিনে নৌকায় আর স্টিমারে চড়ে স্বামীর সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ এসেছিল গীতা। দোতলার সেই ছোট্ট বাসা। রেডিওতে দুপুরে অনুরোধের আসর শোনা। এত সংক্ষিপ্ত সবকিছু — এত দ্রুত সব ঘটে গিয়েছে যে ভাবতে গেলে স্বপ্নের মতো মনে হয় আজ।

তন্ময় হয়ে অতীতে ডুবে ছিল গীতা। হঠাৎ বাচ্চার কান্নার আওয়াজে পিছনে ফিরে তাকাল সে। আনিস ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। একটা ছোট্ট যন্ত্র নিয়ে কী করছিল আনিস। 'ওটা মিনুর মেয়ের কান্না। আয়, এদিকে আয় দেখি। একটা গান গা বা কিছু বল। মুন্সীগঞ্জে গেলে তোর মাকে শোনাব।'

লজ্জা পায় গীতা। এ যন্ত্রটার কথা সে শুনেছে। চোখে দেখেনি কখনো। অনেক জোরাজুরির পর ও খোকনের উদ্দেশে কিছু বলতে রাজি হলো। গরমের ছুটিতে খোকন যেন অতি অবশ্যই বেড়াতে আসে হলদিয়া। গীতা এবার অনেক আমসত্ত্ব দেবে। গতবার প্রচুর লিচু ধরেছিল এখানে। খোকন লিচু খেতে খুব ভালোবাসে। তাই যেন অবশ্য করে আসে সে। আনিস আবার গীতাকে বাজিয়ে শোনায় কী সে বলেছে। শুনে লজ্জা পায় গীতা। মুছে ফেলতে বলে সব। হেসে আনিস যন্ত্রটাকে এক পাশে সরিয়ে রাখে। তারপর মানিব্যাগ খুলে দুটো ছবি বের করে। প্রথম যে-ছবিটি গীতার হাতে দেয় তাকে কখনো দেখেছে বলে মনে হলো না গীতার। একটি মেয়ের ছবি। দেখতে সাদাসিধে।

'কে?'

আনিস রহস্যময় হাসে। 'একটি মেয়ে।'

বাকিটা গীতা বুঝে নেয়। 'কী নাম?'

'রেণু।'

'ঢাকার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। ছাপা শাড়ি পরনে। আরেকবার ভালো করে ছবিটা দেখে গীতা। মিষ্টি মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখেমুখে মেয়েটির। 'বেশ সুন্দর দেখতে।' ছবিটা আনিসের হাতে ফিরিয়ে দেয় গীতা। 'থাক। আর বাড়িয়ে বলতে হবে না। তবে সুন্দর না হলেও বিয়ে করলে ওকেই হয়তো করব।'

আনিস দ্বিতীয় ছবিটা দিয়ে জিজ্ঞেস করে — 'দেখ তো, একে চিনতে পারিস কিনা।'

এটাও একটি মেয়ের ছবি। বছর তের-চোদ্দের। ভীষণ মিষ্টি আদুরে চেহারা। দু'বেণী দু'দিকে ঝুলছে। খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে গীতার। চিনতে পারছে না। প্রশ্নময় দৃষ্টিতে আনিসের দিকে তাকাল, আনিস হেসে ফেলে।

'চিনতে পারলি না? লুসি।'

'লুসি!' অবাক হয়ে আবার ভালো করে ছবিটা দেখে। তাই তো। হাসি আপার বড় মেয়ে লুসি। সেই কতটুকু দেখেছি ওকে। কী আশ্চর্য, এত বড় হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে!

'ও খুব সুন্দর গান গায়। মাঝে মাঝে আসে টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে। ছোটবেলা থেকেই আমার খুব ন্যাওটা।'

'হাসি আপার ক'টা ছেলেমেয়ে?'

'দুটো — তবে ছেলেমেয়ে নয়। দুটোই মেয়ে। ছোটটাকে বোধহয় দেখিসনি। রুনি। দশ বছর বয়স।'

'মঞ্জু আপার?'

'একটা ছেলে-একটা মেয়ে।'

'আর মিনুর?'

'একটি মেয়ে।'

AMARBOI.COM

গীতা চুপ করে থাকে! গীতার বুকে তোলপাড়। বছর চারেক আগে বাবার চিঠিতে সহপাঠী দীপালির ম্যাট্রিক পাসের সংবাদে খুশিতে উত্তেজনায় কেঁদে ফেলেছিল গীতা। সুনীল সেদিন গীতার মুখ দেখে ভয় পেয়েছিল কোনো খারাপ সংবাদ এসেছে এই ভেবে। গীতার মনে হয়, ছবির মতো সাজানো এদের জীবন। যেভাবে যা চেয়েছে তাই ঘটেছে। গীতা শাড়ির আঁচল খুঁটছে। নড়েচড়ে ভালো করে বসল আরেকবার।

'আনিস ভাই।'

'বল।'

গীতা আনাচে কানাচে সবকিছু হাতড়ে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে পরের কথাগুলো কোনোমতে উচ্চারণ করল। 'আপনি আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন, আনিস ভাই।'

গীতা টের পাচ্ছিল ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। তবু সে কোনোমতে তার একান্ত অথচ প্রচণ্ড সমস্যার কথা খুলে বলল আনিসকে। ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে এসব সংশয় আর অনিশ্চয়তার দিন কাটাতে আর চায় না গীতা। সব শুনে আনিসকে চিন্তিত মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গীতা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আনিসের মুখের দিকে। দ্বিতীয়বার আবার তাকে দেবতার মতো মনে হয় ওর কাছে। 'নার্সের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করিসনি কেন?'

করেছিল গীতা। বিশেষ করে ওই ইনজেকশনটার কথা শুনে অব্দি খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল সে। বছরে মাত্র দু'বার সুঁই ফোটানো — অবিশ্বাস্য হলেও নাকি কার্যকর।

'বুঝেছি।' আনিসকে সবকিছু বলতে হয় না গীতার। 'অদ্ভুত একটা নিয়ম আছে এ ব্যাপারে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কিছু করা বারণ। অথচ এ নিয়ম ক্ষতি ছাড়া লাভ যে কিছু করছে মনে হয় না।'

আনিস পায়চারি থামিয়ে স্টোভ জ্বালায়। চায়ের সরঞ্জাম বের করে গীতাকে চা তৈরি করতে বলে দু'জনের জন্যে। 'আমি ততক্ষণে একটু ঘুরে আসি।'

আনিস বেরিয়ে গেলে গীতা আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। দুপুরের তাজা রোদটা এখন মিইয়ে এসেছে।

দূরে স্টিমারের ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোয়ালন্দের স্টিমার লৌহজং ছাড়ল বোধহয়। এ স্টিমারে করেই বাবা এসেছিল সন্টুকে প্রথমবারের মতো দেখতে। এ স্টিমারে চড়েই তার স্বপ্নরাজ্য নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিল গীতা ঘর বাঁধতে! সেখান থেকে ফিরেও এসেছিল একই স্টিমারে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জ এবং চাঁদপুর হয়ে লৌহজং আসার এ পথ যেন অন্তহীন। অন্তত তাই মনে হচ্ছিল সেদিন গীতার। অন্ধকার রাতে স্টিমারের রেলিং ধরে বাইরে দাঁড়িয়েছিল সে। চাঁদপুরের কাছাকাছি পরিপূর্ণ ভরা পদ্মা আর মেঘনার সংযোগ। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছিল। ফুলে ফুলে উঠছিল জল আর স্টিমারের গায়ে ধাক্কা লেগে একটানা গর্জন করে ভেঙে পড়ছিল। যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর জল। পদ্মার সেই বিশাল রূপ দেখে ভয় পেয়েছিল গীতা। পাবেই তো। ধলেশ্বরীর তীরের মানুষ গীতা। মুন্সীগঞ্জের চারপাশে নদী থাকলেও সে-সব নদীর এপারে দাঁড়ালে ওপারের মাটি দেখা যায়। শান্ত সমাহিত ধলেশ্বরী পার হতে গিয়ে কখনো গীতার মনে হয়নি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে। অথচ সেদিন পদ্মা পার হতে গিয়ে বারবার তার মনে হচ্ছিল কোথায় কোন অজানা নির্বাসনে সারা জীবনের জন্যে চলে যাচ্ছে সে, সেখান থেকে আর কোনো দিন লোকালয়ে ফেরা যাবে না। অথচ হলদিয়া তো অপরিচিত ছিল না তার।

গীতা চা তৈরি করার আগেই আনিস ফিরে এলো। হাতে বাদামি রঙের একটা কাগজের প্যাকেট। 'এটা নিয়ে যা। ভালো করে সবকিছু পড়ে দেখবি। আমরা আবার মাস তিনেক পরে ফিরে আসছি। তখন ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে। তোর বরকেও বুঝিয়ে বলিস — পড়তে দিস। লেখাপড়া করা মানুষ। নিশ্চয়ই অবুঝ হবে না। আর একান্তই যদি হয়, তখন না হয় তোর জন্যেই নিজের হাতে নিয়ম ভাঙব আমি, কি বলিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনিস হেসে প্যাকেটটা গীতার হাতে তুলে দেয়। গীতার মুখে কোনো কথা নেই। চুপচাপ চায়ের কাপে চামচ দিয়ে চিনি মেশাচ্ছে গীতা।

আনিস খাটের কোণে বসেছিল। চা দিতে গিয়ে ভালো করে আনিসের মুখের দিকে তাকাল গীতা। আনিস ভাই আগের চাইতেও আরো যেন সুন্দর হয়েছে দেখতে আজকাল। ওজন বেড়েছে বলেই হয়তো মুখটা অত লম্বা মনে হয় না আর। চুলগুলো কিন্তু আগের মতোই বড় বড়, এলোমেলো। সেই পরিচিত মিষ্টি গন্ধ।

'কি রে? কিছু বলবি?' চায়ে চুমুক দেয় আনিস।

'জানেন আনিস ভাই, আমার কিন্তু আর ঢাকা দেখা হয়নি কখনো। এত কাছে নারায়ণগঞ্জে ছিলাম। তবু যাওয়া হয়নি।'

'সে কি!' আনিস অবাক হয়। তারপর হেসে বলে, 'ঠিক আছে, আমার বিয়ের সময় তুই ঢাকা যাবি। তোকেই প্রথম দাওয়াত করব। তুই না গেলে বিয়েই হবে না আমার, ঠিক আছে?'

গীতা মাথা ঝাঁকায়। ঘর থেকে বেরোবার আগে দরজার সামনে গীতার কয়েকটা ছবি নেয় আনিস তার ছোট্ট ক্যামেরা দিয়ে। ঘোমটা ছাড়াও একটা নেয় গীতার মা-বাবাকে পাঠাবে বলে। বেলা পড়ে এসেছে। যথেষ্ট আলো ছিল না। হয়তো ভালো হবে না। ছবিগুলো হলে গীতাকে পাঠাবে।

চা শেষ করে রাস্তায় যখন নামল ওরা, সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই তখন। ডুবে যাওয়া সূর্যের কিছুটা লাল আলো তখনো পশ্চিমের আকাশে। কিন্তু দ্রুত তা হারিয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। গীতার মনে পড়ে ছোটবেলা চৈত্র-বৈশাখ মাসে কালবোশেখির শেষে সন্ধ্যায় আকাশটাকে এমনি শান্ত মনে হতো তার। গাছের ডাল — ঘরের ছাউনি উড়ে এসে পড়ছে যত্রতত্র। এরই মাঝে সব ভুলে খানিকক্ষণের জন্যে আম কুড়োবার বাতিক। সিঁদুরে আম, কাঁচামিঠে, ভুতুড়ে, লেংড়া, ফজলি কত কি...।

একটা অবিমিশ্র আনন্দে মনটা ভরে আছে গীতার। তাই মাথা উঁচু করে পরিষ্কার সুনীল আকাশটাকে একবার দেখে নিল সে। একটু একটু শীত করছে। শাড়িটা ভালোমতো গায়ে জড়িয়ে নিল গীতা। এ রাস্তা দিয়ে কোনো দিন এর আগে হেঁটেছে মনে পড়ে না তার।

তবু সবকিছু কেমন পরিচিত মনে হচ্ছে। মনে পড়ছে সে-ই কবেকার কথা। ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে স্কুল থেকে ঘরে ফিরছে গীতা। মা বসে আছে অপেক্ষা করে খাবার সাজিয়ে। ঘরে ফেরার সেই উদ্দাম আনন্দ। সরষে ফুলের উজ্জ্বল সোনালি সৌন্দর্য রাস্তার দু'পাশে। তারই তাজা এবং কড়া গন্ধ বাতাসে। আরেকটু গেলে একটা ছোট্ট বাজারের কাছে এসে পড়ে ওরা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দোকানের সামনে ঝুলছে হারিকেন। যাওয়ার সময় এ রাস্তা দিয়ে যায়নি তো গীতা।

'পথ ভুল করেননি তো, আনিস ভাই?'

'না, এটা একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা, তোর তো বেজায় দেরি হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর শাশুড়ি বা বর রাগ করবে না তো?'

'না।' গীতা জানে কথাটা সত্য নয়। এ সন্ধ্যারাতে ঘরের বউ বাইরে থাকবে এটা অচিন্তনীয় এ বাড়িতে। কিন্তু আজ সবকিছুই অন্য রকম। গীতা তাই ও নিয়ে ভাবছে না একেবারেই।

বাজারটা বাঁয়ে ফেলে ছোট্ট একটা রাস্তা নিয়ে ওরা এগোয়। গীতা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। নির্ভীক সৈনিকের মতো ছন্দ তুলে হাঁটছে গীতা। মনে পড়ে ছোটবেলা স্কুল থেকে কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকশন নিয়ে মেছোবাজারের পথ দিয়ে ঘরে ফেরার সময় এমনি অনুভূতি হতো। ভনভন মাছি, খোলা নালা, পচা মাছের গন্ধ। কিন্তু কোনো কিছুতেই ভয় নেই আর। আমার গায়ে এখন তাজা ওষুধ। আমার আর কলেরা হবে না। আঃ! কী শান্তি! কী নিশ্চিন্ত এ অনুভূতি।

বাড়ির ঠিক সামনে এসে আনিস দাঁড়ায়, এক মুহূর্ত। বেলি ফুল ফুটেছে কোথাও কাছাকাছি। মিষ্টি পরিচিত হালকা গন্ধ চারদিকে।

'চলি তাহলে আজ। তুই এগুলো ভালো করে পড়ে দেখ। তাড়াহুড়ো করিসনে। আর এই আমার ঠিকানা রইল। প্রয়োজন হলে, কোনো প্রশ্ন থাকলে, জানাস। আমরা তো শিগগিরই আবার আসছি।'

আনিস আর দেরি করে না। গীতার পিঠে আলতো হাত রেখে পিছন ফিরে চলতে শুরু করে।

গীতার মনে পড়ে এমনি এক সন্ধ্যায় ঠাকুরদা মারা গিয়েছিল। পাড়ার ছেলেরা হরিনাম করতে করতে নিয়ে যাচ্ছিল ঠাকুরদার মৃতদেহ। এমনি করে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল ঠাকুরদা সারা জীবনের জন্যে। মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধ ঠাকুরদার জন্যে মনটা ডুকরে কেঁদে উঠল গীতার। আনিসের সাদা শার্ট অন্ধকারে ঢেকে গেলে গীতা ধীরে ধীরে বাড়িতে ঢোকে।

উঠানে পা দিতে-না-দিতেই শাশুড়ির চিৎকার কানে আসে।

'এ না হলে আর শহুরে মেয়ে হলো কী করে? সাহস বলে সাহস! কী শক্ত বুকের পাটা, বাছা তোমার!' তুলসীতলায় প্রদীপ ও ধুপচি হাতে সুনীলের মা ফেটে পড়ছেন রাগে।

সন্টু কাঁদছে সন্ধ্যার কোলে। ফিসফিস করে সন্ধ্যা জানাল, বাছুর ছুটে গিয়ে গরুর দুধ খেয়ে নিয়েছে। শাশুড়ির প্রচণ্ড রণমূর্তির সবটাই যে সন্ধ্যারাতে একা ঘরে ফেরার জন্যে নয়, বুঝতে পারল গীতা। কটা বাজে এখন? ছটা-সাতটা? কী আসে যায়? সন্ধ্যা আরো জানাল, সুনীল দোকান থেকে ফিরে আবার বেরিয়েছে গীতার খোঁজে স্কুলঘরে। সেখান থেকে হয়তো দুধ কিনতে যাবে বাজারে।

গীতা জানে শাশুড়ির বাক্যবাণই শেষ নয় আজকের ঘটনার। সুনীল ফিরবে শিগগিরই। সুনীলের সেই থমথমে মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে গীতা। কিন্তু কী আশ্চর্য! এ জন্যে এক ফোঁটাও ভয় বা দুশ্চিন্তা হচ্ছে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার। ঘরে ঢুকে বাদামি কাগজের প্যাকেটটাকে পুরনো কাপড়ের থলিতে লুকিয়ে ফেলে গীতা। তারপর হারিকেন হাতে পুকুরঘাটে গিয়ে ভালোমতো হাত-মুখ ধুয়ে আসে। ফিরতে ফিরতে হঠাৎ কী মনে হতে ঘরের পেছনের বেড়াতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ছবিতে দেখা মেয়েটির মতো মুখভঙ্গি করার চেষ্টা করে একবার। তারপর নিজের মনেই হেসে ঘরে ঢুকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে সন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় গীতা। সুনীলের মা এখনো বকবক করছেন ঠাকুরঘর থেকে। গীতার কানে আজ ঢুকছে না কিছুই। সম্রাজ্ঞীর মতো ধীর পদক্ষেপে রান্নাঘরের শিকল খুলে চুলোর পাশে এসে দাঁড়ায় সে। চুলো জ্বালাতে হবে। অথচ দিয়াশলাইটা যে কোথায় রেখেছে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

দিয়াশলাই খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকারে গুনগুন করে গান গাইছে গীতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিহীন, বন্ধনহীন, ব্যতিক্রমী প্রেম

ভালোবাসার রসায়ন

বুক ধড়ফড়। গলা শুকনো। চোখে বাষ্প। হাতের তালু ভেজা-ভেজা। উষ্ণ ও দ্রুত নিশ্বাসপ্রশ্বাস। শরীরে উত্তাপ। আসন্ন প্রিয়সান্নিধ্যের সম্ভাবনায় উত্তেজিত, উল্লসিত, আলোকিত হৃদয়। যেন বিশাল সমুদ্র আছড়ে পড়ছে পাড়ে অথবা প্রচণ্ড তেজে ঘটছে ক্রমাগত জলপ্রপাতের পতন। যে মানুষ কখনো গান গায় না, সে হঠাৎ গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে অমৃতা প্রীতমের গল্পের অঙ্গুরীর মতো। যে লোক কখনো কবিতা পড়ে না, তার কণ্ঠে বিশেষ বিশেষ পঙ্‌ক্তির আবৃত্তি অথবা আড়ালে দু-চার লাইন কবিতা লেখা। উন্মনা চিত্ত। ফাঁকা দৃষ্টি। মনের ভেতর অস্থির দোলা। এলোমেলো পায়চারি। সাক্ষাতে জাদুর উন্মাদনা, স্মরণে শিহরণ, বিচ্ছেদে কাতর। সহস্র মানুষের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে সারাক্ষণ শুধু একটি মুখের হাতছানি — প্রত্যাশা। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা ছাড়িয়ে শুধু একজনের চিন্তায় আচ্ছন্ন ও উন্মুখ মন। অন্তরে অনুক্ষণ যার আনাগোনা, তারই পরিচিত পদশব্দের আশায় সর্বদা উদগ্রীব কর্ণযুগল। রাতে অনিদ্রা, নিরন্তন দিবাস্বপ্ন। কোনো কাজে বা চিন্তায় মনোনিবেশ প্রায় অসম্ভব। পত্র লেখা, পত্র ছেঁড়া, পত্র পাঠ এবং তার পুনরাবৃত্তি।

সামগ্রিকভাবে ওপরের এই লক্ষণগুলো কীসের ইঙ্গিত? আর কিছু নয়। একটি মানুষ আরেকজনের প্রেমে পড়েছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে-আকর্ষণ একটি নারী ও একটি পুরুষকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছে, সেই মহাশক্তি প্রেমের কাছে বাঁধা পড়েছে নরনারী।

প্রেম ও তার স্বরূপ নিয়ে বরাবরই মেতে আছে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নাটক ও চলচ্চিত্র। আমাদের সবারই ধারণা প্রেমের রকম, ধরন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতা সম্পর্কে অথবা ভালোবাসার মহিমা, ব্যাপকত্ব ও তীব্রতার ব্যাপারে শিল্পী-সাহিত্যিকরা যে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিয়ে এসেছেন তার বাইরে আর কিছু থাকতে পারে না। তাঁরাই প্রেম সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, তাঁরাই এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কবিতা/গান, লোকসংগীতের কথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু কিংবা সমরেশ বসুর উপন্যাস, অথবা সুবোধ ঘোষ বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প পড়ে প্রেমের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সম্পর্কে যতই আমরা সচেতন হই না কেন, তবু প্রেমকে বরাবরই মনে হয় কেমন যেন বায়বীয়, অপার্থিব-অবর্ণনীয়। দৈনন্দিন ধরাছোঁয়ার বাস্তব জিনিসের মতো তাকে যেন বোঝা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু যদি বলা যায় প্রেমের চিরন্তন সব লক্ষণ ও প্রকাশের পেছনেই রয়েছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত কতকগুলো কারণ যেগুলির প্রধান ভিত্তি সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, তা হলে হয়তো কেউ কেউ চমকে উঠবেন।

ফ্রয়েড বা রিচ যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, আমরা পুরোপুরি সেদিকে যাব না। ফ্রয়েড মানুষের প্রায় সব কর্ম ও চিন্তার মধ্যেই যৌন অনুষঙ্গ আবিষ্কার করলেও এর পেছনের আরো মৌলিক কারণগুলো ও আণবিক পর্যায়ে এর জৈবিক ভিত্তিটি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেননি, কেননা তাঁর বিষয় ছিল মনোবিজ্ঞান। আমরা যদি আরো গভীরে যাই, মানুষের শরীরের মৌলিক রসায়ন ও জীবকোষ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করি, তা হলে দেখতে পাব, যে দুটি মানব-সম্পর্ক পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি জোরালো এবং মানববন্ধনের ভিত্তি, সেই নারী-পুরুষ সম্পর্ক এবং সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্কও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্যে অপরিহার্য। আর এই দুটি সম্পর্কই নিয়ন্ত্রিত হয় শরীরের কতগুলো হরমোন এবং ওই জাতীয় পদার্থের ওঠানামার মাধ্যমে। হরমোনের তারতম্য ও মস্তিষ্কে তার প্রভাব শুধু এ দুটি সম্পর্ক নয়, অন্যান্য সম্পর্কও — যেমন বৃহত্তর পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সহকর্মী বা প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক, এমনকি সাধারণ মানবসম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। সামাজিক বন্ধন মানেই বাছাই ও ছাঁটাই করার মাধ্যমে কাউকে কাউকে কাছে টানা এবং সুখে-দুঃখে তাদের সঙ্গে নিজেকে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িয়ে ফেলা। আর এই জড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা বা অনুভূতিটি মস্তিষ্কের বিশেষ স্থানের সচলতা, অচলতা অথবা হরমোনের তারতম্যের জন্যে ঘটে থাকে। এর ভিত্তি সবটাই পরিবেশগত বা অর্জিত নয়।

নরনারীর প্রেম

নরনারীর প্রেমের তিনটি ধাপ বা পর্যায় আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই তিন রকমের প্রেম মস্তিষ্ককে তিন রকম রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিচালিত করে : (১) প্রেমের প্রথম ধাপ হলো যৌন তাড়না ও যৌন আকাঙ্ক্ষা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যায়ের প্রেম সাধারণত পুরুষদের মধ্যে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরন ও মেয়েদের মধ্যে মেয়েলি হরমোন এস্ট্রোজেন দিয়ে প্রভাবিত।

যৌন তাড়না থেকে যে-প্রেমের জন্ম, তা সবসময় খুব যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রচণ্ড জৈবিক আকর্ষণ থেকে উৎসারিত। ফলে সঠিক ও মানানসই সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় না ঘটলেও এই পর্যায়ের প্রেমে অনেক সময় সহজলভ্য কোনো একজনের সঙ্গে অন্ধ হয়ে ঘর বাঁধতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তরুণ-তরুণীরা। এর ফলে পরবর্তীকালে অনেক বিয়েরই বিবাহ-বিচ্ছেদে সমাপ্তি ঘটে। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রেম হলো রোমান্টিক বা প্যাশোনেট প্রেম, যা দুটি বিশেষ নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের জন্ম দেয়। এই পর্যায়ের প্রেমের পাত্রপাত্রী পরস্পরকে কাছে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রিয় ব্যক্তিটি কাছে থাকলে উচ্ছল আনন্দঘন হয় জীবন। বিরহে তীব্র যন্ত্রণা। মনমেজাজ, মতিগতির প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে এ সময়। ব্যবহার হয় কিছুটা উলটাপালটা, অবোধ্য। জীবন হয়ে পড়ে পুরোপুরি একমুখী ও আচ্ছন্নতাময়। এই পর্যায়ের প্রেম নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষ ও নারী দুয়ের ক্ষেত্রেই ডোপামিন ও নরএপিনেফ্রিনের আধিক্য ও সেরোটনিনের অভাবজনিত কারণে। (৩) তৃতীয় পর্যায়ের প্রেমে যুগলবন্ধন ঘটে এবং তা পারস্পরিক গভীর টান ও মানসিক নির্ভরতার জন্ম দেয়। এই পর্যায়ের প্রেমে প্রথমে চরম উত্তেজনা কিন্তু শেষে মন স্থির ও শান্ত হয়ে আসে। যখন স্থায়ী ও গভীর আস্থা ও নির্ভরশীলতার জন্ম হয় তখন এই পর্যায়ের প্রেম অক্সিটোসিন ও ভেসোপ্রেসিন নামক হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়া বেটা এন্ডরফিন বলে একরকম পদার্থও নির্গত হয়, যা মানুষকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে এবং একরকম ভালো লাগার জন্ম দেয়।

অক্সিটোসিন হরমোন মানববন্ধন ও ভালোবাসার সবচেয়ে জরুরি ও মৌলিক হরমোন বলে বিবেচিত। জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে নরনারী যখন যৌন মিলনে শীর্ষসুখ উপভোগ করে, তখন দুজনের শরীরেই প্রচুর পরিমাণে অক্সিটোসিন নির্গত হয়। এই অক্সিটোসিন তখন এই যুগলবন্ধনকে আরো মজবুত করে। আসলে হরমোনরা কখনো এককভাবে বা স্বাধীনভাবে কাজ করে না। একে অন্যের সহায়ক শক্তি বা শত্রুর মতো কাজ করে। অক্সিটোসিন যদিও পুরুষ-নারী দুজনের শরীরেই প্রবাহিত হয়, নারীর শরীরে অক্সিটোসিনের প্রভাব অনেক বেশি, কেননা নারী-হরমোন এস্ট্রোজেনের সঙ্গে সম্মিলিত অক্সিটোসিন অনেক বেশি কার্যকর। পুরুষ-হরমোন টেস্টোস্টেরনের সঙ্গেও অক্সিটোসিনের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু এস্ট্রোজেনের মতো তা শক্তিশালী নয়। অক্সিটোসিন শরীরে এস্ট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন নির্গত করতে সাহায্য করে যা মানুষকে যৌনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, ফলে দেখা যায় — যৌন চাহিদা ও মানববন্ধন একে অন্যকে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছে। এস্ট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন যৌন চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। পরিণতিতে নরনারীর যে যৌন মিলন ঘটে, তাতে সৃষ্টি হয় অক্সিটোসিন যা তাদের বন্ধনকে দৃঢ় করে এবং আরো এস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন তৈরি করতে সাহায্য করে।

অক্সিটোসিন কিন্তু শুধু যৌন মিলনের সময়েই নির্গত হয় না। সাধারণ আদরের স্পর্শেও অক্সিটোসিনের মাত্রা বেড়ে যায় শরীরে। আর যেহেতু এস্ট্রোজেন দিয়ে বিশেষভাবে প্রভাবিহ অক্সিটোসিন, স্পর্শের শিহরণ নারীরা যতটা অনুভব করে, পুরুষরা ততটা করে না। শুধু তা-ই নয়, সারা দিনের কোনো এক সময়েও নারীশরীরে পুরুষরা যদি সাধারণভাবে বা আদরের সঙ্গে কিছুটা স্পর্শ বুলিয়ে যায়, তা নারীশরীরে যথেষ্ট পরিমাণে এস্ট্রোজেন ও অক্সিটোসিন তৈরি করে — যা তাকে যৌনতায় চালিত করে এবং পরবর্তীকালে তা যৌন মিলনের সহায়ক হয়।

আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব এই ভালোবাসার জাদুকরী হরমোন অক্সিটোসিন যা এস্ট্রোজেনের সঙ্গে মিলে যৌনাকাঙ্ক্ষা ও যৌনসুখ তৈরি করে, প্রলেক্টিনের সঙ্গে মিশে এই একই হরমোন মাতৃত্ববোধের জন্ম দেয় ও যৌনকাঙ্ক্ষা দমন করে। অক্সিটোসিনের আরেকটা কাজ হলো — মনে রাখার ক্ষমতা ও ব্যথার বোধ কমিয়ে দেওয়া, যার ফলে সঙ্গীর সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করলেও অথবা সন্তানজন্মের পর শারীরিক ব্যথা থাকলেও নারী তা সহজে ভুলে যেতে পারে।

যদিও প্রেমের তিনটি সুস্পষ্ট ধাপ রয়েছে, তবু এমন দেখা গেছে যে, একজন মানুষ একই সঙ্গে তিন রকম প্রেমেই আসক্ত। একজনের সঙ্গে হয়তো তার দীর্ঘদিনের মানসিক নির্ভরতা ও গভীর টানের সম্পর্ক, যার সঙ্গে হয়তো জাগতিক বহু বিষয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। একই সঙ্গে আরেকজনের সঙ্গে হয়তো রয়েছে রোমান্টিক প্রেমের সম্পর্ক। আবার সম্পূর্ণ আরেকজনের সঙ্গে আছে শুধুমাত্র যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটাবার সম্পর্ক। আবার কখনো-কখনো, বিশেষত মেয়েদের বেলায়, যৌনাকাঙ্ক্ষা বা যৌনতাড়না পর্যায়ের প্রেমের আগেই হয়তো আবির্ভূত হয় রোমান্টিক প্রেম এবং পরে রোমান্টিক প্রেমের পথ ধরেই জন্মায় যৌন আকর্ষণ। অথবা কখনো-কখনো এই দুই পর্যায়ের প্রেম সমান্তরালভাবে একই সঙ্গে একই ব্যক্তির জন্যে নিবেদিত হয়। বিশেষ করে আমাদের মতো অবদমিত, রক্ষণশীল ও সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থায় যৌন আকর্ষণ ও যৌন অনুভূতি প্রায়শই সুপ্ত থাকে বলে এর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা অনেক সময় অসচেতন থাকি অথবা স্বীকার করতে নারাজ হই। ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন প্রাথমিকভাবে প্রথম পর্যায়ের প্রেমের, অর্থাৎ যৌন তাড়নার কোনো স্থানই নেই যেন এখানে, দ্বিতীয়টিও ছিল না এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত। তৃতীয়টিরই জয়গান গাওয়া হয় সর্বত্র। তবে, সমাজস্বীকৃত নয় বলেই সর্বজনীন এই বোধ আকাঙ্ক্ষা বা আকর্ষণ যে পুরোপুরি কখনো আমাদের ভিতরে অনুপস্থিত ছিল তা বলা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ

অক্সিটোসিন যা 'ভালোবাসার হরমোন' বলে খ্যাত, তা বাৎসল্যবোধেরও জন্ম দেয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীর শরীর এস্ট্রোজেনের প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে অক্সিটোসিন নির্গত হয়। শুধু তাই নয়। এস্ট্রোজেন মস্তিষ্ককে অক্সিটোসিন গ্রহণ করার জন্যেও প্রবলভাবে তৈরি করে। সন্তানজন্মের অব্যবহিত আগে পেটে ব্যথা (জরায়ুর সংকোচন) যখন শুরু হয়, পিটুইটারি থেকে প্রচুর পরিমাণে তখন অক্সিটোসিন বেরোতে থাকে। বাচ্চা যখন জন্মনালি দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করে, তখনো অক্সিটোসিন নির্গত হয়। মায়ের সঙ্গে সন্তানের বন্ধন রচনায় ও যোগাযোগে অক্সিটোসিন সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সেতু হিসেবে কাজ করে। শিশু নিজেও অক্সিটোসিন তৈরি করে; এ ছাড়া বেশ কিছুটা পায় মায়ের কাছ থেকেও। দুজন দুজনের শরীরের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের মধ্যে বন্ধন বাড়ে। সন্তানকে মা যখন তার বুকের দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করে, তখন অক্সিটোসিনের প্রভাবে প্রলেক্টিন হরমোন নির্গত হয়, যা শিশুকে দুগ্ধ পরিবেশনে সাহায্য করে। প্রলেক্টিন শুধু দুধ দান করেই ক্ষান্ত হয় না, মায়ের শরীরে এস্ট্রোজেনের মাত্রাও কমিয়ে দেয়।

মা ও শিশুর এই বন্ধনে বাবাও বাদ যায় না অথবা নির্বিকার থাকে না। তার শরীরেও ভেসোপ্রেসিন বলে একরকম হরমোন নির্গত হয়, যা পিতৃসুলভ স্নেহ ও ভালোবাসার জন্যে দায়ী। ভেসোপ্রেসিন পুরুষকে কোমলতা দান করে এবং তাকে মমতাশীল করে তোলে। জীবনসঙ্গিনী ও সন্তানের মঙ্গলবাসনায় সিক্ত হয়ে ওঠে তার মন। এই হরমোন তার সন্তান ও গর্ভধারিণীকে রক্ষা করা ও তাদের নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য জোগাড় করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে এই হরমোনই পুরুষ জন্তুটিকে অন্যান্য জন্তু থেকে ও তার সঙ্গিনী ও তার গর্ভজাত সন্তানকে রক্ষা করার সাহস ও শক্তি জোগায়। এ ছাড়া ইদানীংকালে এক বিজ্ঞান-গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব বাবা গর্ভবতী মায়ের পাশে থাকেন এবং তার খোঁজখবর নেন, তাদের শরীরে সঙ্গিনীর গর্ভকালীন সময়ের শেষভাগে এবং সন্তানজন্মের অব্যবহিত পরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কিছুটা কমে যায়, যা তার যৌনাকাঙ্ক্ষাকে দমন করে এবং সন্তানের তথা মানবপ্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় সাহায্য করে।

কানাডার কিংস্টনে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, হবু পিতাদের শরীরে শুধু টেস্টোস্টেরন কমে না, অস্থিরচিত্ত ও দুর্ভাবনার হরমোন কর্টিসলের পরিমাণও কমে যায়। সেইসঙ্গে বাড়ে এস্ট্রোজেনের পরিমাণ যা তাকে আরো স্নেহময় ও সহনশীল করে তোলে। বলা বাহুল্য, টেস্টোস্টেরন ও এস্ট্রোজেন যথাক্রমে পুরুষ ও নারী-হরমোন বলে পরিচিত হলেও পুরুষের শরীরেও সাধারণভাবে খানিকটা এস্ট্রোজেন থাকে এবং নারীর শরীরেও কিছুটা টেস্টোস্টেরন থাকে এবং স্বল্পমাত্রায় হলেও এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অক্সিটোসিন যে বাৎসল্যবোধের জন্যে দায়ী, বিজ্ঞানীরা তা ইঁদুরের ওপর বিভিন্নরকম গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন। তাঁরা কুমারী মেয়ে-ইঁদুরের শরীরে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দিয়ে দেখেছেন যে অক্সিটোসিনের প্রভাবে মা না হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ করে ইঁদুরগুলো মাতৃসুলভ আচরণ শুরু করে দেয়। অর্থাৎ খড়কুটো দিয়ে তারা সন্তানের জন্যে ঘর বানাতে শুরু করে। এ ছাড়া কাছাকাছি শিশু-ইঁদুর দেখলে তারা তার গা চেটে দিয়ে আদর করে এবং দুধ খাওয়াতে চায়। অন্যদিকে ওষুধ দিয়ে অক্সিটোসিনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিতে পারলে ইঁদুরের বাৎসল্যবোধ, হোক-না সে নতুন মা, রোধ করা সম্ভব।

জীববিজ্ঞানী ও বিবর্তনবাদীদের মতে মানবিক বা সামাজিক যে বন্ধন, বিশেষ করে মায়ের যে অন্ধ টান ও আবেগ, তা মানবপ্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং ব্যক্তিমানুষের জিনসকে অমরত্ব দানের আকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্বুদ্ধ। নরনারীর যৌন তাগিদ ও প্রেম থেকে উৎপত্তি হয় মানবশিশু। তার প্রতি মায়ের প্রচণ্ড টান, মমত্ববোধ, দুগ্ধদান, আদর ও শুশ্রূষা থেকে মানবশিশু আস্তে আস্তে সবল হয়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে একজন সাবালক হিসেবে যে আবার প্রজননের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলে। শিশুর জন্মের পর পিতার শরীরে যেমন টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ সাময়িকভাবে কমে যায়, মায়ের শরীরেও প্রলেক্টিনের প্রভাবে এস্ট্রোজেনের মাত্রাও বেশ খানিকটা কমে যায়। ফলে নতুন মা-বাবার শরীরে যৌনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে কিছুকালের জন্যে। এই সাময়িক যৌনবিমুখতা পরোক্ষভাবে সন্তানের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার উদ্দেশ্যেই ঘটে থাকে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই সময়ের যৌন আকাঙ্ক্ষাহীনতা বাবাকে তাদের জীবনসঙ্গীর চাইতে সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে সাহায্য করে। শুধু তা-ই নয়, যৌনসম্পর্কের ঘাটতি বা অনুপস্থিতি পরবর্তী সন্তান আগমনের সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দিয়ে এই নবজাত শিশুটির বেঁচে থাকার জন্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া প্রলেক্টিনের প্রভাবে সন্তানকে দুগ্ধদানের ফলে মায়ের মাসিক সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। অর্থাৎ বেশ কয়েক মাস তার ওভুলেশন (ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্বাণুর নির্গমন) হয় না। তার ফলে যৌন মিলন ঘটলেও মায়ের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ থাকে। এসবই ঘটে শিশু সন্তানটির বেঁচে থাকার ও সুস্থ থাকার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে।

প্রেম কী, কেন ও কেমন?

প্রশ্ন করা যেতেই পারে — প্রেম বা ভালোবাসার আসল প্রয়োজনটা কী জীবনে বা জগতে। সবটাই কি যৌন তাড়না? প্রেম এবং মানববন্ধন প্রজননে সাহায্য করে, বাৎসল্যবোধে উদ্বেল করে, মানুষকে দুশ্চিন্তা ও হতাশামুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, জীবনে নিশ্চয়তা দেয়, অস্থিরতা কমায়, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়, শরীর ও মনকে উল্লসিত ও উৎফুল্ল রাখে এবং সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ মনের অধিকারী করে মানুষকে। ফলে দেখা যাচ্ছে ভালোবাসা শুধু যৌন সুখ ও সন্তানই দেয় না, মানুষের একাকিত্ব ঘোচায়, সঙ্গ দেয়, তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় বাড়ায় ও তাকে দীর্ঘজীবী হতে সাহায্য করে। জীবনে যত প্রতিষ্ঠা বা সুনামই অর্জন করুক না কেন মানুষ, প্রেমহীন ও বন্ধনহীন জীবনে সে নিজেকে অবহেলিত বোধ করে, অনুক্ষণ জীবনকে অর্থহীন মনে হয় তার। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া বা প্রেমার্জনে ব্যর্থ হওয়া, সাবালক নারীপুরুষের বিষণ্নতাজনিত মানসিক ব্যাধির সবচেয়ে বড় কারণ। আমেরিকাতে যত নারী খুন হয়, তার ৫০%-৭০% খুন হয় নিজ স্বামী বা প্রেমিকের হাতে প্রেমবিষয়ক সংকটে। প্রেমের জৈবিক ভিত্তির সপক্ষে ইদানীংকালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল নিচে দেওয়া হলো :

১. বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, প্রেমে পড়লে মস্তিষ্কের যে সব স্থান উদ্দীপিত হয়, সচল হয়, কোনো বিশেষ দ্রব্য দিয়ে নেশা করলেও ঠিক সেই অঞ্চলগুলোই সচল হয়। ফলে প্রেম ও নেশা জৈবিকভাবে প্রায়ই একরকম। নেশা করলে মানুষ যেমন বাস্তবতা ভুলে যায়, ভালো-মন্দ বাছ-বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং এক অবোধ্য অবর্ণনীয় ভালো লাগা আর উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে মন, প্রেমে পড়লেও ঠিক তাই ঘটে। এ ছাড়া প্রেমের ধারা ও লক্ষণের সঙ্গে কয়েকটি মানসিক রোগ, যেমন ম্যানিক ডিপ্রেশন ও স্কিজোফ্রেনিয়া রোগেরও যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রেমে পড়া এবং এই মানসিক বৈকল্য উভয় ক্ষেত্রেই সেরোটনিনের মাত্রা কমে যায় শরীরে। স্বভাবতই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি ড্রাগের নেশা বা মানসিক রোগের মতো প্রেমে পড়ার লক্ষণগুলোকেও চিকিৎসা করে সারিয়ে ফেলা যায়? যখন কোনো কিশোর বা কিশোরী গভীর প্রেমে মত্ত হয়ে পৃথিবী ভুলে গিয়ে সব কাজ, পড়াশুনা ছেড়ে বিশেষ একজনের ধ্যানধারণায় সম্পূর্ণ উতলা হয়ে নিজেকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তখন কি ডাক্তার বা পিতামাতা তার প্রেমের চিকিৎসা করাতে পারেন? ল্যাবরেটরি পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো কোনো রসায়ন পদার্থের নির্গমন বন্ধ করে অথবা তাদের কার্যাবলি প্রতিরোধ করে কিংবা অন্য কোনো পদার্থের সংযোজন করে প্রেমের অনুষঙ্গ এবং তার তীব্র লক্ষণগুলোকে দমন করা সম্ভব। কিন্তু সেটা করা কি সংগত? প্রেমের মতো স্বাভাবিক, সহজাত ও প্রয়োজনীয় একটি অনুভূতি বা তা প্রকাশের বাড়াবাড়ি ঠেকাতে কোনো মানুষ তার সন্তানকে এক বা একাধিক ওষুধের ওপর নির্ভরশীল করতে চাইবে? সেটা কি তার জন্যে মঙ্গল বয়ে আনবে?

২. কিছুদিন আগে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক, স্টোনিব্রুকের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, সঙ্গমের পর মেয়েরা যে খুব উচ্ছল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিখুশি থাকে তার পেছনেও সরাসরি হরমোনের প্রভাব রয়েছে। এই মিলনের আনন্দ বা সন্তুষ্টি শুধু আরেকজনের প্রেম ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করার জন্যেই হয় না, বীর্যের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোন ও অন্যান্য উদ্দীপক পদার্থ যে রয়েছে, তা মেয়েদের শরীরে শোষিত হয়ে তার রক্তপ্রবাহে সঞ্চালিত হয় বলেই মেয়েরা খুশিতে টগবগ করে। স্টোনিব্রুকের বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই তথ্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই বিজ্ঞান-গবেষণার ফল কোনোমতেই কনডমবিহীন যৌন সম্ভোগের পক্ষে রায় দিচ্ছে না। কনডম শুধু যে পরিবার পরিকল্পনায় সহায়ক তাই নয়, যৌনবাহিত বিভিন্ন রোগ, বিশেষ করে এইডস থেকেও রক্ষা করে।

৩. ড. বারটেল ও ড. জেকি নামক দুই বিজ্ঞানী কিছুদিন আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক গবেষণার ফল প্রকাশ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, নরনারীর প্রেম আর বাৎসল্যবোধ এই দুই রকমের ভালোবাসাই মস্তিষ্কের একই জায়গা থেকে উৎসারিত ও প্রায় একইভাবে নিয়ন্ত্রিত। মস্তিষ্কে এমআরআই পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, মানুষ যখন ভালোবাসায় হাবুডুবু খায় (সে ভালোবাসা নরনারীর প্রেমই হোক অথবা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বা অপত্যস্নেহই হোক) মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কতগুলো জায়গা তখন সচল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের কিছু কিছু অঞ্চল যেগুলো কোনো অপ্রিয় ব্যাপার বা অনুভূতি দ্বারা উদ্দীপিত হয়, সেগুলো অচল হয়ে পড়ে। ফলে ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হলে মানুষ শুধু প্রিয়জনের ভালো দিকটিই দেখে, তার মন্দ স্বভাব, অশোভন আচরণের প্রতি অন্ধ হয়ে যায়। শরীরের এন্ডরফিনের আধিক্যও এই ভালো লাগার বোধের তীব্রতা ও মন্দ দিকটির প্রতি ঔদাসীন্যের জন্যে দায়ী। পরবর্তীকালে এন্ডরফিনের পরিমাণ কমতে শুরু করলে প্রিয়জনের খারাপ দিকগুলো চোখে পড়তে শুরু করে।

বিজ্ঞানীরা এটাও দেখতে পেয়েছেন — মস্তিষ্কের যে-সব স্থান সচল হলে মানুষ বিবেচক ও যুক্তিবাদী হয়, সমালোচনা করার ক্ষমতা অর্জন করে, ভালোবাসায় মত্ত হলে মস্তিষ্কের যেসব অঞ্চল অকেজো ও অচল হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রেমে পড়লে বা বাৎসল্যবোধে আপ্লুত হলে মানুষ তার প্রিয়জনের কোনো দোষত্রুটি চোখে দেখে না, মনে ধারণ করে না — সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্ধ হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের যে সব স্থান প্রচণ্ড প্রেম বা বাৎসল্যবোধে সচল হয়ে ওঠে, দেখা গিয়েছে সেই একই স্থানগুলো সচল হয় যখন আমরা কোনো প্রিয় খাদ্য গ্রহণ করি, যখন বড় একটি আর্থিক বা অন্য কোনো পার্থিব প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে, যখন কোনো উত্তেজনাকর ড্রাগ বা অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করি। নরনারীর প্রেম আর বাৎসল্যবোধ মস্তিষ্কের একই জায়গা থেকে উৎসারিত হলেও দুটি ব্যাপারে এদের ভেতর কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১) মস্তিষ্কের ভেতর মটরদানার মতো একটা ছোট্ট জায়গা রয়েছে যাকে বলে হাইপোথেলামাস। নরনারীর প্রেমে হাইপোথেলামাস সচল হয় এবং তা এস্ট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন নির্গত করতে এবং শরীরকে যৌন উদ্দীপিত করতে সাহায্য করে। সন্তানের জন্যে যে মমত্ব বা বাৎসল্যবোধ, তাতে হাইপোথেলামাস সচল হয় না। (২) মস্তিষ্কের যে অঞ্চল মানুষের মুখমণ্ডল চিনতে ও তার পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে, সেটা বাৎসল্যবোধে খুব সচল হয়ে পড়ে, নরনারীর প্রেমে ততটা হয় না। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যেহেতু শিশুর চেহারা দ্রুত পাল্টায় পিতামাতার মস্তিষ্কের এ অঞ্চলটির সচলতাই স্বাভাবিক। প্রাপ্তবয়স্ক প্রেমিক-প্রেমিকার চেহারা যেহেতু পরিবর্তনশীল নয়, মস্তিষ্কের এই বিশেষ অঞ্চলটি নরনারীর প্রেমে তেমন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে না।

৪. কয়েক বছর আগে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে রাডগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফিশার একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র পাঠ করেন। তিনি চল্লিশজন তরুণ-তরুণী যারা গভীরভাবে প্রেমে পড়েছে তাদের সামনে একবার তাদের প্রেমাস্পদের এবং পরবর্তীকালে তাদের পরিচিত সাধারণ একজনের ছবি উপস্থাপনার পর উভয়বারই তাদের মস্তিষ্কের পরিবর্তনগুলো এমআরআই পরীক্ষা করে নির্ণয় করেন। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন, মস্তিষ্কের যে-যে অংশ প্রেমের পাত্র বা পাত্রীর ছবি দেখে উদ্দীপিত হয়েছে, সেই একই স্থানগুলো উদ্দীপ্ত হয় জীবনের বড় কিছু পাওয়ার আগ্রহে অথবা বিশালভাবে পুরস্কৃত হওয়ার পর। সাধারণ পরিচিতের ছবি দেখে এ স্থানগুলো সচল হয় না। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ড. ফিশার বলেন, প্রেম সে-অর্থে অনুভূতি নয়, এটা একটা তাড়না, অভিলাষ, প্রত্যাশা। গভীর ও অতি প্রয়োজনীয় এই প্রাপ্তির ইচ্ছা, আগ্রহ ও অভিপ্রায় থেকেই আস্তে আস্তে অনুভূতির জন্ম হয়। প্রেম মানুষের চূড়ান্ত প্রাপ্তি — চরমভাবে পুরস্কৃত হওয়ার অভিজ্ঞতা।

৫. ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মারাজিতি কিছুদিন আগে একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, গভীরভাবে প্রেমে পড়লে পুরুষ ও নারীর সহজাত স্বভাব ও প্রবৃত্তির মৌলিক কিছু ওলটপালট ঘটে। পুরুষ হয়ে যায় কিছুটা নারীর মতো, নারী হয়ে যায় কিছুটা পুরুষের মতো। প্রেমে পড়লে পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন কিছুটা কমে যায় এবং সেই সঙ্গে এস্ট্রোজেনের পরিমাণ খানিকটা বাড়ে। অন্যদিকে নারীর শরীরে টোস্টোস্টেরনের পরিমাণ বেড়ে যায় প্রেমে পড়লে — যা তার যৌন উত্তেজনা ও যৌন পরিতৃপ্তির সহায়ক। প্রেমে পড়লে শরীরে টোস্টোস্টেরন খানিকটা কমে যাওয়ায় এবং এস্ট্রোজেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় পুরুষ তার চিরাচরিত আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসী ভূমিকা ছেড়ে কিছুটা শান্ত সমাহিত, ধৈর্যশীল ও মমতাময় হয়ে ওঠে। জোর করে দখল করার মনোভাব পাল্টে সে সঙ্গিনীর কথা ভাবতে শেখে। আর নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— যে চিরকাল শান্তশিষ্ট, ধৈর্যশীল, যে যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে বা তা মেটাবার বেলায় বরাবরই লজ্জাশীল ও আনতনয়ন, সে প্রেমে পড়লে টেস্টোস্টেরনের প্রভাবে হঠাৎ বেপরোয়া ও সাহসী হয়ে ওঠে। নিজের ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে ও তা মেটাবার জন্যে সচল ও অগ্রণী হয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। ফলে প্রেম ও আনুষঙ্গিক হরমোনের ওঠানামা পুরুষ ও নারীকে পরিবেশগতভাবে পরস্পরের কাছে টেনে আনে যা তাদের যুগলবন্ধনের উৎস ও পরিবর্ধক হয়।

যুগলবন্ধনের ভিত্তি

বিজ্ঞানীরা যুগ যুগ ধরে নরনারীর বা পুরুষ এবং স্ত্রীজাতীয় জন্তু-জানোয়ারের যুগলবন্দির রহস্য ও ভিত্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা জানতে চেয়েছেন একগামিতা বা বহুগামিতা কি প্রাণীজগতের সাধারণ একটা প্রবণতা? এটা কি জিনস (genes) দিয়ে নির্ধারিত? নাকি পরিবেশ বা সামাজিকভাবে অর্জিত অন্য অনেক কিছুর মতো এটিও একটি পরিশীলিত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য? সমস্ত জীবজগতে মাত্র ৩% প্রাণী একগামী। অর্থাৎ শতকরা তিন ধরনের প্রাণীর মধ্যে একটি পুরুষ আরেকটি স্ত্রী প্রাণীর সঙ্গে জুটি বেঁধে সন্তানের জন্ম দেয়, তা প্রতিপালন করে ও একসঙ্গে সারা জীবন বসবাস করে। অন্য সব প্রাণীই বহুগামী।

বিজ্ঞানীরা এতদিনে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছেন যে, একগামিতা শুধুমাত্র বিরল নয়, একধরনের অস্বাভাবিক আচরণও বটে। এটা যতটা না প্রাকৃতিক, তার চেয়েও বেশি পরিবেশগত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্য। তবু এর পেছনে জেনেটিক বা বংশগত প্রভাবও রয়ে গেছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাঁরা অবিকল যমজ সন্তানদের জীবনপ্রবাহ বহু বছর ধরে অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যমজদের একজন বহুগামী হলে অন্যজনেরও হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। বিজ্ঞানীরা এটাও দেখেছেন যে, যে-ধরনের প্রাণীদের মধ্যে একগামিতা লক্ষ করা যায়, তারাও সুযোগ পেলে এদিকে-ওদিকে মনোনিবেশ বা শারীরিক সম্পর্ক করে ফেলে মাঝে মাঝে। তারপর আবার গুটি গুটি পায়ে নিজের ঘরে, নিজের স্থায়ী সঙ্গীর কাছে ফিরে আসে। একগামী বলে পরিচিত নীল পাখি ও মানুষ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমেরিকায় বসবাসরত দম্পতিদের সন্তানের জন্মদাতা পিতার সত্যিকার পরিচয় যাচাই করার চেষ্টা করলে দেখা যেত, অন্তত ১০% পরিবারেই পিতা বলে পরিচিত ব্যক্তিটি আসলে জৈবিক পিতা নন। তা সত্ত্বেও একগামিতাকে কেন্দ্র করে মনুষ্য প্রজাতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে মত্ত হয়ে আছে। শুধু ধর্মগ্রন্থই একে দাবি করে না, সমাজের বিভিন্ন নিয়মাবলিও তা চাপিয়ে দেয়। স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ততার অভাব বা অন্যজনে আসক্তি সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সংসারে নানান জটিলতাই শুধু নিয়ে আসে না, এ কারণে আজ পর্যন্ত বহু রাজরাজত্ব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে — অনেক রাজনৈতিক নেতানেত্রী রাতারাতি তাঁদের আসন ও জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন।

একগামিতার বিচ্যুতি যত মুখরোচক গালগল্প ও মজাদার আলাপের সৃষ্টি করে মানুষের অন্য কোনো আচরণের ঘাটতি বা গলদ হলে তা করে না। তা সত্ত্বেও কম মানুষই আছে শুধু মানুষ কেন, জীবজগতের খুব কম প্রাণিই আছে যারা সারাজীবন একগামী থাকাকে মনে-প্রাণে-দেহে জরুরি বলে মনে করে বা তা মেনে চলে। বিজ্ঞানীরা তাই একমত যে, প্রাণিকুলে একগামিতার প্রবণতা বা চর্চা স্বাভাবিক কোনো প্রক্রিয়া বা নিয়ম নয়। এটা ব্যতিক্রম। একগামিতার সংজ্ঞাও তাই পাল্টে গিয়েছে। এখন একগামিতার সংজ্ঞা বহুমাত্রিক। কেবল একজন যৌনসঙ্গী থাকাই একগামিতার বৈশিষ্ট্য নয়। একসঙ্গে জীবনযাপন, একসঙ্গে সন্তানের লালন-পালন, একই ঘরসংসার সামলানো এবং একত্রে সামাজিক ওঠাবসা করাও একগামিতা। জীবজগতে বহুদিন ধরেই যৌন একগামিতা ও সামাজিক একগামিতা, এ দুভাবে একগামিতাকে ভাগ করা হয়েছে। নীল পাখির ডিম বা ছানা তার শুক্রাণুর ফসল নয় জানলে সঙ্গে সঙ্গে সে তা ছুড়ে ফেলে দিত নিচে। সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে সেটা খুব সুখবর হতো না নিশ্চয়ই। জীবজগতের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখা গিয়েছে যে যখন সম্পদ ও খাদ্য অপ্রতুল ও নিয়ন্ত্রিত, পরিবেশ বিরূপ কিংবা সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের আকার বা অবস্থা এতটাই ছোট, অসহায় অথবা অরক্ষিত যে পিতামাতা দুজনের যৌথ চেষ্টা ও যত্ন ছাড়া সন্তানের প্রতিপালন ও খাদ্য জোগাড় করা সম্ভব নয়, তখনই প্রাণীরা জোড়ায় জোড়ায় জুটি বাঁধে — অর্থাৎ একগামী হয়। পাখিরা যেহেতু ডিম পাড়ে, ডিমকে তাদের তা দিতে হয় এবং বসবাস ও সন্তান প্রতিপালনের জন্যে তাদের বাসা বানাতে হয়, আবার খাদ্যও জোগাড় করতে হয়, সেহেতু পাখিদের মধ্যে জানোয়ারদের তুলনায় একগামী হওয়ার যা যুগলবন্দি ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় এক বিশেষ রকমের ইঁদুর আছে যারা আমৃত্যু জুটি বাঁধে। এদের জীবন এতই সংগ্রামময়, খাদ্যসংকট এতটাই প্রকট ও শীতকালে এত বেশি ঠাণ্ডা যে মা বা বাবার পক্ষে একা সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়। প্রেইরি ভোল বলে অন্য এক ইঁদুর জাতীয় জন্তুর কথা অবশ্য আলাদা। এরা একবার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে আপাতত কোনো কারণ ছাড়াই সারা জীবন পরস্পরের সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে জীবনযাপন করে, শত প্রলোভনেও অন্যের দিকে ফিরে তাকায় না। এই জুটি বাঁধা সম্পূর্ণ জেনেটিক — জৈবিক। কেননা প্রকৃতিগত প্রেইরি ভোলের খুব কাছাকাছি জন্তু মোন্টানা ভোলের শতকরা ৯৯% জিনস অবিকল প্রেইরি ভোলের মতো। মাত্র ১% জিনসের পার্থক্যের জন্যে প্রেইরি ভোল পুরোপুরি একগামী ও মোন্টানা ভোল পরিপূর্ণভাবে বহুগামী। মানুষের ওপরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, সদ্যপ্রসূত মানব-শিশুর ওজন মায়ের তুলনায় এত কম যে খুব কম জীবজন্তুর মধ্যেই তা দেখা যায়। যখন থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলার বদলে দুপায়ে ভর করে আনুলম্বিক হাঁটতে শুরু করল মানুষ, তখন থেকেই মানুষের জরায়ুর আয়তন ছোট হয়ে গেল — যার ফলস্বরূপ তুলনামূলকভাবে ছোট মানবশিশুর জন্ম। শুধু আনুপাতিক অল্প ওজনের জন্যেই নয়, অন্যান্য বহু ব্যাপারেই জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণীর তুলনায় মানবশিশু অনেক অসহায় ও অন্যের মুখাপেক্ষী। গরু, ছাগল, কুকুর আর বাঘের বাচ্চারা জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেখানে উঠে দাঁড়ায়, হাঁটতে পারে, নিজের খাবার নিজে গ্রহণ করতে পারে, সেখানে মানবশিশুর তা করতে লেগে যায় বেশ কয়েক বছর। এই কারণেই সন্তানের পরিচর্যার জন্যে মানব-পিতামাতার জুটি বাঁধা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

ভালোবাসার একই ভাষা

আকর্ষণ, ভালোবাসা ও মানববন্ধনের যে জৈবিক ভিত্তি রয়েছে, তার বড় প্রমাণ হলো দেশ-কাল, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষার মান, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ প্রেমে পড়ে। প্রেমের অনুষঙ্গ সর্বজনীন : প্রেমে পড়লে সবাই একইরকম ব্যবহার করে থাকে, একই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। পুরুষ প্রধানত আকৃষ্ট হয় স্ত্রী জাতির দুটি বৈশিষ্ট্যে। প্রতিটি পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত নারী হবে সুন্দরী ও যৌবনবতী। প্রতিটি সমাজে সর্বকালে পুরুষের কাছে নারীর শরীরের বাঁক, তার নিতম্ব ও বক্ষের আনুপাতিক মাপ তার প্রতি আকর্ষণের কেন্দ্র। আর নারীর কাছে সে-ই সবচেয়ে প্রার্থিত পুরুষ যে শারীরিকভাবে শক্তসমর্থ ও পার্থিবভাবে সংসারের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ও যোগ্য। প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষার এই যে বিভাজন, এটা সবটাই অর্জিত বা পরিবেশগত নয়। এর পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে।

বিবর্তনবাদীদের মতে, যেহেতু পুরুষের শরীরে কোটি কোটি শুক্রাণু রয়েছে এবং এর উৎপাদন সীমিত নয়, তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা বা শখ সে তার জিনস যতখানি সম্ভব ছড়িয়ে দেবে বিভিন্ন জায়গায় যাতে তার প্রজন্ম ও উত্তরাধিকার বজায় থাকে প্রবলভাবে। এর ফলে পুরুষের যৌনতা সর্বকালেই সর্বত্রই খোঁজে একাধিক নারীসঙ্গ। অন্যদিকে মেয়েরা মাসে কেবল একটি করে ডিম্বকোষ তৈরি করে। তাও আবার পরিণত বয়সের বিশেষ একটা পর্যায়েই ঘটে কেবল, যার দৈর্ঘ্য তিন থেকে চার দশকের বেশি নয়। শুধু অপ্রতুল ও মূল্যবান ডিম্বকোষ তৈরি করেই ক্ষান্ত হয় না নারীর শরীর। একবার এ ডিম্বকোষের সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন ঘটলে যে মানবশিশুর জন্ম হবে, নারীর শরীর জানে সেই সন্তানকে জন্ম দিতে, দুগ্ধদান করতে ও লালনপালন করতে তার অনেক বছর লেগে যাবে। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী তার সঙ্গী নির্বাচনে বড়ই সতর্ক ও সচেতন। যে-সঙ্গী তার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে, যে-সঙ্গী শারীরিকভাবে সক্ষম, পার্থিবভাবে দায়িত্বশীল, নারীরা সাধারণত সেদিকেই ঝোঁকে। যত্রতত্র মন বা শরীর খোয়াতে নারীর তাই আগ্রহ কম, অপরপক্ষের শত প্ররোচনা সত্ত্বেও। ভালোবাসা ও যৌন অনুভূতির জৈবিক ভিত্তি আরো একটি ব্যাপারেও স্পষ্ট হয়। মাসিক চক্রের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ওভুলেশনের কাছাকাছি বা ঠিক পরবর্তী সময়ে যখন মেয়েরা গর্ভধারণে সবচেয়ে বেশি সক্ষম, তখন শরীরে অতিরিক্ত এস্ট্রোজেনের প্রভাবে নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে তীব্র হয়। এ থেকেও প্রমাণিত হয় প্রেম ও যৌনমিলনের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় প্রজনন এবং ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টিকে এগিয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

যৌনসঙ্গী বা সন্তানের পিতা নিবার্চনে বিশ্বের নারীকুল যতই সংযম ও বাছবিছার করুক না কেন, বৃহত্তর জীবজগতে কিন্তু স্ত্রীজাতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি বড় একটি দেখা যায় না। এমনকি একগামিতার উদাহরণ যে নীল পাখি, তাদের মধ্যেও স্ত্রী-পাখিকে দেখা যায় কখনো কখনো সুযোগ সুবিধামতো অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে অংশগ্রহণ করতে। প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, সঙ্গী পুরুষ নীল পাখিটির অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষ-পাখিরা মেয়ে-পাখিটিকে ধর্ষণ করছে। পরে তাঁরা লক্ষ করেছেন, যদিও স্ত্রী নীল পাখি ইচ্ছে করলেই বীর্য উপড়ে ফেলতে পারে, তবু তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই শরীরে পরপুরুষের বীর্য ধারণ করে সন্তান উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা — নারী নীল পাখি এটা করে তার প্রজাতির বৈচিত্র্য বাড়াতে — তার কুলের অস্তিত্ব রক্ষার্থে। একই রকম জিনসের সন্তান জন্মালে কোনো প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত মহাদুর্যোগে সম্পূর্ণ প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বৈচিত্র্যময় প্রজাতি হলে সেটা ঘটবে না। ফলে নারী-প্রাণীর সব সময় আকাঙ্ক্ষা থাকে বৈচিত্র্যময় প্রজাতি সৃষ্টির — পুরুষ প্রাণীর যেমন ইচ্ছা থাকে যত বেশি সম্ভব তার নিজস্ব সন্তান তৈরি করার।

মানব প্রজাতির নারীর মধ্যে বহুগামিতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভাবও যে কতটা প্রাকৃতিক, কতটা ধর্ম, সমাজ ও পরিবারের মূল্যবোধ ও আচরণবিধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, তা বলা মুশকিল। নরনারীর প্রেমের মতোই সন্তানের প্রতি মা-বাবার স্নেহ ও মমতাও সর্বকালীন। প্যান্ট-শার্ট পরা মা-ই হোক, আর শাড়ি-সালোয়ার কামিজ কি গাছের বাকল বা পাতা পরা মা-ই হোক, সন্তানের প্রতি বাৎসল্যবোধ ও জীবন দিয়ে তাকে আগলে রাখার বাসনা সর্বত্রই সমান। সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক বিভাজন, রাজনৈতিক আদর্শ, ধর্মীয় বিধান কিছুই এই অপত্যস্নেহ, জোরালো মানববন্ধনকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে না। এই বন্ধনের শক্তি ও মমতার প্রকাশ সর্বত্রই প্রায় একইরকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃহত্তর মানবিক সম্পর্ক

শুধু নরনারীর সম্পর্ক বা বাৎসল্যবোধই নয়, শরীরের ভেতরের হরমোনগুলো বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক, সহকর্মী বা প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক, বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে পারিবারিক সদস্যদের সম্পর্ক এবং আরো ব্যাপক অর্থে সামগ্রিক মানবিক সম্পর্ক ও বন্ধনেরও ভিত্তি। স্পর্শে — যা মানব-সম্পর্কের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ — অক্সিটোসিন নির্গত করে শরীরে। বন্ধুর গায়ে বন্ধুসুলভ স্পর্শও অক্সিটোসিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। শরীরে হরমোনের বিভিন্ন মাত্রার উপস্থিতি এবং নানারকম হরমোনের সংশ্লিষ্টতা ও পারস্পরিক যোগাযোগ মানব সম্পর্কের ভিত্তি। যেমন ধরা যাক, এটা সর্বস্বীকৃত যে পুরুষে-পুরুষে বন্ধুত্ব ও মেয়েতে-মেয়েতে বন্ধুত্বের রকম ও প্রকাশ ভিন্ন। মেয়েলি হরমোনের প্রভাবে, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মেয়ে-মেয়ে বন্ধুরা বিপদে বা সমস্যায় পড়লে পরস্পরের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলে, একে অন্যের পরিচর্যা করে, সাহায্য প্রার্থনা করে ও সাহায্য বিতরণ করে। এই সময় তারা পরস্পরের অনেক কাছে চলে আসে। অন্যদিকে পুরুষ-পুরুষ বন্ধুত্ব এই ধরনের সমস্যাসংকুল সময়ে দুঃসময়ে নিজেদের আড়াল করতে দেখা যায়। পুরুষরা তখন নিজেদের গর্তে বা খোলসে ঢুকে যায়, পরস্পরের কাছে নিজেদের খুলে ধরার বদলে এই সব অনভিপ্রেত সময়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে ভালোবাসে।

www.amarboi.com

আমরা সবাই জানি, স্মৃতিশক্তি মানববন্ধনের একটা মস্ত বড় ভিত্তি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে আসে। বৃদ্ধ বয়সে ক্ষয়ে যাওয়া এই স্মৃতিক্ষমতার সঙ্গে শরীরের এস্ট্রোজেন বা টেস্টোস্টেরনের ঘাটতির সম্পর্ক রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

এ ছাড়া মানুষের মধ্যে দুটি পুরোপুরি বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা যায়। একদল যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করে যায় এবং আরেক দল যারা মানসিক রোগে আক্রান্ত (যেমন অটিজম, Autism) হওয়ায় কারণে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, কারো সঙ্গে মানসিক বন্ধন অনুভব করতে অপারগ। এই উভয় বোধেরই একটা জৈবিক ভিত্তি রয়েছে এবং হরমোনের প্রভাবে এর অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

অটিজমের অন্যতম কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, যেসব শিশু গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত টেস্টোস্টেরন হরমোনের সংস্পর্শে আসে, তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বেশি আশঙ্কা। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এখনো নিশ্চিত নন, শত শত অপেক্ষমাণ দর্শকের মধ্যে হঠাৎ কেন একজন অপরিচিত ব্যক্তি নিজের জীবনের সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য এক আগন্তুককে রক্ষা করার জন্যে! অন্যরা কেন ঝাঁপিয়ে পড়ে না? শরীর বা মনের ভেতর কি সেই বস্তু যা তাকে প্রণোদিত করে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মহৎ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে? এটা সবটাই কি অর্জিত গুণাবলি? নাকি তার শরীরের ভেতর হঠাৎ করে বেড়ে ওঠা মাত্রাতিরিক্ত কোনো হরমোনের প্রভাব? এ ছাড়া বহুগামিতা অথবা ব্যভিচারী হওয়ায় প্রবণতা, সমকামিতা মাত্রাতিরিক্ত যৌন তাড়না, সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্কের আত্মীয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন (incest), ধর্ষণ, যৌন ঈর্ষা ও সন্দেহপরায়ণতা, যৌনতাজনিত অন্যান্য অপরাধের সঙ্গেও হরমোনের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। অবশ্য এ সব কিছুরই কেবলমাত্র জৈবিক ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। পরিবেশ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সাধনা ও সুস্থ জীবনচর্চাও অনেক অন্তর্নিহিত জৈবিক প্রবণতাকে হ্রাস করতে বা উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

একইরকমভাবে, প্রাকৃতিকভাবে সন্তানের জনক-জননী না হওয়া সত্ত্বেও যে পালক-পিতামাতার মধ্যে সমপরিমাণ বাৎসল্যবোধের জন্ম হয়, সেটাও প্রমাণ করে — শুধু জরায়ুতে সন্তান গ্রহণ বা দুগ্ধদানই নয়, সন্তানের স্পর্শ ও তার প্রতি আগ্রহও সেইসব হরমোন সৃষ্টি করতে পারে যা মানুষকে বাৎসল্যবোধে সিক্ত করে। তাই ভালোবাসার জৈবিক ভিত্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, পারস্পরিক সাহচর্য ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে গভীর ও বহুমাত্রিক মানব-সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার পেছনে দেহজ ও পরিবেশগত হয়তো আরো অনেক কারণ রয়েছে যার সন্ধান আমরা এখনো পাইনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতৃতর্পণ

এখন বেলা প্রায় এগারটা। সোমবার ১১ জুলাই। মাধবী এইমাত্র স্নান সেরে ঘরে ঢুকল। ভেজা চুলে তোয়ালে জড়ানো। খালি পা। সাদা সায়ার ওপর ছাপানো বেগুনি শাড়ি অগোছালোভাবে কোনোমতে প্যাঁচানো। দেখলেই বোঝা যায় এক্ষুনি পোশাক পাল্টাবে। প্রতি বছরের মতো আলমারি খুলে লালপেড়ে গরদের শাড়ি আর লাল সিল্কের ব্লাউজটা বের করে রাখল খাটে। তারপর ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে আঁচড়াতে থাকে হালকা বাদামি লম্বা চুল।

কিছুক্ষণ আগে তার স্বামী চলে গেছে অফিসে। বাচ্চা দুটো স্কুলে গেছে তারও আগে। কাজের মেয়েটি বাজার থেকে এখনো ফেরেনি। এ সময় সারা বাড়িতে মাধবী ছাড়া আর কেউ নেই।

গরদের শাড়ি আর লাল ব্লাউজ পরা হয়ে গেছে ততক্ষণে। আলমারিটা এবার আবার খুলবে মাধবী। কাপড়জামার তলা থেকে বের করে আনবে ৫ ইঞ্চি X ৭ ইঞ্চি সাইজের বাঁধানো সেই ছবিটি। সাদা রংটা একটু বাদামি হয়ে গেছে ছবির। কালো রংটাও আগের মতো গাঢ় নেই। ছবিটির দিকে একমনে তাকিয়ে থাকে মাধবী। এই তার মা! কী ঝকঝকে হাসি! কী উজ্জ্বল চোখ! এমন মানুষ কখনো নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনতে পারে? মাধবীর চেয়েও বয়স কম এ তরুণীর। একে কেমন করে মা ভাবা যায়? তবে মা বলতে সারা জীবন ছবিতে দেখা এ মেয়েটিকেই জেনে এসেছে মাধবী। ছবিটা নাকি তোলা হয়েছিল মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই। সে জানে না কেন প্রতিবারই আজকের দিনটি একইভাবে উদ্‌যাপন করে সে। এ তরুণীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করে মাধবী। কিন্তু স্মৃতি ঘেঁটে ঘেঁটে সমস্ত অতীত ওলটপালট করেও, দু-একটা আবছা দৃশ্য ছাড়া কিছুই মনে পড়ে না। তবু একটু পরে ফুল ও সন্দেশ নিয়ে জগদ্ধাত্রী বাড়িতে যাবে সে। মা ওই দেবীর খুব ভক্ত ছিল, এ কথা অনেকবার শুনেছে মাধবী। প্রতি সপ্তাহেই নাকি একবার করে যেত সেখানে। মাধবী যায় বছরে এক দিন। ১১ জুলাই মায়ের মৃত্যুদিনে।

এমন একটা সময় ছিল যখন তার সঙ্গে আরো একজন যেত মন্দিরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরে ভক্তি তার ছিল না। তবু সে যেত মাধবীর সঙ্গে। পেতলের ঝকঝকে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মার কথা মনে করার চেষ্টা করত মাধবী। আর সেই সঙ্গে তার সেই সাথীটির জন্যেও মনপ্রাণ ঢেলে প্রার্থনা করত। একটু একটু করে যে নিদারুণ আর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে সে, যার ওপর তার কোনোই হাত নেই, তা যেন তোমার অলৌকিক ক্ষমতায় রোধ করা যায় ঠাকুর। আজ দীর্ঘ ন'বছর মাধবী একাই যায় মন্দিরে। কিন্তু তার সেই প্রার্থনা আজো শেষ হয়নি। ছবিটা আবার দ্বিতীয় তাকের কাপড়চোপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখে মাধবী। ফুল, বেলপাতা, চন্দন আর সন্দেশে সাজানো নৈবেদ্যের থালা আগে থেকেই সাজানো ছিল। ওটা তুলে নিয়ে গেটের বাইরে এসে এখন রিকশায় উঠবে মাধবী।

টুংটাং শব্দ করে, সামান্য উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে রিকশা এগিয়ে চলে মন্দিরের দিকে। পুজোর রেকাবিখানা হাঁটুর ওপরে দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে মাধবী।

কদিন আগে সুধা এসেছিল শহরে। শ্বশুরবাড়ি থেকে যখনই এখানে আসে, মাধবীর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করে যায়। এবার শঙ্করদাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এমনই ছিল সুধার ইচ্ছা। তবে শঙ্করদা যায়নি, শীঘ্রই নাকি যেতে হবে।

সরু গলিটা পার হয়ে রিকশা ততক্ষণে বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। মাধবী দেখে রাস্তার ধারে তের-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে ছোট্ট একটা টিনের কৌটা প্রবলভাবে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে 'ঝাল মুড়ি' 'ঝাল মুড়ি' বলে চিৎকার করছে। চৈত্রের অলস দুপুরে স্কুল-ফেরত একটি কিশোরীর ঝাল-মুড়ির প্রতি অতি আগ্রহের কথা মনে পড়ে যায় তার। রিকশার ঝাঁকুনি ভুলে মুহূর্তের জন্যে বালকের হাতের ওই টিনের কৌটোটিতে ঢুকে পড়ে সে। তার অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎকে খুব ভালো করে একবার ঝাঁকিয়ে নেয়। আর তারপর জগদ্ধাত্রী বাড়িতে যাওয়ার গলিতে ঢোকার আগেই আনমনা মাধবী হঠাৎ কী মনে করে রিকশাচালককে ডান দিকে যেতে ইশারা করে। একটা পুরনো দোতলা দালানের সামনে এসে থামে রিকশা। গাছের পাতা স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। বাড়ির সামনেটায় যায় না মাধবী। ডান পাশের সবুজ রঙের দরজায় গিয়ে আস্তে ধাক্কা দেয়। বড় পরিচিত এই বাড়ি। এই ঘর। এই দরজা। তবু বুকের ভেতর তোলপাড়। বিরাট বিরাট গাছ কীভাবে ছেয়ে ফেলেছে বাড়িটাকে। সব কিছুই কেমন অন্ধকার। এমন ছিল না আগে।

'কে?'

'আমি মাধু। দরজা খোল শঙ্করদা।'

ঘরের ভেতরটায় অন্ধকার আরো ঘন।

'মাধু!'

'হ্যাঁ, শঙ্করদা। শুনলাম তুমি চলে যাচ্ছ।'

'কাছে আয় মাধু। আমি আজকাল আর ভালো দেখতে পাই না। শুনতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাই কম। তোকে তো বলেছিলাম এমন একদিন আসবে। তখন আর একা থাকা সম্ভব হবে না। সে সময় বোধহয় এসে গেল মাধু।'

'আমি সব জানি শঙ্করদা। একবারটি তাই দেখতে এলাম তোমাকে।' মাধবী শঙ্করের সামনে এসে দাঁড়ায়। সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেয় শঙ্কর। সাদা পায়জামা, ঘিয়ে পাঞ্জাবি পরনে। চুলে-দাড়িতে দু'একটা সাদা রেখা। টেবিল থেকে চশমাটা হাতড়ে চোখে পরে নিয়ে মাধবীকে দেখার চেষ্টা করে শঙ্কর।

'তুই কি আগের মতোই সুন্দর আছিস মাধু? আমি তো চোখ-মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।'

'শঙ্করদা, তোমাদের পরিবারের কারো তো এই বয়সে এমন হয়নি। এত তাড়াতাড়ি কেন এমন হলো তোমার?'

শঙ্কর হাসে। মাথাটি এদিক থেকে ওদিকে নাড়ায় একবার।

'কেন হলো তা তো জানি না। কিন্তু এমন যে হবে সে তো জন্ম থেকেই জানি। বাবার হয়েছিল। কাকার হয়েছিল। ঠাকুরদাও এভাবেই ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। কার কখন হবে কেউ জানে না। কিন্তু হবে যে সেটা সবারই জানা। বংশের দোষ রক্তে রয়েছে। কী করব বল?'

'ওসব কথা থাক। আমি আজ অন্য কথা শুনতে এসেছি। আর তোমাকে দেখতে এসেছি প্রাণভরে শঙ্করদা।'

'কতকাল পরে তুই এলি বল তো। কত বছর তোকে দেখি না! আচ্ছা মাধু, তোর বর কেমন আছে? ছেলেমেয়েরা?'

'সব ভালো। ওদের কথা থাক। আজ তোমার কথা বল। সেই যে জলবসন্তে পুড়ে যাচ্ছিল তোমার গা। ওদিকে আমার বিয়ে হচ্ছে। সানাই বাজছে। তুমি আমাকে তোমার গানের খাতাটা দিয়ে দিলে। আচ্ছা শঙ্করদা, তুমি আর গান কর না?'

'মেসোমশাইরা চলে গেল। দীপু — তোর ছোট ভাইটা — দোতলায় তোদের ঘরে কতটুকু সময়ই-বা থাকত! সারাক্ষণ পড়ে থাকত আমার ঘরে। বড় ন্যাওটা ছিল আমার। ওকে আমি তবলা শেখাতাম। ওরা চলে যাবার পর বাড়িটা একেবারে খালি হয়ে গেছে। ওপরে নতুন যারা এসেছে, ভালো করে চিনিও না তাদের।'

'আমার মার কথা বল শঙ্করদা। তোমার তো মনে আছে মাকে। কী হয়েছিল মার?'

'তুই তো এসব কথা আগে কখনো জানতে চাস নি?'

'আজ চাই। তুমি চলে যাচ্ছ। আর কেউ তো একথা বলবে না আমাকে!' শঙ্কর বালিশের নিচে থেকে দেশলাই বের করে। টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়। আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরায়। বার কয়েক দীর্ঘ টান দেয়। অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া ছাড়ে ওপরের দিকে।

'সব কথা তো মনে নেই। একটু একটু মনে পড়ে। মা-বাবার কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেছি বাকিটা।'

শঙ্কর একটু থামে। মনে মনে স্মৃতিকে পরখ করে নেয় একবার।

'সে রাতেও তোর বাবা ঘরে ফিরতে অনেক রাত করেছিল। তোর মা তোর যদু কাকুর সঙ্গে বসে তাস খেলছিল সময় কাটাবার জন্যে। অনেক রাতে ফিরল তোর বাবা। তারপর। ওপরে খুব হৈচৈ। বকাবকি। হুলস্থূল করে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা রিকশা করে কোথায় চলে গেল তোর যদু কাকা। তোর মা পরদিন ঘুম থেকে আর উঠল না। আমার মা বলত বড় লক্ষ্মী-বড় পয়মন্ত মেয়ে ছিল তোর মা।'

মাধবী শঙ্করের কাছে সরে আসে। শঙ্করের কপালে তার হাতের তালু ঠেকায়। কাটা শশার মতো ঠাণ্ডা কপাল! অথচ সেদিন!

'উঃ! কী জ্বর ছিল সেদিন তোমার। বসন্তে সারা গা ভরা। যন্ত্রণায় ছটফট করছিলে তুমি। আমি কিছুই করতে পারিনি। তোমাকে ছেড়ে বরের ঘরে পালিয়েছিলাম। কী গরমই না পড়েছিল সেই দুপুরে। কী প্রচণ্ড রোদ! সব যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল!'

আজ গরম নেই। রোদ নেই। মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওরা দু'জন এখন খাটের ওপর উঠে এসে বসেছে। বালিশে হেলান দিয়ে একটা পুরনো অ্যালবামে ছবি দেখছে খুব মনোযোগ দিয়ে। মাঝে মাঝে শঙ্করকে ছবির বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে মাধবী। শঙ্করের একার চোখে প্রায় সব ছবিই ঝাপসা। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকায় মাধবী। বেলা প্রায় একটা।

AMARBOI.COM

'তোমার খাওয়া হয়েছে কিছু?'

'আমি খেয়েছি। তুই?'

'আমি আজ উপোস।'

মাধবী শাড়ির পাড় দিয়ে পায়ের আঙুলগুলো একবার ঢাকে, আরেকবার খোলে। খোলা চুলগুলো একটা আলগা খোঁপায় বেঁধে নেয়। হাতের নখগুলোর দিকে তাকায়। ওগুলো কাটলে হতো আজ। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের তিলটার ওপর হাত বোলায় কয়েকবার।

'তুমি এবার একটু শোও শঙ্করদা। বিশ্রাম কর কিছুক্ষণ। আমি বসছি।'

শঙ্করের কোনো আপত্তি আজ শুনবে না মাধবী। জোর করেই শঙ্করকে শুইয়ে দেয়। তারপর পাশে আধশোয়া অবস্থায় শঙ্করের চুলে বিলি কাটতে থাকে। আরামে চোখ বুজে আসে শঙ্করের। আস্তে আস্তে একসময় মাধবীও শঙ্করের পাশে শুয়ে পড়ে।

'আমার কনুইয়ের কাছে এ কাটা দাগটা কেমন করে হয়েছিল মনে পড়ে তোমার?'

'তা আর পড়বে না? জীবনে একবারই তো মেরেছিলাম তোকে। তবে সেদিন সত্যি সত্যিই যা রাগ ধরেছিল তোর ওপর। এত একগুঁয়ে তোকে আর কোনোদিন দেখিনি। মা এসে ছাড়িয়ে না দিলে নির্ঘাৎ মেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলতাম সেদিন।'

ওরা দু'জনেই হেসে ওঠে।

'শঙ্করদা, তোমার কি মনে হয় কেবল তোমার ওই পারিবারিক অসুখটার জন্যেই বাবা আমাদের বাধা দিয়েছিল?'

'তাই তো মনে হয় রে! মেসোমশাই যে স্নেহ করতেন আমাকে, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই।'

মাধবী হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শঙ্করকে। তার দাড়িতে, কপালে বারবার মুখ ঘষতে থাকে। শঙ্কর তাকিয়ে দেখে মাধবীকে। অনেক বড় হয়ে গেছে সে। বেশ ক'টা বছরই তো কেটে গেছে এর মধ্যে। মাধবী শঙ্করের ডান হাতটা টেনে এনে নিজের বুকের ওপর রাখে। সেই হাতের মধ্য দিয়ে শঙ্কর শুধু মাধবীর হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা নয় — আরো গভীরে তার রক্তের চলাচলের শব্দও স্পষ্ট টের পায়। শঙ্করের লোমশ বুকে আলতোভাবে আঙুল বোলাতে থাকে মাধবী। আর আস্তে আস্তে আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে শঙ্কর। নিভে যাওয়ার আগে, অন্ধকারে একেবারে হারিয়ে যাওয়ার আগে যেন সদ্যলব্ধ যৌবনের সমস্ত শক্তি আর উন্মাদনা নিয়ে জেগে ওঠে সে। তারপর খুব ভালো করে দেখে মাধবীকে। চোখ জুড়িয়ে আশা মিটিয়ে দেখে। দরদি শিল্পীর মতো খুব সাবধানে আর যত্নে হাত বোলাতে থাকে শঙ্কর মাধবীর সর্বাঙ্গে। চোখের দৃষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেই স্পর্শের অনুভূতি এত প্রগাঢ়? কে জানে? আর মাধবী। কুমারী মেয়ের মতো সারা গা কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। দেয়াল হাতড়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় মাধবী। মুহূর্তে ঘরটা অন্ধকারে ডুবে যায়। বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে। শঙ্করের বুকের খুব কাছে সরে আসে মাধবী। তারপর গভীর আশ্লেষে নিজের ভেতরে টেনে নেয় শঙ্করকে।

মাধবীর দিকে মুখ করে কাত হয়ে শুয়ে আছে শঙ্কর। চোখ দুটে বোজা। দু'হাতের তালুর ওপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মাধবী। দেয়ালঘড়িটা যথারীতি নির্লিপ্তভাবে টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে। বাইরে ভেজা আমগাছের ডালে বসে দুটো শালিক সেই কখন থেকে কিচিরমিচির করছে। সামনের রাস্তায় জল ছিটিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল শব্দ করে। বিছানার পাশে জানালার পর্দা বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে জবজবে। মাধবী তার আর্দ্রতা শুকোতে একখানা রুমাল বের করে। তারপর আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। শাড়িটা ঠিক করে পরে নেয়। দু'হাত দিয়ে টিপে টিপে চুলগুলো কিছুটা গোছগাছ করে।

বড় প্রশান্ত দেখাচ্ছে শঙ্করকে। ওর দীর্ঘ টানাটানা বোজা চোখ দুটো দেখলে কে বলবে ওই চোখের দৃষ্টি প্রায় অবলুপ্ত?

সামনের মাসেই ছোটবোনের বাসায় চলে যাবে শঙ্কর। আস্তে আস্তে চেনা পৃথিবীটা অচেনা হয়ে আসবে তার কাছে। এমন দিন যে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছে সবাই তা জানত। কেবল শঙ্করই তা মানতে পারছিল না।

মাধবী থালা থেকে ফুলগুলো নিয়ে খাটের পায়ের কাছে ছোট্ট তেপায়ার ওপর রাখে। সন্দেশের ঠোঙ্গা তুলে রাখে মাথার কাছের তাকে। নিচু হয়ে শঙ্করের বোজা চোখের পাতার ওপর আলগোছে চুমো খায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে তাকায় শঙ্কর। মাধবীর মুখ থেকে চোখ তার সরে না। শঙ্করের গায়ের চাদরটা আলগোছে ওর গলা পর্যন্ত টেনে দেয় মাধবী। তারপর আরেকবার ভালো করে দেখে নেয় মানুষটাকে। তার আজন্ম পরিচিত সেই মুখটাকে — যে মুখ তার নিজের মুখের মতোই পরিচিত, যা অনেক দিন দেখেনি সে — হয়তো আর কখনো দেখবে না। দরজা ভেজিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় মাধবী। যদু কাকু এখন কোথায় আছে কে জানে? বেঁচে আছে কি? প্রচণ্ড অভিমান আর অপমান নিয়ে এই বাড়ির সামনে থেকেই এক রাতে রিকশা করে হারিয়ে গিয়েছিল যদু কাকু। আর নিঃশব্দে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল তার মা। কিন্তু মাধবী হারবে না। মরবে না। শূন্য নৈবেদ্যের থালাখানা বাঁ হাতের তালুতে উঁচু করে ধরে সামনের দিকে এগোয় মাধবী। পূজারিণীর বেশে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে।

একটা খালি রিকশা আসছে না এদিকেই? হাত তুলে রিকশা ডাকে মাধবী। সে এবার ঘরে ফিরবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলসী ভরে না তবু

প্রতি বিকেলেই কলসী কাঁখে ওরা, পাশাপাশি দুই বাড়ির দুই বউ, চৌধুরীদের বাড়িতে যায় তাদের টিউবওয়েল থেকে এক কলসী করে খাবার জল তুলে আনার জন্যে। চৌধুরীরা যথেষ্ট ধনী। পাড়ার লোকজনকে একআধ কলসী কলের জল দিতে কার্পণ্য করে না তারা। যেতে আসতে প্রত্যেকদিনই তাদের পার হয়ে যেতে হয় সরকারদের বিশাল ভিটাখানি। সেটার অবস্থান বড় রাস্তাটি যেখানে কোমর বেঁকিয়ে আবার সোজা চলতে শুরু করে সেখানেই। বাসস্থান, কাচারীঘর ছাড়াও এক বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে সরকারদের। কাচারীঘরটি একবারে রাস্তা ঘেঁষে। মাসখানেক হলো, এই সময় প্রতিদিন কাচারীঘরের সামনে এক চিলতে বারান্দায় একটি বেতের চেয়ারে বসে থাকে এক যুবক। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। হালকা পাতলা গড়ন। সরু অথচ ঘন কালো গোঁফ। পরনে পায়জামা ও রঙিন পাঞ্জাবি। চোখে কালো ফ্রেমের ভারী কাচের চশমা। যখনই তাকে দেখে তারা, সে হয় বসে বসে বই পড়ছে, না হয় দু'পায়ের ওপরে একটি বাঁধানো খাতা রেখে কিছু লিখছে। অথবা চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে। কতদিন তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে দু'টি বউয়েরই। যখন তাকায় সে, কোনো ভণিতা না করে সোজা মুখের দিকে তাকায়। কখনো মৃদু হাসি দিয়ে, কখনো চোখ নামিয়ে এনে সম্ভাষণ জানিয়েছে তারা তাদের গাঁয়ের এই নতুন অতিথিটিকে — অপরিচিত যুবকটিকে। যদিও কখনো কথা হয়নি। সে কে, কোথা থেকে এসেছে, তাও জানে না বউরা।

এই দুই বউয়ের একজনের নাম ফুল, আরেকজনের ঝুমকো।

একদিন হলো কী, ভরা কলসী কাঁখে দুই বউ যথারীতি ঘরে ফিরছে সেই চেনা পথ দিয়ে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, একটি বিশাল সাদা গাভী কোথা থেকে ছুটে এলো তাদের দিকে। গরুটির গলায় তখনো ঝুলছে একটা লম্বা দড়ি-পাটের তৈরি — পাকানো। বুঝতে কষ্ট হয় না কারো, মালিক মাঠ থেকে খুঁটি খুলে ঘরে নেওয়ার সময়ে পালিয়েছে গাইটি। হঠাৎ একটু স্বাধীনতার স্বাদ পেতে সাধ হয়েছে হয়তো তার। গরুটির কাছে থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় ওরা দুই বউ ভরা কলসী কাঁখে রাস্তার সীমানা ঘেঁষে জায়গিরদারদের বাগানের বেড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রচুর জায়গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তায় প্রাণীটির চলাফেরা, যাতায়াতের জন্যে, যাতে ওদের কোনো ঝামেলা না করে নির্বিঘ্নে সে চলে যায় এখান থেকে। তবু কেন জানি, কোন মতলবে, সে এসে চড়াও হয় ফুলের ওপর। গরুটির চেপ্টা ও লম্বা মাথার ওপর ছোট ছোট দু'টি কালো শিং। সেই শিং দুটো নামিয়ে নিয়ে এসে সে ফুলের কাঁখের কলসীটাকে সমানে গুঁতোতে থাকে অযথা। যতক্ষণ সম্ভব ধরে রাখার চেষ্টার পরেও ভয়ে একসময় ফুলের কাঁখ থেকে কলসীটা পড়ে যায় মাটিতে। কাত করে পড়া পিতলের কলসীর জলে ভেসে যায় শুকনো রাস্তা। কী করবে বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঝুমকো, ফুলের সঙ্গে আসা অন্য বউটি। কিন্তু শুধু কলসী ফেলে দিয়েই ক্রোধ কমে না গরুটির। সে ফুলের দিকে ছুটে আসে সম্পূর্ণ মাথা উঁচিয়ে। উপায় না দেখে জোরে দৌড়াতে গিয়ে পথের ওপর উঁচু হয়ে থাকা এক টুকরো ইটে হোঁচট খেয়ে ধপাস করে নিজের বুকের ওপর উপুড় হয়ে সোজা পড়ে যায় ফুল। মুহূর্তের ভেতর কী ঘটে গেল ভালোভাবে বুঝে ওঠার আগেই ফুল টের পায়, দুটো শক্ত হাত তার দুই বাহু ধরে তাকে মাটি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ফুল দেখে তাকে। দেখে অবাক হয়। অপরিচিত মুখ নয় এটি। অথচ তাকে পরিচিতও বলা যায় না। ফুল দেখে এই ভর সন্ধেয় আশপাশে যখন আর কেউ নেই, তাকে দু'হাতে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আর কেউ নয়, সরকারবাড়ির কাচারীঘরের সামনে চেয়ারে বসে থাকা সেই যুবকটি।

মাটি থেকে তুলতে তুলতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে ফুলকে জিজ্ঞেস করে, 'খুব লেগেছে কি?' হয়তো প্রশ্নটা নেহায়েত সৌজন্যমূলক। কিন্তু ফুলের কানে তা অমৃতের মতো শোনায়। কী মধুর, কী মিষ্টি সে গলা। কী দরদ। আহা, সত্যি সত্যি লাগলেও তো পারত আরেকটু?

'না, না' — সংকোচে লাল হয়ে যায় ফুল।

ওমা! সে কী?

লোকটি করে কী? করে কী?

নিজের ডান পা'টি কাছে টানতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ফুল।

সে টের পায়নি, ইটের টুকরোয় হোঁচট খাওয়ায়, তার খালি পায়ের আঙ্গুলে লেগেছে বেশ। ফুল দেখে, তার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ডগা থেকে রক্ত ঝরছিল তখন। লোকটি রাস্তায় পড়ে থাকা পিতলের কলসীটা কাত করে জল বের করে প্রথমে নিজের দু'হাত ভালো করে ধুয়ে নেয়। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ফুলের ডান পায়ের গোড়ালির পেছনটা ধরে কলসী থেকে অনেকখানি জল ঢেলে ফুলের পায়ের রক্তাক্ত বুড়ো আঙ্গুলটি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় নিজের ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে।

'এই রাস্তায় কত রকম যে জার্ম রয়েছে! ঘরে গিয়ে আবার ধুয়ে মুছে একটু এন্টিবায়োটিক মলম লাগিয়ে নেবেন।'

বিশাল এক টোল-পড়া আধ-ভরা কলসীটি ফুলের হাতে তুলে দেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি। ফুলকে মাটিতে ফেলে দিয়ে গরুটি মুহূর্তে কোথায় কোন দিকে উধাও হয়ে গেল ওরা কেউ টের পায়নি। এতক্ষণে গরুর মালিকটি গরুর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রাস্তা দিয়ে তাকে খুঁজে বেড়াতে শুরু করেছে।

'আহা। কলসীটি একটু বাঁকা হয়ে গেছে। শাশুড়ি যদি বকে এ জন্যে, বলবেন, আপনার পায়ের ব্যথার কাছে ওটা কিছুই নয়।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে। ওর কথা বলার ধরনে এতক্ষণে ওপাশে দাঁড়ানো ঝুমকোও শব্দ করে হাসে। লোকটি একবার মুখ তুলে ঝুমকোকে দেখে। তারপর আর দেরি করে না। সরকারবাড়ির দিকে পা বাড়ায়। এর পর থেকে প্রতিদিন কলসী কাঁখে জল আনতে যাওয়ার সময় সরকারবাড়ির সামনে এলেই ছেলেটির কথা মনে পড়ে ফুলের। কলসী খালি হোক আর ভরা হোক, একবার ওই মুখের দিকে তাকাবেই ফুল। কী অসীম মমতা মাখা চোখ দুটি দেখেছিল সে সেই সন্ধ্যায়! কেবল একটি পায়ের একটি আঙ্গুলের ডগায় অতি সামান্য একটু ছোঁয়া! কিন্তু এ কথা ভাবতে গেলে এখনো শরীরে উষ্ণ এক শিহরণ টের পায় সে। অথচ কী আশ্চর্য। সেদিন সন্ধ্যার পর আর এক দিনও ছেলেটি ফুলকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি তার পা'টা কেমন আছে। ভদ্রতা করেও তো মানুষ এই প্রশ্ন করে। অথচ মনে হয় তাকে চেনেও না সে। কৃচিৎ এদিকে তাকায়।

আরো সপ্তাহখানেক পরে হঠাৎ একদিন ফুল আর ঝুমকো যাচ্ছে জল আনতে। দেখে সরকারবাড়ির কাচারীঘরের সামনে আজ কেউ বসে নেই। সেই চেয়ারটি খালি পড়ে আছে। ফুল ভাবে, কোনো কারণে আসতে দেরি হচ্ছে তার। প্রতি বিকেলে যে এখানে বসে থাকে সে আজ আসবে না — এটা তো হয় না! ফেরার পথে নিশ্চয় দেখবে তাকে। ফেরার পথেও কাচারীঘরের সামনেটা ফাঁকা। কেউ বসে নেই চেয়ারে। হঠাৎ ফুলের কাঁখের পূর্ণ কলসীটিকে সম্পূর্ণ শূন্য মনে হয়। কলসীর ওপরে জলের দিকে তাকিয়ে, যেন বিরক্ত হয়েছে তেমন সুরে, ঝুমকোর উদ্দেশে বলে সে, 'ধ্যাৎ! একটা গান্ধী পোকা পড়েছে জলে।'

বলেই সবটা জল উপুড় করে রাস্তার ধারে মাটিতে ফেলে দিয়ে আবার চৌধুরীদের বাড়িতে গিয়ে জল ভরে আনে ফুল। কিন্তু সরকারদের কাচারীঘরের সামনেটা তখনো আগের মতোই ফাঁকা। কেউ এসে বসে না সেখানে। একইরকমভাবে চলে পরের দিন-ও।

তার পরদিন।

তার পরদিন।

তারপরের দিন।

পুরো এক সপ্তাহ।

একদিন সকালে কলসী ছাড়াই, সরকারদের বাড়িতে এসে হাজির ফুল। এ বাড়ির ছোট মেয়ে মায়ার সঙ্গে খানিকটা জানাশোনা আছে তার। তাই অসময়ে ফুলকে একা এ বাড়ির আসতে দেখে কেউ অবাক হয় না। এটা-সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথার পর মায়াকে সঙ্গে নিয়ে কাচারীঘরের সামনে যেখানে এখনো চেয়ারখানা পাতা, সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় ফুল। কোনো কথা না বলে কেবল শূন্য চেয়ারটির পিঠটার ওপর আলগা করে তার দু'টি হাত রাখে। মায়া চেয়ারটির দিকে তাকায়। কী মনে করে নিজের থেকেই জানায়, বি.এ পরীক্ষা শেষে তাঁর মেজোকাকির ছোটভাই কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিল এখানে। প্রতি বিকেলে এ জায়গাটায় বসে বসে গল্পের বই পড়তে বা হাওয়া খেতে খুব পছন্দ করত সে। পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পাস করেছে সে। এই গেল সপ্তাহেই তাই বাড়ি ফিরে গেল। আরো নাকি পড়ার ইচ্ছা আছে তার।

'ওঃ'। আর কোনো শব্দ বেরুল না ফুলের কণ্ঠ দিয়ে। তার বোঝা উচিত ছিল এ গাঁয়ের মানুষ সে নয়। চলে তো যাবেই। তবু প্রতি বিকেলে চৌধুরীদের বাড়িতে কলসী কাঁখে জল আনতে যাওয়ার সময় তার কথা মনে পড়ে ফুলের। মনে পড়ে সেই উলটাপালটা দিনটির কথা। পাগলা গরুর পাগলাটে চোখ দুটোর কথা। কোনো কারণ ছাড়া শিং উঁচিয়ে তার দিকে ধেয়ে আসার সেই দৃশ্য। আর তারপর তার সেই সটান মাটিতে পড়ে যাওয়া। সে স্পষ্ট টের পায় তার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে অন্য এক পুরুষের উষ্ণ স্পর্শ। ফুল নিচু হয়ে নিজের হাত দিয়েই ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটির ডগায় হাত বুলোয়।

ঝুমকো জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে রে?'

'ব্যথা পেয়েছি! বড্ড যন্ত্রণা!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ

এক ফোঁটা জায়গা নেই কোথাও। এত ভিড়! একেবারে গিজগিজ করছে চারিদিক। সেই দুই বজ্জাত মেয়েকে অবশেষ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। সালিশ/বিচার কেবল একবার, এক জায়গাতে নয়, সে সব হয়েছে অন্তত চারবার, তিন তিনটি ভিন্ন জায়গায়। যথারীতি, প্রতিবারই আংশিকভাবে হলেও শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দুটো মেয়েরই মাথা ন্যাড়া। বহু ব্যবহৃত ভাঁজহীন পরনের সুতির শাড়ি দুটো ও ব্লাউজের হাতা আর পিঠের এখানে-সেখানে ছেঁড়া। ওদের সারা গায়ে, বিশেষ করে মুখমণ্ডলে, বাহুতে, গলায় অসংখ্য ছোট ছোট নীলচে, অথবা সামান্য ফোলা ফোলা আঘাতের চিহ্ন আর আঁচড়ের দাগ।

বিচারের নামে এত কিছু করার পরও আবার ওদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। যুক্তি হিসেবে একজন জানায়, মানবাধিকার সংস্থার লোকেরা, বিশেষ করে ওই প্যান্ট-শার্ট পরা সাহেবী বাঙালি ভদ্রমহিলা, আজ সকালে সবাইকে শাসিয়ে এসেছেন, নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার জন্যে। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি দাবি জানিয়েছেন, ওদের গায়ে কোনো আঁচড়টি যেন কেউ দিতে সাহস না করে। এটি জঙ্গল নয় — আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি সভ্য দেশ। এখানে আইন আছে, বিচারের জন্যে কোর্ট আছে, আইন প্রয়োগের জন্যে আছে পুলিশ, থানা-জেলখানা। যথেচ্ছ বর্বরতা চলতে পারে না এখানে। কিন্তু ওঁর কথা শুনে আড়ালে হেসেছে সবাই। সারাদিন ধরে, নিজেদের পরিকল্পনা মতো, যা করা দরকার, যা ওদের প্রাপ্য স্থির হয়েছে, তার সবই, মানে সবরকম বিচারআচারই সম্পন্ন করা হয়েছে। তারপর বেলাশেষে লম্বা এক প্রসেশন করে রাস্তায় মাঝখান দিয়ে ওদের দুজনকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে থানার ভেতরে নিক্ষেপ করে যে যার মতো ভেগেছে। রাত্রিতে তো আর কোনো কাজ এগুবে না। অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল সকালের জন্যে। থানার ঘুটঘুটে অন্ধকার হাজতঘরে মশার অনবরত ভোঁ ভোঁ শব্দের ভেতর মেঝেতে পাতা একটি নোংরা কম্বলে শায়িত অথবা উপবিষ্ট ওদের দু'জনের তত্ত্বাবধানে থাকবে একমাত্র যে ব্যক্তি, সে হলো কাঁচাপাকা গোঁফ আর বিশাল ভুঁড়ির মধ্যবয়সী এক কনস্টেবল, যাকে মানিক কনস্টেবল বলেই লোকে জানে। পরনারীর দিকে হাত বাড়ানোর অভিযোগে এর আগে কয়েকবারই সে চাকরি খোয়াতে খোয়াতে কোনোমতে রক্ষা পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে দুটোর অপরাধ? গুরুতর সন্দেহ নেই। দুজনেই ওরা একটি গার্মেন্টস তৈরির কারখানায় কাজ করে। বেশ কয়েক বছর ধরেই। থাকে বাড্ডার এক বস্তিতে ঘর ভাড়া করে আরো তিনটি মেয়ের সঙ্গে। অন্য মেয়ে তিনটি ওদের দুজনের তুলনায় বয়সে অনেক ছোট। সবে ষোল-সতেরো বছর বয়স হবে তাদের। মাস কয়েক আগেই জীবনে প্রথমবারের মতো শহরে, তাও আবার রাজধানী শহরে, এসেছে তারা বরিশাল ও খুলনার গ্রাম থেকে। এত খাটুনির কাজের পরেও হাতে-পায়ের নখে সস্তা টুকটুকে লাল নেইল পলিশ আর ঠোঁটে হাল্কা গোলাপি লিপস্টিক মেখে রঙিন সালোয়ার কামিজ পরে প্রজাপতির মতোই ওরা সব সময়ে উড়ে বেড়ায় অথবা টগবগ করে ফোটে আনন্দে। তাদের তারুণ্য, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন, সবচেয়ে বড় কথা প্রতি মাসে নির্ধারিত রোজগারের টাকা থেকে নিজের খরচ চালাবার পরও বাড়িতে কিছু অর্থ পাঠানোর সামর্থ্য এক অসীম মনোবল ও পরিতৃপ্তির উৎস ওদের জন্যে।

অভিযুক্ত মেয়ে দুটো ওদের তুলনায় বয়সে অনেকটাই বড়। রীতিমতো। সাজসজ্জাহীন। একেবারে শান্ত, সমাহিত। ছুটিছাটায়, ঈদে, ধর্মঘটে ওরা কখনো বাড়িতে বা আর কোথাও যায় না। ওদের আসলেই কোনো বাড়ি আছে কি না, থাকলে কোথায়, সংসারে আর কে আছে তাদের, এসব সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না — ওরাও এসব নিয়ে কখনো কথা বলে না। তবে রোদেজলে পোড় খাওয়া আর দীর্ঘ অপুষ্টিতে ভোগা আপাতদৃষ্টিতে প্রায়-যৌবনাক্রান্ত এই দুই নারীকে দেখলে যত বয়সীই মনে হোক না কেন, আসলে কিন্তু ওদের বয়স মধ্যতিরিশের কাছাকাছি মাত্র। তবু, এ বয়সে, গার্মেন্টসে এখনো যে চাকরি আছে তাদের, তার বড় কারণ বহুদিন থেকে এখানে কাজ করে তারা, মুখে রা'টি নেই, আর দুজনেরই কাজের মান অত্যন্ত ভালো। সবচেয়ে বড় কথা, ওদের মতো করে নির্ভুল বোতাম-ঘর ও পকেট কেউ সেলাই করতে জানে না, বিশেষত সোয়েটার-কার্ডিগানে।

কানাঘুষো চলছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। সহকর্মী ও সহবাসীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ওরা দুজন ঠিক স্বাভাবিক জীবন যাপন করে না। সব সময় তারা একত্রে চলাফেরা খাওয়াদাওয়া করে। অন্যদের সঙ্গে খুব একটা মেশে না। ওরা দুজন ঠিক দু'টি নারীর মতো নয়, দুই বান্ধবীর মতোও নয়, বরং কিছুটা স্বামীস্ত্রীর মতো, — অনেকটাই প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। বেশ কয়েকবার অসময়ে ঘরে ঢুকে ওদের দুজনকে একত্রে বিছানায় অথবা মেঝেতে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে, অথবা লুটোপুটি করতে দেখেছে তাদের রুমমেটরা। কাল বিকেলে গৃহসঙ্গীদের ইশারায় বাসার আশপাশের প্রতিবেশীরাও এসে ভিড় করেছিল ওদের বাড়ির বেড়ার জানালার পাশে। পর্দা টাঙ্গানো বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রথমে দেখে নিয়ে তারপর হঠাৎ করে সবাই মিলে ঘরে ঢুকে একেবারে হাতেনাতে ওদের ধরে ফেলে। তারপর প্রথমেই বস্তির মাঠে, পরে আজ সকালে গার্মেন্টসের হলঘরে, এবং বিকেলে ফ্যাক্টরির বাইরের আঙিনায়, তার মানে দুই দু'বার করে ওদের অফিস প্রাঙ্গণেই, এবং সবশেষে ওরা যে বাসায় ভাড়া থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই বাড়ির উঠানে সর্বসম্মুখে তাদের সালিস বসে। একসময় ওদের ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিসপত্র ঘর থেকে একে একে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় বাইরে, উঠোনে, যা মুহূর্তের মধ্যে ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে যায়। কান ধরে ওঠাবসা করানো হয় গোটা পঞ্চাশেক বার, অন্তত দু'জায়গাতে। চারদিক থেকে অজস্র গালাগাল, অকথ্য সব বিশেষণ, শূন্যে ছুড়ে দেওয়া থুতু, স্থির লক্ষ্যে নিক্ষেপিত অরন্ধিত পচা ডিম অব্যাহত ছিল শুরু থেকেই। ওরা কোনো কথারই জবাব দেয় না। কোনো শাস্তি বা মন্তব্যেরও প্রতিবাদ করে না। ওদের পক্ষ অবলম্বন করার জন্যে কোনো আত্মীয়, বন্ধু, সাক্ষী বা উকিলের সাহায্যও প্রার্থনা করে না। শুধু মাঝে মাঝে পরস্পরের মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওরা। যেন কিছু জানতে চায়, বলতে চায়, কিন্তু নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করে না তারা। যখন থানায় ওদের নিয়ে আসা হলো, সারা দিনের অনাহারে আর সমস্ত শরীরজুড়ে অজস্র খোঁচা, কিল, ঘুষি আর চাপড়ের প্রচণ্ড যন্ত্রণা, ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরিহিত তেনাকাপড়, আনাড়ি হাতে অসমানভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া ন্যাড়া মাথা, এই সবকিছু শরীরে ধারণ করে ওদের সেই মুহূর্তে কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছিল। আর সেটা হলো, যা হবার কাল হবে। আজ রাতে, এখন, যদি কোনো মতে শুধু কোথাও একটু শুয়ে পড়া যেত, যদি একটু ঘুমুতে পারত তারা। ওদের বিচ্ছিন্ন করে দু'দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে একবার কেবল ওরা পরস্পরের ন্যাড়া মাথায় হাত বুলোয়। একজনের চোখ ছলছল করে ওঠে। অন্যজনের চোখে মনে হয় জ্বলছে আগুন। এই অপরিচিত থানায় হাজতঘরের সংখ্যা মাত্র দু'টি। একটিতে তখন ছিল আজই ভোর রাতে হাতেনাতে গ্রেফতার করে আনা ধর্ষণে উদ্যত এক ধনাঢ্য পরিবারের বখাটে যুবক, আর অন্যটিতে নিউমার্কেটে পার্স ছিনতাই করতে গিয়ে কাল রাতে ধরা পড়া এক প্রৌঢ় মুটেওয়ালা। এই দুজনেরই অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু, এবং জটিলতার বিচারে অনেক সহজ ও একমাত্রিক হওয়ার কারণে এবং তাদের আত্মীয়দের সময়মতো জমা দেওয়া জামিনের দরখাস্ত ও জামানতের টাকা প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সেই সন্ধ্যাতেই তাদের হাজত থেকে জামিন মঞ্জুর করে সেখানে, সেই দুই হাজত ঘরে, ওই দুই অসৎ বিকৃত রুচির সমাজ-ধ্বংসকারী নারীকে ঢোকাবার আদেশ দিলেন বড় দারোগা। উপস্থিত স্থানীয় নেতানেত্রী ও গার্মেন্টস কর্মকর্তাদের আশ্বস্ত করে বিদায় করেন এই বলে যে, আসুক না কাল সেই সাহেব-বাঙ্গালিনী। এই কেসে ওদের ছাড়িয়ে নেওয়া এত সহজ হবে না তিনি প্রায় নিশ্চিত। সবচেয়ে বড় কথা, দাঁতে দাঁত চেপে বড় দারোগা বলেন, এই জীবনে ওই দুই বজ্জাত মেয়েমানুষ দুটো আর কক্ষনো একত্রিত হতে পারবে না। সেটা তিনি নিজে দেখে নেবেন। তাঁর দৃঢ় কণ্ঠস্বর ও সর্বসম্মুখে ঘোষিত এই কঠিন প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট আভাস দেয় যে দেশের সার্বিক দুরবস্থার জন্যে এই দুই নারীর অসামাজিক সম্পর্ক আর ক্রিয়াকলাপই প্রধানত দায়ী, এবং কোনোমতে এই দুজনকে আলাদা করে রাখতে পারলেই বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর মৌলিক অধিকার

পরিবারে নারী অধিকার : চার মৌলিক উপাদান

দীর্ঘকালের অবদমন ও বৈষম্যমূলক সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে নারী যে আংশিক স্বাধিকার ও স্বাবলম্বিতা আজ অর্জন করেছে, তা কোনো সমাজেই রাতারাতি ঘটেনি। পর্যায়ক্রমে, ধাপে ধাপে ঘটেছে তা, যার সঙ্গে মিলেমিশে আছে সমাজ উন্নয়নের আরো বেশ কিছু উপাদান ও প্রক্রিয়া। কেননা, নারীর অবস্থা বা অবস্থানের উত্তরণ স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে অন্যান্য সামাজিক উন্নতির ধারা। নারীর প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকারের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা, ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের সনদ ও অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী নারীর মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও তার বাস্তবায়ন, ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন এবং আপামর সমাজ ব্যবস্থার বড় ধরনের এক বিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব নারীর কাঙ্ক্ষিত এবং প্রকৃত সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য। আইনের শাসন, ক্ষমতার ভিত্তিতে ও ন্যায্যভাবে প্রশাসনিক কার্যকলাপের সুষ্ঠু পরিচালনা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-জীবিকার সুষম বণ্টন ও সুব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্নয়নের এবং নারী স্বাধীনতার সাফল্যের মূল কথা। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সমাজই মূলত আলাদা এবং তাদের নিয়মকানুন, মূল্যবোধ, শিক্ষার মান, আচার-আচরণ, চলাফেরার পরিধি, ধর্মীয় সংস্কার যথেষ্ট স্বতন্ত্র, এটা অনস্বীকার্য যে গণউন্নয়নের তথা নারী স্বাধীনতার বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ধাপে, বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এই সব বিভিন্ন সমাজের অবস্থান। ফলে দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে নারী যে অসুবিধা বা বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করে, তার মাত্রা ও ধরন যথেষ্ট আলাদা এবং এই বাধা ও প্রতিকূলতা উত্তরণের পথও ভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময়।

পশ্চিমের তুলনায় আমাদের দেশের কিছু অনগ্রসর সম্প্রদায় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীসমাজ যে তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ অবস্থায়, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং সামাজিক স্তরে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, আমার ধারণা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে অন্তত চারটি মৌলিক ব্যাপারে নারী নিজে উদ্যোগী হয়ে যদি তার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তাহলে বৃহত্তর সমাজে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এর সুফলের প্রতিফলন ঘটবে। যে চারটি বিষয় আমি উল্লেখ করব, যার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ নারীর হাতে থাকলে তার আত্মপ্রত্যয়ই শুধু বাড়বে না, ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগও অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। এই চারটি বিষয় যা মূলত জৈবিক, তার স্বাধীনতা, স্বাবলম্বিতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের স্তম্ভ। এগুলোর প্রতিটিই এত জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তব, সাধারণ ও দৈনন্দিন ব্যাপার যে অনেকেই হয়তো এগুলোকে অতি সামান্য ও সহজে করণীয় বলে বিবেচিত করবেন। এমনকি এগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার করে এ বিষয়গুলো নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা করার প্রচেষ্টাও চালাবেন কেউ কেউ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং ব্যাপক অর্থেই এগুলো অত্যন্ত মৌলিক ও জরুরি বিষয় — অন্তত আমাদের দেশের নারীর জীবনে। প্রচলিত মূল্যবোধ ভেঙে দিয়ে যথেষ্ট অনুশীলনের মধ্য দিয়েই এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সামাজিক ধারণা পালটানো দরকার। আর সঠিকভাবে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা আয়ত্ত করার ভার নারীর নিজের হাতে গ্রহণ করাটা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। নিচে নারীর জীবনের এই মৌলিক চারটি বিষয় উল্লেখিত হলো।

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা : বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাস্থ্যসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে আমাদের দেশে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আগের চেয়ে অনেক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌনবাহিত সংক্রামক রোগ নিয়ে পল্লিবধূরাও আজকাল খোলামেলা আলোচনা করেন স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে, সে তো এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হওয়ার সুযোগে নিজের চোখে দেখেই তারিফ করেছি! কিন্তু তারপরও অধিকাংশ মানুষ, এমনকি মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীরাও ভুলে যান বা অস্বীকার করেন পল্লিবালা অথবা গ্রাম্যবধূরা প্রতি মাসে মাসিকের সময় পাঁচ থেকে সাত দিন কেমন করে কাটায়, কতটা ব্যস্ত সন্ত্রস্ত থাকে তারা তখন। কতটা বিব্রত সংকোচিত, ভীত ও লজ্জিত থাকতে হয় তাদের প্রকৃতির খেয়ালে মাস শেষে নির্ধারিত এই রক্তপাতের জন্যে। এগারো, বারো বা তেরো বছর বয়স থেকে শুরু করে আটচল্লিশ, পঞ্চাশ বা বায়ান্ন বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে রজস্বলা নারীরা কী দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে যায় আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, তার খবর কেউ রাখে না। শহরে অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন ঘরের মেয়েদের পক্ষে গরিব পল্লিবালাদের এ বাস্তব সমস্যাটার ব্যাপকতা বোঝা দুষ্কর। গ্রামের পারিবারিক গঠন, বাসস্থানের কাঠামো, শৌচাগারের অবস্থা বা অনুপস্থিতি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাস্টবিনের অভাব বা অপ্রতুলতা মেয়েদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাসিক ব্যবস্থাপনার বিরাট অন্তরায়। এ ছাড়া তাদের না আছে কোনো নিভৃতি বা নির্জনতা, না আছে নিজস্ব ঘর, পরিচ্ছন্ন কাপড় বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদান। ফলে মাসের ওই প্রত্যাশিত দিনগুলো তাদের কাছে আবির্ভূত হয় বিভীষিকার মতো, বিশেষ করে অল্পবয়সী সদ্য রজস্বলা নারীদের জন্যে।

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বেশ কয়েকটা গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়েদের স্কুলে অনুপস্থিতি ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ মাসিক মোকাবিলা করার উপাদান বা সামগ্রীর অপ্রতুলতা অথবা মাসিক সংক্রান্ত জটিলতা এবং এ ব্যাপারে সংকোচ, ভয়, দুর্ভাবনা। অনেক নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েদের নিজের একান্ত ব্যবহৃত রঞ্জিত কাপড়খণ্ড ধোয়ার জন্যে জীবাণুনাশী সাবান, প্রয়োজনীয় জলাশয় কিংবা জলের ব্যবস্থা কিংবা নির্জন গোপন জায়গাও থাকে না। অনেকেরই হয়তো ব্যবহৃত কাপড় ফেলে দেয়ারও কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। থাকলেও প্রতি মাসে নতুন করে ব্যবহারযোগ্য পুরনো কাপড় জোগাড় করাও কারো কারো জন্যে অসাধ্য। কিন্তু সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে রোদে হাওয়ায় খোলামেলা অথচ একান্ত কোনো জায়গায় তা শুকিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাই বা কজনের আছে? ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের অভাব ও ফেলে দেয়ার জায়গার অপ্রতুলতার কারণে একই বা কয়েকটি বস্ত্রখণ্ডই ধুয়ে শুকিয়ে বারবার ব্যবহার করে আমাদের দেশের অধিংকাশ নারী। আর অন্ধকারে, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় গোপনে শুকানো আর ভালোভাবে সাবান সহকারে পরিচ্ছন্ন করার ঘাটতির কারণে এসব পুনঃপুন ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড হয়ে পড়ে বিভিন্ন রোগজীবাণুর ঘাঁটি।

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের মেয়েদের যৌনাঙ্গের ও মূলত্রাশয়ের বিভিন্নরকম সংক্রামক ব্যাধির জন্যে মাসিকের সময় তাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাসিক-উপাদান ব্যবহারের অপ্রতুলতাই দায়ী। ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সঙ্গে মাসিক ব্যবস্থাপনার একটি সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। যোগাযোগ রয়েছে তাদের আত্মপ্রত্যয়, আত্মসম্মান, সমভাবে এবং নিঃসংকোচে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জনের সঙ্গেও।

সংক্রামক ব্যাধির উপদ্রব ছাড়াও এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অল্পবয়সী মেয়ে মাসিকের সময় মারাত্মক ও উদ্বেগজনক শারীরিক কষ্টের শিকার হয়। প্রচণ্ড পেটে ব্যথা থেকে শুরু করে তলপেটে প্রবল খিঁচুনি এবং তারই ধারাবাহিকতায় তাদের অর্ধাহার বা অনাহার — ফলশ্রুতিতে স্কুল বা কাজে যাওয়ার অপারগতার কথা কে না শুনেছে? নিয়মিত প্রতি মাসেই এমন ঘটে, তেমন নারীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। অথচ এসবই নিরাময়যোগ্য — চিকিৎসাযোগ্য ব্যাধি। হরমোনের গোলামালের জন্যে অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্য ত্রুটির জন্যে উঠতি বয়সী অনেক মেয়ের মাসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিয়মিত, অপ্রত্যাশিত ও অসময়ে ঘটে। ফলে সার্বক্ষণিকভাবে তারা নিজের শরীর ও শারীরজনিত সম্ভবপর বিব্রতকর অবস্থার কথা ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। অথচ এসব সমস্যাকে নেহাত 'মেয়েলি' ব্যাপার বলে গোপনীয় বা আড়াল করে না রেখে, অগ্রাহ্য না করে, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে এই সাময়িক দুর্ভোগ কাটিয়ে অনেক মেয়েই তাদের পড়াশোনা, বাইরের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। তাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়ে তাতে। নানান কুসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার কারণে মাসগত প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মটাকে অনেক মেয়েই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষত প্রতিটি ধর্মেই যেহেতু রজস্বলা নারীকে ধর্মস্থানে যেতে বা ধর্মেকর্মে অংশীদার হতে বারণ করা হয়েছে, অধিকাংশ নারীই এ সময় নিজেকে অপরিচ্ছন্ন, অস্পৃশ্য ও নোংরা ভাবতে শুরু করে। এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রে কোনো বাধা না থাকা সত্ত্বেও এবং পরিবার পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলে সময়টা সবচেয়ে 'নিরাপদ' হলেও, এই সময় নারীদেহ 'পঙ্কিল' ভাবার কারণে, নারী বা তার সঙ্গী সাধারণত এই সময় যৌনমিলনেও আগ্রহী হয় না। এ ছাড়া কোনো কোনো সম্প্রদায়ে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে এ সময় মেয়েদের আলাদা জায়গায় শুতে দেয়া হয়, আলাদা পাত্রে এবং আলাদাভাবে রন্ধিত নিম্নমানের খাদ্য পরিবেশন করা হয়। কোনো কোনো সম্প্রদায় এ সময় মেয়েদের রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না, এমনকি আচার নাড়তেও দেয় না রোদে। এ সবই কুসংস্কার। এ সবই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু এর ফলে যে হীনম্মন্যতা জন্ম নেয়, তা শুধু মাসিকের কয়েকটা দিনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, নারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং জীবনের সম্পূর্ণ পরিধি পর্যন্তই প্রসারিত হয়। নারী মেনে নেয় এবং সমাজ দাবি করে নারীর অধস্তন।

রজস্বলা হওয়া মাত্রই নারীকে ঘরবন্দি করে পুরুষ ও সমাজ। কেননা মাসিকের আবির্ভাব ঘোষণা করে, নারী সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে — সন্তান উৎপাদনে সক্ষম সে এখন। ফলে তার চলাচলের পরিধি সংকুচিত করে দেয়া হয়, তার চারণক্ষেত্র নির্দিষ্ট সীমানার ভেতর সীমিত করে দেয়া হয়। কিন্তু পুরুষ নয়, নারী নিজে স্থির করবে কোথায়, কখন যাবে সে মাসিকের সময় এবং অন্য সময়। রজস্বলা হওয়ার কারণে পুরুষ ও সমাজের ইচ্ছানুযায়ী বাহির মানে শিক্ষালয় ও কর্মক্ষেত্র থেকে সরে এসে নারী যদি অন্তপুরে নিজেকে নিক্ষেপ করে, তা হলে পুরুষের আজীবনের খায়েশ, তার বংশের পবিত্রতা — তার জিনসের (genes) ধারাবাহিকতা রক্ষা পাবে ঠিকই। নারী হবে তার হাতের পুতুল। বন্দি। অন্তরীণ।

আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে আজকাল। রোগবালাই নিরাময় থেকে শুরু করে টিকা, ওরস্যালাইন, ফুটানো জল খাবার পরামর্শ, পরিবার পরিকল্পনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামগ্রী, স্ল্যাবের পায়খানা — কী না সরবরাহ করা হচ্ছে! কোনো কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অল্প খরচে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির প্রকল্পও গ্রহণ করেছে জানি। সেইসব প্রকল্প আরো উপযোগী, উন্নতমানের এবং কম ব্যয় সাপেক্ষ হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে ব্যবহৃত সামগ্রীর নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করাও জরুরি। মাসিক সম্পর্কে প্রচলিত চিন্তাধারা পালটানো দরকার। এটা যে প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাভাবিক ও জৈবিক একটি প্রক্রিয়া, এত গোপন করার, লজ্জা পাওয়ার, সংকুচিত হওয়ার বা নোংরা ভাবার কোনো কারণই যে নেই, এই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি একটি উপায়।

মনে পড়ে, পশ্চিমের এক বিশাল জনসম্মেলনে এক নারীবাদী যখন বক্তৃতা করতে উঠছেন মঞ্চে, হঠাৎ তিনি টের পেলেন তার মাসিক সদ্য শুরু হয়েছে — অসময়ে। এ অবস্থায় বিচলিত নেত্রী কী দিয়ে কথা শুরু করবেন ভাবতে গিয়ে হঠাৎ কোথা থেকে এক প্রবল শক্তির সন্ধান পেলেন নিজের ভেতরে। মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে সোজাসাপ্টা বলে বসলেন তার শারীরিক অবস্থা। শুরু করলেন এই বলে যে I am menstruating. গ্লোরিয়া স্টেইনাম একইভাবে লিখেছিলেন তাঁর প্রখ্যাত প্রবন্ধ, If men could menstruate! গ্লোরিয়ার সেই হাস্যরসাত্মক লেখায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে, নারীর বদলে পুরুষ যদি রজস্বলা হতো, কত গর্বের সঙ্গে না তারা তাদের শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করে বেড়াত। মাসিক মোকাবিলা করার বিভিন্ন বাণিজ্যিক উপাদানের ব্র্যান্ড নাম দিয়ে কতরকম মুখরোচক আলোচনা চলত রাস্তায়, ঘাটে, ক্লাবে, ট্রেনে। নারী নাই বলে বেড়াল সে রজস্বলা, রাখলই না হয় আড়াল করে তার মাসিকের উপকরণ, কিন্তু সে যখন রজস্বলা হয়, নিজেকে যেন অস্পৃশ্য বা আলাদা না ভাবে। তার দৈনন্দিন রুটিনে, ব্যক্তিগত, শিক্ষা বা কর্মজীবনে যাতে কোনোভাবে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে প্রতি মাসে এই নির্ধারিত রক্তক্ষরণ। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল (অন্য সব জীবের বেলায় এটা ঘটে না) মেনে নিয়ে সব হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে যেতে হবে নারীকে এই সময় এবং সব সময়। আর এ জন্যে ঘরে, পরিবারে, কর্মস্থলে নারীর প্রয়োজনীয় নিভৃতি ও মাসিকের উপকরণের (হোক তা স্যানিটারি ন্যাপকিন অথবা পরিচ্ছন্ন পুরনো বস্ত্রখণ্ড ও সাবান কিংবা তুলো) প্রতুলতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এটা কোনো মেয়েলি ব্যাপার নয়। মৌলিক মানবিক অধিকার। কর্মক্ষেত্রেও, বিশেষ করে পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মতো জায়গায় যেখানে অনেক অল্পবয়সী মেয়ে একসঙ্গে কাজ করে, নারীদের জন্যে নির্দিষ্ট ও সংখ্যায় যথেষ্ট বাথরুম, বাথরুমের ভেতর পয়সার বিনিময়ে মাসিক মোকাবিলার সামগ্রীর ব্যবস্থা এবং ব্যবহৃত সামগ্রীর পরিত্যাগ ও নিষ্পেষণের ব্যবস্থা করা একান্তই জরুরি। নারী শ্রমিকদের সুবিধা অসুবিধা, তাদের প্রাইভেসি এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যে, বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসের এই বিশেষ সময়টাতে তাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় তদারকির জন্যে, পোশাক শিল্প কারখানায় নারী সুপারভাইজার নিয়োগও কাম্য।

রন্ধন : গল্পটা এরকম। এক ভোরে ঘুম থেকে উঠে এক গ্রাম্য গৃহবধূ হঠাৎ মনস্থির করে আজ সে রাঁধবে না। সে অসুস্থ নয় — তার সন্তান, স্বামীও সুস্থ। প্রাত্যহিক জীবনে এমন কিছু অঘটন ঘটেনি, যার জন্যে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। স্বামী, শাশুড়ি, ননদ কারো সঙ্গেই বচসা বা বিতণ্ডা হয়নি। সে স্রেফ ঠিক করেছে, সেদিন — অর্থাৎ এক দিন সে রান্না করবে না, যা বছরের পর বছর প্রতিদিন করে আসছে। এই সামান্য একটা ইচ্ছা বা শখ কী অসামান্য হয়ে দেখা দেয় পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কাছে। আর এটি যে কোনোমতেই কাম্য বা গ্রহণীয় নয়, সেটাই বর্ণিত হয় গল্পে।

মজার ব্যাপার হলো, এক নারী সমালোচক এই গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে মহা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন এই বলে যে কেন এই নারী আজ রাঁধবে না, এটার কারণ ব্যাখ্যা করা বা অন্য কথায় তার এই অবাধ্যতার পক্ষে যুক্তি স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি ছিল লেখকের জন্যে। বলা বাহুল্য, সমাজবিজ্ঞানী সেই সমালোচক মহিলা অনেক ভেবেচিন্তে, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেছেন যে এই গ্রাম্যবধূ আসলে হিন্দু ধর্মমতে অরন্ধন ব্রত যাপন করছিল বলেই সেদিন রান্না না করার সংকল্প নেয়। এই না বলা কথাটা ধরে ফেলেছেন বলে সমালোচক এতটাই নিশ্চিত ও গর্বিত যে এই সোজা কথাটা লেখক কেন খোলসা করে না বলে রহস্য করলেন, কেন পাঠকদের ধোঁকা দিলেন, জানতে চাইলেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রশ্ন রাখলেন, লেখক কি তাহলে পাঠকদের সঙ্গে তামাশা করেছেন? প্রকৃতপক্ষে, এই গৃহবধূ কোনো পূজা অর্চনা করছিল না। ওধরনের কোনো ব্রত খুব প্রচলিত রয়েছে শোনা যায় না বাংলাদেশে। তাছাড়া বধূটি ওরকম কিছু করলে স্বভাবতই তার শাশুড়ি, ননদ, স্বামীও তা জানত। আসলে, নেহাত একদিন তার ইচ্ছা জেগেছিল, প্রতিদিনের মতো হাঁড়ি না ঠেলে, একটি দিন নিজের মতো করে একটু সময় কাটাতে — প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে। গাছপালা, ফুল, পাখি, মাছ, সূর্য, ঘাট, জলের সঙ্গে একাত্ম হতে। কিন্তু তার এই ইচ্ছা শুধু প্রথাগত বা প্রাচীন পারিবারিক আবহাওয়াতেই নয়, দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা শহুরে মানুষের মধ্যেও, এমনকি মেয়েদের মধ্যেও, গ্রহণযোগ্য বা স্বীকৃত নয় (সমালোচক মহিলার বিশ্লেষণ যার প্রমাণ)।

'বউ ভাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববধূকে নতুন গৃহে বরণ করে নেওয়ার নামে, তার হাত দিয়ে অতিথিদের প্রতীকী অন্ন পরিবেশনের মাধ্যমে, তাকে সেই যে হাঁড়ির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়, সে বন্ধন আর কোনোদিন ঘোচে না, মৃত্যু নামক মহা শক্তিধর এসে হাত ধরে তাকে পরিত্রাণ না দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত। আমাদের দেশে কোনো বিবাহিতা নারী ভাবতেই পারে না যে রান্না করা না-করার ইচ্ছে তারও থাকতে পারে। সংসারের সব মানুষের মুখে রন্ধিত অন্ন জোগাড় করে দেয়ার দায়িত্ব সার্বক্ষণিকভাবে তার নাও হতে পারে। কখনো কখনো তারও সাধ হতে পারে, হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে একটু আরাম করার, রান্নাঘরে একবেলা বা এক দিন ভাতের হাঁড়ি না ঠেলার। স্বামী বা অন্য পারিবারিক সদস্যরাও সেই দায়িত্ব নিতে পারে মাঝে মাঝে।

গত শতকে জন্ম নেওয়া মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি পর্যন্ত তাঁর নরনারী প্রবন্ধে বলেছেন, 'গৃহস্থালির কাজকর্ম নারীও করতে পারে, নরও করতে পারে। অবসর ও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। রান্নাবান্না, কাপড় কাচা প্রভৃতি ব্যাপার নারীর জন্যে নির্দিষ্ট নয়। পরিবার-সংগঠনের ভেতর পুরুষও এগুলো করতে পারে।' সভ্য দেশে রান্নার জোগাড়যন্ত্র এবং প্রকৃত রান্না করার দায়িত্ব অধিকাংশ পরিবারেই ভাগবাটোয়ারা করে নেয়া হয়। যেভাবে নেয়া হয় সংসারের অন্যান্য কাজ, যেমন ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, কাপড় ধোয়া, বাজার করা, সন্তানদের খাওয়াপরা, যত্নাদি। অনেকে বলতে পারেন, অনেক সচ্ছল শহুরে পরিবারেই মাসোহারার বিনিময়ে নির্ধারিত রান্নার লোক থাকে। সেখানে গৃহকর্ত্রীর তো এ সমস্যা নেই। প্রথমত দেশের মোট জনসাধারণের তুলনায় সেরকম বাড়ির সংখ্যা নগণ্য। দ্বিতীয়ত, এটা সত্য যে সেইসব সচ্ছল পরিবারে চুলার পাশে বসে আয়েশি গৃহকর্ত্রীর হয়তো আগুনের তাপ সব সময় সরাসরি সইতে হয় না। কিন্তু কোন বেলা কী খাবার তৈরি হবে, কার জন্যে বিশেষ করে কী রাঁধতে হবে, কে কখন খাবে সব কিছুর দায়িত্ব তাকেই নিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া থেকে শুরু করে রান্না ও পরিবেশনের তদারকি করতে হয় তাকে নিজের হাতেই, ফলে রান্নার জন্যে নির্দিষ্ট লোক থাকলেও রান্নাঘরের কাজকর্মে একরকম করে লেগে থাকতেই হয় কর্ত্রীকে। পুরুষরা বরাবর এ দায়িত্ব এড়িয়ে এসেছে। এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তারা বলেছে, যেহেতু পুরুষকুল রোজগার করে এবং রোজগারের জন্যে তাদের বাইরে বেরোতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, শ্রমের সুষম বণ্টন ও ন্যায্যতার খাতিরেই রান্নাবান্নার দায়িত্ব নারীকে নিতে হয়। কিন্তু যুগ পাল্টেছে। পাল্টেছে দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনধারা। শহরে অনেক পরিবারেই এখন অর্থনৈতিক ও নৈতিক কারণে পুরুষ নারী দুজনেই অর্থকরী কর্মকাণ্ডে জড়িত — দুজনেই বেরিয়ে এসেছে পরিবারের গণ্ডি ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে। তারপরও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলেও রান্নাবান্নার দায়িত্ব প্রায় অবধারিতভাবেই স্ত্রীর কাঁধেই নিতে হয়। গ্রামেও নারীরা বরাবর ঘরের বাইরে বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকে। ধান বোনা থেকে শুরু করে শস্য রোপণ, পাকা শস্য কর্তন, ধান, মরিচ, সরষে ইত্যাদি শুকানো, পাকা ধান মাথায় বয়ে ঘরে আনা, ধান মাড়ানো আর কত কী করে সর্বক্ষণ! সেইসঙ্গে করে রান্নাবান্না, সন্তান ধারণ, প্রতিপালন সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকাল কৃষিকাজ ছাড়াও পল্লিবালারা যুক্ত হয়েছে আরো বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে। মাটি কাটা, মাটি বহন করা থেকে শুরু করে নির্মাণশিল্পের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়েছে গ্রামের ও শহরের গরিব মেয়েরা। এ ছাড়া কুটিরশিল্পের প্রধান অংশটারই কারিগর নারী — বিশেষ করে পল্লিনারী। আর শহরে পোশাকশিল্পে কাজ করছে তো লাখ লাখ অল্পবয়সী নারী। তা হলে, বাইরের পরিশ্রম একই রকম করলে ঘরের কাজে তাদের সহযোগিতা কেন মিলবে না স্বামীর কাছ থেকে? বিশেষ করে সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফেরার পর মেয়েদেরও তো সাধ হয়, তৈরি গরম গরম খাদ্য গ্রহণের? তাদের সে সাধ বরাবরই কি অপূর্ণ থেকে যাবে? সেটা কোন যুক্তিতে চলবে? শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন এই রান্না করার মহা দায়িত্বটা মাথার ওপর খড়গের মতো ঝুলতে থাকায় আমাদের দেশের বধূরা কখনো একবেলা বা দুটো দিন নিজের মতো করে কারো বাড়িতে গিয়ে সময় কাটাতে পারে না, সে বাড়ি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি হোক, মা, বোন বা নিকটাত্মীয়ের বাড়ি হোক।

একসময় বিবাহিত মেয়েরা দীর্ঘদিনের জন্যে মায়ের বাড়িতে আসত নিজের শরীর ও মনের ক্লান্তি ঘুচাতে। একান্নবর্তী পরিবার থাকায় তখন তার এই সাময়িক অনুপস্থিতি বাড়ির অন্য বউয়েরা মিলেমিশে ভাগ করে নিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে যৌথ পরিবার প্রথা প্রায় ভেঙে পড়ায় বিবাহিত মেয়েদের পক্ষে একা স্বামী সন্তান ফেলে দুটো দিনের জন্যেও আরাম করতে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। অথচ এই নিভৃতি — এই নিস্তার — এই অব্যাহতি শুধু শরীরের জন্যে নয়, মানসিক প্রশান্তির জন্যেও অত্যাবশ্যকীয়।

আমি লক্ষ করেছি, শহরে উচ্চ পদে আসীন মহিলারাও এক রাত গৃহের বাইরে থাকলে, যাওয়ার আগে রান্না করে রেফ্রিজারেটরে থরে থরে সাজিয়ে রেখে যান খাবার, যাতে স্বামী, পুত্রকন্যার কোনো অসুবিধা বা ঝামেলা করতে না হয়। দেখেশুনে মনে হয় প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যেন প্রতিবন্ধী। নিজের খাবার নিজে তৈরি করার সামর্থ্য পর্যন্ত তাদের নেই। তবে খাবার তৈরি করে রেখে যাওয়ার জন্যে সবার ঘরে ঘরে রেফ্রিজারেটর নেই। আর যদি তা থাকতও, তা হলেও কেন স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যরা দুটো দিন রান্না করে নিতে পারবে না? আর যদি রান্না একান্তই করতে না পারে, ফলমূল, সেদ্ধ তরিতরকারি খেয়ে নিতে পারে তারা। ভাত রাঁধার সামর্থ্য না থাকলে, মুড়ি, চিড়ে, খই, পাউরুটি, আলু সেদ্ধ, দুধ, দই কত কিছু আছে খাবার! প্রতিদিন যে সপ্ত ব্যঞ্জন না হলেও তিন ব্যঞ্জন দিয়ে গরম গরম ভাতই খেতে হবে, এ বাধ্যবাধকতা কে চাপিয়ে দিয়েছে?

পৃথিবীর কত দেশে তো মানুষ ভাত খায় না — অন্তত নিয়মিত ভাত খায় না, এমন দেশের সংখ্যাই তো বেশি। তারা কি কোনো অংশে কম শক্তিধর বা তারা কি বুদ্ধিহীন আমাদের থেকে? মোট কথা, হাঁড়ির সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত্যবন্ধন শুধু প্রতিদিন রান্না করতেই বাধ্য করায় না মেয়েদের। এই অচ্ছেদ্য বন্ধন তাদের অনেক সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে নিরুৎসাহ করে — তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অন্তরায় হয় — তাদের জীবিকা নির্বাচনে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। মজার ব্যাপার হলো, এই রান্না করার সঙ্গে আমাদের বাড়ির বউদের এমন করেই গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে সমাজ যে, কোনো পুরুষ বিপত্নীক হলে (এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও) পুরো সমাজের সমবেদনা ও করুণা উপচে পড়ে তার ওপর। 'আহা রে! কেমন করে খেয়ে পরে এখন বাঁচবে লোকটা?' অন্তত রান্না করে খাওয়াবার মতো 'মানবিক কারণেও' তাকে আবার বিয়ে দিতে উৎসাহী ও উদ্যত হয়ে পড়ে পরিবার ও সমাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু পেটের ক্ষুধা নয়, পুরুষ মানুষটির যৌন চাহিদার জন্যেও তার পুনরায় বিবাহ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি কোনো নারী বিধবা হয়, তার আবার বিবাহের ব্যাপারে কারোরই তেমন মাথাব্যথা নেই। প্রথমত সে নিজের রান্নাই শুধু নয়, ঠিক আগের মতোই পরিবারের অন্য সবার রান্নাবান্না ও পরিবেশন ঠিকমতো চালিয়ে যেতে পারবে। বরং নিজের স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্যদের ওপর এখন নজর আরো বেশি দিতে পারবে। আর যৌনক্ষুধা? আরে, নারীর আবার ওসব আছে নাকি? সে তো শুধু পৃথিবীতে এসেছে পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ মেটাতে। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির মতো ধর্মীয় আদর্শের অনুসারী লেখকও তাঁর যুক্তিবাদের মাধ্যমে স্বীকার করেছিলেন, 'নারীর দেহ পুরুষের কাছে লোভনীয় সামগ্রী, এ কথা যতটা সত্যি, পুরুষের অবয়ব নারীর কাছে লোভনীয় বস্তু এটাও তার চাইতে কম সত্য নয়।' অথচ আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে দাবি করেন, এমন অনেকেই এ সত্যকে অস্বীকার করতে চান। সে যা-ই হোক, মোট কথা, পুরুষকেও আস্তে আস্তে রান্নার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তা শুরু হবে শুধু বিয়ের পর নয়, আগে থেকেই। ঠিক যেমন করে মেয়েরা মায়ের পাশে পাশে থেকে ও দেখে, মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করার মাধ্যমে, বিভিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কাজ চালাবার মতো ন্যূনতম রান্নার জ্ঞান অর্জন করে বিয়ের আগেই। কোনো নারী বিনা কারণে, বিনা অসুখে, অত্যাচারিত বা শোকতপ্ত না হয়ে, কোনোরকম ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়াই কখনো কখনো রান্না ঘরে যেতে না পারে। সেটা পূর্ব নির্ধারিত হলে উত্তম। না হলেও পরিবারে সব সদস্যের প্রচেষ্টা থাকবে তার ইচ্ছাকে সম্মান করা। আর সেটা করে স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্য সেদিন রান্নার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। রান্নার দক্ষতা বা সহজাত ক্ষমতা যে নারীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, সেই মেধা যে তার জিনে লুকিয়ে নেই, তার বড় প্রমাণ পৃথিবীর সব দেশেই পেশাদারি পাচকরা প্রায় সবাই পুরুষ। জীবিকার জন্যে যে কাজ পুরুষ বাইরে করতে পারে, স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতার খাতিরে সে কাজ ঘরে করতে বাধা কোথায়? এরকম মূল্যবোধ ও বোঝাপড়া সংসারে প্রচলিত থাকলে তা শুধু রান্না করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারেই নয়, নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অধিকার, স্বাবলম্বিতার অন্যান্য অনেক দিকই আলোকিত করবে নিঃসন্দেহে। রান্না করার ব্যাপারটাকে সরাসরি জৈবিক বলা না গেলেও যেহেতু নারীর কায়িক পরিশ্রমের এক সিংহভাগ রান্নার অনুষঙ্গে কাটে, এটি নিঃসন্দেহে তার জৈবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম।

একত্রে আহার গ্রহণ : একটা অতি সাধারণ পদক্ষেপ পরিবারের ও সমাজের অনেক বৈষম্য ঘোচাতে পারে। আর সেটা হলো, পরিবারের সব সদস্যের একসঙ্গে বসে খাদ্য গ্রহণ করা। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারে শিশুদের ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের আগে খাবার পরিবেশন করা হয়। পরে নিভৃতে রান্নাঘরে একা একা বসে পরিত্যক্ত বা অবশিষ্ট খাদ্যকণা দিয়ে আহার সারেন গৃহিণী। এটা এতটাই প্রচলিত, এতটাই স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য হয়ে পড়েছে যে কেউ এ ব্যাপারটির ভেতর কোনো দোষ, অবহেলা বা বৈষম্যের আভাস দেখেন না। এর ফলে দিনের পর দিন বড় মাছটি অথবা মাছের বড় পেটিটি কিংবা মাংসের সেরা টুকরোগুলো বেছে বেছে স্বামীর পাতে পড়ে। আর দিন শেষে হেঁসেলে এক গাদা ঝোলের মধ্যে ভেসে থাকা লেজা অথবা পিঠের ছোট্ট এক টুকরো কাঁটাওয়ালা মাছ কিংবা মুরগির গলা অথবা পাখা দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন ঘরের গৃহিণী। এই গৃহবধূই যখন আবার শাশুড়ি হন, পুত্রবধূর কাছেও আবার একই প্রত্যাশা থাকে তার।

শুধু পারিবারিক সদস্যের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার নয় এটা। বাড়িতে অতিথি এলেও সাধারণত একই ব্যাপার ঘটে। অতিথি পুরুষরা আগেভাগে খেয়ে নেয়। পরে নারীরা খাদ্য গ্রহণ করে। অথবা অতিথি পুরুষ ও নারীরা একত্রে খাওয়াদাওয়া করে। পরে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাই ভাগবাটোয়ারা করে খেয়ে নেয় বাড়ির মেয়েরা। শহরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত কোনো কোনো পরিবারে একসঙ্গে এক টেবিলে বসে খাদ্য গ্রহণের রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু গোটা দেশের চিত্র এটা নয়। পর্যায়ক্রমে খাবার পরিবেশনের ফলে শুধু উন্নতমানের খাবারই নয়, মুখরোচক খাবারও যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করার সুযোগ পান শুধু পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই যাদের প্রথম খাদ্য পরিবেশন করা হয়। নারী কতখানি সময় ধরে রান্নার জোগাড় করে, কতখানি সময় রান্নায় ব্যয় করে, আর বিনিময়ে সে কতটুকু বা কী মানের আহার গ্রহণ করে এই খোঁজ কেউ নেয় না — পুরুষরা তো নয়ই। অথচ এই বোধ বা উপলব্ধি যতদিন না পুরুষের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে, তারা ক্রমাগত চিতলের পেটি অথবা মুরগির বুকের মাংস খেয়ে দেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে দিবানিদ্রা দেবে। আর তার স্ত্রী তখন সবে হেঁসেল গোছাতে গোছাতে শুধু ডাল অথবা মাছের ঝোলের সঙ্গে লঙ্কা মাখিয়ে এক গাদা ভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করবে। চিতলের বদলে চাপিলা অথবা নলা মাছ হলেও চিত্রটা ঠিক পালটায় না। শুধু রকমটা একটু ভিন্ন হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের জগতে নারীর বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ অবিচার চলে এসেছে — বৃহত্তর সমাজে পুরুষ ও নারীর অধিকারের মধ্যে যে বিশাল বৈষম্য রয়েছে, তার গোড়ায় রয়েছে নিজের ঘরের একান্তে একসঙ্গে বসে না খাওয়া থেকে উদ্ভূত বৈষম্য। ঘরের ভেতর সহমর্মিতা, সহানুভূতি, ন্যায্যতার বোধ যদি ঘুমিয়ে থাকে, বাইরের জগতে এসে হঠাৎ করে তার জেগে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

ভাবতে অবাক লাগে, কতটা স্বার্থপর, কতটা আত্মপ্রেমিক হলে পুরুষ সবার আগে ঘুম থেকে উঠে সবার শেষে ঘুমুতে যাওয়া মানুষটির — অর্থাৎ বাড়ির গৃহিণীটির খাবারদাবারের খোঁজ পর্যন্ত নেয় না। পুরুষ নিজে রাঁধে না এবং রান্নাজনিত আনুষঙ্গিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে না বলে অতি অসংবেদনশীল মানুষটির মতো অসময়ে ভরদুপুরে অথবা বিকেলে হঠাৎ এক গাদা তাজা পুঁটি বজুরী কিনে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত বা শখ ঘরের বধূটির দৈনন্দিন কাজ কতটা বাড়িয়ে দেবে, সে এখনো দ্বিপ্রাহরিক খাবার খেয়েছে কী খায়নি, এসবের কোনো খোঁজ নেওয়াই প্রয়োজন বোধ করে না গৃহস্বামী। একসঙ্গে বসে না খাবার কারণে, এবং রান্নার পরিমাণ ও রকম সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় আস্তে-আস্তে পুরুষ এতটাই অসংবেদনশীল হয়ে পড়ে যে সেটা শুধু নিজের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনো কখনো না বলে কয়ে দুপুরে বা রাতে খাবার খেতে সঙ্গে নিয়ে আসে এক বা একাধিক বন্ধু বা সহকর্মী। তাদের খাবার জুগিয়ে ঘরের বধূটি আদৌ কিছু খেতে পেল কি না, তার খবর কেউ রাখে না। ফলে, একত্রে বসে খাদ্যগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সকাল সন্ধ্যা যে কঠিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয় গৃহকর্ত্রীকে, তাতে তার নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া একান্তই দরকার। নারী শুধু সব তৈরি করবে, আর দান করবে, বিনিময়ে নিজের জন্যে কিছুই রাখবে না, গ্রহণ করবে না কোনো কিছুই, নারীর এই রকম এক আত্মঘাতী রূপকে আদর্শ বলে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো যুক্তিই নেই। ফলে তার দিকে ফিরে তাকাবার জন্যে শুরু হোক পরিবারে একত্রে খাদ্য গ্রহণ, প্রতিবেলা সেটা সম্ভব না হলেও অন্ত ত দুপুরে বা রাতে একবেলা একসঙ্গে বসে সবাইকে খেতে হবে। এতে খাদ্য বৈষম্য শুধু কিছুটা দূর হবে তা-ই নয়, নারীর স্বার্থত্যাগ, নিষ্ঠা ও অন্যের প্রতি দরদ সম্পর্কে সচেতন হবে পুরুষ — শ্রদ্ধা করতে শিখবে সেসব গুণাবলিকে। নিজেরা শিখবেও কিছু কিছু। এতে করে তার মধ্যে সহমর্মিতার বোধ জাগ্রত হওয়াও স্বাভাবিক। এ ছাড়া একসঙ্গে বসে খেতে খেতে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়, আলোচনা, সমস্যা ও ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে নিষ্পত্তি, প্রাত্যাহিক জীবনের ছোটখাটো ঘটনা, টুকিটাকি নিয়ে কথাবার্তা বা পরামর্শ অনেক কিছু করারই সুযোগ পায়, যা হয়তো অন্য সময়ে সম্ভব হয় না, কেননা সংসারে সবার অবসর একই সময় বের করা দুরূহ বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌন-সংযোগ ও সন্তান ধারণ : বিবাহিত জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যৌনতা, যা মানবিক অন্যান্য অনেক সম্পর্ক থেকে একে আলাদা করে। কিন্তু আমাদের সমাজে যৌনসঙ্গী নির্বাচনে যেমন নারীদের হাত নেই, যৌন পরিতৃপ্তির ব্যাপারটাও অধিকাংশের কাছে অপরিচিত। যদিও বাঙালির যৌনজীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না, তবু হুমায়ুন আজাদের এ ব্যাপারে মন্তব্য সঠিক বলেই মনে হয়। তিনি তাঁর 'নারী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বাঙালি নারীর যৌনজীবন বলাৎকার ও চরম বিরক্তি অবসাদের সমষ্টি। উচ্চশিক্ষিত কিছু নারী জানিয়েছেন, তারা পুরুষ সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাদের স্বামীরা লাফ দিয়ে উপসংহারে পৌঁছোন, এই তাদের কাম জীবন। দরিদ্র অশিক্ষিত নারীরা সাধারণত ভোগ করে স্বামীর বলাৎকার। বাংলাদেশের প্রতিটি শয্যাকক্ষ, যদি থাকে, নারীর জন্যে বলাৎকার বা বিরক্তি অবসাদ কক্ষ।' ভারতীয় population council-এর কর্মকর্তা এম. ই. খানের বাংলাদেশের ওপর গবেষণাও অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, বাঙালি পুরুষদের নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম কৌশল, নারীদের এ সম্পর্কে কিছু জানতে না দেওয়া। অজ্ঞতাই আশীর্বাদ দর্শন এটাই। খান দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ নারী তার যৌন জীবন অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে যৌনতা সম্পর্কে নেহাত অজ্ঞ হিসেবেই। সম্পূর্ণ যৌনজীবনের তৎপরতা ও তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ভার পুরুষের হাতে। নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা মতামত সেখানে গ্রাহ্য নয় মোটেই। পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে পুরুষেরা বাস্তবিক কারণেই আগ্রহী হলেও কখন এবং কী ধরনের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, সেটাও তারাই নির্ধারণ করে দিতে চায়। এই হলো বাস্তব অবস্থা। অথচ ছ-দশক আগে মোঃ ওয়াজেদ আলি নারী-পুরুষ সম্পর্কে বলে গেছেন, 'উভয় উভয়ের দৈহিক মানসিক ও যৌন শান্তি বিধানে অক্ষম বা অপ্রতুল অনুভূত হওয়া মাত্র তারা বা তাদের যে কোনো একপক্ষ বিবাহ সম্পর্ক ছেদন করতে পারবে। নর বা নারী কেউ কারো অধীন হবে না।' যারা সৌভাগ্যবতী, যারা নিজেরা পছন্দ করে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করেছেন (তাদেরও অধিকাংশই যৌনতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন বিয়ের পরই) অথবা পরিবারে নির্ধারিত বিয়ের পরও যৌনজীবনে পরিতৃপ্ত, তাদের কথা আলাদা, সংখ্যায় তারা অতি অল্পই। বৃহত্তর বিবাহিত নারীসমাজে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যখন শুধু স্বামীর কাম চরিতার্থ করার জন্যেই নারীর যৌনসংযোগ ঘটে, এবং সেটাই জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে তারা গ্রহণ করে নেয়, তখন অন্তত এটুকু স্বাধীনতা তাদের দরকার যে তার একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হবে না স্বামী। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই সেটা ঘটে না। স্বামীর কাম ভাব জাগ্রত হয়েছে অথচ স্ত্রী তা চায় না, নিস্তার পাবে কি সে? এটা শুধু আমাদের দেশে বা উন্নয়নশীল দেশের নারীদেরই সমস্যা নয়। জগৎজুড়েই রয়েছে এ সমস্যা — কম বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশেই স্বামী বা প্রেমিক কর্তৃক ধর্ষণের অভিযোগ শেষমেশ আইনে টেকে না। ফলে বাধ্য হয়ে কোনো কোনো বিচলিত ও নিরাশ নারী নিজের হাতে বিচার তুলে নেয়। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে সম্পূর্ণ বা আংশিক পুরুষাঙ্গ খুইয়েছে একাধিক ব্যক্তি। কিন্তু সমস্যার সমাধান এটা নয়। পুরুষ বরাবরই নারীকে তার ভোগের সামগ্রী মনে করে। সেই সঙ্গে তাদের অনেকের ধারণা, নারীর যৌন চাহিদা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই। যৌন জীবনে আমাদের দেশের পুরুষরা কখনো নারীকে সমান অংশীদার মনে করে না। তারা মনে করে, যৌনকর্মে নারীর একমাত্র ভূমিকা পুরুষকে পরম পুলকের আস্বাদ দেওয়া, অর্থাৎ কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে নিশ্চুপে নিজেকে সঁপে দিয়ে কেবল স্বামীর স্খলনের অপেক্ষা করা। এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। নারীরও যে যৌন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে — তারাও যে জাগ্রত হয় — পুরুষের সঙ্গ কামনা করে তাদেরও যে চরম পুলক অনুভব করার ক্ষমতা রয়েছে — দীর্ঘদিন ধরে তাদের অবদমন করে রাখা যে অমানবিক ও অস্বাস্থ্যকর, এ বোধ কবে আসবে আমাদের পুরুষদের মধ্যে? যতদিন তা না আসে, যতদিন নারীকে তার হাজারো কর্তব্যের মতো — দৈনন্দিন রুটিনের মতো — ছেলেকে ভাত খাইয়ে স্কুলে পাঠাবার মতো করে স্বামীর বাসনার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হচ্ছে, ততদিন অন্তত এটুকু আশা করা যাক যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা করবে না স্বামী। নারী যদি তার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কখন সে যৌন সংযোগে অংশগ্রহণ করবে, কখন নয়, তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবনই যে উন্নততর হবে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই যে শুধু বৃদ্ধি পাবে তা নয়, তাদের অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যাও হ্রাস পাবে, নারীর নিজের প্রতি আস্থা বাড়বে। মার্গারেট স্যাংগার বলেছিলেন, 'যে নারী নিজের শরীরের মালিক ও নিয়ন্ত্রক নয়, সে নারী কখনো নিজেকে স্বাধীন বলতে পারে না।' নারী যেহেতু নিজের শরীর দিয়ে সন্তান ধারণ করে, প্রসব করে, স্তন্যদান করে, সন্তানের প্রতিপালন করে, যৌন সংযোগ ও সন্তান ধারণের স্বাধীনতা ও মতামত তার থাকতেই হবে। এই অধিকার অস্বীকার করা মানে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করা। সেটা মহা অপরাধ। পরিশেষে, অনেক চড়াই উতরাই পার করে দেশ আজ আমাদের এক কঠিন ক্রান্তিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট্ট ভূখণ্ডে অনেক বেশি মানুষ থাকার কারণে স্বাভাবিক যেসব সমস্যা দেখা দেয়, তার বেশির ভাগ সমস্যাই আমাদের রয়েছে। তা সত্ত্বেও বাঙালি জাতির অক্ষয় অদমনীয় মনোবল, পরিশ্রমী দেহ, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, প্রযুক্তির আমদানি, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্রুত অগ্রগতি আজ আমাদের গোটা জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে অনেক সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছে। এ অবস্থায় নারীর জীবনেও ঘটে চলেছে বিপ্লব। শিক্ষাক্ষেত্রে বিনা বেতনে বা অতিসামান্য বেতনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, টিকা, জীবাণুমুক্ত পানীয় জল, ওরস্যালাইন, স্ল্যাবের পায়খানা, পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রী ও উঁচু মানের শস্যের বীজ ও মুরগি ছানার ব্যবস্থা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ছোটখাটো বিভিন্ন অর্থকরী কাজে বিনিয়োগের সুযোগ বাংলাদেশের নারীর আত্মপ্রত্যয় যেমন বাড়িয়েছে, পরিবারে তার অবস্থানও কিছুটা হলেও দৃঢ়তর করেছে সন্দেহ নেই। পোশাক শিল্পের অগ্রগতি, মহল্লায় মহল্লায় বড় বড় মুরগির খামার, কুটির শিল্পের প্রসার ও বাজারজাতের ব্যবস্থা, নির্মাণ ও বস্ত্র শিল্পে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ সাধারণ এবং নিম্নবিত্তের নারীদের অর্থ উপার্জনের পথও সুগম করেছে। এ ছাড়া শিক্ষা ও সেবামূলক পেশা ছাড়াও শহরের শিক্ষিত নারীরা আজ বাণিজ্যিক ও ব্যবস্থাপনার কাজেও লিপ্ত। সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙালি নারী হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে একটু-একটু করে স্বাবলম্বিতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটি সর্বজনবিদিত যে, কোনো দেশের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে নারীর অবস্থা ও অবস্থান। সেই বিচারে আমাদের নারীরা তাদের চলাচলের পরিধি আজ অনেকটাই বিস্তৃত করেছে। এই অবস্থায় পারিবারিক পর্যায়ে ওপরে উল্লিখিত চারটি মৌলিক বিষয়ে নারীর সচেতনতা ও তার অধিকার/নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দেশের সামগ্রিক নারী সমাজের স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতার সাফল্যকে অনেকটাই এগিয়ে দেবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরন্ধন

ভোর হইয়াও হইতেছে না। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে চারদিকে। শেফালী ফুলের সৌরভ আর সাদা কমলার অপূর্ব সমাহার রাধা বিছানা হইতেই স্পষ্ট টের পাইতেছে।

গতকাল রাত্রিতে স্বামী, শাশুড়ি অথবা ননদিনী কাহারও সঙ্গে কোনো রকম বচসা হয় নাই রাধার, যাহা যখন তখন, যেইখানে-সেইখানে প্রতিদিনই ঘটিয়া থাকে।

শরীরে বাড়তি উত্তাপ নাই — এতএব জ্বর যে হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য কোনো রকম দৈহিক বৈকল্য অথবা ক্লান্তিও অনুভব করিতেছে না সে।

বাহিরে বৃষ্টি নাই। আকাশ পরিষ্কার। সুনীল।

শীত অথবা উষ্ণতা কোনোটাই বিরক্তিকর পর্যায়ে উপনীত হয় নাই। রাধার একমাত্র সন্তান সাধন সম্পূর্ণ সুস্থ।

স্বামী ও পুত্র এখন পর্যন্ত পাশেই নিদ্রানিমগ্ন।

তবুও রাধা হঠাৎ স্থির করিল আজকে সে রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না। রাধা আজ রাঁধিবে না।

সূর্যকে ডাকিয়া রাধা বলিল, 'আজ তুমি দেরিতে উঠিবে। কারণ আমি অনেকক্ষণ বিছানায় থাকিব।'

অন্ধকারের সহিত কথা বলিবার সুযোগ হইল না। কেননা রাধার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বেই আঁধার বিদায় লইয়াছে।

পাখিকে ডাকিয়া বলিল রাধা, 'তোমারা আজ ঘুম ভাঙ্গানিয়া গান থামাইও না। আমি জাগিয়া জাগিয়া শুইয়া শুইয়া সেই গান শ্রবণ করিব।'

মেঘকে ডাকিয়া বলিল, 'সূর্যকে সাহায্য কর। উহাকে লুকাইয়া রাখ তোমাদের শাড়ির অঞ্চলে।'

শেফালীকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিলো, 'আর ঝরিয়া পড়িও না। মনে কর রাত্রি প্রভাত হয় নাই।'

শিশিরকে বলিল, 'তুমি বিন্দু বিন্দু ফোঁটায় ঘাসের উপর নামিয়া আসিতে থাক।'

সূর্য কথা শুনিল রাধার। অনেকক্ষণ সে আকাশে উদিত হইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘ আসিয়া সুনীল আকাশ ঢাকিয়া রাখিল।

পাখিরা রাত্রিশেষের গান ক্রমাগত গাহিতে লাগিল।

শেফালী বোঁটা শক্ত করিয়া আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য লইয়া বৃক্ষে শোভা পাইতে লাগিল।

শিশিরবিন্দু অনবরত ঘাসের উপর ঝরিয়া পড়িয়া তাহাদের ভালোবাসায় সিক্ত করিল।

রাধা আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া এপাশ হইতে ওপাশে গড়াইয়া শুইল।

ইতোমধ্যে বাড়িতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিতে সকলেরই বিস্তর বিলম্ব ঘটিয়াছে আজ।

নামতা আর আদর্শলিপি ভুলিয়া সাধন পুনঃপুন বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

রাধার স্বামী আয়ানের হাটে যাইবার সময় উপস্থিত।

ননদিনী বিদ্যালয়ে যাইতে প্রস্তুত।

প্রভাতী উপাসনা সাঙ্গ করিয়া শাশুড়ি ঠাকুরণ দিনের প্রথম আহার গ্রহণ করিতে উন্মুখ।

অথচ রাধা তখনো শয্যায়।

রাধা আজ রাঁধিবে না। রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

'কী হইল? হইলটা কী?'

'সকলেই কি উপবাসী হইবে আজ?'

'ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হইতেছে না।'

সমস্বরে শাশুড়ি, ননদিনী ও স্বামীর ব্যাকুল প্রশ্ন।

রাধার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই।

শয্যা ছাড়িয়া সে মন্থর গতিতে মাটিতে নামিল।

ঘরের কোণায় রক্ষিত কলসিখানা কাঁখে লইয়া ধীরে ধীরে পুকুরের দিকে ধাবিত হইল।

'পুত্র কি আমার বিনা আহারেই কাজে যাইবে আজ?'

রাধা নিরুত্তর। শাশুড়ি ক্রুদ্ধ।

'বলি এত দেমাগ কোথা হইতে আসিল? হইলটা কী?'

রাধা নিরুত্তর। স্বামী বিস্মিত।

'বৌঠান, আমার পাঠশালায় যাইবার সময় হইল।'

রাধা নিরুত্তর। ননদিনী বিষণ্ন। চিন্তিত।

পুকুরঘাটে আসিয়া জলে পা ডুবাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে রাধা। পশ্চাতে মিলিতকণ্ঠের গুঞ্জন নয় — রীতিমতো চিৎকার। ইতোমধ্যেই তীব্র বিলাপের মাধ্যমে পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকজনকে একত্রিত করিয়াছেন শাশুড়ি। রাধা নির্বিকার। জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপচাপ বসিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে সে।

পুঁটি, বজরী, খলিসা, আর কাজলী ঝাঁক বাঁধিয়া দৌড়াইয়া আসে রাধার পায়ের কাছে।

'যাও তোমরা এইবারটি সরো! তোমাদের কাহারও জন্যে আহার আনি নাই আজিকে।'

মাছেরা তবু সানন্দে ডিগবাজি খায়। রাধার উপস্থিতিই তাহাদের চঞ্চল করে। অন্য কিছু চাহে না তাহারা।

আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাধা। মুখ টিপিয়া সূর্য হাসে।

'রাগ করিয়াছ?' সূর্যের প্রশ্ন।

'কেন, আরেকটু বিলম্ব সহিল না তোমার?' অভিমান-বিক্ষুব্ধ স্বরে রাধার জিজ্ঞাসা।

'ক্ষেতের শস্যসমূহে দৃষ্টি বুলাইলেই বুঝিবে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইলে কি ঘটিত।'

রাধা পুকুরপাড়ে মৃতপ্রায় শস্যক্ষেত্র অবলোকন করে। 'উহারা বাঁচিবে তো?' রাধা চিন্তিত।

'তুমি একবার হাসিলেই উহারা আবার জাগিয়া উঠিবে।'

রাধা দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের চারিদিকে এক পাক ঘুরিয়া মন খুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার দুই বাহু দুইদিকে শূন্যে প্রসারিত।

রাধা হাসিতেছে। হাসিতেছে। হাসিতেছে।

সবুজ শস্যক্ষেত্র যেন এইমাত্র ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। নড়িয়াচড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল তাহারা।

রাধা হঠাৎ আবিষ্কার করিল তাহার স্বামী আসিয়া দুই ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকাইতেছে তাহাকে।

চোখের সম্মুখে শাশুড়ি অগ্নিদৃষ্টি আর কঠিন বাক্যবাণ দিয়া তাহার সম্পূর্ণ শরীরে হুল ফুটাইতেছে।

ননদিনী অভিমানে ক্রন্দন করিতেছে।

রাধা তবু হাসিতেছে। হাসিতেছে। হাসিতেছে।

রাধা হাসিতেছে।

রাধার সঙ্গে তাল মিলাইয়া শিরশির করিয়া হাওয়া বহিতেছে।

পুকুরের জল ছোট তরঙ্গ তুলিয়া খিলখিল করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

পাখিরা কিচিরমিচির শব্দে অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে।

মাছেরা নাচিতেছে — ভাসিতেছে — ডুবিতেছে।

ফুলেরা পাতার সহিত একতা ঘোষণা করিয়া মৃদুভাবে মাথা নাড়াইতেছে।

রাধা হাসিতেছে। হাসিতেছে। হাসিতেছে।

ক্রোধান্বিত স্বামী আছাড় দিয়া ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাটের পথে যাত্রা শুরু করে।

শাশুড়ির বিলাপ আর অভিশাপ উচ্চলয়ে বাজিতে থাকে।

ভীত ননদিনী এক-পা দুই-পা করিয়া প্রতিবেশীর বাড়ি সরিয়া পড়ে।

পুত্র সাধন আস্তে আস্তে আসিয়া দাঁড়ায় পুকুরের কিনারায়।

রাধা তবু রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

রাধার মাথাটা হঠাৎ এক পাক ঘুরিয়া যায়।

বমনের ইচ্ছা একবার বুক চাপিয়া উঠিয়া আসে। কোনোমতে তাহা দমন করে সে।

মাটিতে বসিয়া পড়ে রাধা। আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়। সে যে অসুস্থ নহে সেই সম্পর্কে সে অবগত। জীবনের সবচাইতেই সুস্থ প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই যে অসুস্থতার জন্ম দেয় রাধা কেবল তাহাই অনুভব করিল একবার। সুতরাং সে ভীত নহে।

'মা আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে।'

দূর হইতে কে যেন আবার বলিল, 'মা আমার খুব ক্ষুধা লাগিয়াছে।'

রাধার হৃদয়ে একটা বড়রকম তোলপাড় শুরু হইল। শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ উপস্থিত হইল প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব। পুত্রকে বুকে জড়াইয়া সে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল জলের দিকে।

তারপর আকাশের দিকে। সূর্যের দিকে। তারপর গাছ, পাখি, ফুল, পাতার দিকে।

AMARBOI.COM

রাধা তাহার চারিদিকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকে।

একটা কাক উড়িয়া আসিয়া টুপ করিয়া একখান ছোট্ট পাকা পেঁপে ফেলিয়া গেল রাধার কোলে। দুই হাতে তাহা খুলিয়া রাধা পুত্রের মুখে পুরিয়া দিল। সাধনের ক্ষুধা তাহাতে মিটিল না। রাধা মাছরাঙাকে ডাকিয়া কহিল, 'পুকুরের মধ্যখানে যে শাপলা ঝাড়, তাহার মধ্য হইতে সবচাইতে বড় ঢ্যাপটা তুলিয়া আন আমার সন্তানের জন্যে।'

ঢ্যাপটা আকারে বৃহৎ — ক্ষুধা নিবারণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু রাধার পুত্র তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ভক্ষণ করিল।

'মা আমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে। তুমি রাঁধিবে না?'

চতুর্থ বর্ষ সমাপ্ত করিয়াছে সাধন। উহার উদরে এখন প্রচণ্ড ক্ষুধা। গাছের সামান্য ঐ ফল কেমন করিয়া পারিবে এই ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে?

'মা, তুমি রাধিবে না?'

বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহে। আর বুঝি পারা যাইবে না। তবু কোনোমতে রাধা কহে, 'না।'

রাধা রাঁধিবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না। রাধা আজ রাঁধিবে না।

সাধনকে বক্ষে চাপিয়া পুকুরঘাট হইতে রাধা ফলের বাগানের গহীনে চলিয়া আসে। জোড়াসন কাটিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পুত্রকে কোলের উপর শোয়াইয়া দেয়। তারপর একবার এইদিক একবার ঐদিক সতর্কতার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আশেপাশে কেহই নাই। হাওয়ার দাপটে জামরুল আর কাঁঠালগাছগুলির ডালপাতা নড়িয়াচড়িয়া রাধার চারিদিকে একটা মৃদু বেষ্টনীর সৃষ্টি করে। রাধা আস্তে আস্তে বুকের কাপড় সরায়। খোলা আকাশের নিচে তাহার উন্মুক্ত বক্ষের সুদৃঢ় ও সুপুষ্ট স্তনযুগল সূর্যের আলোতে ঝলমল করে। রাধা তাহার বাম স্তনবৃন্ত সন্তানের মুখে তুলিয়া দেয়। আর তাহার দক্ষিণ হস্ত অনবরত সাধনের মাথা, চুল, কপাল আর চক্ষে আদর বিলাইতে ব্যস্ত থাকে। অনভ্যস্ত সাধন প্রথম কয়েক মুহূর্ত ঘটনার আকস্মিকতায় চমকাইয়া যায়। তাহার পর ধীরে, খুব ধীরে সে মায়ের স্তনকলি অতি আগ্রহে মুখের ভিতর টানিয়া লয়। প্রথমে একটু, তারপর আরো একটু জোরে, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়া সাধন তাহার সবচাইতে নিরাপদ খাদ্য মায়ের শরীর হইতে শুষিয়া লইতে চেষ্টা করে।

রাধা চিন্তিত। রাধা উন্মুখ। কিছুই ঘটিতেছে না। এখন সে কী করিবে? মেরুদণ্ড সোজা করিয়া হাঁটু ছড়াইয়া আরো আরাম করিয়া বসে রাধা। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলায়। দাঁতে দাঁত চাপিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রাধা কিছু কামনা করে — ইচ্ছা করে। আর ঠিক তক্ষুনিই তাহা ঘটে। ঝর্ণার মতো কুল কুল করিয়া, সমস্ত শরীর শিরশির করিয়া কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া, দুই পাড় প্লাবিত করিয়া, বাঁধভাঙা বন্যার মতো নামিয়া আসে কিছু তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া।

রাধা তাকায় সন্তানের মুখের দিকে।

খিলখিল করিয়া হাসিতেছে সাধন।

আর তাহার ক্রিয়াশীল ঠোঁটের দুই কষ বাহিয়া সাদা সাদা দুধের ফেনা ঝরিয়া পড়িতেছে মাটিতে টুপ টুপ করিয়া।

রাধা হাসিতেছে।

সাধন হাসিতেছে।

মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এক পায়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শালিক বিশ্রাম লইতেছে। মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে।

রাধা হাসিতেছে।

সাধন হাসিতেছে।

রাধা ঠিক করিয়াছে আজিকে সে রাঁধিবে না।

রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না।

রাধা আজ রাঁধিবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা

আয়োজন

পদ্মার ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে ছোট নিরিবিলি গ্রাম তারপাশা। আশপাশেই রহিয়াছে হলদিয়া, ষোলঘর, শ্রীনগর, শিমুলিয়া ও দিঘলী। সন্ধ্যা হইতে বেশি বাকি নাই। হেমন্তের মাঝামাঝি সময়। বেলা পড়িতে না পড়িতেই এখন শীত নামিয়া আসে।

সকাল হইতেই সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া একটা উৎসব উৎসব আমেজ। রহিমার নিকানো উঠানের উত্তর ধারে বসানো বিশাল মাটির উনানটায় আজ অপরাহ্নে আগুন জ্বালানো হয় নাই। ধান সিদ্ধ করিবার এখন সময় কোথায় তাহার? কন্যা সুফিয়ার মাথায় ভালো করিয়া তৈল মাখাইয়া দেওয়া হয় না অনেক দিন। চুল তো নয়, যেন পাটখড়ি। রহিমা প্রথমে কন্যার মাথার ঠিক মধ্যস্থলে বোতল হইতে বেশ খানিকটা আধা জমা সাদা সাদা নারিকেল তৈল ঢালিয়া দিল। তাহার পর ডাইন হাতের তালু কন্যার মাথায় ক্রমাগত চপাস চপাস শব্দে উঠানামা করাইয়া সম্পূর্ণ তৈলটিকে মাথাময় ছড়াইয়া দিতে থাকিল। মনে মনে ভাবিল, যদি এই সুশীতল তৈলের খানিকটাও মস্তিষ্কের ভিতরে কোনোরকমে ঢুকাইয়া দেওয়া যায়! সে শুনিয়াছে নারিকেল তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে — অন্তর নির্মল করে। এই সময় — গ্রামের এই ভরা দুর্দিনে বড় প্রয়োজন শরীর ও মন ঠাণ্ডা রাখা। সুফিয়ার মাথায় যেন কোনো কুমতলব ভর না করে। রহিমা আরো খানিকটা নারিকেল তৈল ঢালিল কন্যার মস্তকে। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া সুফিয়ার চুলগুলি ভালো করিয়া কাঁকই দিয়া আঁচড়াইয়া দিল। দুই ধারে দুইটি বেণী গাঁথিয়া, প্রতিটি বেণী দুই ভাঁজ করিয়া লাল ফিতা দিয়া কানের পাশে ফুল করিয়া দিল। গ্রামের একটি কন্যার দুর্দশা আর পতনে অন্য কন্যাদের প্রতি পিতামাতার বড়ই নজর, অন্তত আজিকার এই সন্ধ্যা বেলায়। রহিমা এইবার ওজু করিয়া আসরের নামাজটা আদায় করিয়া লইবে। উহার পর অন্যান্য প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে যাইবে সালেহাদের বাড়িতে।

সালেহাদের ঘরের দরজার বাহিরে প্রচুর লোকসমাগম এখন। পুরুষরা সকলেই বাহিরে। উঠানে পাতিয়া দেওয়া হোগলার উপর একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছে বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, তরুণ ও কিশোর। দেখিয়া মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, গ্রামের লোক তো বটেই, ভিন্ন গ্রাম হইতেও মানুষ আসিয়াছে। সকলেই কাহারো না কাহারো সঙ্গে খোশগল্পে মত্ত। কেউ কেউ আবার ইহারই মধ্যে হুক্কায় সুখটান দিতেছে। কেউ পান চিবায়। কাহারো কাহারো হাতে জ্বলন্ত বিড়ি।

ঘরের ভিতরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে সালেহা। তাহাকে ঘিরিয়া জটলা করিতেছে পাড়ার মহিলারা। সালেহা কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না। একেবারে ভাবলেশহীন বসিয়া রহিয়াছে। পরনে সবুজ সুতি শাড়ি। তাহার লম্বা কালো চুল পিছনের দিকে টানিয়া আঁচড়াইয়া একটা শক্ত খোঁপায় প্যাঁচানো।

মাগরিবের নামাজের পরপরই সালিশি বসিবে। আকমল মোল্লা চোখে কম দেখেন আজকাল। খদ্দরের পুরাতন চাদরখানা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়াছেন। নাতির কাঁধে হাত দিয়া লাঠিতে ঠকঠক শব্দ করিতে করিতে রহমতের গোয়ালের পাশ দিয়া চলিয়াছেন আজিকার সভায় যোগ দিতে। বালির পুকুরের পাশের বিশাল মাঠ আর তালগাছের সারি ভাঙ্গিয়া গোপালদের রান্নাঘরের পিছনে যে বিরাট খাদ, তাহার পাশ কাটাইয়া এদিকেই আগাইয়া আসিতেছে আরো দশ-বারজন নারী-পুরুষ। আজিকে বোধহয় কেহই আর নিজের ঘরে রহিবে না। সালেহার ভাগ্য নির্ধারণ করিতে সকলেই আজ অংশগ্রহণ করিবে। পশ্চিম দিকের কালু শেখের কলাই ক্ষেতের আইল ধরিয়া একজনের পিছনে একজন করিয়া হাঁটিয়া আসিতেছে সাত-আটজন। তাহাদের কাহারো হাতে নিবানো কুপি, কাহারো হাতে আলোহীন হারিকেন। রাত্রিবেলা ঘরে ফিরিয়া যাইবার পূর্বপ্রস্তুতি। সকলেরই গন্তব্য সালেহাদের বাড়ি। অবশেষে আসিলেন গ্রামের বৃদ্ধ কাজী। আসিলেন শহরে পড়াশুনা করা মসজিদের যুবক ইমাম। আসিলেন মাদ্রাসার মৌলভী। আসিলেন চৌধুরীবাড়ির মেজ সাহেব। বড় সাহেব পক্ষাঘাতে পঙ্গু। মেজই এখন সমস্ত গ্রামের মুরুব্বি। সবার শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল কাশেম মোল্লা ও তাহার পিছনে পিছনে মাথা নিচু করিয়া কাশেম মোল্লার একমাত্র পুত্র সোবহান। দেখিয়াই বোঝা যায়, সোবহানের হাঁটিতে বেশ কষ্ট হইতেছে। খানিকটা কুঁজা হইয়া, তলপেটের দিকটা ভিতরের দিকে টানিয়া লইয়া, বুকটা সামনে ঝুঁকাইয়া, ডাইন পা টানিয়া টানিয়া সোবহান আসিয়া উপস্থিত হয় সালেহাদের উঠানে। এইখান হইতেই রক্তাক্ত সোবহান রাত্রের অন্ধকারে চিৎকার করিতে করিতে পালাইয়াছিল গত সপ্তাহে।

সকলেই বসিয়া আছে হোগলাতে। সংবাদপত্রের লোকও আসিয়াছে একজন। পূর্বদিকের কোণায় চুপচাপ বসিয়া আছে। শুধু সোবহানই একা দাঁড়াইয়া থাকে। বৃদ্ধ পিতা কাশেম হাতে করিয়া লইয়া আনিয়াছে একটা উঁচু জলচৌকি। উঠানের এক কোণায় সেই বিশাল কাঠের জলচৌকিটা পাতিয়া দেয় সে। তাহার পর হাত কচলাইতে কচলাইতে সমবেত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামবাসীর কাছে আহত পুত্রের পক্ষে মাটিতে বসা অত্যন্ত কষ্টকর এই বিবেচনায় তাহাকে জলচৌকিতে বসিতে দিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। ইমাম সাহেব ও মেজ চৌধুরী পরস্পরের সঙ্গে চক্ষু চাওয়া-চাওয়ি করিয়া কাশেমের অনুরোধ অনুমোদন করিলে সোবহান আস্তে আস্তে জলচৌকিতে উপবিষ্ট হয়। বসিবার সময় বাম হাত দিয়া দুই উরুর মাঝখানে লুঙ্গির কুঁচকানো অংশ চাপিয়া ধরিতে হয় তাহাকে। দাঁত দিয়া নিচের ঠোঁটটিকেই জোরে কামড়াইয়া ধরে সোবহান। উঠানের লোকজনের মধ্য হইতে এই সময় নানান রকম অস্পষ্ট ধ্বনি ও কথা ভাসিয়া আসে। সোবহান মাথা নিচু করিয়া বসিয়া থাকে।

ইতোমধ্যে সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। দিঘলী বাজারের করিম ব্যাপারি তাহার দোকান হইতে আনা একটা হ্যাজাক লাইট জ্বালাইয়া অন্যটিকে জ্বালাইবার জন্যে হ্যাজাকের তলার দিকে অবস্থিত কেরোসিনের ভাণ্ডারটিতে অনবরত পাম্প করিয়া চলিয়াছে। হোগলার উপর চাদর মুড়ি দেওয়া এতগুলি মানুষ। উঠানের এই পাশে একটি গয়া ও জাম্বুরা গাছ, অন্য পাশে দুইটি বরই গাছ, দুই দিকে দুইটি ছনের ঘর, হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোতে এই সব কিছু — সমস্ত পরিবেশটা কেমন অপরিচিত অবাস্তব মনে হয়।

বিচার

AMARBOI.COM

সালেহাদের ঘরের যে দরজা জাগ্রত গৃহবাসীদের নিয়ে কখনো বন্ধ হয় না, সবসময় যা হাঁ করে খোলা থাকে, সেখানে আজ লম্বা ভারী কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। পর্দার বাইরে উঠানের কোণে ঘরের দোরগোড়ায় একটা লম্বা বেঞ্চি পাতা হয়েছে। ওখানে এসে একে একে বসেছেন ইমাম সাহেব, কাজী, মেজ চৌধুরী, মৌলভী ও আকমল মোল্লা। পর্দার ওপারে ঘরের ভেতর চৌকিতে বসে আছে সালেহা। সালেহার মা ঘরের অন্যপাশে মাটিতে স্থির হয়ে বসে আছে, মাথাটা বেড়ার গায়ে কাত হয়ে হেলান দেয়া। গ্রামের অন্যান্য মহিলা ঘরের ভেতর থেকে পর্দা ও বেড়ায় ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে।

প্রথমেই চৌধুরী সাহেব আজকের সালিশের মূল অভিযোগ এবং বাদী ও বিবাদী শনাক্ত করেন। তাঁর নির্দেশে উঠান থেকে কাশেম মোল্লা ও সোবহান এবং ঘরের ভেতর থেকে সালেহা স্ব স্ব হাজিরার ঘোষণা দেয়। এরপর কাজী সাহেব সালেহা ও কাশেমকে উদ্দেশ করে উপদেশ দেন যাতে তাদের যা যা প্রশ্ন করা হবে, সেগুলোর সঠিক, স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় তারা। এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ সালিশির ভার গিয়ে পড়ে মসজিদের ইমামের ওপর, যিনি বয়সে তরুণ হলেও জ্ঞানে ও মর্যাদায় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। ইমাম সাহেব প্রথমে সালেহাকেই জেরা করতে সাব্যস্ত করেন।

ইমাম : আপনের নাম, পিতার নাম, বাসস্থান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহা : সালেহা বেগম, পিতা মরহুম ফজলুল মিঞা, বাড়ি তারপাশা, বিক্রমপুর।

ইমাম : আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনে গত দিবাগত রাইত আটটার সময় কাশেম মোল্লার পুত্র সোবহান আলীর পুরুষাঙ্গ একটি বঁটি দিয়া প্রায় অর্ধেক কাইট্যা ফেলাইছেন। এ অভিযোগ সত্য?

সালেহা : জ্বি।

বাইরে অস্ফুট গুঞ্জন। কাজী সাহেব হাতের ইশারায় জনতাকে শান্ত হতে বলেন। সোবহান তার জলচৌকিতে একটু নড়েচড়ে বসে। যন্ত্রণাটা এই মুহূর্তে যেন একটু বেড়ে গেছে তার। কাশেম মোল্লা তার ডান হাতখানা আলতোভাবে একবার ডান গালে, একবার বাঁ গালে ছোঁয়ায় আর আস্তে আস্তে 'তোবা তোবা' উচ্চারণ করে।

ইমাম : এই ঘটনার কোনো সাক্ষী আছে?

সালেহা : না।

ইমাম : আপনার আম্মা তখন কই ছিল?

সালেহা : রোকেয়াগো বাড়িতে ধান বানতে গেছিল।

ইমাম : ক্যান কইরতে গেলেন এই কাম?

সালেহা নিশ্চুপ।

ইমাম : হ্যায় কি আপনার শরীরের উপর সবসময় জবরদস্তি করত?

সালেহা : না।

ইমাম : তাহলে?

সালেহা নিশ্চুপ।

ইমাম : যেদিন আপনে তার পুরুষাঙ্গ কাইট্যা দিলেন সেইদিন ছাড়াও কি সে, মানে হের আগেও কি সোবান আপনার গায়ে হাত দিছে?

সালেহা : হ, দিছে।

ইমাম : কতদিন আগে হেয় প্রথম এই কাম করছে?

সালেহা : তিন বছর আগে। টাউনে পইড়তে যাইবার আগে।

আবার বাইরে তুমুল গুঞ্জন। প্রায় প্রত্যেকের মুখ থেকে 'ওয়াস্তাক্ ফেরুল্লাহ' জাতীয় শব্দ উচ্চারিত হয়। মৌলভী সাহেব ও মেজ চৌধুরীর ঠোঁটজোড়া ক্রমাগত শব্দহীন নড়াচড়া করে। ইমাম সাহেব একবার গলা খাঁকারি দিয়ে স্বরটা পরিষ্কার করে নেন। তারপর বাঁ হাত দিয়ে থুতনির কালো দাড়িতে আস্তে আস্তে হাত বুলান। বৃদ্ধ কাজী জোরে জোরে 'নাউজুবিল্লাহ' আওড়ান।

ইমাম : আপনি এমন দুষ্কর্ম ক্যান কইরলেন?

সালেহা চুপ।

ইমাম : সোবান কি আপনারে মিথ্যা কথা কইছে? প্রতারণা করছে?
সালেহা : না।

ইমাম : সে কি আপনারে বিবাহের লোভ দেখাইছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহা : না। তবে তিন বছর আগে হ্যায় বিয়ার কথা কোনো সময় মুখে লইত না। এইবার শহর থেইক্যা ফিরা আইস্যা কিন্তু বিয়ার প্রস্তাব করছে কয়েকবারই।

ইমাম : বিয়া হয় নাই ক্যান?

সালেহা : আমি রাজি অই নাই।

ইমাম : ক্যান?

সালেহা : আমি জানি আমার লগে বিয়াতে কেউ মত দিব না।

ইমাম : সোবান কি আপনারে ডর দেখাইত? মানে আপনে তার লগে মিলতে রাজি না অইলে সে আপনের ক্ষতি করব, লোকের কাছে সব বইল্যা বেড়াইব, নিন্দা করব, এমন কথা কইত?

সালেহা : না।

ইমাম : তাহলে আপনি ক্যান, এই কাজ কইরলেন?

সালেহা চুপ।

ইমাম : আপনে কি ডরাইতেন ঐবার সে শহরে যাইবার আগে আপনের যে অবস্থা কইরা গেছিল, আবার ঐ অবস্থায় পড়বেন?

সালেহা : না। তিন বছর আগে আমি অনেক কিছুই জানতাম না। বোকা আছিলাম। তাই বিপদে পড়ছিলাম। এখন জানি কি কইরতে অয়। আর ডরাই না।

উঠানে এবং ঘরে সমস্বরে নানাবিধ ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। কাজী সাহেব বেঞ্চি থেকে উঠে দ্রুত ঘরের পেছনের দিকে প্রস্থান করেন। মৌলভী সাহেব 'নাউজুবিল্লাহ' 'নাউজুবিল্লাহ' বলে দু'হাত দু'কানের পাশে ধরে মাথার টুপিটি সোজা করে বসান। রহিমা ঠেলেঠুলে সুফিয়াকে ঘরের উল্টোদিকে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলে সে নিজেকে ক্রমাগত দোষারোপ করে।

ইমাম : আপনে ক্যান এই কাজ কইরলেন? যখন সোবান আপনারে ছুঁইত, আপনের কি খুব খারাপ লাগত?

সালেহা : না, খারাপ লাগত না। বালই লাগত। বেশির ভাগ সময়েই খুব বাল লাগত।

সমবেত কণ্ঠে আবার 'ওয়াস্তাক্ ফেরুল্লা' উচ্চারিত।

ঘরের ভেতরে মহিলাদের প্রত্যেকের মুখে আঁচল। ইমাম সাহেব এবার শব্দ করে নয়, নিজেকে পাক পবিত্র করার জন্যে মনে মনেই কাঙ্ক্ষিত শব্দগুলো আওড়াতে চেষ্টা করেন। তার পাতলা ঠোঁট দুটো অনিয়ন্ত্রিতভাবে নড়াচড়া করতে থাকে ক্রমাগত।

ইমাম : আপনে কি জানতেন যে কাজ আপনে করতাছিলেন, সেটা জেনা? জাহান্নামে যাইতে অইব? দোজখের ডর নাই আপনের?

সালেহা : দোজখে যখন যাইতেই অইব, ডরাইয়া আর করুম কী?

ইমাম : যে লোকটা আপনারে বিপদে ফালাইয়া শহরে চইল্যা গেল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার তার লগেই মিলামিশা কইরতে আপনার শরম লাগল না? গিন্না লাগল না?

সালেহা : লাগছিল। তারপরে বুজলাম আমার আর কোনোদিন বিয়া অইব না। গরু-বাছুর দেখন, পাককরণ, ধান সিদ্ধকরণ — এই গতর খাটাইয়াই জীবন কাটব। আর মা'র পিছা লাথ্যি তো খাইতে অইব সবসময়। সোবান ভাই আমারে পছন্দ করে। আমারে কোনো সময় বকাবকি করে না। হ্যায় যখন আইত আমার খুব বাল লাগত। অনেক আনন্দ দিছে আমারে সোবান ভাই। আর হেইবার শহরে যাইবার আগে আমার বিপদের কথা হ্যায় জানতও না।

বাইরের লোকজনের মধ্যে এবার উত্তেজনাটা আর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কিনা সন্দেহ। কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মন্তব্য করে। মেয়েটির বেহায়াপনায় ঘরের ভেতরের মেয়েরাও স্তম্ভিত, লজ্জিত। সালেহার মা ক্রমাগত মাটিতে মাথা ঠোকে। মহিলারা সকলেই তাদের ঘোমটা আরো বড় করে টেনে দেয়, যদিও ঘরের ভেতর কোনো পুরুষ নেই। ইমাম সাহেব আবারও নিজেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে মনে মনে দোয়া-দরুদ পড়তে থাকেন। সালেহা পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে কান খাড়া করে।

ইমাম : সোবান কী করছিল ঐদিন? হঠাৎ ক্যান আপনে এত ক্ষেইপ্যা গেলেন? আপনারে মারছে? বকাবকি করছে? কাইজ্যা করছিলেন আপনেরা?

সালেহা : না।

ইমাম : তাইলে?

সালেহা একটু চুপ থাকে। যে কথাটা না বলার জন্যে বহুভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল সে, অবশেষে তা বেরিয়েই আসে। সালেহা আস্তে করে বলে, 'আমার হেদিন ইচ্ছা করে নাই।'

কী? কী বলল সালেহা? সকলে উৎকর্ণ হয়ে পড়ে। উপস্থিত গ্রামবাসী প্রত্যেকেই শুনতে চায় কথাটা। ভালো করে শোনা যায়নি কী বলেছে সালেহা।

কী? কী করে নাই? কী শব্দ উচ্চারণ করল সালেহা? যারা শুনতে পেয়েছে তারাও নিজেদের কানকে অবিশ্বাস করে আবার শুনতে চায়। যারা শুনতে পায়নি, তাদের আগ্রহ এখন তীব্রতর হয়।

ইমাম : আপনের সেই মনের কথা তারে জানাইছিলেন?

সালেহা : হ, কইছিলাম।

ইমাম : সে কী কয়?

সালেহা : পাত্তা দেয় নাই। জোর কইরতে চাইল।

ইমাম : এর আগে আর এমন করছে?

সালেহা : হ, গত সপ্তায়ই করছিল। আমার ইচ্ছা নাই জাইন্যাও সে জোর করছিল।

ইমাম : তখন আপনি কী করছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহা : তার উপুড় করা মুখে স্যাপ ছিটাইয়া দিছিলাম।

আবার সমবেত গ্রামবাসীর মধ্যে মিলিত গুঞ্জন। মৃদু উত্তেজনা। অনেকগুলো অশ্লীল ও তির্যক মন্তব্য।

ইমাম : সে কী করল তখন?

সালেহা : স্যাপ মুইছ্যা ফালাইয়া হাইস্যা কইল, তরে রাগ করলে খুব সুন্দর লাগে। তারপর যা কইরতে চাইছিল তাই করল। এইবার তাই আমি ঐ সুযোগ দেই নাই।

বাইরের লোকজন এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তারা এখনো শুনতে পায়নি সালেহার অপরাধের পেছনের কারণটি কী। বড় আস্তে সে কথাটি বলেছিল সালেহা। শব্দটা শ্রুতিগোচর হয়নি। গ্রামবাসীদের অনুরোধে ইমাম সালেহাকে নির্দেশ দেন কেন সে এই কাজ করেছে সেই জবাবটা জোরে আরেকবার বলতে, যাতে সকলে শুনতে পায়। সালেহা তখন পর্দা সরিয়ে দরজার বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি ঐকাজ করছি এর লেগ্যা যে, ঐদিন আমার ইচ্ছা করে নাই, তারপরেও হ্যায় জোর করছিল।'

শুধু সোবহান নয়, কাশেম মোল্লা নয়, মসজিদের সদ্যবিবাহিত জোয়ান ইমাম, তার পাশের বৃদ্ধ কাজী, মৌলভী সাহেব বা মেজ চৌধুরীও নয়, তামাম গ্রামবাসীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হ্যাজাক লাইটের উজ্জ্বল আলোতে ঘরের দরজার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে সালেহা। মনে হয় সে যেন এ গ্রামের কেউ নয়। যেন মূর্তিমতী এক ইচ্ছাময়ী দেবী অথবা কোনো প্রেতাত্মা।

AMARBOI.COM

ইচ্ছার বৃক্ষ আরোহণ

সালেহার কণ্ঠনিঃসৃত অনুচ্চ, ছোট্ট ও মোলায়েম শব্দটি হঠাৎ বেগবতী হইয়া ওঠে।

আর তখন ইচ্ছা একটি স্বরবর্ণের পিছনে দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ, যাহা দৃশ্যত ও শ্রুতিগতভাবে খুবই কাছাকাছি, একে অন্যের পিঠে চড়িয়া সমস্ত গ্রামময়, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, মনের খুশিতে ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে।

ইচ্ছা এখন গাছের ডালে।

ইচ্ছা ঘরের চালে।

ইচ্ছা আকাশে।

ইচ্ছা বাতাসে।

ইচ্ছা মাটিতে, পানিতে, কাদায়, মানুষে।

রাবেয়া আজ স্থির করিয়াছে চুল বাঁধিবে না। এলো চুল পিঠময় ছড়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া দরজায় সামনে বসিয়া আছে সে। তাহার লম্বা ঘন কালো চুলের কোঁকড়ানো সিঁড়ি বাহিয়া আঁধার চুঁইয়া চুঁইয়া নামিয়া আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরণীতে। ত্রয়োদশীর বিশাল চাঁদ বুকে লইয়াও সুনীল আকাশ সেই গহীন অন্ধকার হইতে এই তারপাশা গ্রামটিকে আলোকিত করিতে ব্যর্থ হয়।

রামতনুর ছোট মেয়েটি আজ নামতা পড়িবে না। কেননা সংখ্যা আর গুণফলে তাহার আসক্তি নাই এক্ষণে। সে জোরে জোরে ছড়া আওড়াইতে থাকে। জোবেদা আজ রাঁধিবে না। তাহার শাশুড়ি ও স্বামী গিয়াছে সালিশিতে। সে তাই আজ আয়াস করিতে চায়। রান্নায় মন নাই। শেফালী আর গন্ধরাজের কলি আজিকার রাত্রে প্রস্ফুটিত হইবে না। এই ভয়াবহ রাতে, এই বিষাক্ত বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইতে, শ্বেতশুভ্র পাপড়ি মেলিতে তাহাদের ইচ্ছা করিতেছে না। নদীতে আজ জোয়ার-ভাঁটা হইবে না। চাঁদের ইচ্ছা হয় নাই তাই। নদীর সহিত সে যুক্তি করিয়া এই সিদ্ধান্ত লইয়াছে। আগামীকাল ভাইফোঁটা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ঘাস আর লাউয়ের পাতায় উপড়ে পড়া শিশির, যাহাকে ইহারা 'ওস' বলিয়া শনাক্ত করে এই গ্রামে, সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া চন্দন বাটিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবে ভগ্নিগণ। সহোদরের সকল অকল্যাণ তিরোহিত হয় তাহাতে। কিন্তু শিশিরও আজ মনস্থির করিয়াছে আর মাটির দিকে ধাবমান হইবে না। আমগাছের ডালের উপর, কড়ুই গাছের পাতার নিকট, খোলা মাঠের অনেক উপরে শূন্য দিগন্তে তাহারা সমান্তরালভাবে খেলা করিতে থাকে।

হোগলার কোনায় নীরবে উপবিষ্ট সংবাদপত্রের স্থানীয় প্রতিনিধিও এইমাত্র মনে মনে একখানি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। গত তিন দিন ধরিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মফস্বলের যেই সকল সংবাদ সে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, যেমন, হলদিয়ায় প্রচুর আমের মুকুল ধরিয়াছে, দুদু মিঞার বেগুনের ভিতর ঐশ্বরিক আরবি শব্দ আবিষ্কৃত, অথবা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার কথিত সন্তানটি তাহার ঔরসজাত নয়, সেইগুলো সকলই তাহার কাছে এই মুহূর্তে কেমন বিবর্ণ ও গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। তাহার চোখের সম্মুখে আজিকে রাত্রিতে যাহা ঘটিল, সারা রাত ধরিয়া কেবল তাহাই লিখিবে সে। অন্য কিছু নয়।

এতদিন ধরিয়া বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক খালেক সরকার জানিত শরীরের মধ্যে কেবল মুখগহ্বরেই একটি বিচিত্র ঢাকনি আছে যাহা খাইবার সময় শ্বাসনালীকে এবং নিশ্বাস লইবার সময় খাদ্যনালিকে ঢাকিয়া রাখে। আজ সে পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করিল এই রকম আরেকটি শক্ত, চলন্ত ও আজব ঢাকনি রহিয়াছে শরীরের অন্যত্রও, যেখানটার প্রবেশপথ সর্বদাই উন্মুক্ত বলিয়াই সে মনে করিত।

খালেক এটাও জানিত পানির গতি নিম্নমুখী। পুরুষ তাহার শারীরিক তেজ-বিক্রম আর প্রত্যঙ্গগত বৈচিত্র্যের কারণে পানির এই ধর্মকে কখনো কখনো অস্বীকার করিতে সমর্থ হইলেও নারীর শরীর — বহিষ্কৃত পানি সর্বদাই নিম্নগামী। কিন্তু আজ সে সবিস্ময়ে লক্ষ করিল তাহা সর্বাংশে সত্য নহে। গ্রামের প্রায় কেহই আজ ঘরে নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালেক ও তার স্ত্রী সেলিমা ছাড়া খালেকদের বাড়ির সকল নারী-পুরুষও গিয়াছে সেই সালিশিতে। খালেকের না যাইবার পিছনে যে উদ্দেশ্যটা সবচাইতে বড় ছিল, রাতের অন্ধকারে, বসতবাড়ির এই দুর্লভ নির্জনতায় তাহা এই মুহূর্তে তাহাকে পরিপূর্ণভাবে দখল করিয়া লয়। সেলিমার মেয়েলি আপত্তি ও বাধাকে অতিক্রম করিয়া সে বীরের মতো প্রচণ্ড দাপটে প্রবেশ করিতে চায় তাহার নিজস্ব ভুবনে — যেখানকার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, সম্পূর্ণ অধিকার কেবল তাহারই আছে বলিয়া সে বরাবর জানিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ইচ্ছা তখন কাঁপিতেছে শুধু খালেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়, সেলিমার প্রতিটি জীবকোষে, তাহাদের শুইবার ঘরের বাতাসে — খোলা জানালায় — খাটের বাজুতে — তোষকের তুলায় — বালিশের ঢাকনায়। বাহিরে হিমেল হাওয়া, আকাশে কাস্তের মতো চাঁদ, এই নিরবচ্ছিন্ন অবসর, ঘরের ভিতর নির্জনতা সব মিলাইয়া আজিকার এই দুর্লভ সন্ধ্যা হইতে সেলিমার প্রত্যাশা ছিল ভিন্ন রকমের। তাহার ইচ্ছার প্রকৃতি ছিল অন্য লয়ে। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া স্বামীর আলতো আদর গ্রহণ করিতে করিতে একান্ত নির্ভয়ে নিঃসংকোচে মনের গভীরের অনেক কথা আজ খুলিয়া বলার সুযোগ হইবে সে ভাবিয়াছিল। খালেক সেটা বুঝিতে চাহিল না। তাই তাহার প্রবেশপথে প্রথমে সে পাথরের মতো শক্ত দেয়াল অর্থাৎ পূর্ব-অপরিচিত ইচ্ছার ঢাকনিতে বাধা পাইল। তাহার পরও যখন সে থামিল না বরং আরো অগ্রসর হইতে চাহিল, তখন পদার্থবিদ্যায় লিখিত পানির সেই চিরাচরিত ধর্ম অস্বীকার করিয়া সেলিমার শরীর-নির্গত একরাশ গরম পানি ক্রমাগত ছিটাইয়া পড়িতে থাকিল খালেকের সর্বাঙ্গে। প্রথমে তাহার উরু, তলপেটে, পরে বুকে, গলায় ও হাতে এবং সর্বশেষে মুখে, মাথায় — সর্বত্র।

জীবিত সালেহা

সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও মাথা-ধরা নিয়ে বিছানায় ছটফট করছে সালেহা। তার পিঠে, হাতে, পায়ে, এমনকি মুখেও কালো এবং লাল লম্বা সরু সরু আঘাতের চিহ্ন। বিধবা মা গরম পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সেসব বিচিত্র রেখাগুলো আস্তে আস্তে মুছিয়ে দেয়। তারপর ছেঁচা রসুনের সঙ্গে শর্ষের তেল গরম করে হাতের আঙুল দিয়ে তার দাগগুলোর ওপর বুলাতে থাকে। পিঠের যেসব জায়গায় লম্বালম্বিভাবে ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছিল, সেখানে কিছুক্ষণ আগে জ্বলন্ত সলতে দিয়ে সেঁকে দিয়েছে মা। পেকে যাওয়ার মতো কষ্টকর অভিজ্ঞতা এড়াতে এ নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাময় প্রতিষেধক কাজটি করতেই হয় কখনো কখনো। সালেহার গায়ে জ্বরও এসেছে খানিকটা। মাথায় ঠাণ্ডা পট্টি দেওয়ার জন্যে আরো খানিকটা পরিষ্কার তেনা ছিঁড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে সালেহার মা। কুপির মৃদু আলোতে চৌকির কোনায় বসে দু'হাত দিয়ে কাজ করছে আর মুখ দিয়ে অনবরত কন্যাকে অভিসম্পাত করছে প্রৌঢ়া। 'দুই বছর বয়সে লুন্তিতে তো মইরাই গেসিলি। ঘাওয়ে শরীল গইল্যা গেছিল। আলু বাটা মাখাইয়া কলাপাতায় শোয়াইয়া রাখতাম। হায় আল্লাহ, তখনো যদি মইরা যাইতি। তুইও শান্তি পাইতি — আমিও পাইতাম।'

শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে আবার বলে, 'বংশের মুখে চুনকালি মাথাইলি। লোক হাসাইলি। সাত গেরামের লোকের সামনে এমন কইরা অপমান হইল, তারপরেও ক্যান মরতে পারলি না পোড়ামুখী। বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া মরলি না ক্যান?'

সালেহা চোখ মেলে তাকায়। মায়ের মুখের প্রতিটি শব্দই তার কানে গিয়েছে। সে রাগ করে না। নিঃশব্দে হাসে। বলে, 'ক্যান মরলাম না, জানস আম্মা?'

'না, জানি না। জানতে চাইও না। তোমারে আর নকরামি কইরতে অইব না। জানি তো কবি মইরতে ইচ্ছা করল না, হের লেইগ্যা মরি নাই। নাইলে কবি, তরে ছাইড়া যাইতে কষ্ট হইছিল আম্মা।'

'না লো মা। হেইটার কোনোটাই কমু না। মরি নাই ক্যান জানস? রোজই গুম থাইক্যা উইঠ্যা ভাবি কাউলকা থেইক্যা সুদিন আইব। আহে না। হের পরও ক্যান জানি বাঁইচ্যা থাকতে ইচ্ছা করে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘ভালো মেয়ে’, ‘মন্দ মেয়ে’

মন্দ মেয়ের সম্ভ্রম

প্রায় সাত বছর আগে এক দৈনিক পত্রিকার কলামের শেষে একটি জটিল প্রশ্ন রেখেছিলাম পাঠকদের কাছে। প্রশ্নটা ছিল এ রকম। আমরা ভদ্দরজনরা দিবারাত্র এই যে এত বেশি চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত মেয়েদের ‘ইজ্জত’ (যদিও শব্দটা বিনা দোষে অথবা অত্যন্ত সীমিত অর্থে ব্যাপক ব্যবহারের কারণে আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়) রক্ষার্থে, আমাদের সেই প্রবল ভাবনা বা দায়িত্বশীলতা কি সব মেয়েদের জন্যই প্রযোজ্য? যদি তা না হয়, কোন মেয়েদের বেলায় আমরা এ বিশেষ ব্যাপারটি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ি এবং পড়লে কেন পড়ি। আমি সেই কলামের শেষাংশটুকু হুবহু তুলে দিচ্ছি :

“কখন বাংলাদেশের একটি মেয়ে তার এমন একটি মৌলিক অধিকার হারায়? কখন তথাকথিত ‘মা-বোনের সম্মান’ রক্ষার্থে নিবেদিতপ্রাণ আর আগের মতো সাড়া দেয় না? কখন আমাদের সনাতন মূল্যবোধ, পরিচিত সংবেদনশীলতা ভোঁতা হয়ে আসে? যখন একটি মেয়ের বয়স চল্লিশ অতিক্রান্ত হয়? যখন তার চুলের ২০ শতাংশ বা তারও বেশি সাদা হয়ে যায়? যখন তার স্তনযুগল শরীরের সঙ্গে আনুলম্বিক না হয়ে সমান্তরাল হয়ে আসে? যখন চামড়ার মসৃণতা ও সুষমা ভেদ করে উঁকি দিতে শুরু করে বাটিকের কাপড়ের মতো অসংখ্য ভাঁজ, রেখা, ছোটখাটো জ্যামিতিক নকশা? অথবা যখন তার পদযুগলে জুতোর বদলে থাকে কাদার আবরণ অথবা আনুপাতিক হিসেবে মূল শাড়ির চেয়ে তালির পরিমাণ বেশি? যখন চিন্তায় বাঙালি রমণী মানেই ‘রমণীয়’ এই বিশ্বাস নিয়েও একটি মেয়েকে কোনোমতেই রমণীয় মনে হয় না, তা গায়ের রং মুখের আকৃতি বা শারীরিক বৈকল্য যে কোনো কারণেই হোক। যখন সাদা সিঁথি রাঙা করে দেয় সিঁদুরের প্রলেপ? যখন মেদের বাহুল্য অথবা অপুষ্টিজনিত মেদহীনতায় মাংসপেশি ঋজুতা হারিয়ে ফেলে? যখন মাথার চুল অথবা ডান বাহু ও কাঁধ ঢেকে রাখে না শাড়ির আচল? অথবা যখন অতীত কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা, প্রচলিত বিশ্বাস

WWW.AMARBOI.COM

অথবা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ অবচেতন মনে এই ধারণার জন্ম দেয় যে, এই মেয়েটিকে অগ্রাহ্য করা চলে এবং তার প্রতি অশোভন আচরণ করার মধ্যে তেমন কোনো ঝুঁকি নেই। কখন? কখন?"

বাসের এক শিক্ষিতা আরোহিণীকে বখাটে কয়েকটি ছেলের অযথা উত্ত্যক্ত করার পরও বাসময় সব যাত্রীর কঠিন নীরবতা ও ঔদাসীন্য দেখে ব্যথিত হয়ে সেই কলাম লিখেছিলাম। আজ এতকাল পরে প্রসঙ্গটা মনে এসেছে আবার সীমা হত্যা, তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, বিচারের রায় ও লোকজনের মতামত বিবৃতির অনুসরণে। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে আরো বেশ কিছু ঘটনাও আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে অন্যান্য অপরাধ, অপরাধী বা অপরাধের শিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বা নেতৃস্থানীয় লোকের যে দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, মেয়েদের শালীনতা লঙ্ঘনের অপরাধের ব্যাপারে একই মানসিকতা, যুক্তিবোধ বা চিন্তাধারা কাজ করে না। কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলি। যেমন ধরুন, কারো বাসায় চুরি হয়ে গেছে। পরে জানা গেল এক তলার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও গৃহস্বামী সব জানালা খুলে ঘুমুত রাতে। চোরের জন্যে চুরি করা জানালা খুলে ঘুমুবার জন্যে সহজতর হলেও আমরা কিন্তু গৃহকর্তাকে কখনো এই বলে নিন্দা করব না যে, বেশ হয়েছে, কেন ঘুমুতে গেলে জানালা খুলে? চুরি তো হবেই। চোরের দোষ কী? চুরির শিকার গৃহকর্তার প্রতি আমাদের মায়া বা সহানুভূতি কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণই থাকবে যদিও কোনো ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হয়তো বলে ফেলতে পারে, 'এমন দুর্দিনে যত গরমই লাগুক, জানালা খুলে ঘুমুনো ঠিক নয়। আর এ ভুল কোরো না।' কথাটিতে গৃহকর্তার বিচক্ষণতার প্রতি সামান্য কটাক্ষ থাকলেও ব্যক্তিটিকে কিন্তু পরিত্যাগ করা হয় না। তাকে দোষীও সাব্যস্ত করা হয় না। তেমনিভাবে রাত্রিবেলা রিকশা করে ঘরে ফেরার পথে কোনো মহিলার গলার হার যদি চুরি হয়ে যায়, আমাদের একইরকম প্রতিক্রিয়া হবে। প্রথম প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগের। আহা, বেচারা, শখের সোনার হারটি হারাল। তারপর যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে গেলে বড়জোর কেউ কেউ বলবে, 'আজকের দিনে এত রাতে সোনা পরে রিকশায় চড়া একেবারে নিরাপদ নয়। বোকা মেয়েটা সেটা বুঝতে পারেনি।' এখানেও মেয়েটির বাস্তবজ্ঞানহীনতা নিয়ে মনে সংশয় জাগলেও তার প্রতি সহানুভূতি কিন্তু কেউ হারাবে না। একজনও বলবে না, 'বেশ হয়েছে। এত রাতে গয়না পরে বাইরে লোক দেখাতে যাওয়া কেন? চোরদের প্রলোভন দেখিয়েছ, ওরা চুরি করেছে। ওদের দোষ কী?' অথচ ধর্ষণ বা নারীদের উত্ত্যক্ত করার অপরাধটিকে অপরাধ বলে বিবেচনার আগে অনেক জটিল চিন্তা, অনেক যুক্তিতর্ক আমাদের মাথায় ভর করে। আমরা মেয়েটির শারীরিক-মানসিক নির্যাতন এবং তার ব্যক্তিগত ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকে প্রায়শই লঘু করে দেখি। দেখি যদি-না মেয়েটি তথাকথিত 'ভদ্দরলোকের' মেয়ে বা বউ হয় অথবা যদি-না সামাজিক অবস্থান বা শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে অথবা তার জীবনাচরণ দিয়ে আমাদের এই নিশ্চয়তা দিতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে এই অপ্রীতিকর ঘটনাটির জন্যে সে নিজেই দায়ী ছিল না। অর্থাৎ অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে নারী নির্যাতন, বিশেষ করে নারী ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির মতো অপরাধের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে এখানেই মৌলিক পার্থক্য। এখানে অপরাধীর চেয়ে অপরাধের শিকারকে আগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। এই অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সে-ই যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করেনি, এটা তাকেই প্রমাণ করতে হবে।

সীমার ধর্ষণের ঘটনা কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পর এক নারীনেত্রী মন্তব্য করেছিলেন 'মেয়েটির চরিত্র ভালো নয়। গার্মেন্টসে কাজ করা মেয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্য জাতের (অন্য ধর্মের বোঝাতে চেয়েছেন বোধহয়) ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অপরিচিত জায়গায়। এইসব মেয়েদের...' ইত্যাদি। অর্থাৎ মেয়েটি যে ধর্ষিত হয়েছে, তার পেছনে তার নিজস্ব দায় বা অপরাধের বোঝা কম নয়। প্রথম অপরাধ, সে গার্মেন্টসের শ্রমিক। দ্বিতীয় অপরাধ সে যুবতী হয়েও পরপুরুষের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল। তৃতীয় অপরাধ, তার সঙ্গী অন্য ধর্মের লোক। চতুর্থ অপরাধ, নিজ বাসস্থান বা কর্মস্থান থেকে দূরে অন্যত্র তাদের দেখা গেছে। পঞ্চম অপরাধ, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছিল এ যাত্রা; এবং তার ওপর অমানবিক নির্যাতনের পরে প্রচারিত অপরাধ, ভ্রাম্যমাণ যৌনকর্মী ছিল সে। এতগুলো অপরাধ একসঙ্গে করার পর মেয়েটির যে সামগ্রিক চরিত্র ধরা পড়ে, তাতে তার 'ইজ্জত' রক্ষা করা কোনো আইন, প্রশাসন বা এই সমাজের জনসাধারণের কর্তব্য বলে বিবেচিত না হলে অবাক হওয়ার কী আছে? অথবা তার সম্ভ্রম লজ্জিত হলে লজ্জনকারীর দায়ই-বা কতটুকু? ধর্ষিত হওয়ার পর দিনের পর দিন কেটে গেছে। সে যে ধর্ষণের শিকার, এই তথ্যটুকু ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করার জন্যে চট্টগ্রামের মতো শহরে, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্তব্যরত ডাক্তারের খোঁজ মেলেনি। কোনো রহস্যময় কারণে সম্ভবত বিনা স্নানে (অপরাধের আলামত মুছে যাওয়ার আশঙ্কায় ধর্ষণের শিকারদের ডাক্তারি পরীক্ষার আগে সাধারণত স্নান করা বা পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না) একই বস্ত্রে মেয়েটিকে স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল এক জায়গা থেকে অন্যত্র মেডিকেল পরীক্ষার জন্যে। তারপরে জনরোষ এড়াতে একসময় পরীক্ষা করতেই হয়। অপরাধও চাপা থাকে না। তবু সীমা আমাদের নারীনেত্রীর সহানুভূতি কুড়াতে ব্যর্থ হয়। মনে পড়ে, আমাদের এই বিশেষ নারীনেত্রীই সিলেটের নূরজাহানের মৃত্যুর পর নিজে সরজমিন ঘটনা তদন্ত করে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'এ ঘটনা নিয়ে তোলপাড় মিডিয়ার চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। ফতোয়াবাজি, নারী নির্যাতন, নারী হত্যা ওসব কিছুই নয়। জায়গা-জমিন নিয়ে গ্রামের চিরাচরিত রেষারেষিরই একটা ঘটনা। আমি নিজে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি এইটুকু ইটের টুকরো ছোড়া হয়েছিল। কিছুই না। এইটুকু ব্যথা পাবার কথা নয়।'

এ কথাগুলো (আক্ষরিক অর্থে হুবহু এক না হলেও) ভদ্রমহিলা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে বসে উচ্চারণ করেছিলেন। নিজের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী একত্র করে ইটের টুকরোগুলো কত ছোট সেটা দেখাবার প্রয়াসের মধ্যে সমগ্র ব্যাপারটিকে লঘু করে প্রতিস্থাপনের একটা সুস্পষ্ট চেষ্টা লক্ষ করে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তার কথা শুনে মনে হয়েছিল তাবৎ গ্রামবাসীর সামনে গর্তে দাঁড় করিয়ে নূরজাহানকে ইটের টুকরো ছুড়ে মারার ব্যাপারটির ব্যাপকত্ব পর্যন্ত বুঝতে পারেননি আমাদের নারীনেত্রী। মেয়েটি ইটের আঘাতে আদৌ আহত হলো কি হলো না এটা তো কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। কেউ কখনো বলেওনি ইটের আঘাতেই মারা গেছে নূরজাহান। গ্রামবাসী সব নারী-পুরুষের সামনে এই যে উন্মুক্ত বিচারের নামে প্রহসন, অপমান, এর যন্ত্রণা ধরতে পারবেন না এ কেমন নেত্রী নারী সমাজের!

সারা দেশ যখন নূরজাহানের নির্মম মৃত্যুর প্রতিবাদে সরব, তখন আমাদের নারী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী এই মহিলার এরকম মন্তব্য এটাই প্রমাণ করে, সরিষা দিয়ে ভূত তাড়ানো কখনো যাবে না, যখন সরিষাতেই ভূতের বসবাস। সীমা মারা যাওয়ার পর সীমার তথাকথিত ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং জীবনাচরণ নিয়ে অনেক মন্তব্য, লেখালেখি হয়েছে। প্রচেষ্টা, অপরাধের গুরুত্বকে লঘু করা। এ ছাড়া আরো একটি ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক এবং দুশ্চিন্তা দেখা গেছে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে। সেটা হলো সীমার ধর্মীয় পরিচয়। হিন্দু ঘরে জন্মেছে ও বেড়ে উঠেছে সীমা। তার প্রেমিক মুসলমান। কেউ কেউ বলেছে, সীমা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কেউ বলেছে, তারা বিয়ে করেছিল। এ দুটোর কোনোটারই সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তবু তড়িঘড়ি করে সীমার মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে। অন্যদিকে এক রাজনৈতিক দল তার মৃত্যুতে গায়েবি নামাজ পড়েছে এবং একজন ইসলাম ধর্মের মহিলার শব দাহ করার অপরাধে সরকারকে দায়ী করছে এই বলে যে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত করেছে এ ঘটনা। মৃতদেহ দাহ করে অপরাধের সব চিহ্ন এবং প্রমাণ যে নিশ্চিহ্ন করে ওেয়া হলো সেটা যেন কোনো বিবেচনার বিষয় নয়। সৎকারের বিভিন্ন পদ্ধতি ধর্মীয় অনুভূতির পরিপন্থী এটাই বড় কথা। এসব দেখেশুনে শুধু মনে হয়েছে, আসল ঘটনাটা প্রায় কারোরই মাথাব্যথা নয়। আসল হলো সেটি, আমাদের দেশের একটি সাধারণ অসহায় মেয়ে ভয়ংকর কতগুলো অপরাধের শিকার হয়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার শরীরকে উপভোগ করেছে কিছু লোক, পরে নিরাপত্তার নামে তাকে কারাগারে আশ্রয় দিয়ে হত্যা করেছে। সীমা আমাদের বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক বিচারে 'সতী' না 'অসতী', 'হিন্দু' না 'মুসলমান', 'গার্মেন্টস শ্রমিক' না 'পেশাজীবী' এসব কোনো তথ্য বা পরিচয়ই মুখ্য বা প্রয়োজনীয় নয়। মোদ্দাকথা একজন মানুষের ওপর একটি মারাত্মক অন্যায় সংঘটিত হয়েছে, সে অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধীর শাস্তি পেতে হবে। শিকার কে, তার পরিচয় এখানে জরুরি নয়। যেমন জরুরি নয় অপরাধীর পরিচয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় শুধু আমাদের দেশে বা এই উপমহাদেশেই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনায় পৃথিবীজুড়ে লোকদের প্রতিক্রিয়াই প্রায় এক রকম। তারা অপরাধীর সঙ্গে অপরাধের শিকারকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করায় এবং নিঃসন্দেহে সেটা দুঃখজনক। আজ আপনাদের কাছে আমেরিকায় সংঘটিত তিনটি বহুল প্রচারিত ধর্ষণের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করব, যেখানে আদালতের রায়ের পাশাপাশি জনসাধারণও রায় দিয়েছে এবং সব সময় তা অপরাধের শিকারদের অনুকূলে যায়নি।

(১) প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম (মিডওয়েস্ট) অঞ্চলের এক অঙ্গরাজ্যে। খুব সম্ভব মিশিগানের ছোট্ট একটি শহরে। এক স্বামী পরিত্যক্তা তিন শিশু সন্তানের জননীকে একটি পুল হাউজে বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপরে ফেলে উপর্যুপরি গণধর্ষণ করে ওখানে পুল ক্রীড়ারত স্থানীয় মাস্তানরা। আদালতে বিচার গেলে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করলে ওই অঞ্চলের মহিলারা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের ক্ষোভের কারণ, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকারী এই মহিলা সমাজের জন্যে হুমকিস্বরূপ এবং তারই প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল স্থানীয় যুবকরা যার ফলশ্রুতি উল্লিখিত অপরাধ। ফলে দোষটা ষোল আনাই ওই নিঃসঙ্গ মহিলার যার ঘরে কখনো কখনো অনাত্মীয় পুরুষদের যাতায়াত করতে দেখা গেছে। দীর্ঘ বিচারের পর উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে প্রত্যেক আসামিই বিনা শর্তে মুক্তি পায়। আর তখন স্থানীয় রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছিল তাদের সংবর্ধনায়। এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। একজন স্খলিত রমণীর উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তিতে তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। কেন গিয়েছিল ওই রমণী রাতে এই পুল হলে? আর যদি গিয়েছিলই, এমন পরিণতির জন্যে তৈরি হয়েই যাওয়া উচিত ছিল এবং সম্ভবত গিয়েছিলও। পরে এই নিয়ে আবার সতীসাধ্বী সাজার চেষ্টা কেন আবার। অকাট্য যুক্তি। তবে এইসব বিশুদ্ধ নারীরা এটা মস্তিষ্কে ধারণ করেননি যে একজন মানুষের অসামাজিক জীবনযাপন (বর্তমান মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে) করার অপরাধে তাকে সমাজে একঘরে করা যেতে পারে, তার সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে না পারেন তারা, বন্ধুত্ব করতে না পারেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে সংঘটিত কোনো ভয়ানক অপরাধের শাস্তি এ জন্যে লঘু বা অনুপস্থিত হতে পারে না। অপরাধ অপরাধের নিজস্ব গুরুত্বেই বিবেচিত হবে। অপরাধের শিকারের ব্যক্তিগত জীবন তাকে বা অপরাধীকে লঘু-গুরু করবে না।

(২) দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল নিউইয়র্ক শহরের কেন্দ্রস্থলে। সেন্ট্রাল পার্কে। স্টক এক্সচেঞ্জে কর্মরত এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা — তিরিশ বছরের এক স্বাস্থ্যসচেতন তরুণী। রোজকার মতো দীর্ঘ কর্মক্লান্ত দিনের শেষে রাত দশটায় ঘরে ফিরে সেন্ট্রাল পার্কে জগিং করতে বেরিয়েছিল। তাকে সেখানে কে বা কারা ধর্ষণ করার পর পুনঃপুন মাথায় মারাত্মক আঘাত করে একটি জলাশয়ের পাশে ফেলে রেখে চলে যায়। অপরাধীরা ভেবেছিল এত বড় আঘাতের পর রক্তক্ষরণে মেয়েটির আপনি মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু সুস্বাস্থ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকারী এই নারী শরীরের রক্তভাণ্ডারের এক বিশাল অংশ হারিয়েও বেঁচে ছিল। প্রাতঃভ্রমণকারী কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পর দীর্ঘ চিকিৎসায় আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেছিল মেয়েটি। কিন্তু সেসময় আমেরিকার জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ভোলার নয়। এমন একটি অনভিপ্রেত ঘটনায় সবাই চমকে উঠেছিল। কিন্তু মেয়েটির প্রতি সহানুভূতির চেয়েও তার প্রতি কটাক্ষ ছিল বেশি। এত রাতে সেন্ট্রাল পার্কে জগিং করা কেন? এমন সুন্দর দোহারা চেহারা নিয়ে নির্জন পার্কে একা একা জগিং করা মানেই আশপাশের লোকদের প্রলুব্ধ করা তার শরীরী আবেদন দিয়ে। রাস্তায়, ঘাটে, ট্রেনে, বাসে, অফিসে সর্বত্র একই আলোচনা। উপসংহার ও রায়ও একই রকম। মেয়েটির অবিবেচনা ও ভুল গতিবিধি এত বড় দোষ বলে গণ্য হলো যে, তার ওপর সংঘটিত এত বড় অপরাধও যেন জনমনে প্রত্যাশিত রোষ সৃষ্টি করতে অসমর্থ হলো। অথচ হারলেমে মধ্যরাতে একা একা ভ্রমণরত কোনো পুরুষ পথচারীর পকেট মার গেলে তার অবিবেচনার কথা কখনো কেউ দায়ী করবে না। পার্থক্য এখানেই।

(৩) তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ফ্লোরিডায়। কেনেডি পরিবারে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাগ্নের সঙ্গে এক নৈশ বারে দেখা হয়েছিল এক তরুণীর। তারা একসঙ্গে নেচে ও মদ্যপান করে গভীর রাতে বার থেকে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে এসেছিল সমুদ্রসৈকতে। সেখানে মেয়েটির অভিযোগ, তাকে ধর্ষণ করে তার সঙ্গী। মেয়েটি নিজেও এক ধনী ও বনেদি পরিবারের সন্তান। অর্থ বা প্রচারের জন্যে এমন একটি অভিযোগ আনা তার কাছে প্রত্যাশিত নয়। তবু সংবাদটি কাগজে ফলাও করে ছাপা হওয়ার পর আমেরিকার সাধারণ জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রায় পুরোটাই মেয়েটির বিরুদ্ধে যায়। অভিযোগ, এতই যদি সতী হবে তবে কেন একা গিয়েছিল বারে এত রাতে? শুধু বারে নয়, বার থেকে বেরিয়ে সমুদ্রসৈকতে এক যুবকের হাত ধরে। এখন কথা হলো, হ্যাঁ, এটি সত্য। অধিকাংশ দায়িত্বশীল, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, বিবেচক মেয়ে হয়তো এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হতো না। কিন্তু তরুণ বয়সে, ভালো লাগার উন্মাদনায়, বিশেষ করে মদ্যপান করার পর কোনো মেয়ে যদি আমেরিকার মতো সমাজে তার সঙ্গীর সঙ্গে মাঝরাতে সমুদ্রসৈকতে যায়, এটা এমন কিছু অগ্রহণযোগ্য বা অস্বাভাবিক আচরণ বলে বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। হয়তো বড়জোর এটাই অনুমান করা যেতে পারে যে, তাদের দুয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে তার সঙ্গে বেরোবার আগে মেয়েটিকে নাকে খত দিতে হয়েছিল অথবা যৌনশর্তে আবদ্ধ হতে হয়েছিল যে এ যাত্রা অবধারিতভাবেই মৈথুন পর্যন্ত গড়াবে। আসলে একটি নারী ও একটি পুরুষের মধ্যে গড়ে ওটা মানসিক-শারীরিক সম্পর্কের যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো একজন আর অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অপরপক্ষ যদি সভ্য ও মার্জিত ব্যক্তি হয়, আক্ষেপ বা হতাশা সত্ত্বেও সেটা মেনে নেয়। কেননা মানসিক সম্পর্ককে চুক্তিবদ্ধ করা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলো থেকে একটা সাধারণ সত্য বেরিয়ে আসে যে মেয়েদের যৌনতাকে নিয়ে সবারই বড় ভয়। পুরুষদের তো বটেই, অন্য মেয়েদেরও। মেয়েদের শরীর ও তার যৌন আবেদন এতটাই শক্তিশালী যে তাকে ভয়ংকর, পরিত্যাজ্য অথবা নিন্দাযোগ্য করে তোলার অবিরাম চেষ্টা চলেছে সেই আদিকাল থেকে সব সমাজেই। তবে যতই সে চেষ্টা চলুক না কেন, মুনি ঋষি নানান ধর্ম ও সমাজ-যাজকরা তাদের ধর্মগ্রন্থে নীতিশাস্ত্রে যত জোরালোভাবে যা-ই বলুক না কেন, মনে মনে তারা ঠিকই জানে এ সত্যকে, নারীর যৌন আবেদনের শক্তিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর তার ফলে এই শরীরকে লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখা, তাকে আগলাবার পুরো দায়িত্বটা তারা পরোক্ষে তুলে দিয়েছে নারীরই হাতে। এটাই তোমার পরম কর্তব্য। জীবনের প্রধান এবং একমাত্র আরাধ্য। তুমি যদি তা রক্ষা করতে না পার, এটা তোমারই অক্ষমতা — তোমারই দুর্বলতা ও পরাজয়। তোমার অন্যান্য সকল সুকুমারবৃত্তি, তোমার সকল অর্জন মূল্যহীন শরীর পাহারা দিতে যদি তুমি অপারগ হও। সমাজ এ জন্যে তোমায় কখনো ক্ষমা করবে না। আর তাই অপরাধ বা অপরাধীকে ভুলে অপরাধের শিকারের সারল্য, নির্বুদ্ধিতা, অবিবেচনা অথবা অপরিণতমনস্কতাকে সব অপরাধ ও অবিচারের জন্যে দায়ী করা হয়।

এই মনোভাব পরিবর্তন করতে হলে মেয়েদের শরীরকে সেকালের ব্রাহ্মণ বিধবার মাটির কলসি করে রাখলে চলবে না, যে কলসি শূদ্র অথবা অহিন্দু কেউ স্পর্শ করলেই অপবিত্র, ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে — পুরোপুরি ভেঙে ফেলাই যার একমাত্র প্রতিকার। মেয়েদের শরীর এতটা নাজুক, এতটা ভঙ্গুর, এতটা মূল্যহীন নয়। শরীরের খোলসে পুরোপুরি আবদ্ধ সত্তাকে পাহারা দেওয়াই যখন মেয়েদের প্রধান ও অধিকাংশ মেয়েদের জন্যে একমাত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিশাল কর্মক্ষেত্রে বৃহত্তর জগতে অন্য সব মহত্তর অথবা, অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ কাজে অংশগ্রহণ করা ততটা অগ্রাধিকার পায় না।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে 'মন্দ মেয়ে' তাহলে কে? যে একাধিক পুরুষের স্পর্শ শরীরে গ্রহণ করেছে স্বেচ্ছায়, বেঁচে থাকার তাগিদে অথবা কোনো অনভিপ্রেত ঘটনার চাপে, দুর্বৃত্তের আক্রমণে? যে একাকিত্বে, বিনোদনে অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গ ভোগ করে? আনন্দ পায়? যার দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে স্বামী ছাড়াও অন্য কোনো পুরুষ যে বাস্তবে না হলেও চিন্তায় কিংবা স্বপ্নে দেখেছে কোনো পুরুষের কণ্ঠলগ্না হতে যে তার স্বামী নয়? আপনাদের বিচারে যদি এরা সকলেই 'মন্দ' মেয়ে হয়, এবং তাদের সম্ভ্রম রক্ষা যদি আপনাদের দায়িত্ব বলে বিবেচিত না হয়, তা হলে কিন্তু আপনাদের অনেকের অনেক দায়িত্বই কমে যাবে। কেননা ও-রকম বিশুদ্ধ 'ভালো মেয়ে' খুব বেশি নাও থাকতে পারে, যাদের সম্ভ্রম রক্ষা করে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন আপনারা। তবে মেয়েদের এভাবে 'ভালো' ও 'মন্দ',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অপাপবিদ্ধ' ও 'লজ্জিত' হিসেবে ভাগ করে তাদের নিরাপত্তা তাদের কল্যাণের ব্যাপারে দুমুখী নীতি চালু করাও কোনো সভ্য যুগের সভ্য মানুষের কাজ নয়। ওটা পরিহার করা মঙ্গলকর, সমাজের ও মানবতার স্বার্থেই।

পঁচিশ বছর আগে আরো অনেক স্বার্থত্যাগ ও বলিদানের সঙ্গে তিন লাখ মেয়ের সম্ভ্রম হারাবার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। মাত্র দশটি মাসের ভেতর এই জনগোষ্ঠীর নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নৃশংসভাবে ধর্ষিত হয়েছিল। এর পরও ধর্ষণ সম্পর্কে আমাদের আপামর জনসাধারণের মধ্যে আজ পর্যন্ত একটা সচেতনতা, পরিণতমনস্কতা, একটা সম্যক উপলব্ধি সৃষ্টি হলো না, একটি উদার ও মানবিক জনমত তৈরি করা গেল না এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। ধর্ষণ কিন্তু খুন-জখমের মতোই একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। অপরাধীর শাস্তি হবে তার কৃত অপরাধের জন্যেই। অপরাধের শিকারের ব্যক্তিগত জীবনাচরণ, তার বিশ্বাস, ধর্ম, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান এই অপরাধের গুরুত্ব বা অপরাধীর শাস্তি নির্ণয়ে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। রাখা উচিত নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্ত্রহরণ

কাছাকাছি একটা গণ্ডগোল চলছে কোথাও। বহু কণ্ঠের মিলিত গুঞ্জন ভেসে আসছে। শুক্রবার বিকেল। এমনিতেই চুপচাপ নিরিবিলি এই পাড়া-গাঁ এলাকা। তারপর আজ আবার স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। কলেজ বলতে তো স্থানীয় হাইস্কুলে কয়েক ঘণ্টার এই সন্ধ্যাকালীন সমাবেশ, যেখানে তমাল রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ায়। সর্বমোট ছাত্র ছাব্বিশ জন।

তমাল ঠিক বুঝতে পারে না গোলমালটা আসছে কোত্থেকে। অন্যদিন হলে বাইরে গিয়ে হয়তো খোঁজ নিত। কিন্তু আজ সে ইচ্ছেও নেই। গতকাল এক রাতের জন্যে শহরে গিয়েছিল সে। ফিরে এসে ঘরের দরজার তালা আর খুলতে হয়নি আজ। ঠিকে ঝি কালুর মা দরজার সামনে বসে ঝিমুচ্ছিল। তমালকে দেখে প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে মাথা থাপড়ে কান্নাকাটি করে সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! প্রথমে তো তমাল ভয়ই পেয়েছিল। মহিলার একমাত্র কিশোর পুত্রের নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছে। কিন্তু পরক্ষণেই কালুর মা যখন চোখের জল মুছে ডান হাতের পিঠ দিয়ে আস্তে ধাক্কা দিতেই তমালের ঘরের দরজা টান টান করে খুলে গেল, তমালের আর বুঝতে বাকি রইল না কিছু। দরজা খোলা কেন এ প্রশ্ন অবান্তর। ধীর পদক্ষেপে তমাল ঘরে ঢোকে। না, সে নিশ্চয়ই ভুল করেছে। এ ঘর তার নয়। হতে পারে না। কাল শহরে যাওয়ার প্রাক্কালে যে ঘর সে তালাবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিল কোনো অজানা শক্তির খামখেয়ালিতে সে-ঘর এখন সম্পূর্ণ তছনছ। বিছানা, বালিশ যত্রতত্র। ফুলদানিটা কাত হয়ে পড়ে আছে টেবিলের ওপর। জলে ছপছপ করে ভিজছে একগাদা কাগজপত্র। ফুলের ডগাগুলো জল ছুঁয়ে নেই বলে এরই মধ্যে অর্ধশুষ্ক সবগুলো মৌসুমি ফুল। কাগজপত্র ঘরের মেঝের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঢেকে রেখেছে।

একা বাস করলেও নিজের সামান্য আসবাবপত্র, বিছানা, কাপড়চোপড়, বই-কাগজ গুছিয়ে ছিমছাম থাকতে ভালোবাসে তমাল। এক সময় ছোট বোন মিতি তামাশা করে বলত, 'ছোড়দা, তোর বউ জুটবে না দেখবি। জুটলেও পালিয়ে যাবে। এত খুঁতখুঁতে লোককে মেয়েরা পছন্দ করে না, জানিস?'

মিতির কথার যথার্থতা ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে তমাল। তবে মিতি-কথিত কারণ তার বৌ না জোটার জন্যে সার্বিকভাবে কতখানি দায়ী তমাল জানে না। তিন্নির অতি ধীরে তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলার সঙ্গে তমালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁতখুঁতে ছিমছাম স্বভাবের খুব একটা সম্পর্ক আছে মনে হয় না। তিন্নি তমালকে জানত বহুদিন। তার চরিত্রের এদিকটা নতুন করে তিন্নির কাছে উন্মোচিত হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ ছিল এর পেছনে। যে-কারণ সাধারণত প্রথমেই মনে আসে, যা যুক্তি এবং সান্ত্বনা হিসেবে হৃদয়ে স্থান দিয়ে নিজের অক্ষমতা, পরাজয় এবং অভাববোধকে লাঘব করতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল তমাল, সে আজ নিশ্চিত সে-কারণ অর্থাৎ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশ তাদের সম্পর্কের অবনতির জন্যে দায়ী ছিল না। সত্যি বলতে গেলে তমালের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলেও তিন্নির জীবনে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব আজো ঘটেনি। আর সেটাই তমালের মনঃপীড়ার সবচেয়ে বড় কারণ। একটি রক্ত-মাংসের মানুষের কাছে লোকে হার মানতে পারে, একটা কাল্পনিক আশঙ্কার কাছে নয়। আট বছরেরও বেশি জানাশোনা, ঘনিষ্ঠতা। এত সহজে কেমন করে তিন্নি মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারল?

তমাল একবার ভাবল ঘরটা একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক কী কী খোয়া গেছে গতকাল রাতে। টেবিল-ঘড়ি, রেডিও, কলম দুটো, ঝোলানো শার্ট-প্যান্ট, সে সব তো গেছে দেখতেই পাচ্ছে। টেবিলের ভেজা কাগজপত্রের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, যা ভিজেছে তার ভেতর অতি প্রয়োজনীয় কাগজ কিছু নেই। আর কিছু খুঁটিয়ে দেখতে স্পৃহা নেই তার এ মুহূর্তে। তমালের খুব পরিশ্রান্ত মনে হয় নিজেকে। সব কিছু ফেলে রেখে টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে সাধ হয়। ঘুম থেকে উঠে হয়তো দেখবে ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। তার ঘর আগের মতোই গোছানো ছিমছাম — যেখানে যে জিনিসটা থাকে সেখানেই রয়ে গেছে।

কালুর মায়ের সঙ্গে এতক্ষণে কালুও এসে ঘরে ঢোকে।

'দাদাবাবু আমরা দুজনে মিলে ঘরটা একটু গুছিয়ে দিই?'

'না। এখন তোমরা যাও। আমি খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নেব।'

বলেই তমাল একবার ভাবল কালুকে পাঠাবে নাকি পরিচিত কারো কাছে? এ মুহূর্তে কেউ এলে কথা বলতে পারলে ভালোই লাগত হয়তো। কিন্তু কাকে ডাকতে পাঠাবে তমাল? সুমনকে? না, ওর সঙ্গে মেয়েদের প্রসঙ্গ ছাড়া কোনো কথা বলা যায় না। পৃথিবীতে মেয়ে ছাড়া, বিশেষত মেয়েদের দেহ ছাড়া, সুমনের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা কোনো কিছুর নেই। তমালের সঙ্গে ওর মেলামেশাটা বড় বিচিত্র। কখনোসখনো মেয়েদের নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনায় সুমনের সঙ্গে খানিকক্ষণ মেতে থাকা গেলেও মাঝে মাঝেই তমাল বিরক্ত হয়ে পড়ে এ ধরনের আড্ডার একঘেয়েমিতে। সুমন সেটা জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তমালের প্রতি তার কোথায় যেন একটা অন্ধ এবং আন্তরিক মমত্ববোধ রয়েছে। ঘুরেফিরে তাই আসে তমালের খোঁজ নিতে। না, সুমনকে আজ ডাকা যায় না। তাহলে, আবেদ? না, আবেদ আবার সর্বক্ষণ তার বামপন্থী চিন্তাধারা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে। ওর চিন্তার সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ নেই তমালের। তমাল নিজেও নির্যাতিতের পক্ষে দাবি তুলতে গিয়ে একাধিকবার হাজতবাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। পলাতক থাকতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। কাজে বা কথোপকথনে তার সেই রাজনৈতিক মতাদর্শ সবসময় প্রকাশ না পেলেও চিন্তায় সে আজো খুব বদলায়নি বলেই তার ধারণা। কিন্তু মুশকিল হলো আবেদকে বোঝানো যায় না যে বইয়ের ভাষায় কথা বললে নীরস হয়ে পড়ে বাক্যালাপ। রাজনৈতিক আলোচনাও উপভোগ্য করা চলে শব্দনির্বাচন সবসময় বই-ঘেঁষা না হলে। কিন্তু আবেদ কোনোরকম সমঝোতায় রাজি নয় এ ব্যাপারে। উপস্থিত ব্যক্তিদের আগ্রহের পরোয়া না করে একাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাত্ত্বিক আলোচনায় মেতে থাকতে পারে আবেদ। আর কে আছে আবেদ ছাড়া? রবি? সে তো বন্ধুত্বকে তার গাড়ির স্পেয়ার টায়ারের মতো করে ট্রাঙ্কে পুরে তীব্রবেগে জীবন চষে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ গাড়ি চলছে — দিব্যি, কোনো গোলমাল করছে না কোথাও, স্পেয়ার টায়ারের উপস্থিতি সম্বন্ধেও সচেতন নয় সে। কোনো কারণে রাস্তার পরিত্যক্ত তারকাঁটায় অথবা প্রচণ্ড উত্তাপে একটা টায়ার ফেটে গেলে তৎক্ষণাৎ সেই স্পেয়ার টায়ারের কথা মনে পড়ে তার। সেই অবহেলিত টায়ার তখন হয়ে ওঠে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রবি জীবনে দরকার ছাড়া কাউকে ডাকে না বা কারো কাছে যায় না এটা সত্য নয়। তবে সেই ডাকা ও যাওয়াও হবে তার নিজের যখন ইচ্ছে বা সময় হবে, তখন। বিপরীত পক্ষের আগ্রহ বা সুবিধে অনুসারে নয়। তমাল রবির জীবনযাত্রা, কথাবার্তা, হাসি-তামাশা এবং চালচলনে প্রথমে তাই অভিভূত হলেও আজকাল প্রায়ই টের পাচ্ছে রবির সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা সেটাও চালাতে হবে রবির শর্ত অনুযায়ী — পারস্পরিক ভাববিনিময় বা জীবনের স্বাভাবিক গতি দিয়ে তা নির্ধারিত হবে না। তাহলে আর আজ কাকে ডাকবে তমাল? একমাত্র ডাকা যায় চৌধুরী দম্পতিকে। তমালের এ বিপর্যয়ের খবর পেলে ওঁরা দুজনেই ছুটে আসবেন তমাল জানে। বকবক করতে করতে চৌধুরীগিন্নি তমালের সঙ্গে হাত লাগিয়ে চটপট তার ঘরটাও গুছিয়ে ফেলবেন। তারপর জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়ি। রাতের খাবার না খাইয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু আজ চৌধুরীদেরও ডাকতে মন চাইছে না। চৌধুরী দম্পতির জীবন বড় অদ্ভুত। ওঁদের দুটি মেয়ে। একটির বয়স তের, অন্যটির ছয়। দুজনেই কঠিন হাঁপানি রোগে আক্রান্ত। সারা বছরই ওরা অসুস্থ থাকে। শীতকালে তো কথাই নেই। চৌধুরীগিন্নির নিজেরও সামান্য হাঁপানির টান আছে। তবে মেয়েদের তুলনায় কিছুই নয়। ছোটবেলা থেকে দুটো অসুস্থ সন্তানের দেখাশোনা, পরিচর্যা করতে করতে এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যেন কেমন নির্জীব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন। নির্মল আনন্দ, হাসি-ঠাট্টা, জীবনের হালকা দিকটাতে যেন কোনোই আগ্রহ নেই তাঁদের। সামাজিক অনুষ্ঠানে সবাই যখন হাস্যরসাত্মক নানান আলোচনায় মেতে থাকে, চৌধুরী দম্পতিকে দেখা যায় চুপচাপ ঘরের এক কোণে বসে থাকতে। মানবিক সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারে এমন কোনো সংবাদ বা ঘটনা ব্যতীত বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁরা আজ কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ ঘটাতে সম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থ। না, আজ চৌধুরীদের ডাকা যায় না। এ দুর্দিনে তাঁদের ডেকে তাঁদের ব্যবহার করতে তমালের মন চায় না। সবচেয়ে বড় কথা, আজকের দিনে তাঁদের ডেকে কথা বলার অর্থ হলো নিজেদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে চৌধুরী দম্পতির মনগড়া ধারণাকে নতুন করে প্রশ্রয় দেওয়া।

তমাল আজ তাই হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল, সে প্রকৃত অর্থে বন্ধুহীন। চারপাশে দৈনন্দিন জীবনে যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করছে, যারা তার নিত্য সহচর, তারা কেবলই পরিচিত — আত্মার কাছাকাছি কেউ নয়। তমাল তাই বিছানায় শুয়ে পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু বালিশ? মাথার বালিশ, কোলবালিশ সব যে ছেঁড়া! পেটের নাড়িভুঁড়ির মতো দুর্জন তস্করের ধারালো অস্ত্রের ঘায়ে সব তুলো বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। তমালের ঘরে বিনা নিয়ন্ত্রণে গতকাল রাতে যে বা যারা এসেছিল, তাদের নির্বুদ্ধিতায় এবার হাসি পায় তমালের। ওরা কি ভেবেছিল মাস্টারের ঘরেও এত টাকা পয়সা থাকে যা লুকিয়ে রাখতে হয় বালিশের ভেতর? না, শোয়া আর হলো না তমালের।

তমাল তাই দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখা যাক গণ্ডগোলটা আসছে কোত্থেকে। খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার হয় না। রাস্তার মোড়ে পুরনো বিশাল বটগাছটার তলাতেই জটলাটা জমেছে। তমাল এক পা দু'পা করে কাছে এগোয়। কয়েক গণ্ডা মাথার ভিড় ডিঙিয়ে একটু ভেতরে ঢুকতেই তমালের চোখে পড়ে সেই মেয়েটিকে, যে মাস দুয়েক আগে একবার এসেছিল তমালের কাছে। একটা মোটা সুতি শাড়ি সারা গায়ে জড়িয়ে (তমালের মনে হয়েছিল শাড়িটা আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে এসেছিল মেয়েটি) আঁচল খুঁটতে খুঁটতে মেয়েটি জানতে চেয়েছিল তমালের রান্না করে দেবার কাজটি সে পেতে পারে কিনা। গ্রামের পুরোহিত নিবারণ চক্রবর্তীর একমাত্র মেয়ে কমলা। পুজো দেয়ার লোকের বড়ই অভাব গ্রামে। তারপর যারা একসময় পুজোআর্চা করত, আর্থিক দীনতায় আজ তাও কমতে কমতে বছরে কেবলমাত্র একটা বা দুটোয় এসে ঠেকেছে। আগের মতো ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন, বিয়ে পৈতে বা শ্রাদ্ধও হয় না আজকাল। ঠাকুরমশাইর তাই অভাবের সংসার। কমলা জানতে চেয়েছিল তমালের মতো আশপাশের আরো দু-তিনজন লোক যাদের রান্না করার জন্যে ঘরে কেউ নেই, তাদের খাবারের ব্যবস্থাটি ঠাকুরমশাইর বাড়িতে করা যায় কি না। কমলার জিজ্ঞাসার ধরন, দ্বিধা এবং সংকোচ থেকে তমালের বুঝতে বাকি ছিল না, পুরোহিতের কন্যা হয়ে জন্মাবার সামাজিক গুরুভারটা বহন করতে না হলে এই মুহূর্তে লোকের বাড়ি গিয়ে ঠিকে ঝির কাজ করতে কমলার আপত্তি হতো না। কিন্তু শত হলেও এতদিনের সংস্কার আর বিশ্বাস। বামুনের মেয়ে হয়ে ভিক্ষা করা হয়তো চলে, কিন্তু লোকের বাড়ি গিয়ে দাসীগিরি করা তো যায় না! রান্না করার সঙ্গে একটা যৎসামান্য মহিমা জড়ানো রয়েছে, যার আড়ালে দাঁড়িয়ে কমলা নিজের দীনতা, নিজের লজ্জা কোনোমতে ঢেকে রাখতে পারে। বামুনরা তো চিরকালই পুজো-পার্বণে ভক্তদের বাড়িতে ভোগের রান্না করে তাদের কৃতার্থ করে এসেছেন। শোনা যায় দেবতারা নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বামুনের হাতে রান্না না হলে খাবেনই না। সে যাই হোক — ব্যাপারটা ভেবে দেখবে এবং অন্যান্যদের বলে কী করা যায় দেখা যাবে, এরকম একটা আশ্বাস দিয়ে কমলাকে সেদিন বিদায় করেছিল তমাল। কিন্তু বিকেলে কালুর মাকে কথাটা জানাতেই সে একবাক্যে তমালকে নিরস্ত করেছিল এ ধরনের প্রস্তাবে। 'ও মেয়ের বিরাট ইতিহাস আছে গো দাদাবাবু! ও বাড়িতে কক্ষনো যাবেন না।'

কালুর মা যে ইঙ্গিত দিয়েছিল, তা সুমন আর রবি আরো পরিষ্কারভাবে বলেছিল তমালকে। তমাল জেনেছিল কমলার একটা অতীত আছে, যে-অতীতে সে এমন কিছু করেছিল যা আজ ভুলে থাকতে চায় কমলা। অন্তত পারিপার্শ্বিক সমাজ তা ভুলে যাক, সে চায়। কিন্তু দেখা গেল কমলার বিগত অতীতের সেই ঘটনা একমাত্র কমলা ছাড়া আর কেউ ভুলতে রাজি নয়। প্রথম যৌবনের তার সেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক আজ কোথায় কেউ জানে না। কিন্তু জলজ্যান্ত কমলা তো বেঁচে রয়েছে! তাকে চোখের সামনে রেখে সেই গনগনে স্মৃতি থেকে বিচ্যুত হবে অতটা স্মৃতিভ্রষ্ট উন্মাদ কেউ তো নয়! তাই কমলার বেড়ার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রিকশাওয়ালারা প্রতি রাতে শিস দেয়। কলেজে-পড়া ছেলেরা কমলাকে দেখলে গানের কলি, কবিতার ছত্র ছুড়ে মারে। কেউ কেউ জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো পর্যন্ত! না, তমাল এ-সবের কিছুই করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমলাকে তার ভাত রেঁধে দেয়ার চাকরিটি দেওয়ার সাহসও হয়নি তার।

দু'সপ্তাহ আগেই হঠাৎ কালুর মা এসে বলল কমলার বিয়ে। নির্দিষ্ট দিনে কালুর মা এসেই আবার খবর দিল বরপক্ষ বিয়ের আসর থেকে ছেলে নিয়ে চলে গিয়েছে বিয়ে না করে। কমলার চরিত্র সম্বন্ধে আবার জানাজানি হয়ে গিয়েছে। এরকম ঘটনা এটাই প্রথম নয়। শোনা যায়, এর আগেও কয়েকবার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পরও কমলার বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। তবে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বর ফিরে যায়নি এর আগে।

সেই, সেই রাতেও এমনি একটি মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল এই গ্রামে। তমাল সেদিন বাইরে আসেনি। কেননা, কোথা থেকে এবং কেন এই কথাবার্তা ভেসে আসছে সে সবই জানত। বাইরে এসে দেখার সাধ হয়নি। সেই সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে চেষ্টা করেছিল তমাল। রাতে একদম খিদে ছিল না। তাই সে রাতে কিছুই খায়নি তমাল।

বটগাছটার আরো একটু কাছে এসে দাঁড়ায় তমাল। খোলা বটগাছের ঠিক নিচে আছে কমলা। পরনে একটা লাল-পেড়ে কোরা মিলের শাড়ি যা পুনঃপুন ব্যবহারে বেশ ময়লা। শায়িত বাবার মাথাটা কোলে তুলে তাঁর মাথায় হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছিল কমলা। তমালের মনে হলো এটা হয়তো কমলার অধিবাসের শাড়ি ছিল — বিয়ের শাড়ি পরার সুযোগ তো আর হয়নি তার! বৃদ্ধ নিবারণ চক্রবর্তী জ্বরের ঘোরে তখনো বকবক করে কমলার সত্বর মৃত্যুর জন্যে ঈশ্বরের কাছে পুনঃপুন প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর শারীরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষমতা নয়, অসুস্থতা নয়, বাড়ি ভাড়া দেয়ার অপারগতায় এক বস্ত্রে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতে বাধ্য হওয়ার গ্লানিও নয়, তাঁর জীবনের সমস্ত লাঞ্ছনা, অপমান, সব কষ্টের জন্যে দায়ী যে-কমলা, তার মৃত মুখ দর্শন করতে পারলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে নিবারণ চক্রবর্তীর।

পাড়াপড়শির কথা থেকে তমাল বুঝতে পারে কমলাদের কোনো এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় আসছে অন্য গ্রাম থেকে। তার সঙ্গে আপাতত গ্রামেই যাবে বাবা মেয়ে। তমাল আবার তাকায় কমলার দিকে। ভালো করে দেখে কমলাকে। গায়ের কালো রং-এর ওপর ছোট নিটোল নাক, দুটো উজ্জ্বল চোখ। বাঁকানো ঈষৎ মোটা ভুরু। ঠোঁট দু'টো সরু সরু, ভরাট গাল। অজস্র কালো চুল। এলো খোঁপা অর্ধেক ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে পিঠে। কমলার পরনের শাড়িটা বড় মলিন। তমালের মনে হলো কমলার এই যে ম্লান চেহারা তার জন্যে এই অপরিচ্ছন্ন শাড়িটা অনেকাংশে দায়ী। হঠাৎ তার মনে পড়ল, অবিবাহিত হলেও তার ঘরে একটা সুন্দর শাড়ি রয়েছে। লাল-পেড়ে হলুদ রং-এর তাঁতের শাড়ি; জমিনে অজস্র লাল বুটির কাজ-এ একমাত্র শাড়ি যা তমাল কিনেছে জীবনে। ও-শাড়িটা পরলে এ গাছতলাতেও কমলাকে এত মলিন, এত ক্লান্ত দেখাবে না। এই শাড়ি তিন্নিকে যেদিন দিতে গিয়েছিল তমাল, সেদিনই পার্কে তিন্নি বলেছিল, 'জীবনটা কেমন একটা ছকবাঁধা অভ্যেসের মতো হয়ে পড়েছে। শুক্রবার করে তুমি আসবে। আমি সেজেগুজে তোমার সঙ্গে বেরুব। এই পার্কে আসব। বাদাম খাব কিংবা পাশাপাশি বসব। অতি পরিচিত কয়েকটি শব্দ আওড়াব। তারপর যে যার মতো ঘরে ফিরে যাব। আশ্চর্য, আমরা এখন পর্যন্ত বিয়ে অবধি করিনি! বিয়ে করলে এতদিনে পারিবারিক সমস্যা ছাড়া কোনো কথাই হয়তো অবশিষ্ট থাকত না আমাদের মধ্যে।' তিন্নি শাড়িটা নেয়নি। অতি ভদ্রভাবে তমালকে তা ফিরিয়ে দিয়েছিল, যেমন করে ফিরিয়ে দিয়েছিল আট বছরের সব স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। স্মৃতি ছাড়া আজ আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই এ দীর্ঘ সম্পর্কের। শেষ দিকে বড় অসহনীয়, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তিন্নি।

বটতলা থেকে তমাল দ্রুত ঘরে ফিরে আসে। খাটের নিচে ট্রাঙ্কটি খুলে এলোপাতাড়ি খুঁজতে শুরু করে হলুদ রঙের তাঁতের সেই শাড়ি। এখানেই রেখেছিল তমাল। কিন্তু নেই। ট্রাঙ্কের কাগজপত্র, তিন্নির একগোছা পুরনো চিঠি, দু'একটা গেঞ্জি, সব ছত্রখান। ট্রাঙ্কটা উল্টে মাটিতে ফেলে তন্ন তন্ন করে খোঁজে তমাল। না, কোথাও নেই। তমাল এবার পাগলের মতো ঘরের সর্বত্র ছুটে বেড়ায়। আরেকটা স্যুটকেস, আলমারি, তাকিয়া, বিছানার তলা — সব আবার নতুন করে তছনছ করে। কোথাও নেই। এবার সত্যি সত্যি তমালের খুব রাগ হয়। ভীষণ ক্রোধ জন্মে অজানা অচেনা গত রাতের সেই তস্করের ওপর। কী অধিকারে তার অগোচরে তার ঘরে ঢুকেছিল সে? শুধু যে তার মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে তা নয়, তমালের অতীত, বর্তমান, তার সমস্ত জীবনের বন্ধ বাক্সের ডালা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে তার সব কিছু জেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে সেই ভণ্ড লম্পট। নিজের খুশিমতো তন্ন তন্ন করে সব ছুঁয়ে গেছে, দেখে গেছে এবং সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে তার একান্ত ব্যক্তিগত অনেক কিছু। তমাল ভাবে, এ অন্যায়, বড়ই অন্যায়।

কমলার মলিন বসন, বিষণ্ন মুখমণ্ডল চোখে ভাসে তমালের। তার দাক্ষিণ্য কমলা গ্রহণ করবে কিনা তার নিশ্চয়তা ছাড়াই একটি হলুদ রঙের টাঙ্গাইল শাড়ি দিয়ে কমলার জীবনের সমস্ত লজ্জা, দীনতা-কমলার সারা জীবনের গ্লানি ঢেকে দিতে চেয়েছিল তমাল। কিন্তু এক অবিবেচক স্বার্থপরের স্বেচ্ছাচারিতায় তাও আর সম্ভব হলো না। এখন তাহলে কী করবে তমাল?

তমাল বোঝে, ভেতর থেকে দরজা ভেজাবার পালা আবার এখন। তারপর একটা বা দুটো বই নিয়ে শুয়ে শুয়ে প্রবল মনোযোগের সঙ্গে আবার সেই পড়ার ভান।

বাইরের কোলাহল এতক্ষণে স্তিমিত হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে। তমালের ঘরের ভেতর জিনিসপত্র আগের মতোই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর নিজস্ব ভুবন

নারী ও ঘর

সত্তর বছর আগে লেখা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বিখ্যাত রচনা 'A room of one's own' অনুযায়ী একজন নারীর সার্থক লেখক হওয়ার জন্যে চাই দুটো জিনিস : ১. নির্দিষ্ট উপার্জনের নিশ্চয়তা, ২. একখানা ঘর। অর্থ এবং নিভৃতি ছাড়া সৃজনশীলতার বিকাশ সম্ভব নয়, মনে করতেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। তাঁর মতে : লেখক যদি স্বস্তিতে, সুখে না থাকে, তার সৃজনশীলতা ব্যাহত হয়।

কল্পনা ও বাস্তবতা, যুক্তি ও কৌতুক মিলিয়ে লিখিত এ রচনা মূলত একটি কলেজের লেকচার সিরিজের জন্যে তৈরি হলেও পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্রে পরিণত হয়। ভার্জিনিয়ার কল্পনাপ্রসূত শেক্সপিয়ারের বোনের অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী ও তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশের অন্তরালে ছিল যেসব বাধা ও সীমাবদ্ধতা, সেসব অতিক্রম করার জন্যেই অন্য নারীদের অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি। তাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন শেক্সপিয়ারের ভগিনী — তাঁর কবিসত্তা (যদিও ভার্জিনিয়া নিজেই স্বীকার করেছেন প্রতিশ্রুতি থাকলেও সেই শেক্সপিয়ারের বোন জীবনে একটি শব্দও লেখেননি)।

এ রচনার জন্যে যতই ভার্জিনিয়াকে ভোগবাদী, পার্থিব ও বস্তুসচেতন বলে নিন্দা করুক না লোকে, উল্‌ফের ধারণা, চিন্তার স্বাধীনতা ও চিন্তার উৎকর্ষ ছাড়া কালজয়ী রচনা বা সফল কবিতা নির্মাণ সম্ভব নয়। আর চিন্তার সেই স্বাধীনতারই পূর্বশর্ত — নির্ধারিত আয় ও একখানা নিভৃত কক্ষ। ভার্জিনিয়া মনে করেন মেয়েরা সে সুযোগ, মুক্তি ও স্বাধীনতা কখনো ভোগ করেনি। আর তাই পুরুষ যেখানে অনবরত ক্ষমতা, আধিপত্য, সম্পদ এবং খ্যাতি লাভ করেছে, নারী ক্রমাগত লাভ করেছে সন্তান। ভার্জিনিয়ার আশা — যদি মেয়েরা সেই স্বাধীনতা, সেই সাহস অর্জন করতে পারত, তারা ঠিক যা ভাবছে, যেমন করে ভাবছে সেই ভাবনা ঠিক তেমনিভাবে প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারত। যদি একবার তারা তাদের পারিবারিক বৈঠকখানা পেরিয়ে বাইরের পৃথিবী, তার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্ভার আর কোলাহলে চোখ ফেলতে পারত তাহলে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তে বাস্তবতার আলোকে বৃহত্তর মানবসমাজকে তারা নিরীক্ষণ করতে পারত।

ভার্জিনিয়া বিশ্বাস করতেন একটি মেয়ে যদি এটা মেনে নিতে পারে যে, তার হাত ধরে কেউ তাকে সামনে এগিয়ে নিতে যাবে না, তাকে একাই এগোতে হবে, জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবল নারী-পুরুষের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নয়, শাশ্বত বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তা হলেই সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত। শেক্সপিয়ারের ভগ্নি আবার বেঁচে উঠত, তাঁর কবিতা বিকশিত হতো।

কান্নার জন্যে ঘর

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিক টনি মরিসনের বিখ্যাত উপন্যাস 'Sula' (১৯৭৩)। মরিসনের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এটিও কৃষ্ণকায় মার্কিন জীবনের জাগ্রত প্রতিচ্ছবি। দুই বাল্যসখীর অম্লমধুর ভালোবাসা, প্রতারণা, হিংসা-দ্বন্দ্ব আর নির্ভরতার জটিল অনবদ্য মানবগাথা।

নেল ও সুলার জন্ম ও শৈশব অতিক্রান্ত হয় একই ছোট্ট শহরে। পরে জীবনের নানাবিধ মোহ, সুযোগ, বিভিন্ন মোড়ে আর ঘাত-প্রতিঘাতে দুজন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুরকমভাবে বেড়ে ওঠে। নেল সেই মধ্যপশ্চিম অঞ্চলের আটপৌরে ছোট্ট শহরেই থেকে যায়। ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান নিয়ে কালো মেয়ের গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ওদিকে সুলা যায় বড় শহরে। কলেজে পড়ে। কর্মজীবী, স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। বিয়ে বা সংসার নয়, বহু পুরুষের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে আরো তৃষ্ণা বুকে নিয়ে আবার ফিরে আসে জন্মস্থানে — সেই ছোট্ট শহরে। পুনরায় দেখা হয় দু-সখীর। নতুন করে শুরু করে তাদের পারস্পরিক আবিষ্কার, সংঘাত আর গভীর বিশ্বাস ও আস্থাভঙ্গের বিচিত্র সম্পর্ক।

এই উপন্যাসে একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে নেল হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা ছোট্ট জায়গা — একটুখানি নিভৃতি। বেলা আড়াইটে বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে আসবে। হাতে আর সময় নেই। এখন যদি সম্ভব না হয়, ওরা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত অর্থাৎ গভীর রাতের আগে তার আর কোনো সুযোগ হবে না। নেল তার চারদিকে তাকায়। ছোট্ট, ব্যক্তিগত একটি জায়গার জন্যে। প্রথমে সে ভাবে তার বিছানার কথা। পরক্ষণেই এই বিছানার সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় স্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। একবার ভাবে ক্লজেটের কথা। কিন্তু ক্লজেটে বড় অন্ধকার। অতঃপর মনে আসে বাথরুম। হ্যাঁ, এ জায়গাটি বেশ ছোট্ট এবং আলোকিত। তার দুঃখ ও বেদনাকে ধরে রাখার জন্যে সীমিত। আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে শান্ত সমাহিত করাবার জন্যে যথেষ্ট উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় কথা সন্তানদের, প্রতিবেশীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই একটি জায়গাতে এসেই সে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারে। অবশেষে নেল বাথরুমকেই বেছে নেয়। কিন্তু কীসের জন্যে? কী করতে চায় সে? এই নিভৃতি, এই আড়াল, এই ছোট্ট ঘরটির কী প্রয়োজন তার? প্রয়োজন আছে। নেলের খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। তার বুক উজাড় করা, পেটের গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসা, কণ্ঠনালিতে আটকে থাকা এই কান্নার দমক আলগা করে হাল্কা হতে চায় নেল। এ কান্না পিতার মৃত্যুর শোকের কান্না নয়। এ কান্না ছোট্ট ছেলেটির গা পুড়ে গেছে সেই দুঃখে নয়, এ কান্না অত্যন্ত ব্যক্তিগত, নিজস্ব কান্না। একান্ত নিজের যন্ত্রণা ও গভীর কষ্ট থেকে উৎসারিত কান্না। এ জন্যেই তার এ নিভৃতির প্রয়োজন।

কিন্তু কেন কাঁদতে চাইছে নেল। কালো সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই ছোট্ট শহরে স্বামী, সন্তান, ঘর নিয়ে আর দশটি মেয়ের মতো বেশ পরিপূর্ণ জীবন যাপনই তো করছিল নেল। তা হলে কেন সে আজ কাঁদতে চাইছে, গলা পরিষ্কার করতে চাইছে? চাইছে কারণ মাত্র কিছুক্ষণ আগে সে একটি টাই আবিষ্কার করেছে তার শোবার ঘরের ক্লজেটে। তার স্বামী জুড তাকে ছেড়ে সম্প্রতি চলে গেছে। চলে গেছে তারই বাল্যবন্ধু সুলার সঙ্গে। চলে গেছে — কেন না নেল নিজের চোখে ওদের দুজনকে একত্রে বিবস্ত্র ও চুম্বনরত অবস্থায় আবিষ্কার করেছিল তারই নিজের ঘরে।

জুড চলে গেছে। ফিরে এসে প্রথাগতভাবে তার যাবতীয় ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসও নিয়ে গেছে। কিন্তু ভুলে ফেলে রেখে গেছে অতি পরিচিত এই টাইখানা — নীল রঙের ভেতর একটি দিকে যার হলুদ রেখা। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের — এই গৃহে, নেলের জগতে তার অবস্থানের আর কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি জুড। এই টাই নেলকে মনে করিয়ে দিচ্ছে জুড এখানে ছিল যেভাবে ক্লজেটে ওটা ঝুলছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক জুড যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসবে। কিন্তু নেল জানে সেটা হওয়ার নয়। জুড কোনোদিন ফিরবে না। এভাবে চলে গেলে কেউ ফিরে আসে না।

স্বামী এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধুকে একসঙ্গে হারানোর শোকে যে কান্না, 'why me' বলে যে আফসোস ও বিলাপ তার জন্যে নিভৃতির প্রয়োজন হয় বইকি!

মৃত্যুর জন্যে ঘর

সিলেটের অভিজাত হোটেল 'পলাশ'-এর নিভৃত কক্ষে আত্মহত্যা করেছেন মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়। মৈত্রেয়ীকে আমি চিনি না। তার স্বামী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কেও নয়, যদিও তার আবৃত্তি শুনেছি ক্যাসেটে। ওদের কথা অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মুখে, যারা কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছেন ওদের, ভালোবেসেছেন। মৈত্রেয়ীর এরকম অসময়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে যারা গভীরভাবে শোকাহত, নির্মলেন্দু গুণ, শফি আহমেদের কাছে এই সাহিত্যানুরাগী দম্পতির কথা শুনেছি আমি। ওদের অতি স্নেহের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতিমনা মেয়েটিকে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি, জীবন্ত অবস্থায় যাকে কোনোদিন চোখে দেখিনি। মৈত্রেয়ী আমাকে শিখিয়েছেন শুধু লেখার জন্যে নয়, শুধু কাঁদার জন্যে নয়, মৃত্যুর জন্যেও নিভৃতির প্রয়োজন, অন্তত কোনো কোনো গভীর সংবেদনশীল স্পর্শকাতর মানুষের জন্যে তো বটেই।

নিজস্ব একখানা ঘর যদি কেবল লেখা অথবা অন্য যে-কোনো সৃজনশীল চর্চার জন্যেই প্রয়োজন হয়, যদি কাঁদার জন্যে প্রয়োজন হয়, মৃত্যুর জন্যে কেন নয়? কর্মজীবী নারী ছিলেন মৈত্রেয়ী। প্রাত্যহিক জীবনে না হলেও কর্মোপলক্ষে, মন খুলে কাঁদার জন্যে একখানি নিরিবিলি ঘর তো তিনি ইচ্ছে করলেই পেতে পারতেন। পেয়েছিলেনও। তবু তাঁকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হলো। তবে কি আমরা এটাই মনে করব নিজস্ব উপার্জন আর একখানা ঘরই (তা সৃজনশীলতার বিকাশ কিংবা কান্না যে-কোনো প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হোক না কেন) যথেষ্ট নয়। জীবনে আরো কিছু প্রয়োজন? যে প্রয়োজন ও তার অভাব অনুভব করেছিলেন মৈত্রেয়ী, অনুভব করেছিলেন 'নিজস্ব কামরা'র প্রবক্তা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ নিজেও, যিনি মৈত্রেয়ীর মতোই স্বামী এবং ঘর ফেলে, নিজস্ব আয় ফেলে নিজের হাতে জীবনের সমাপ্তি ডেকেছিলেন। কোটের পকেটে ভারী ভারী পাথর ভরে ধীরে স্থির নেমে গেছিলেন গভীর সলিলে। আত্মহননের কী বিস্তৃত আয়োজন দু-ক্ষেত্রেই।

অথচ এমন একটি দুঃখজনক, অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ব্যক্তিগত ঘটনাকে একটি জাতীয় দৈনিক (দলীয় দৈনিকও বটে) কী কুৎসিতভাবে, কী ভয়াবহ বিকৃতভাবে প্রথম পাতায় বক্স আকারে পরিবেশন করে! হোটেলের নিভৃত কক্ষে একাকী কোনো মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু, কেবল এই সংবাদটিই হয়তো মুখরোচক গল্প জন্ম দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট অন্তত এই কাগজটির ক্ষেত্রে। তার ওপর যোগ হয়েছে 'মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়' নাম। আর যায় কোথায়? মৈত্রেয়ীরা শুধু জীবদ্দশাতেই ভারতের চর নয়, মৃত্যুর পরও ভারতীয় নাগরিক থেকে যায়। আর তারপর তার চল্লিশোত্তীর্ণ শরীর যদি যৌবনাতিক্রান্ত না হয়, তা হলে হোটেলের নিভৃত কক্ষে এ আত্মহননের ঘটনার পর তার কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতি জানারও প্রয়োজন হয় না আর। তার ব্যক্তিগত জীবনাচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও কটূক্তি করতেও বাধা থাকে না। ভারতীয় কলগার্ল আর এনজিও কর্মীর মধ্যে পার্থক্য ঘুচে যায় — মনে হয় একই ধরনের জীবিকা এ দুটো! হবেই বা না কেন, ওরা সকলেই যে সমান এ কাগজটির চোখে।

গত মাসে একটি বিদেশি ছবি দেখার সুযোগ ঘটেছিল। নাম 'ক্রুসিবল্'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ অঙ্গরাজ্যের ছোট্ট শহর সালেমের উইচহান্টের সেই কুখ্যাত কাহিনি নিয়ে ছবি। কয়েকটি কিশোরীর দুষ্টুমি, অ্যাডভেঞ্চার ও মিথ্যে কথার পরিপ্রেক্ষিতে শয়তানের দোসর সাজিয়ে বহু নিরপরাধ লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সালেমে। এ ছবির নায়ককে যখন শয়তানের দোসর শনাক্ত করা হয়, তাকে একবার শেষ সুযোগ দেওয়া হয় তার দোষ স্বীকার করার। যদি সে বলে শয়তানের সঙ্গে তার কথোপকথন ঘটেছে, তা হলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। স্বীকার না করলে মৃত্যু। সুহৃদের পরামর্শে আর জীবনের প্রতি প্রবল ভালোবাসায় অনীহার সঙ্গেও অবশেষে সে মিথ্যে কথা বলে। মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয় যে, সে শয়তানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু যখন তাকে এই ঘটনাটি স্বীকার করে নিয়ে নিজের নাম স্বাক্ষর করে রাখতে বলা হয়, যে স্বাক্ষরিত দলিল স্থায়ীভাবে সালেমের নগরভবনে রেখে দেওয়া হবে, সম্পূর্ণ বেঁকে বসে লোকটি। সবাই অবাক। কিন্তু কেন? সে তখন চিৎকার করে বলে, 'কেন না ওটা আমার নাম। আর আমার এইটাই শুধু নাম।' জীবনের চাইতেও নিজের পরিচিতি বড় তার কাছে। মৃত্যুকে বেছে নিলেও নিজের সুনামকে বিনষ্ট হতে দিতে রাজি নয় সে। অথচ মৃত্যুর পরও তার যোগ্য সুনাম — তার সম্মান, সম্ভ্রম পেতে ব্যর্থ হলো মৈত্রেয়ী — জীবনেও যা সে বা তার স্ব-গোত্রীয়রা কখনো পায়নি এই কাগজের সমর্থকদের কাছে।

AMARBOI.COM

ঘর ও মানুষ

লেখার জন্যে, কান্নার জন্যে, মৃত্যুর জন্যে যদি নিভৃত ঘরের প্রয়োজন হয়, বাঁচার জন্যে, সুস্থতা ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজন কোনো মানুষ অথবা প্রকৃতির সান্নিধ্য। সেই মানুষ নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বালক, দেশি-বিদেশি যে কেউ হতে পারে। প্রকৃতির যে-কোনো রূপ, হোক না বিস্তীর্ণ বালুভূমি, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্রসৈকত, জঙ্গল, অথবা নক্ষত্রখচিত রাত — সেই ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রয়োজন শুধু আত্মঅবলোকনের স্পর্ধা ও সৎ ইচ্ছার। জীবদ্দশার খুব অল্প সময়ই আমরা নিজের জন্যে বাঁচি। যাপিত জীবনের প্রায় পুরোটিই কাটে অন্যের চোখে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার অবিরাম চেষ্টায়। আর তাই সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিভৃতি ও স্বাবলম্বিতার সঙ্গে কখনো কখনো কারো হাত ধরে পথ চলার মধ্যে কোনো গ্লানি দেখি না আমি, যতক্ষণ এই চলা দুজনকেই শক্তি জোগায়, আলো দেখায়। যতক্ষণ নির্ভরশীলতা থাকে পারস্পরিক, যতক্ষণ তা স্বেচ্ছায় একাকী পথ চলার সুযোগ এবং সাহসের পরিপূর্ণ বিকল্প না হয়। ফলে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'If we face the fact, for it is the fact, that there is no arm to cling to, but that we go alone and that our relation is to the world of reality and not to the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

world of man and woman, then the opportunity will come and the dead poet who was Shakespeare's sister will put on the body which she has so often laid down.' আমি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি না। আর মৃত্যুর কথা যখন চিন্তা করি, নিভৃতি নয়, প্রিয়জনের মমতাময় মুখই চোখে ভাসে আমার। দূর কোনো অপরিচিত স্থানে নিভৃতে একাকী মৈত্রেয়ীর মতো আমি মরতে চাই না, প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আমি নিঃশেষিত হতে চাই। সে প্রিয়জন স্ত্রী-পুরুষ যে কেউ হতে পারে, হতে পারে জাগতিক বিচারে আমার আত্মীয় অথবা অনাত্মীয়। যে প্রিয়জন বেঁচে থাকতে আমার জীবনকে আলোকিত, সমৃদ্ধ ও উজ্জীবিত করেছে, আমি চাই তার উপস্থিতিতেই আমার দেহ অসার হয়ে পড়বে। প্রাণ হবে নিশ্চল-নিশ্চুপ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের জন্যে সময়

কিছুদিন আগে আমার মেয়ের কাছ থেকে একটা ই-মেইল পেলাম। লিখেছে, 'ভাবতে পারো আমার বয়স তিরিশ হয়ে গেল?' না, ভাবতে পারি না। তবে হঠাৎ করেই প্রায় তিন দশক আগের কিছু স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আমার মেয়ে জয়ীষার বয়স তখন ছ-সাত মাস। আমেরিকান সোসাইটি ফর ফার্মাকোলজি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল থেরাপিউটিক্সের বার্ষিক সম্মেলনে আমার একটা পেপার দিতে যাওয়ার কথা। সেবার কনফারেন্স হচ্ছিল পোর্টল্যান্ড, ওরেগনে। যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোনায়। আর আমরা থাকি তখন একেবারে দক্ষিণ-পূর্বের এক উপকূলবর্তী শহর মোবিল, অ্যালাবামায়। গাল্‌ফ অব মেক্সিকোর ওপর উষ্ণ, সবুজ, ছিমছাম শহর মোবিল। এতটুকু মেয়েকে এতদূরে ফেলে কেমন করে বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগ দিতে যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এ প্রসঙ্গে একটু পেছনের দিকে ফিরে যাই।

ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে একটানা বাইশ বছর পড়াশোনা করে ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করি। আমার বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে। বিয়ের পর ন'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পড়াশোনা ও রিসার্চের কাজের চাপে সন্তান গ্রহণের সুযোগ হয়নি তখনো। ফলে ১৯৭৭ সালের গোড়াতে যখন প্রথম পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অ্যালাবামার মোবিলে এলাম, আমি তখন সদ্য অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস আগে *সায়েন্স* ম্যাগাজিনে এই শূন্য পদটির যখন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, লক্ষ করেছিলাম প্রফেসরের নাম দেওয়া হয়েছে — সৈয়দ জামাল মোস্তাফা। ফার্মাকোলজি বিভাগ। চারদিকে এতরকম ফেলোশিপ থাকা সত্ত্বেও গভীর দক্ষিণাঞ্চলে এত দূরে এ বিশেষ পদটির জন্যে আমার আবেদনের প্রধান কারণ ছিল, আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক বাঙালি। কূপমণ্ডূকত্ব এ-চিন্তায় প্রকাশ পেলেও, স্বীকার করি একজন বাঙালি প্রফেসরের কাছে কর্মজীবনের শুরুতে বিজ্ঞান গবেষণার হাতেখড়ি হবে ভাবতে আমার ভালো লেগেছিল। পরে অবশ্য জেনেছি (চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগেই) যে ড. মোস্তাফা আসলে লক্ষ্ণৌর লোক। স্বভাবতই খুব ভালো উর্দু বলেন। বাংলা জানেন না। অত্যন্ত সহৃদয় ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী সীমাও লক্ষ্ণৌর মেয়ে। চমৎকার দেখতে —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারেও। একমাত্র শিশুপুত্র জিশান। তরুণ দম্পতি। আমাদের নতুন শহরে প্রাথমিকভাবে সংসার গোছাতে সাহায্যের কোনো ঘাটতি রাখেননি তাঁরা। কিন্তু বিপাক বাধল যখন আমার সন্তানসম্ভাবনার কথা জানালাম ড. মোস্তাফাকে। অসম্ভব রেগে গেলেন তিনি আমার ওপর। তাঁর কথা থেকে এটা প্রচ্ছন্ন যে, তিনি এ ব্যাপারটা তাঁকে ঠকানোর পর্যায়ে ধরে নিয়েছেন।

আমি তাঁকে বলতে পারতাম, জানুয়ারিতে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম ও প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, আমি তখনো অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম না। কিছু লুকোবার প্রশ্ন তাই আসে না। দ্বিতীয়ত, এটা আমার নাগরিক, মানবিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার। এ ব্যক্তিগত ব্যাপারটি জানানো না-জানানো সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আমি তাঁকে বলতে পারতাম, তাঁর মন্তব্যগুলোকে ভিত্তি করে আমি যদি কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করি, তাঁর শুধু চাকরির সংশয় দেখা দিতে পারে তা নয়, শাস্তিও পেতে হতে পারে। তিনি নিজেও জানেন যে সম্পূর্ণ রীতি ও আইনবহির্ভূত আচরণ করছেন। চরম বৈষম্যের শিকার করছেন আমায়। আমি নিশ্চিত উপমহাদেশের মেয়ে যদি আমি না হতাম, তিনি এত সহজে তাঁর আশাহত হওয়ার ক্ষোভটা এভাবে প্রকাশ করতে পারতেন না। সেইসঙ্গে আমি এও বুঝতে পারছিলাম, ভারত থেকে আগত মেধাবী এই তরুণ বিজ্ঞানী এদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্যে, স্বাভাবিকভাবেই কত আগ্রহী ও সংগ্রামী। আমিই তাঁর প্রথম পোস্টডক। যাই হোক আমি এরপর যা করলাম, সেটা আজ হলে করতাম কি না সন্দেহ। ড. মোস্তাফার কাছে তখন প্রাণপণে প্রমাণ করতে শুরু করলাম যে, আমার গর্ভাবস্থা বিজ্ঞান সাধনার অন্তরায় কোনোমতেই নয়। ফলে দ্বিগুণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ল্যাবে পড়ে রইলাম। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে, পা টনটন করে ব্যথা করতে থাকত সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্যে। শরীর ভেঙে আসতে চাইত। কিন্তু নিজেকে দমতে দিতাম না।

আমার রিসার্চের বিষয়টিও ছিল বেশ চমৎকার। হার্ট অ্যাটাক হলে অর্থাৎ করোনারি রক্তনালি বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড থেকে স্বাভাবিকভাবেই এডিনোসিন নামে একটি পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা করোনারি রক্তনালিকে প্রসারিত করে রক্ত চলাচলের সুযোগ এনে দেয়। এটা শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। জরুরি অবস্থায় রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ডকে চালু রাখার স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা। এই এডিনোসিন কেমন করে কাজ করে, তার জন্যে নির্দিষ্ট রিসিপ্টর প্রোটিন আছে কি না করোনারি রক্তনালির জীবকোষের আচ্ছাদনে, থাকলে সেগুলো কেমন প্রকৃতির, সেটা জানাই আমার গবেষণার বিষয় ছিল। ল্যাবরেটরির জন্তু অর্থাৎ ইঁদুর কিংবা গিনিপিগ দিয়ে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করলাম, এসব ছোট জন্তুর করোনারি রক্তনালির পরিমাণ এতই অকিঞ্চিৎকর যে তা দিয়ে আমার প্রয়োজনীয় কাজ করা সম্ভব নয়। ফলে তখন বাধ্য হয়ে যেতে শুরু করলাম স্লটার হাউজে অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কসাইখানায়। শহরের অপরপ্রান্তে অবস্থিত স্লটার হাউজে নিজেই ড্রাইভ করে যেতাম। আমার চোখের সামনে বিশাল বিশাল গরুদের সার করে দাঁড় করিয়ে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারা হতো। মৃত বা অর্ধমৃত এই পশুগুলো মাটিতে পড়ে গেলে ছুরি দিয়ে ওদের বুকের পাঁজর ভেদ করে সেখান থেকে তখনো প্রচণ্ডভাবে স্পন্দনরত হৃৎপিণ্ডগুলো নিজ হাতে খুলে আনতাম। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডগুলো বরফের ভেতর ঢুকিয়ে না রাখলে রিসিপ্টরের গুণগত মান লোপ পেয়ে যেতে পারে। তাই রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডগুলো বরফের বাকেটে ভরে আবার গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসতাম ল্যাবে। সারাদিন ধরে ওই হৃৎপিণ্ড থেকে, সূক্ষ্ম কাঁচি ও ফোরসেপের সাহায্যে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছোট ছোট করোনারি রক্তনালিগুলো আলাদা করে সংগ্রহ করতাম। তারপর সেগুলো গুঁড়ো করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবকোষের আচ্ছাদন আলাদা করে সংগ্রহ করা যখন শেষ হতো, অনেক রাত হয়ে যেত তখন। সেগুলো ভবিষ্যতে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে ফ্রিজ করে রেখে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত শরীরে ঘরে ফিরতাম। রাতে ঘুমের মাঝেও স্বপ্ন দেখতাম সেসব বীভৎস দৃশ্য। গুলিবিদ্ধ হয়ে পশু ও মানুষ পাশাপাশি খুন হতো। প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুড়তে থাকত ওরা। গর্ভবতী মেয়েদের সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর স্বপ্ন দেখার ও সুখাবার গ্রহণের পরামর্শ দেয় লোকে। অথচ গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে অন্তত দুদিন স্লটার হাউজের এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হতো আমায়। যার ফলাফল রাতভর দুঃস্বপ্ন। আর সুখাবার? ক্লান্ত শরীরে রান্না করার আগ্রহ বা শক্তি একেবারেই থাকত না। কোনোমতে কিছু রেঁধে ক্ষুধার নিবৃত্তি করতাম। সে সময় আমার শরীরে বসবাসরত কন্যা আজো যে সুন্দর জিনিস দেখে মুগ্ধ হয়, সুন্দর চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে, এ জন্যে আমি অত্যন্ত প্রীত, ধন্য।

মেয়ের জন্মের আগে-পরে মিলে মাত্র চার সপ্তাহ ছুটি নিয়েছিলাম আমি। 'মেটার্নিটি লিভ' বলে আমেরিকায় তখন কোনো ছুটি বরাদ্দ ছিল না। নতুন চাকরি বলে আমার বাৎসরিক ছুটি সামান্যই ছিল। 'সিক লিভ'ও নেওয়া যেত না, কেন না 'গর্ভাবস্থা' অসুস্থতা নয়। কেবল তখন কোনো বিশেষ জটিলতা দেখা দিলেই 'সিক লিভ' নেওয়া চলত। ফলে সন্তান জন্মের তিন সপ্তাহ পরেই আবার কাজে যোগ দিয়েছিলাম। এত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অবশ্য কিছু স্বীকৃতিও পেয়েছিলাম। এডিনোসিন রিসিপ্টরের অস্তিত্ব করোনারিতে প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করি আমরা। একই বছর পরপর তিনটি জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে আমার পেপার গৃহীত হয়। এছাড়া পরবর্তী তিন বছর এ-বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ থেকে একটা ফেলোশিপ পাই। আমার বিজ্ঞানসাধনার জীবনে ওই বছরটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ — সবচেয়ে সার্থক হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু আমিই জানি, এ জন্যে কী অসীম মূল্য আমায় দিতে হয়েছে। যদি ওই সময়টিতে আবার ফিরে যাওয়ার উপায় থাকত, আমি ব্যাপারটাকে অন্যভাবে মোকাবিলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম। গর্ভাবস্থা পঙ্গুত্বের সমকক্ষ নয় — এটা প্রমাণ করার চেষ্টা বা হীনম্মন্যতা থেকে যে বিশাল গুরুদায়িত্ব নিজের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিলাম, আমি কখনো তা করতাম না। প্রতিটি মেয়ের জীবনেই এ-সময়টা একটা বিশেষ সময়। একটু আরাম করার, একটু আয়েশ অবসর করার অধিকার আছে তার — এ সময়ে যা নিজের বেলায় আমি পুরোপুরি অস্বীকার করেছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমার জীবনের সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল সময়ে অর্থাৎ গর্ভাবস্থার শেষ অর্ধেক ও কন্যার জন্মের প্রথম ছ'মাস আমার স্বামীকে কর্মোপলক্ষে সাড়ে তিনশ মাইল দূরে অন্য অঙ্গরাজ্যে থাকতে হতো। আমার সঙ্গে তখন ছিল কেবল সদ্য দেশ থেকে আসা আমার ছোট ভাই। ভাগ্য ভালো জয়ীষার জন্ম হয়েছিল রোববার। ফলে অন্তত দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা প্রসব বেদনা ও মেয়ের জন্মলগ্নে জ্যোতি ছিল পাশে। প্রার্থনায় বিশ্বাস না থাকলেও আমি খুব আশা করতাম জয়ীষা উইকএন্ডে জন্মাবে, যাতে ওর বাবা কাছে থাকতে পারে তখন। সেটা ঘটেছিল বলে সত্যি খুশি হয়েছিলাম আমরা।

তা যা বলছিলাম। শিশু সন্তানকে তিন হাজার মাইল দূরে রেখে বিজ্ঞান সম্মেলনে যেতে হচ্ছে। বিমানবন্দরে স্বামীর কোলে মেয়েকে তুলে দিয়ে প্লেনে উঠতে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার সঙ্গে একই কনফারেন্সে যোগ দিতে যাচ্ছিল আরো একটি মেয়ে। গীতা রাই। দক্ষিণ ভারতীয়। বিয়ে হয়েছে এক পাঞ্জাবি বিজ্ঞানীর সঙ্গে। গীতাও পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেও এক নাবালক পুত্র ও শিশুকন্যাকে স্বামীর কাছে রেখে যাচ্ছে। দুজনেরই খুব মন খারাপ আমাদের। সারাটা পথ প্লেনে প্রায় চুপচাপ বসে রইলাম আমরা পাশাপাশি। যেন কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে যাচ্ছি অন্তিমদর্শনে। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের সময় পূর্ব উপকূল থেকে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে আছে। ফলে দুপুরের ভেতরেই আমরা পোর্টল্যান্ড পৌঁছে গেলাম। অত্যন্ত সুন্দর ও পাহাড়ি শহর পোর্টল্যান্ড। হোটেলে ঢুকে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ফোন করি বাসায়। সব ভালো আছে। বাচ্চারা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করেছে। জয়ীষা তখন ঘুমুচ্ছে। জ্যোতি আমায় নিশ্চিত করতে চায়, মেয়ের কোনোই অসুবিধে হবে না। সে আমি নিজেও জানি। রাতে মেয়ে জাগলে আমার চেয়ে ওরই ঘুম আগে ভাঙে — সে-ই প্রথম সন্তানের শিয়রে গিয়ে দাঁড়ায়, এ কথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। তবে জাগ্রত সময়ে মেয়ের দেখাশোনা আমিই করি মূলত। ঘুমকাতুরে বলে রাতে উঠতে একটু আলস্য। তার ওপর রয়েছে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি — ঘরে ও অফিসে। কিন্তু তাই বলে মেয়েকে এত দূরে ফেলে আসা! বেলা পড়ে আসতে থাকে। আমি ও আমার সঙ্গিনী একটু একটু করে কথা আদান-প্রদান শুরু করি। প্রথম প্রথম সবটাই ঘিরে থাকে আমাদের সন্তান-ঘর-মোবিল। তারপর আমরা কথা বলি আমাদের কর্মজীবন সম্পর্কে। আমাদের নানাবিধ আগ্রহ ও অবসর যাপনের ব্যাপারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত কিছু করার কথা একসময় মনে হতো, কত ছোটখাটো আনন্দ নেওয়ার উপকরণ ছিল জীবনে। এখন এই মুহূর্তে বাড়ন্ত সংসার আর উঠতি ক্যারিয়ার নিয়ে হিমশিম খেতে খেতে সে সবে মোটেও দৃষ্টিপাত করতে পারি না আমরা। বিশেষ করে আমাদের তো 'ডাবল জিয়োপার্ডি'। এক মেয়ে — তার ওপর বিদেশি। অথচ ঢুকতে চাইছি অত্যন্ত কঠিন, পুরুষ অধ্যুষিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় এক কর্মময় জীবনে।

গীতা ও আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম আজ বিকেলে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ব। যতক্ষণ সম্ভব বাইরে বাইরে ঘুরব। খুব হালকাভাবে সময়টা কাটাব। যেই ভাবা সেই কাজ। স্নান করে নিজেদের একটু যত্ন করে সাজাই আমরা। সুন্দর দুটো সিল্কের শাড়ি পরি। হালকা সুগন্ধি মাখি গায়ে। মুখে ক্রিম। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। আয়নার সামনে দাঁড়াতে অনেকদিন পর আবার নিজেকে নারী বলে মনে হয়। দৈনন্দিন ব্যস্ততা, বিবিধ কাজের চাপে কবে যে শেষ ভালো করে চুল আঁচড়িয়েছি, আয়নায় নিজেকে ভালো করে চেয়ে দেখেছি, মনে নেই। আমরা বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম একটি জাপানিজ রেস্টুরেন্টে। হোটেলের নির্দেশানুযায়ী শহরের নামকরা জাপানিজ রেস্টুরেন্ট ওটা। সব কিছুই সেদেশের কায়দায়। জুতো খুলে ঢুকতে হয় ভেতরে। তারপর সেখানে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসতে হয়। চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নেই। চোখের সামনে খাবার রান্না করে দেয় কাঁচা উপকরণ থেকে। আমরা বেছে দিলাম কী খেতে চাই — কেমন করে খেতে চাই। ওরা মুহূর্তের মধ্যে সেসব রান্না করে টেবিল সাজিয়ে দিল চোখের সামনে। গরম গরম এই খাবার বেশ সুস্বাদু লাগছিল আমাদের। এক সময় ওয়েটার জানতে চাইল সাকে চলবে কি না। কোনোদিন খাইনি। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সম্মতিসূচক ইশারা করলাম। গরম জলের পাত্রের ভেতর পানীয়ের ডিকান্টার বসিয়ে, দুটো হাতলবিহীন ছোট ছোট কাপসহ একটি ট্রে নিয়ে এসে টেবিলে রাখল ওয়েটার। প্রথমে মুখে দিতে মনে হলো হালকা গরম নির্দোষ জল। একটু একটু খেতে খেতে আস্তে আস্তে কিছুটা আমেজ এলো। তখন সবকিছু বেশ হালকা ও মনটা কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ঠিক করলাম একটা ছবি দেখব। পাশে সিনেমা হলে একটা দারুণ অ্যাকশন মুভি চলছিল। টিকিট কেটে বসে খানিকক্ষণ দেখার চেষ্টা করলাম। ভালো লাগল না। বেরিয়ে এসে ঠিক করলাম শহরটি ঘুরে দেখা যাক। যেহেতু কিছুই চিনি না শহরের, ট্যাক্সি নিয়ে লাভ নেই। কোথায় যেতে হবে কোনো ধারণাই নেই যেখানে। ফলে আমরা ঠিক করলাম বাস নেব। এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গায় বদল করে যতটা পারা যায় শহর দেখব বাসে করে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছি তো দাঁড়িয়েই রয়েছি। দু-একটা বাস চলে গেল। থামল না। পোর্টল্যান্ডের প্রাক্তন মেয়র শহরটাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন তাঁর আমলে। সব বাসস্ট্যান্ডই আধুনিক ডিজাইনে কাচে ঘেরা। খুব আকর্ষণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসগুলোও নতুন — ঝকঝকে। রাস্তাঘাট প্রশস্ত — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হোটেলের রিসেপশনিস্ট বলছিল, এসব কারণেই নাকি এই মেয়রকে ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি করে ওয়াশিংটন নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমাদের সামনে দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল একটা চাইনিজ চেহারার লোক। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চীন-জাপান থেকে আগত মানুষের সংখ্যা প্রচুর। জিগ্যেস করলাম, 'বাসকে থামাতে কী করতে হবে? কোনো বাসই যে এখানে থামছে না!'

ভাঙা ইংরেজিতে লোকটি বলল, 'ওপরের দড়ি ধরে টান দেবে। তবেই বাস থামবে।' বলেই শূন্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে নিচের দিকে টানার ভঙ্গি করে দ্রুত চলে যায় লোকটি। আমরা হাঁ করে মাথার ওপর দড়ি খুঁজতে থাকি। পাই না। মনে প্রশ্ন জাগে — পোর্টল্যান্ডের যাতায়াত ব্যবস্থা এতই ভালো নাকি যে সমস্ত শহরে সংকেত দেওয়ার জন্যে ওপর দিয়ে দড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে? পরে বুঝলাম লোকটি আমাদের প্রশ্ন বুঝতে পারেনি। বাসের ভেতর থেকে ড্রাইভারকে থামার জন্যে দড়ি টেনে সংকেত দেওয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছিল। (আজকাল অবশ্য অধিকাংশ বাসেই 'টাচ টেপ' — অটোমেটিক সংকেত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।)

যাই হোক, পরে বুঝতে পারলাম আমাদের বাসস্ট্যান্ডটিতে এক্সপ্রেস বাস থামে না। সেগুলোই এতক্ষণ না থেমে চলে গেছে। একটি বাস জানতে চায় আমরা কোথায় যেতে চাই। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ফিক করে হেসে ফেলি। বাস তৎক্ষণে চলতে শুরু করেছে। আমরা একেবারে সামনের সিটটিতে, অর্থাৎ ড্রাইভারের ডানদিকে গিয়ে বসি। নিজের পাগলামি ও সন্ধ্যার অন্ধকারে এ অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভেবে আপন মনেই হেসে উঠি। ড্রাইভার বারবার আড়চোখে আমাদের দিকে তাকায়। শাড়ি পরিহিত এই দুই মহিলাকে তার কাছে হয়তো অদ্ভুত ও কিছুটা সন্দেহজনক মনে হয়। বাসের ভাড়া কয়েন অর্থাৎ খুচরো পয়সায় দিয়ে দিতে হতো তখন। কাগজের নোট চলত না। আমাদের কাছে যথেষ্ট ভাঙতি ছিল না। দু-একজনের কাছে নোট ভাঙাতে চাইলাম। না পেয়ে বোকার মতো চুপচাপ ভাড়া না দিয়েই বসে থাকি আমরা। প্রায় আধঘণ্টা পর বাসটা আস্তে আস্তে খালি হয়ে যায়। ততক্ষণে আমরা ড্রাইভারকে জানিয়েছি যে আমরা একটা বিজ্ঞান সম্মেলনে এসেছি এ শহরে এবং আজকের রাতের এই অভিযাত্রার উদ্দেশ্য কেবলই শহর দেখা। ভদ্রলোক মনে হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

আমাদের সম্পর্কে আগে যাই ধারণা হোক, এখন তিনি আমাদের অতিথির মতো সমাদর শুরু করেন। ততক্ষণে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন জায়গায় এসে থেমেছে বাসটি। পেছনের সিট থেকে এক মহিলা দুটি বাচ্চা ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে আসে ড্রাইভারের কাছে। জানতে পারি তারা তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা। গ্রীষ্মের ছুটি বলে ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই মাঝে মাঝে এসে বাবার বাসে ঘুরে বেড়ায় বাচ্চারা। ভদ্রলোকের পদবি 'Bosse', আমার শেষ নামের সঙ্গে খুব মিল। জানালেন এখন তার পনেরো মিনিটের বিরতি। খাওয়া-দাওয়া করে নতুন পথে যাবে এই বাসটি। উঁচু পাহাড়ের ওপরে নির্মিত ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হয়ে ফিরবে। ফলে শহরের সুন্দর অঞ্চলটা দেখতে পাব আমরা অপেক্ষা করলে। আমরা তো মহাখুশি। মিসেস বোসে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে এসেছে সকলের জন্যে। ওদের অনুরোধে ওদের সঙ্গে আমরাও খাই এটা-ওটা। সমস্ত বাসে তখন এই পরিবারের পাঁচজন ছাড়া শুধু আমরা দুজন। খাওয়া-দাওয়া করে নতুন রুটে চলতে শুরু করে বাস। ততক্ষণে আমরা এই গোটা পরিবারটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছি। ঠিকানা ও ফোন নম্বর আদান-প্রদান করেছি। এরপর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এই পরিবারটির সঙ্গে আমাদের চিঠিপত্র ও কার্ডে যোগাযোগ ছিল।

পুরো এক ঘণ্টা ধরে শহরের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চল ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে বাসটি আবার ফিরে আসে আমাদের হোটেলের কাছে। নামার সময় হঠাৎ মনে হয়, তাই তো, ভাড়া দেওয়া হয়নি। ড্রাইভারকে কথাটা বলতেই ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলে ওঠেন, 'তোমরা ভুল বাসে উঠে পড়েছিলে, তাই তো! ফলে পয়সা লাগবে না। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ো দেখি!' ততক্ষণে নতুন যাত্রীরা বাসে উঠতে শুরু করেছে। আমরা হেসে, হাত নেড়ে পরিবারটিকে বিদায় দিয়ে হোটেলে ফিরে আসি। একটি অদ্ভুত ভালো লাগায় মনটা ভরে যায়। ভাষা, গায়ের রং, জাতিগত পার্থক্য সব ঘুচিয়ে কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্যে হলেও আমরা কোথাকার কোন মানুষ কত কাছাকাছি চলে আসি আরেকজনের! ওরেগনের এই পরিবারটির সঙ্গে এই জীবনে আর যে দেখা হবে না তা তো প্রায় অবধারিত। তবু সেই অবিস্মরণীয় রাতের অভিজ্ঞতা তো মিথ্যে হয়ে যাবে না!

পরদিন আমাদের দুজনের পেপারই বেশ ভালো হলো। অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনাও শুনলাম। সন্ধ্যায় আমাদের সোসাইটির ডিনার ছিল। আবার দুজনে সুন্দর করে সাজলাম। ডিনারে গেলাম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের কী-নোট স্পিচ শুনলাম। খেলাম সবার সঙ্গে। বেশ কিছু নতুন বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হলো। পরিতৃপ্ত মনে ফিরে এলাম হোটেল কক্ষে। এরই মাঝে সুযোগ পেলেই বাসায় ফোন করে সন্তান-স্বামীর খোঁজ নিয়েছি আমরা।

রাতে শুয়ে শুয়ে আমরা প্রথমবারের মতো পরস্পরের কাছে স্বীকার করি, আমাদের এই দূরে আসা, স্বামী-পুত্র-কন্যা ফেলে রেখে একান্ত নিজের জন্যে নিজেকে কিছুটা সময় দেওয়া প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করছি আমরা। কোনো অপরাধবোধ, কোনো পিছুটান নেই এতে। অচিরেই এই সিদ্ধান্তে এলাম যে নিজেদের মানসিক প্রশান্তির জন্যে, আমাদের যে একটি আলাদা অস্তিত্ব আছে — একেবারে নিজস্ব ভালোলাগা-মন্দলাগার ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে, তা বোঝার জন্যে মাঝে মাঝে এভাবে একা কোথাও আসতে হবে। অফিসের কাজে, বিজ্ঞান সম্মেলনে অথবা কেবল বেড়াতেই।

পরদিন সন্ধ্যায় ফেরার পালা। পোর্টল্যান্ড বিমানবন্দর থেকেই প্লেনে চড়ার কথা। কিন্তু এবার সব কিছুই অন্যরকম। তাই রাতে কথা বলতে বলতে আমরা হঠাৎ ঠিক করলাম আরেকটু অ্যাডভেঞ্চার করব। ভোরবেলা উঠে বাসে করে চলে যাব ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটল শহরে। এ প্লেনটি পোর্টল্যান্ড থেকে সিয়াটল হয়েই যায় মোবিল। ফলে পোর্টল্যান্ডের বদলে সিয়াটল থেকে আমরা প্লেন ধরব। আমার পিএইচডি-র গাইড প্রফেসর ইয়ামানাকা তখন সিয়াটল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। মিজৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তাঁর অধীনে আমি কাজ করেছিলাম গবেষণার। ড. ইয়ামানাকা বহুবার যেতে বলেছেন সিয়াটল। তক্ষুনি তাঁর বাসায় ফোন করলে মিসেস ইয়ামানাকা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের সিয়াটল হয়ে যেতে বললেন। দুপুরে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের প্রিয় রেস্টুরেন্টে সিয়াটলের বিখ্যাত খাবার 'স্মোক্‌ড স্যামন' (smoked salmon) খাবার আমন্ত্রণও জানালেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে এয়ারলাইন্সে ফোন করে টিকিটের পরিবর্তন করে নিলাম এইভাবে যে, পোর্টল্যান্ডের বদলে সিয়াটল থেকে আমরা উঠব। এতে ভাড়ার কোনো হেরফের হবে না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে দূরপাল্লার বাসে করে উত্তরে যেতে থাকলাম। যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে প্রান্তিক পশ্চিম সীমা বরাবর, প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ঘেঁষে। কী অপূর্ব সুন্দর এ যাত্রা! একদিকে ধু-ধু সমুদ্র, অন্যদিকে সুউচ্চ পাহাড়। ওরেগন থেকে ওয়াশিংটন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না এ দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের। বাসস্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইয়ামানাকা দম্পতি। রেস্টুরেন্টে যাওয়ার আগে বহুবর্ণের গোলাপশোভিত তাঁদের বসতবাড়িতে নিয়ে গেলেন। চা খেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁদের প্রিয় রেস্টুরেন্টে স্মোক্‌ড স্যামন খেয়ে সিয়াটলের ল্যান্ডমার্ক স্পেস নিডলের সুউচ্চ স্তম্ভের ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁয় কফি পান করে যখন নিচে নেমে এলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ড. ও মিসেস ইয়ামানাকা আমাদের বিমানবন্দরে রেখে এলেন।

ফেরার পথে সারাটা পথ আবার চুপচাপ কেটে যায় আমাদের। আমরা ঘরে ফিরে আসি। বিমানবন্দরে স্বামী-সন্তান অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। আমরা তখন কেবল ভাবছি, আসলেই কি সত্যি গত দুটো দিনে যা ঘটল? আরো পরে বুঝেছি এ শুধু সত্য নয় — এ বাঁচার রসদ। সুস্থতা আর স্থিরতা রক্ষার কবচ। একান্ত নিজের জন্যে নিজেকে কিছুটা সময় দিতেই হবে! জীবনের প্রায় সবটা সময়ই তো আমরা কাটাই অন্যের পরিচর্যায়, ইচ্ছায়, খুশিতে। প্রাত্যহিক জীবনে পুরুষরা যদিও বা পায়, নারীরা একেবারেই পায় না, নিজস্ব কোনো সময়, নিজের মতো করে কাটাতে। ফলে কখনো কখনো এই দূরত্ব — এই নিভৃতির বড় প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে পড়ে তাদের। এই প্রয়োজনবোধ বা তা মেটানোর মধ্যে কোনো গ্লানি বা অপরাধবোধ থাকা উচিত নয়। কেউ যদি এতে স্বার্থপরতা বা উড়নচণ্ডী মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পান, তাদের কাছে একটাই নিবেদন : এমন প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতা আরো ব্যাপকভাবে আক্রমণ করুক সম্পূর্ণ নারীকুলকে। কেন না এ স্বার্থপরতা সুস্থতারই নামান্তর, যা একটি নারীকে উজ্জীবিত করে; জটিলতামুক্ত নির্মল আনন্দ দেয়; শক্তি, সাহস ও উৎসাহ জোগায় প্রাত্যহিক, সাংসারিক সহস্র দায়িত্ব কর্তব্য করে যেতে — নিরবধি বৈষম্যমূলক জীবনাচরণের শিকার হয়েও মাথা তুলে দাঁড়াবার সামর্থ্য অর্জন করতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিভৃতে একাকিত্বে নারী

নিভৃতি আর একাকিত্বের প্রধান পার্থক্য বোধহয় প্রথমটি পরিবেশগত, দ্বিতীয়টি মনোজাগতিক। প্রথমটি স্বেচ্ছাকৃত, পরেরটি আরোপিত। আগেরটি বাঞ্ছিত, অন্যটি অনাকাঙ্ক্ষিত। প্রথমটি মানুষকে উজ্জীবিত করে, দ্বিতীয়টি করে ক্লান্ত — পরাস্ত।

নিভৃতি

জীবন ও সংসারের প্রাত্যহিক কোলাহল, দাবিদাওয়া, কর্তব্য মিটিয়ে প্রতিটি মানুষ কখনো কখনো নিজের জন্যে নিভৃতি খোঁজে। একেকটি দুর্লভ মুহূর্তে নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় সে। একটি একটি করে সকল মুখোশ, প্রসাধন, পরিধেয় খুলে নিজেকে তন্নতন্ন করে দেখে। আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা করে। কোনো প্রবোধ, ছলনা, চাতুরী, কোনো অভিনয় নয়, — নিজের একান্ত আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা কেবল। জগৎজীবনে যতগুলো ভূমিকা পালন করে সে, সব ভুলে নিজের আসল রূপটা দৃশ্যমান হয় তখন। অথবা পরিপূর্ণ রূপ তখনো প্রকাশ পায় না। পায় সেই মুহূর্তের বাস্তবতা — সত্তার খণ্ডাংশ।

কখনো কখনো অবশ্য সে নিভৃতি এতটা অন্তর্গত, এতটা ব্যাপক অথবা এতটা গভীরে পৌঁছায় না। তখনো মানুষ চারপাশের লোকজন, হইহুল্লোড় পাশ কাটিয়ে কেবল একটু একা সময় কাটাতেই পছন্দ করে। আত্মোপলব্ধি, আত্ম-অবলোকন বা আত্ম-আবিষ্কারের জন্যে নয়, শুধু নিজের শ্রান্তি ঘোচাতে — নিজেকে সজীব করতে — বিশ্রাম নিতে। প্রকার যা-ই হোক, নিভৃতির প্রয়োজন বড় বেশি অস্বীকৃত আমাদের সমাজে। ভালোবাসার নামে, আন্তরিকতার দোহাই দিয়ে, কর্তব্য-দায়িত্ব মেটাতে অথবা খেয়াল বা নজর রাখার অজুহাতে আমাদের সমাজে অন্যের প্রাইভেসিতে বড় বেশি হস্তক্ষেপ করে ফেলি আমরা। এটা করে কখনো কখনো নিজেদের ওপরও বেশি ঝক্কিঝামেলা নেওয়া হয়, যার জন্যে করা হয় তাকেও উত্ত্যক্ত করা হয়। কিন্তু একটা অদ্ভুত গোলকধাঁধার ভেতর পড়ে যাওয়ার ফলে এর থেকে যেন মুক্তি নেই আমাদের। যেমন ধরুন কারো অসুখ হলো বা কারো পা ভাঙল। যারা সত্যিকার অর্থেই তার জীবনের কাছাকাছি — ব্যক্তিগতভাবে বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মোপলক্ষে — তারা এলো তাকে দেখতে, গল্পসল্প করল। ভালো কথা। কিন্তু আমাদের সমাজে পরিচিত সকলেই যেন আশা করে অসুখের খবর পেলেই ছুটে যেতে হবে দেখতে। যত ব্যস্ততাই থাকুক। যার অসুখ সেও তাই মনকে সেভাবেই তৈরি রাখে অহরহ লোক আসবে। বাড়ির সকলকেও সেরকম প্রস্তুতি নিতে হয়। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ছাড়াও অতিথি আপ্যায়ন একটা বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তখন।

সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে অথবা জরুরি অস্ত্রোপচারের পরে মরণাপন্ন রোগীকেও রেহাই দেয় না কেউ। নিজেদের বাহবা দিতে অসুস্থ ব্যক্তির জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হয় না তারা। অথচ অনেকেই বোঝে না, রোগীর মঙ্গলের জন্যে, তার নিরাপত্তার খাতিরেই তাকে হয়তো একা থাকতে দেওয়া দরকার। রোগী বা তার আত্মীয়স্বজনের জন্যে সত্যিকার অর্থেই যদি কিছু করার ইচ্ছা থাকে, সেটা অন্যভাবেও করা যায়। সাক্ষাৎ দিয়েই নয় কেবল। ছোট বাচ্চাটাকে ঘরে এনে রেখে, যাতে তার মা রোগীর সেবা করতে পারে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্যে রান্না করে, বাজার করে, তাদের অফিস, বিল বা ব্যাংক-সংক্রান্ত ছোটখাটো কাজ করে দিয়ে।

শুধু অসুস্থ সময়ের কথা নয়, মৃত ব্যক্তির বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের দলে দলে গিয়ে শোকপ্রকাশ সবসময় বাঞ্ছিত কি না সেটাও যাচাই করা দরকার। কেউ কেউ চাইতেই পারে তাদের শোক, দুঃখ বা রোগভোগের সময়টা নিরালায় একান্তে কাটাতে। এমন মানুষও রয়েছে, যারা সত্যিকার অর্থেই সংকোচ বোধ করে তার শরীরের জরা নিয়ে বা ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যে লোকজনের অতিশয় দুশ্চিন্তাপূর্ণ মনোযোগে। তাদের সেই নিভৃতি, তাদের সেই ইচ্ছার স্বীকৃতি দেওয়া দরকার।

আমার মনে আছে — ষোলো বছরের এক ফুটফুটে মেয়ে, দোলা, ক্যান্সারের ভয়াবহ আক্রমণ ও কেমোথেরাপির প্রতিক্রিয়ায় কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ কেশবিহীন ও কংকালসার হয়ে পড়ল। মেয়েটি চাইত না কেউ তাকে এ অবস্থায় দেখুক। নিজের প্রাক্তন রূপ সম্পর্কে সচেতন এই কিশোরী পরিচিত কাউকে সামনে দেখলেই বিছানার চাদর বা বালিশ দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রাখত। সংবেদনশীল প্রিয়জনের উচিত ছিল তার এই অন্তিম ইচ্ছাকে মূল্য দেওয়া — সম্মান করা — তার যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে সহনীয় করে তোলা কিছুটা সমীহ দেখিয়ে। কিন্তু কার্যত তা ঘটেনি। মৃত্যুপথযাত্রী এই মেয়েটিকে ক্রমাগত দর্শন দিতে হতো অতিথিদের, পুরোপুরি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে — প্রচণ্ড ক্ষোভ ও মনঃকষ্টের সঙ্গে। আত্মতুষ্টির জন্যে এমন করে অন্যের প্রাইভেসি হরণের কোনো অধিকার আমাদের নেই।

একইরকমভাবে কোনো সমব্যথী বন্ধু বা স্বজনও প্রিয়জনের মৃত্যু, অসুখ অথবা বিবাহবিচ্ছেদে তার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ব্যক্ত করতে পারে। সে যদি মনে করে কাছে গিয়ে দেখা করার চাইতে দূরে বসেই এমন কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যেতে পারে যা তাকে নিজেকে এবং তার প্রিয়জনকে বেশি সান্ত্বনা দেবে, তা হলে সে সেটাই করবে। ঘনিষ্ঠভাবে সবচেয়ে বড় কাজ বোধহয় দুর্যোগ অথবা দুঃখজনক ঘটনার শিকার ব্যক্তিটির মনে এই বোধের জন্ম দেওয়া — এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে তার প্রতি সহমর্মিতা সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে, লৌকিকতা ও বাহ্যিক আচরণ যেমনটিই করা হোক না কেন, সেই প্রিয়জনের ওপর সর্বদা পরিপূর্ণ নির্ভর করতে পারে এ ব্যক্তি এবং যে-কোনো অবস্থাতে এই প্রিয়জন এসে পাশে দাঁড়াবে।

ফলে কারো মৃতমুখ দেখতে অনাগ্রহী হওয়া, জানাজায় অংশগ্রহণ না করা অথবা শ্রাদ্ধে খাদ্যগ্রহণে বিরত থাকা মৃতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো বা মৃতের আত্মীয়ের প্রতি সমব্যথী না হওয়ার দৃষ্টান্ত নাও হতে পারে। দুঃখের দিন অতিবাহিত করার অথবা প্রিয় ব্যক্তির দুর্দিনে পাশে থাকার ব্যাপারটা একেকজন একেকভাবে দেখে — একেকভাবে মোকাবিলা করে। এই আপেক্ষিক মূল্যবোধ — অনুভূতি প্রকাশে জনে জনে তারতম্য অস্বীকার করে লাভ নেই। কোনো বিশেষ ফর্মুলায় সকলকে ফেলে কাউকে কাউকে এর বিচ্যুতির জন্যে প্রকাশ্যে সামাজিক বিচার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কাজ নয়। সহমর্মিতার অভাবই প্রকাশ পায় কেবল।

একাকিত্ব

AMARBOI.COM

একাকিত্ব কাম্য নয়। সঙ্গ যখন প্রয়োজন, কারো উষ্ণ অস্তিত্ব, পরিচিত কণ্ঠস্বর যখন প্রত্যাশিত, তখন হিমশীতল একাকিত্বে নিজেকে নিক্ষেপণ বড় বেশি যন্ত্রণার। তবু আসে এই একাকিত্ব। পঙ্গু করে আমাদের অনুভব, বেঁচে থাকার স্পৃহা, স্বপ্ন দেখার বাসনা। নিজেকে যতই কেন না সবচেয়ে ভালোবাসি আমরা, আত্মপ্রেমও প্রায় অবধারিতভাবে অন্যের আগ্রহ, অন্যের মনোযোগ নিজেতে আবিষ্কারের মাধ্যমেই। যেই মুহূর্তে মানুষ মনে করে, তার জন্যে ভাবনার কেউ নেই, তার সঙ্গলাভে কেউ উন্মুখ নয়, তার প্রয়োজনে বা বিপদে পাশে এসে কেউ দাঁড়াবে না, সে মুহূর্তে জীবনের সকল আনন্দ ঝরে পড়ে। একাকিত্ব মানুষের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। মানুষকে জীবনবিমুখ করে তোলে। ঘড়ির কাঁটা তখন খুব ধীরে চলে, সেকেন্ডের শব্দ উচ্চৈঃস্বরে বাজে। সূর্যের উত্তাপ তখন খুব প্রখর মনে হয়; শালিকের কিচিরমিচির থামতেই চায় না আর, বাথরুমের আধখোলা কলের গড়িয়ে পড়া জলের শব্দ তখন অসহনীয় একটানা কানে বাজে। টেলিফোনের পাশে উন্মুখ কর্ণদ্বয় কলের গানে তন্ময় হতে পারে না। পুরনো ও পঠিত চিঠি বারবার পড়ে লোকে — অ্যালবামের পাতা চোখের সামনে খুলে ধরে। প্রিয় বইয়ের পাতা উলটিয়ে মনোযোগ দিয়ে পুনরায় পড়ার চেষ্টা চলে। একটানা বৃষ্টির শব্দ শোনে, ফাল্গুনী হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কলম, কালি, রং, ক্যানভাস, ফুলের চারা, কুঁড়ি বড় বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন, মানুষ যখন একা হয়ে পড়ে। তানপুরা, হারমোনিয়াম অথবা তবলায় টুংটাং টোকা পড়লেও, ধূলিই জমে কেবল। নিত্যব্যবহারে তারা চকচকে হয়ে ওঠে না। তখন সন্ধ্যায় ঘরে আঁধার জমলেও আলো জ্বলে দেরিতে, খাবারে অরুচি অথবা নিষিদ্ধ খাবারে দুর্বার আগ্রহ বেড়ে যায়; অসময়ে ঘুম আসে অথচ গভীর রাতে চোখ খোলা। জানালার বাইরের গাছগাছালির ঝিরঝিরে পাতার ছায়া এলোমেলো হাওয়ায় পূর্ণিমার আলোতে ঘরের মেঝেতে খেলা করে।

একাকিত্ব মানুষকে কাবু করে, পরাজিত করে, কাতর করে, দুর্বল করে তোলে। জীবনের শুভ ও সুন্দর দিকগুলো হঠাৎ করে আড়াল হয়ে যায় তখন, গভীর কষ্ট, বঞ্চনা আর হতাশা প্রবলভাবে গ্রাস করে। রাতের দৈর্ঘ্য প্রলম্বিত হয়। সকালে উঠতে কষ্ট। শরীরে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, সব কিছু কীরকম অর্থহীন — নিরানন্দ। মৃত্যু যদি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত হয়, একাকিত্ব জীবনের নিঃশেষিত মুহূর্ত। হৃৎপিণ্ডের ধুপধাপ না থেমেও জীবন যখন নিথর হয়ে আসে — সব আলো নিভে যায় — যন্ত্রণায় নীল হয় তখন মানুষ, শিরা-উপশিরায় উষ্ণ বহমান রক্তধারা নিয়েও। সান্ত্বনা শুধু একটাই। একাকিত্ব স্থায়ী হয় না। স্বাভাবিক মানুষ কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তি, বস্তু, নেশা, শখ অথবা বিনোদনে এ একাকিত্ব একদিন কাটিয়ে ওঠেই। জীবন এগিয়ে চলে এভাবেই।

AMARBOI.COM

নিভৃতি, একাকিত্ব ও নারী

নিভৃতির অভাব ও একাকিত্বের যন্ত্রণা নারী এককভাবে যতটা অনুভব করে, পুরুষ হয়তো তা করার সুযোগ পায় না। নারীর শারীরিক গঠন, বিকাশ ও প্রকৃতির জন্যেও তার জীবনের প্রায় প্রতিটি দশকেই কোনো না কোনোরকম নিভৃতির প্রয়োজন হয়। বয়ঃসন্ধির নানান পরিবর্তন — যথা স্তনের আবির্ভাব ও ঋতুস্রাব, পোশাক পালটানো, স্নান করা, প্রেমের অনুষঙ্গ, স্বামী সোহাগ, সহবাস ও তার ঠিক পরবর্তী পর্যায়, গর্ভকাল, সন্তান প্রসব, স্তন্যদান, ঋতুবন্ধ — প্রতিটি পদেই নারী সংসার আর সমাজের কোলাহল থেকে একটু নিভৃতি খোঁজে। খুঁজে হন্যে হয়। পায় না। নিভৃতি খোঁজে সে ঘর-সংসার, রান্না, আত্মীয়-পরিচর্যা আর বিবিধ লৌকিকতা কর্তব্যের পর নিজের কথা আলাদা করে একটু ভাবার জন্যেও। সে সুযোগও হয় না।

আর একাকিত্ব সবসময় মনুষ্য-পরিজনের অনুপস্থিতিই নয়। এটা যতটা না পারিপার্শ্বিকতার, ততটা বোধের। সাগরের অসীম জলরাশিতে অবস্থান করেও ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিক যেমন পিপাসার্ত, অনেক নারীই সহস্রের সান্নিধ্যে থেকেও সারাজীবন তেমনি একাকী ঘুরে বেড়ায়। জনারণ্যে নারী প্রার্থিত সঙ্গ খোঁজে। তবে এরই ভেতর — সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীকুলের ভেতর — একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে যদি আলাদা করে চিহ্নিত করতে হয়, যাদের একাকিত্বের বোঝা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভারী অথচ যার সন্ধান মেলে না অথবা যা দৃশ্যমান হয় না প্রাত্যহিক জীবনে। যাদের স্বাবলম্বিতা, স্বাধীন চিত্ত ও সাহস তাদের অনুভূতির জগৎটাকে পার্থিব নানান উপকরণ দিয়ে আড়াল করে রাখে, সে সম্প্রদায় যত শিক্ষিত, কর্মজীবী, বিবাহিত, শহুরে নারী (শিকবিশনা)। এই শিকবিশনাদের সোজা হয়ে পথ চলা, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা, আবার একইসঙ্গে ঘর-সংসার, স্বামী, সন্তান ও সামাজিক লৌকিকতার বিষয়ে নজর দেওয়া এতখানিই ক্লান্ত করে যে নিজেদের একাকিত্বের কথা তাদের আলাদাভাবে ভাবারও সবসময় অবসর হয় না। তাদের মানসিক চাহিদা, একাকিত্ববোধ, বিনোদন বা আড্ডার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি অস্বীকৃত যদি নাও হয়, অধিকাংশ সময়েই তা সীমিত থাকে বা মেটানো হয় নিজের বা স্বামীর কর্মোপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে — কর্মসংক্রান্ত লোকজনের সঙ্গে। শিকবিশনাদের যে ব্যক্তিগত বন্ধুর প্রয়োজন হতে পারে, ব্যক্তি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের ভাবনার আদান-প্রদানের যে স্পৃহা রয়েছে, তাদেরও যে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-মন্দলাগার বিষয়গুলো সমমনা লোকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার ইচ্ছে জাগতে পারে, সেরকম সম্ভাবনা বা বাস্তবতাকে অনেকেই মানতে পারে না।

অশিক্ষিত শহুরে বা গ্রাম্যবধূ, যার বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতি খুবই কম, জীবন থেকে যার প্রত্যাশা নগণ্য, যে প্রাত্যহিক দুঃখ-কষ্ট, অপমানের ভার বিনা দ্বিধায় প্রতিবেশিনীর সঙ্গে খোলাখুলি ভাগাভাগি করে, প্রয়োজনে কান্নাকাটি করে লাঘব করতে পারে, তার সঙ্গে শিকবিশনাদের তুলনা হয় না। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ই শেষোক্ত সম্প্রদায়কে ক্রমাগত একাকী ও কোণঠাসা করে দেয়। জীবনের চেহারা অন্যরকম এবং উন্নততর হতে পারে এ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে তাদের, সে জীবন আস্বাদের পদ্ধতিও জানা রয়েছে, তবু সবসময় সেখানে পৌঁছাতে পারে না তারা।

শিক্ষিত কর্মজীবী বিবাহিতা নারী তার একাকিত্বের কথা পুরুষ বন্ধু বা সহকর্মীকে বলতে দ্বিধান্বিত। নানান জটিলতা, ভুল বোঝাবুঝি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সেখানে। আর অনুভবটা উভয়পাক্ষিক না হলে মেয়েদের কাছে বলতে গেলেও নিজের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয় — সহানুভূতির নামে পাওয়া যায় করুণা। কেননা এ সম্প্রদায়ের একাকিত্ব সমাজ স্বীকৃত নয়। অনেকেই ধারণা করতে পারে না মানসিক নির্ভরতার জন্যে শিকবিশনারাও খুঁটি খোঁজে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাবলম্বিতা এবং স্বাধীনতা অর্জন করার পরও তারা যে অন্য সকল স্বাভাবিক মানুষের মতোই স্নেহের, আদরের, মনোযোগের কাঙাল, এ কথা অনেকেই ভুলে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে আছে, আমার ছেলেমেয়েরা দুটোই তখন ছোট। আমার মাতৃতুল্য মেজদি আমার অন্য বোনদের ছেলেমেয়েদের জন্যে নিজের হাতে রাত জেগে জেগে উলের সোয়েটার, মোজা, টুপি বুনে আমারই হাতে তাদের কাছে পৌঁছে দিত। আশ্চর্য, দিদির একবারও মনে হতো না আমার সন্তানদের কথা। কেননা ওর ধারণা আমার বাচ্চারা ভালো এবং দামি শীতের পোশাক পরতে পারে। ওদের ঘরে-বোনা উলের সোয়েটারের প্রয়োজন নেই, অথচ দিদি জানে না জীবনে বহু সুন্দর পোশাক পাওয়ার পরও আমি ছোটবেলায় মায়ের হাতে এমব্রয়ডারি করা গোলাপি অর্গেন্ডির সেই জামাটার কথা আজও ভুলতে পারি না। আমার চার বা পাঁচ বছর বয়সে আমাকে ও ছোড়দিকে দুটো অর্গেন্ডির জামা নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছিল মা। আমারটায় গোলাপির গায়ে ছিল বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে কাজ করা একটা মুরগি, যার হাতে আধখোলা একখানা ছাতা। আর ছোড়দির জামাতে ছিল একটি ফুলের পাশে উজ্জ্বল এক প্রজাপতি। আমি আজও চোখ বুজলেই মায়ের উষ্ণ স্নেহের স্পর্শ অনুভব করি। মুরগি আর ছাতাসহ সেই অর্গেন্ডির গোলাপি জামা স্পষ্ট চোখে ভাসে। জামার গায়ে আজও যেন লেগে আছে মায়ের পরিচিত গন্ধ।

শিক্ষিত, কর্মজীবী, বিবাহিত, শহুরে পুরুষদের মতো শিকবিশনাদের না আছে কোনো স্থায়ী ক্লাব, না আছে কফি হাউস, চায়ের দোকান অথবা রাত করে রাস্তায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থা। এই রাজধানীতে শিকবিশনারা শুধু পড়ার জন্যে, কাজের জন্যে, মৃত্যুর জন্যেই নয়, নেহাত একাকিত্ব ঘোচানোর জন্যে, প্রিয় সঙ্গী বা সঙ্গীদের সঙ্গে নির্মল সময় কাটানোর জন্যে নিজের বাড়ির বাইরে একটা জায়গা খুঁজছে। এ জায়গায় বসে তারা চা খাবে, গল্প করবে, হাসবে, পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে চোখের জল ফেলবে, তাস খেলবে, গান শুনবে, গলা ফাটিয়ে তর্ক, ঝগড়া, আলোচনা করবে। কোথায় সে জায়গা?

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনরাত্রির ছায়াঘর

গতকালই প্রথম নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছে সোমা, সারা মুখজুড়ে কেমন যেন একটা ভাঙচুর ঘটছে তার। হাসলে পরে ঠোঁটের ডাইনে-বাঁয়ে দু'পাশে আধভাঙা চাঁদের মতো রেখা বরাবরই পড়ত তার। এখন যেন তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। গলার ওপর থেকে একপ্রস্থ মেদ আর মাংস কেউ যেন চেঁছে নিয়ে গেছে। গলাটা আগের চেয়ে সরু ও লম্বা দেখায় তাই। কাল রাতেই প্রথম চোখে পড়ল, গালের নিচে কানের দু'পাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত সোজা নেমে আসা কোনাকুনি লম্বা যে হাড় দুটো রয়েছে, তার ঠিক মাঝখানটিতে সামান্য ঝুলে পড়েছে একখণ্ড মাংসপিণ্ড। এ ভাঙনের মধ্যেও প্রকৃতির কী অদ্ভুত সামঞ্জস্য! চিবুকের দু'ধারে একই জায়গায় একই রকম এই ঝুলেপড়া। সোমার টানটান মুখটাতে এ শিথিল মাংসপেশি যেন মানায় না। একে মেনে নেওয়া কষ্টকর। প্রথমে সোমার মনে হয়েছিল, যা দেখছে তা ঠিক নয়। ভেবেছিল, উঁচু সিলিং থেকে বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলন ঠিকমতো পড়েনি বলেই এমন দেখাচ্ছে। কিন্তু বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে উজ্জ্বল আলোতে এসে সোমা নিশ্চিত হয়, যা দেখছে তা দৃষ্টিভ্রম নয়। এটাই তার পরিচিত মুখের আসল চেহারা আজ। দু'গালের নিচে দু'পাশে ছোট্ট মাংসপেশি যেখানে ঝুলে আছে, তার ঠিক ওপরে দু-দিকেই মৃদু গর্তের মতো আবছা কালচে একটা আভাস। অর্থাৎ মাংসখণ্ডটি সেখান থেকেই সরে এসেছে নিচে নিজের জায়গা ছেড়ে। ডিম্পল বলে একে চালিয়ে দেওয়ার জো নেই। ডিম্পল গালের যেখানে টোল ফেলে, সেখান থেকে এর দূরত্ব বেশ খানিকটা।

অবিনাশ ঘরে ছিল না। অন্য অনেক বুধবারের মতো কাল রাতেও ছিল তার অফিসের ডিনার। অবসর গ্রহণ করার পর আবার চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে অফিসের বাইরে অফিসসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি এখন সময় কাটে অবিনাশের। আগের চেয়ে আগ্রহ ও মনোযোগও বেশি সেখানে। এমিলি বলে ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটিও নিশ্চয়ই আছে সেখানে, মানে সেই ডিনারে। মাত্র বছরখানেক আগে কাজে যোগ দিয়েছে মেয়েটি। দারুণ কাজপাগল। শুধু লেখাপড়ায় ভালো আর চটপটে স্বভাবেরই নয়, খাটতেও পারে প্রচুর। তার তরুণ স্বামীটিও অত্যন্ত যত্নবান স্ত্রীর ক্যারিয়ারের ব্যাপারে। দীর্ঘসময় অফিসের কাজে ব্যয় করতে তাই অসুবিধা হয় না এমিলির। ছেলেপুলে হলে তো আর পারবে না, তাই এখুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেটেখুটে যতটা সম্ভব ক্যারিয়ারটা গুছিয়ে নিতে চায়। এমিলি নিজেই এসব কথা বলেছে সোমাকে এক দ্বিপ্রাহরিক খাবারের আয়োজনে। ভাগ্যবানরাই ওসব পারে। ছেলেপুলে, ঘর-সংসার নিয়ে ক্যারিয়ারের কথা ভিন্নভাবে ভাবার সুযোগ তো হয়নি সোমার। এ-প্রসঙ্গে পাশের বাড়ির মেরির কথা মনে পড়ে। পড়াশোনা বেশি করেনি মেরি। চাকরিবাকরিও নয়। কিন্তু জীবন আহরিত প্রজ্ঞা দিয়ে যৌথ জীবন সম্পর্কে অনেক সত্যই আবিষ্কার করেছে সে, যা সোমার কাছে সত্যি বিস্ময়কর।

আয়নায় নিজের চেহারা ভালো করে লক্ষ করার পর কাল সারা রাত ভালোমতো ঘুম হয়নি সোমার। মাঝে মাঝেই জেগেছে। পড়ার ঘরে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত কী লিখছিল অবিনাশ। সোমা একবার মাত্র উঁকি দিয়েছিল সেখানে।

গৌরব এখনো সিয়াটলেই আছে। সামনের মাসে শিকাগোর এক আইটি ফার্মে যোগ দেবে। ওকে ফোন করার জন্যে এখনো বেশি রাত হয়নি। সোমা শুয়ে শুয়ে পুত্রের টেলিফোনের নম্বর টেপে। চার-পাঁচবার বাজার পর অ্যান্সারিং মেশিনে চলে যায় কল। বড় পরিচিত, বড় প্রিয় এ গলার স্বর। কিন্তু এর সঙ্গে তো কথা বলা যায় না! এ যে যন্ত্র! গৌরবের বাসার ফোন নয় এটা, তার সেলুলার নম্বর। সঙ্গেই থাকার কথা। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আবার সেই মায়ের কল, একই পুরনো বুলি, একই শোনা কথার পুনরাবৃত্তি। নয়তো একই ধরনের সাবধানবাণী। এসব কথা বারবার আর কত শুনবে ওরা? অথচ আজ কিন্তু সোমা অন্য কথা বলত। বলত, ওর চাকরি বদলাবার আগেই ওর সঙ্গে এক উইকএন্ডে সিয়াটল, ভ্যানকুভার বেড়িয়ে আসার কথা ভাবছে সোমা। গৌরবের জন্যে এটা কি ভালো সময়? এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব মেশিনে রাখতে ইচ্ছে হলো না সোমার। তাই কোনো কথা না বলেই রেখে দিলো রিসিভার। দ্বিতীয়বার যখন বাথরুমে গেল, জল খেল, চোখেমুখে প্রচণ্ড গরম লাগা-জ্বালা করা চামড়ায় যখন ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিলো, তখনই হঠাৎ সোমা আবিষ্কার করল, আগের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন খুশি নিশ্চিন্তে আর ঘুমুতেও পারে না সে আজকাল। রাতে হঠাৎ গরম লেগে যায়। কখনো আবার বেশ ঠাণ্ডা লাগে, বিশেষ করে হাতের আঙুলে, পায়ের পাতায়। অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে আজকাল। বেশির ভাগই দুঃস্বপ্ন। মাস শেষে নির্ধারিত চার-পাঁচটি দিনের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য যখন থেকে শেষ হয়ে গেল, প্রায় তখন থেকেই অর্থাৎ এ বছরের গোড়া থেকেই শারীরিক অস্বস্তি আর টুকটাক ব্যথা-বেদনা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে তার। কারণে-অকারণে দুশ্চিন্তা করার প্রবণতাও বেড়েছে অনেকখানি। ঠাণ্ডা জলের ছিটা চোখে-মুখে পড়ায় এখন অনেকটা ভালো লাগছে তার। রাত প্রায় দুটো বাজে। তিসাকে ফোন করার জন্য এমন কিছু বেশি দেরি হয়নি। এখান থেকে দু'ঘণ্টা পিছিয়ে আছে ওর সময়। তা ছাড়া বাবার মতোই ছেলেমেয়ে দুজনেই রাতজাগা মানুষ। ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমোতে যায় ভোর রাতে। তবু ভয়ে ভয়েই টেলিফোন নম্বরগুলো টেপে মেয়ের। ভয়, কেননা মাত্র পরশুই কথা বলেছে। এত তাড়াতাড়ি আবার ফোন করলে মেয়ে সাধারণত বিরক্ত হয়। ঘরেই ছিল তিসা। এ-কথা সে-কথার পর সোমা জানতে চায়, মেমোরিয়াল ডে উইকএন্ডে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা আছে কি না তার। তা নইলে মা-মেয়ে একসঙ্গে কিছু করার কথা ভাবা যেতে পারে। অনেক দিন কোথাও যায় না সোমা। মেয়ের কাছে যেতে পারে তখন। অথবা তিসা আসতে পারে এখানে। কিন্তু মায়ের প্রস্তাব শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিসা জানায়, ওই উইকএন্ডে নিউইয়র্ক থেকে তার বন্ধু সোনিয়া আর মারিয়া আসছে তার কাছে। ওরা ঠিক করেছে, সবাই মিলে পাশের স্টেটে ওয়াইনারি দেখতে যাবে। তিসা অবশ্যই কিছু করতে চায় মায়ের সঙ্গে। কিন্তু সেটা হতে হবে লেবার ডে অথবা থ্যাঙ্কস গিভিং উইকএন্ডে। সোমা বোঝে, দেড় মাস সময় যথেষ্ট নয় ওদের সঙ্গে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা মেলাবার জন্যে। তা ছাড়া এ বয়সে মা-বাবার চাইতে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতেই বেশি আগ্রহী থাকবে তারা, এটাই তো স্বাভাবিক। শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে সোমা। আরো অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। একবার মনে হয়, অতুলপ্রসাদের বা রজনীকান্তের গান ছেড়ে দেয় নিচু শব্দে। পরে ভাবে, থাক। আজকাল কী যেন হয়েছে। ঘন ঘন আর গান শোনে না বলেই কি না কে জানে? প্রিয় কোনো গান শুনলে, তার একটি কি দুটি কলি সারাক্ষণ কানে বাজতে থাকে একটানা। কিছুতেই থামে না। সোমা আবারও জল খায়। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে ঘুমের প্রত্যাশায়।

এমন একটা সময় ছিল, যখন অবিনাশ শুতে না এলে ঘুমুতে পারত না সোমা। অবিনাশকে জড়িয়ে ধরে তার গলার কাছে মাথা গুঁজে না দিলে ঘুম আসত না। এ পুরনো অভ্যেস কাটিয়ে উঠতে অনেক দিন লেগেছে। এখনো পুরোপুরি রেশ যায়নি তার। কোনো কোনো রাতে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। অবিনাশ প্রতিরাতে একা একা বসে টেলিভিশনে পুরনো দিনের ছবি দেখে। দেখতে দেখতে কখনো কখনো হাসে, অস্পষ্ট মন্তব্য করে বা কেবল আবিষ্ট হয়ে চুপচাপ কথা শোনে পাত্রপাত্রীর। এ সময়টা তার একান্তই নিজের। অবিনাশ তখন অন্য আরেক জগতের বাসিন্দা, যেখানে তার নিজস্ব অস্তিত্ব ছাড়া থাকে শুধু টিভির পর্দার চরিত্রগুলো।

ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায় আজ। অ্যালার্ম বেজেছে কি বাজেনি খেয়াল করতে পারে না সোমা। এরই মধ্যে কখন ঘুম থেকে উঠে অফিসে চলে গেছে অবিনাশ। রাতে কখন সে ঘুমুতে এসেছিল, কখনই-বা উঠল, কিছুই জানে না সোমা। সাধারণত সাড়ে নটা দশটার আগে কাজে যায় না অবিনাশ। কিন্তু আজ ব্যাংক থেকে কারা যেন আসবে। জরুরি মিটিং আছে তাদের সঙ্গে। কাল রাতেই তাই ডিম সেদ্ধ, সিরিয়েলের বাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও একটি কলা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল সোমা।

শোবার ঘরের জানালার ব্লাইন্ডগুলো খুলে দেয় সোমা। পুবের দিকে মুখ করা এই ঘর। এক ঝাঁক রোদ্দুর এসে ঝিকমিক করতে থাকে ঘরের মেঝেতে পাতা ভারী কার্পেটের ওপর। এই সাতসকালেই কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা করছে সামনের গোলচত্বরে। সোমা নিচের তলায় রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চাপায়। এমনিতে সকালবেলা কিছু মুখে না দিয়েই সে চলে যায় অফিসে। চা-কফি পর্যন্ত নয়। আজ হঠাৎ ইচ্ছে হলো অফিসে দেরি করে যাওয়ার। তাই নিজের জন্যে আজ ব্রেকফাস্ট বানাবার কথা ভাবছে সোমা। দাঁত মাজতে মাজতে বাথরুমের আয়নায় মুখের সেই অসংগতি আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করে। পরিবর্তনগুলো আজ সকালে তেমন প্রগাঢ় মনে হয় না আর। আশ্চর্য, এরই মধ্যে সব মেনে নিল সোমা? কানের দুপাশে জুলফিতে একটা দুটো রুপালি চুল চিকচিক করছে। সোমা বোঝে বার্ধক্যের জয় বোধহয় এখানেই যে, তা হঠাৎ করে একদিন এসে ভর করে না শরীরে। আস্তে আস্তে একটু একটু করে তার লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয় শরীরে, যাতে মানুষও ধীরে ধীরে তা সইয়ে নিতে পারে। মেনে নিতেও কষ্ট হয় না তেমন। সোমা ঠিক করে, আজ বেশ দেরিতে কাজে যাবে। ফলে নিজের জন্যে ভালো করে ব্রেকফাস্ট বানায় সে। কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে বানানো অমলেট আর টোস্ট করা ইংলিশ মাফিনের সঙ্গে কড়া করে চা খায় সোমা। খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকায়। কালচে-কমলা রঙের ছোট্ট ছোট দুটি রবিন পাখি কিচিরমিচির করছে ডেকের ওপর। অনেক দিন রবিন পাখি দেখে না সোমা। এ পাখিগুলো এত কাছে তো কখনো আসে না! নাকি আসে এই সাতসকালে যখন তাড়াহুড়োয় বাইরের দিকে তাকাবার সুযোগ হয় না সোমার! রান্নাঘরের পেছনের দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলে মুখটা একটুখানি বার করতেই ফুরুৎ করে রবিন দুটো উড়ে গিয়ে পেছনের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়। সোমা ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে আজ আর কাজে যাবে না। অনেকগুলো ছুটির দিন জমা হয়ে আছে। অবিনাশের যা ব্যস্ততা, এই গরমে কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়া হবে মনে হচ্ছে না। আজ অফিসে যাওয়ার একটাই বড় তাড়া ছিল, আর তা হলো আজ ক্যারলের জন্মদিন। অফিসের মধ্যে এই একটি মেয়ের সঙ্গেই প্রকৃত অর্থে হৃদ্যতা রয়েছে সোমার। ওরা পরস্পরের জন্মদিন মনে রাখে। গত ডিসেম্বরে দেশ থেকে আসার সময় আড়ং থেকে ক্যারলের জন্যে রুপোর হার, কানের দুল ও ব্রেসলেট নিয়ে এসেছিল সোমা জন্মদিনে দেবে বলে। ছুটি নেওয়ার সিদ্ধান্তটা অফিসে ফোন করে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারলকেও হ্যাপি বার্থডে জানাতে ভুলল না সোমা। সেই সঙ্গে ঠিক করল, দুজনে মিলে অলিভ গার্ডেনে লাঞ্চ খাবে আজ। ইতালিয়ান খাবার ক্যারলের বড়ই পছন্দ। ওর জন্মদিনে ওর পছন্দের খাবারই খাওয়াবে সোমা। ক্যারল যেন অফিস থেকে ঠিক পৌনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারোটায় অলিভ গার্ডেনে চলে আসে। অফিসে আজ যাবে না এ সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর হঠাৎ করেই কেমন যেন হালকা ফুরফুরে লাগতে থাকে তার। একবার মনে হলো অবিনাশকে ফোন করে জানায় সিদ্ধান্তটার কথা। পরক্ষণেই মনে হলো, দরকার নেই। শুধু একগাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। শরীর খারাপ যে নয়, তাও বোঝাতে হবে। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরোয় সোমা। ডেকে পেতে রাখা চেয়ারে বসে সামনের গোলাকার কাচের টেবিলটির ওপরে রাখা অ্যাসপ্যারাগাস গাছটির দিকে তাকায়। প্রায় মরেই গিয়েছিল গাছটা। রোদ আর বৃষ্টির সঙ্গে উত্তাপ মিলে এ-কদিনেই গাছটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই তো গত মাসেই ঘর থেকে বের করে এখানে এনে রেখেছিল গাছটা। সোমা কাঠির মতো একটা শুকনো ভাঙা ডাল যত্নের সঙ্গে ছোট্ট গাছটির গা থেকে সরিয়ে দেয়। চা খেতে খেতে চারদিকে তাকায় সোমা। পাশের বাড়ির কুকুরটা সোমাকে দেখে একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। কাচের বড় জানালা দিয়ে ওদের পেছনের এই ঘরের ভেতরটা প্রায় সবটাই দেখা যায়। কুকুরটা বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। এই তো গত বছরই এতটুকুন ঘরে এনেছিল। ওদের বিশাল টিয়া পাখিটা আজো একই লয়ে কী যেন বলে চলেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সোমা। পাখিটিকে আর্জেন্টিনা থেকে নিয়ে এসেছে ওরা। এ বাড়ির কর্ত্রী সেখানকারই মানুষ। তার জন্মদিনে নাকি মায়ের উপহার ছিল সেটি। কতদিন হয়ে গেল পাশের বাড়ির ওদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয়নি, কথা বলা তো দূরের কথা। ভোরবেলা ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিসে যায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। সপ্তাহান্তে হয় ঘরের কাজ, নয়তো শহরে যাওয়া বা কোথাও নেমন্তন্ন খাওয়া, এই তো জীবন। সোমা আজ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে পাখিটি কী বলছে। আর আশ্চর্য! একটু কান পাততেই সে স্পষ্ট শুনতে পায় টিয়া পাখিটি বারবার করে বলছে, হাউ আর ইউ? সোমা হাসে। ওদিকে ডেকের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে পাখিটির দিকে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে হেসে বলে, 'আই অ্যাম ফাইন, হাউ ডু ইউ ডু?' টিয়া চুপ করে যায়। সোমা ডেক ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ঘাসের ওপর নেমে আসে। হাঁটতে হাঁটতে সীমানা ঘেঁষে লাগানো স্টিলের বেড়ার কাছে চলে আসে। এই কয়েক সপ্তাহ আগেও ওদের বাগানের সীমানার ওপারের গাছগুলোতে একটিও পাতা ছিল না। লম্বা, কালো অথবা সাদা সাদা বিশাল কাণ্ড পাটখড়ির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। পাতা না থাকায় ওপাশের বাড়িঘরগুলো স্পষ্ট দেখা যেত। কিন্তু এরই মধ্যে কলাপাতা রঙের হালকা সবুজ পাতায় ঘন হয়ে এসেছে বন। বার্চ আর ম্যাপলের গাছগুলোর পাতা হাওয়ায় মৃদু শব্দ করছে। বেশ সতেজ ও সুস্থ দেখাচ্ছে গাছগুলোকে এখন। যেন হঠাৎ করেই সব গাছের শরীরে পাতা এসে জড়ো হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বনের ঠিক মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট জলধারাটির দিকে তাকায় সোমা। সরু হলে হবে কী, কুলকুল শব্দ করে পাথরের কুচির মধ্য দিয়ে নিরন্তর বয়ে চলেছে ঝরনাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত কয়েক দিন একটানা বৃষ্টি হওয়ার জন্যেই বুঝি জলধারাটি অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এখন। দুটো সাদা কাণ্ডের বিশাল লম্বা বার্চ গাছের মাঝখান দিয়ে নালাটির উলটোধারে পড়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথরখণ্ডগুলোর দিকে চোখ পড়ে সোমার। বিকেলের দিকে এই নির্জন জায়গাটিতে মাঝে মাঝে দু-চারটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে একসাথে হাসতে দেখা যায়। প্রেম করার জায়গা হিসেবে, বিশেষ করে পয়সাকড়িহীন কিশোর-কিশোরীদের প্রেম নিবেদনের জন্যে জায়গাটি উত্তম সন্দেহ নেই। এখন এই সাতসকালে অবশ্য ওদিকে কেউ নেই। এলে আসবে ওরা বিকেলের দিকে, পড়ন্ত রোদে — তাও কেবল এই বসন্ত আর গ্রীষ্মের কটা মাসেই। সোমা হঠাৎ লক্ষ করে পাথরগুলোর গায়ে কী যেন লেখা লাল, নীল, সাদা রং দিয়ে। চেষ্টা করেও পড়তে পারে না সোমা। এর আগে এখান দিয়ে কতবার হেঁটেছে। কখনো চোখে পড়েনি এই রং বা লেখা। ভালোমতো ওদিকে কখনো তাকিয়েছে কি না সন্দেহ। হঠাৎ সোমার খুব আগ্রহ হয়, কী লেখা আছে পাথরগুলোতে জানার জন্যে। সোমা দ্রুত ঘরে ফেরে। কফি-টেবিল থেকে চশমাটি তুলে চোখে পরে আবার বেরিয়ে আসে। এ-অঞ্চলের গাছগাছালির মধ্যে পাইন, স্প্রুস, উইলো অথবা ওক তেমন দেখা যায় না যেমনটি সে দেখতে পেত দক্ষিণে। তা সত্ত্বেও কী দারুণ সবুজ চারদিক! সোমা চশমা চোখে দিয়ে আবার সেই আগের জায়গাটিতে এসে দাঁড়ায়, যেখান থেকে ওই ছোট্ট জলধারা আর বিশাল বিশাল পাথরগুলো দেখা যায় গাছের ফাঁক দিয়ে। হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোমা। পাথরের গায়ে বড় করে নীল রঙে লেখা আছে — লিসা। তার নিচে লাল রঙের বিশাল এক হৃদয়। তারও নিচে সাদা রঙে লেখা রন। অর্থাৎ লিসা রনকে ভালোবাসে। সোমা হাসে। বড় সুন্দর নারী-পুরুষের — বিশেষ করে উঠতি-বয়সী ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণ ও অভিব্যক্তি।

লনের ঘাসগুলো এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে গেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ঘাস কাটা হয়েছে। এরই মধ্যে কেমন করে এত বড় হয়ে গেল এগুলো! সোমা লক্ষ করে বাঁ পাশের বাড়ির মেরি ডাকছে সোমাকে। বহুদিন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী থেকে গত বছরেই মারা গেছে মেরির চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনের স্বামী পল। এখন এত বড় বাড়িটিতে সে একাই থাকে। ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায়। এই সাতসকালেই ইস্ত্রি করা স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে একেবারে ফিটফাট মেরি। টমেটো গাছে জল দিচ্ছিল সে। সোমা কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গাছের গোড়ায় মাটি নেড়ে দিতে দিতে সোমার সঙ্গে গল্প করে মেরি। এই মহিলা পড়াশোনা বেশি করেনি। চাকরিবাকরিও করেনি জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় না যে, সে হাইস্কুলও পাস করেনি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা না করলেও সাধারণ বুদ্ধি ও জাগতিক প্রজ্ঞা অসাধারণ মেরির। স্থানীয় লাইব্রেরিতে নিয়মিত যায়, বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে, দেশের-জগতের হালচালের খবর রাখে। মেরির সঙ্গে অনেক দিন পর আজ দেখা হলো সোমার। শীতের সময় দেখা হয়েছিল, যখন তারা দুজনেই গাড়ি পরিষ্কার করছিল এক বরফের দিনে। মেরির কথা শুনতে খুব ভালো লাগে সোমার। একদিন এমনি করে মেপ্‌ল্‌ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল তারা গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। স্বামীর মৃত্যুশোক তখনো তিথিয়ে আসেনি। এরই মধ্যে যে গভীর উপলব্ধি আচ্ছন্ন করেছিল মেরিকে, তা সোমার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি মেরি। বলেছিল, দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যাপনের পর একজন চলে গেলে আরেকজনের যে কষ্ট আর একাকিত্ব দেখা দেয়, তার মূল কারণ দুটো। এক. একটা চলমান জীবনে — অতি অভ্যস্ত ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় হঠাৎ একটা ছেদ পড়ে যায়। এই 'ডিজ্‌রাপ্‌শন অব কন্টিনিউটি' মেনে নেওয়া কষ্টকর। দুই. কিছু আক্ষেপ নাকি থেকেই যায়। যা করার ছিল, করা যেত, অপর পক্ষ চেয়েছিল বা শখ করেছিল কিন্তু যে সাধ অপূর্ণ রয়েছে, সেইসব আক্ষেপ, কিছু কিছু সব সময়েই তাড়া করে বেড়ায়। সোমার অনেকবার মনে হয়েছে, মেরি এ-দেশে জন্মেছে, এ-দেশে বেড়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু ওর চিন্তায়-চেতনায় কোথায় যেন একটা পূর্বাঞ্চলীয় গন্ধ রয়েছে। এ-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটা পিছুটান দেখেনি সোমা। ওর স্বামী যখন পক্ষাঘাতে বিছানায় পড়া ছিল, একটি অল্পবয়সী নার্স এসে প্রতিদিন তার দেখাশোনা করে যেত। সেই নার্সই পলকে বিছানায় বসিয়ে চান করাত, গা মুছে দিত, পোশাক পালটে দিত, ফিজিওথেরাপি করাত। কিন্তু মেরি প্রতিদিন নিজের হাতে স্বামীকে খাওয়াত তিনবেলা, মাঝে মাঝেই চুল আঁচড়ে দিত। পাশে বসে বই পড়ে শোনাত, দুজনে মিলে পুরনো দিনের গান শুনত টেপে-রেডিওতে। এই গভীর আত্মনিবেদন, এমন পারস্পরিক মানসিক নির্ভরশীলতা দেখে মুগ্ধ হতো সোমা। কিন্তু এই মেরিই একদিন বলেছিল, মেয়েদের কাছে পুরুষরা দুটো জিনিসই প্রধানত চায়। এক. তার সৌন্দর্য ও যৌবন। দুই. নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ। মেরি বলেছিল, নারী-পুরুষের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, পুরুষ কখনো তার পার্টনারের সঙ্গে বৃদ্ধ হতে চায় না। বৃদ্ধ স্ত্রীকে পাশে রেখেও সে আজীবন তরুণ থাকতে চায়। পলকে দেখিয়ে তামাশা করে কতবার বলেছে মেরি, শরীর নাড়াতে পারে না, তাতে কী হলো? চোখের দৃষ্টি দিয়ে এখনো গিলে ফেলতে চায় তরুণী নার্সটিকে। পল হেসে মেরির হাতটি সস্নেহে চেপে ধরত তখন। সোমার মনে হতো পলের মৃত্যুর পর মেরি বেশিদিন বাঁচবে না, অথবা আর কখনো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। প্রথমে সে আসলেই খুব মুষড়ে পড়েছিল। কারো সঙ্গে দেখা করত না। কথা বলত না। ঘরের বাইরে বেরোত না। একদিন কেবল সোমাকে বলেছিল, দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের সবটাই যে মধুমাখা ছিল তা নয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, মন কষাকষি হয়েছে। এমনকি ব্যভিচারের ঘটনাও ঘটেছে। তবু একটা মানুষ ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-ঘরে সারাক্ষণ, এখন আর সে নেই, মাথা কুটলেও তাকে আর কখনো দেখা যাবে না, পাওয়া যাবে না — এই বোধটি বড় যন্ত্রণাদায়ক। আস্তে আস্তে মেরি আবার ঘরের বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। ফুলের, তরি-তরকারির বাগান করে বসন্তে-গ্রীষ্মে। শীতে অল্প বরফ হলে নিজেই পরিষ্কার করে। বেশি হলে লোক ডাকে। হেমন্তে শুকনো পাতা গুছিয়ে ব্যাগে ভরতেও দেখা গেছে তাকে। এ-বয়সে এত কাজ করে বলেই এমন সুস্থ ও ফিট রয়েছে। শরীরে এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই মেরির, আজও তা ভালো করে লক্ষ করল সোমা। মেরি তার বাগান থেকে একটা বড় সাদা লিলিফুল তুলে দিলো সোমার হাতে। লম্বা সরু ডগার ওপর কলকের মতো সবজে সাদার বিশাল এক লিলি। মেরিকে ধন্যবাদ দিয়ে ডান পাশের লন ভেঙে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সোমা। সামনের ফুলের বাগানটিতে লাল, হলুদ কত টিউলিপ ফুটেছে। এরই ভেতর কয়েকটা টিউলিপের গায়ে আবার একাধিক রং — লাল-হলুদ, অথবা সাদা-লাল। হলুদ অথবা হলুদ-সাদার অসংখ্য ড্যাফোডিলসও রয়েছে। এগুলো সব হঠাৎ করে আজই কি একসঙ্গে ফুটে উঠল? কই! আগে তো লক্ষ করেনি। এ-পথ দিয়েই তো প্রতিদিন ভোরে কাজে যায়, বিকেলের পড়ন্ত বেলায়ও এ-পথেই ঘরে ফেরে। কলিগুলো দেখেছিল মনে আছে। কবে সব ফুল হয়ে ফুটে উঠল, টেরই পায়নি সোমা। বেগুনি আর গোলাপি রঙের সহস্র সহস্র কুঁড়ি অ্যাজালিয়ার ঝাড়ে। এখনো ফুটতে তিন-চার দিন বাকি। গোলাপ গাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায় সোমা। বাড়ির ঠিক দু'পাশে দুটো বড় গোলাপের ঝাড়। হ্যাঁ, সেখানেও বেশ কিছু কলি দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের গোলাপগুলো হলুদ আর লাল। বাঁ দিকেরগুলো গোলাপি আর সাদা। এগুলো সব নিজের হাতে লাগানো সোমার। বাড়ির ঠিক সামনে রেড চেরির গাছে অসংখ্য গোলাপি কুঁড়ি। মেরির বাড়ির সামনে ডগউড গাছটিতে একটিও পাতা নেই। কিন্তু সাদা সাদা ঝাঁকড়া ডগউডে ছেয়ে গেছে দীর্ঘ গাছটি। তার ঠিক পাশেই ক্র্যাব-অ্যাপল গাছটিতেও অনেক লালচে গোলাপি ফুল ফুটেছে। এই সময়টা বেশ লাগে। শীতের শেষে গাছে পাতা আসার আগেই ফুলে ফুলে ভরে যায় কাণ্ড — গাছের সমস্ত ডালপালা।

প্রথম প্রথম এ-দেশে যখন এসেছিল সোমা, অবাক বিস্ময়ে গাছের এ ফুল ফোটা দেখত — দেখে পুলকিত হতো, শিহরিত হতো। পরিতৃপ্ত হতো চোখ। সোমা জানে না, আস্তে আস্তে কখন বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। চোখ সরিয়ে কি নিয়েছে? আসলে ঘরের ভেতর চোখ দেওয়ার জিনিস আস্তে আস্তে বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তা। রাস্তার ওপাশে রডরিগার্সদের বাড়ির সামনে রোজ-অব-শ্যারনের লম্বা গাছটিতে প্রচুর গাঢ় গোলাপি রঙের ফুল ফুটে আছে। পাশে আরেকটি বাচ্চা রোজ-অব-শ্যারন গাছ। তাতেও বেশ কয়েকটি ফুল। সাদার ভেতর মধ্যিখানে খয়েরি রঙের ওই ফুল। এ-গাছটির নাম যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে পেরেছিল সোমা, খুব অদ্ভুত লেগেছিল তার। কী রকম রোমান্টিক নাম, রোজ-অব-শ্যারন। পাতাগুলো দেখে মনে হয়, ঠিক জবা গাছের মতো। ফুলগুলোও দেখতে লাল জবা অথবা ঝুমকা ফুলের মতো। মাঝখানে পরাগসহ একটা লম্বা ডাঁটি বেরিয়ে থাকে। ও-বাড়ির কর্ত্রী বারবারাকে জিজ্ঞেস করেছিল সোমা, সে জানে নাকি এ গাছ হেবিসকাস গাছের ফ্যামিলি কি না। বারবারা ঠিক বলতে পারেনি। সামনের বাঁধানো বড় গোলাকার চত্বরটি, যার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোট ছয়টি বাড়ি, তার ভেতর এখন পরমানন্দে বাইসাইকেল চালাচ্ছে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হঠাৎ সোমার মনে হলো, তাই তো, আজ যে গুড ফ্রাইডে। স্কুল ছুটি। অনেক স্কুল-কলেজ অবশ্য এ পুরো সপ্তাহজুড়েই বন্ধ। বসন্তের ছুটি। অধিকাংশ অফিস অবশ্য খোলা আজ। সোমাদের বাড়ির ঠিক উলটোদিকের বাড়ির সামনে দাঁড় করানো বাস্কেটবলের উঁচু বাস্কেটটিতে একটি কালো আর একটি সাদা কিশোর পালা করে বাস্কেটবল ছোড়ার মহড়া দিচ্ছে। সাদা ছেলেটিকে চিনতে পারে সোমা। সোমাদের বাঁ পাশের বাড়ির ছেলে নিক। এরই মধ্যে আরো যেন লম্বা হয়ে গেছে ছেলেটি। এই নিকই তাদের ল্যাটিন আমেরিকান টিয়াটিকে কথা শেখাবার চেষ্টা করে সব সময়। ধৈর্য আছে বটে ছেলেটির। একই কথা কতবার করে বলে টিয়াটিকে।

AMARBOI.COM

সোমা আর দেরি করে না। লাঞ্চে যাওয়ার আগে নিজেকে একটু পরিপাটি করে নেবে আজ। কতদিন — কতদিন হয়ে গেল নিজের শরীর, মুখমণ্ডলের কোনো পরিচর্যা করে না সোমা। বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা আরেকবার দেখে। শার্লিকে দিয়ে চুলগুলো আবার আগের মতো কালো করে নেবে আজ। এই যে লালচে আভা তার চুলের ভেতর, এটা তার চুলের আসল রং নয়। কপালের ও জুলফির কাছে কয়েকটি রুপালি চুলের ঝিকিমিকি বাদ দিলে তার চুল মূলত কালো। লালচে বাদামি অথবা মেহেদি রঙের মোটেও নয়। সোমা শুনেছিল, প্রথম যৌবনে অবিনাশের ফ্যান্টাসি ছিল, এক লালকেশী সাদা বিদেশিনীর সঙ্গে অন্তত একটি রাত কাটাবার। অবিনাশকে চমকে দেওয়ার জন্যেই মেহেদি রঙের ছোঁয়া কেশে ধারণ করতে সাহস করেছিল সোমা। তা ছাড়া শার্লিও বলেছিল বাদামি গায়ের রং আর কালো চুলের সঙ্গে এই লালচে আভা খুব ভালো যায়। উজ্জ্বল করে তোলে বাদামি রঙের মেয়েদের। অবিনাশ কখনো লক্ষ করেছে মনে হয় না, সোমার চুলের এই রং পরিবর্তন। এই রক্তিম আভা। সোমা ঠিক করে, আজ আবার তার নিজস্ব চুলের রং, অর্থাৎ কালোতে ফিরে যাবে। সেই সঙ্গে একটা ফেসিয়ালও নিয়ে নেবে। শার্লির সময় থাকলে হাতে-পায়ের নখগুলোর পরিচর্যাও করা যেতে পারে। আর্থ্রাইটিসের জন্যে হাঁটু বাঁকা করে পায়ের নখগুলো কাটতে আজকাল বড্ড বেশি কষ্ট হয় সোমার। জামাকাপড় বদলে গাড়ি নিয়ে শার্লির দোকানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে এসে যখন দাঁড়াল সোমা, তখন বেলা সাড়ে নয়টার কাছাকাছি। চুল ছাড়াও শার্লি সোমার ভ্রূ-দুটো ঠিক করে দিলো। ঠোঁট ও নাকের মাঝখানটিতে কয়েকটি অবাঞ্ছিত ছোট ছোট লোম, যা সোমাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করত, তাও তুলে ফেলতে ভুলল না। চুলে রং মাখিয়ে, ফেসিয়াল ও হাত-পায়ের নখের পরিচর্যা শেষ করল শার্লি। পা-দুখানাকে হালকা গরম জলে যখন ভিজিয়ে রাখল, কী অসম্ভব আরাম যে লাগল সোমার! মনে হলো, সে যেন এমন পরিচর্যা বহুকাল পায়নি। শার্লিজ বিউটি দোকানটি আসলেই অনন্য। একই জায়গায় সবকিছুর পরিচর্যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব এ-দেশে। শার্লির এখানে না এলে চুলের জন্যে এক জায়গায়, মুখের জন্যে অন্য জায়গায়, নখের জন্যে তৃতীয় জায়গায় যেতে হতো সোমাকে। এবার শার্লির এখানে এসেছে সে প্রায় নয় মাস পর। সোমা ঠিক করে, এখন থেকে মাসে অন্তত একবার আসবে সে। আরাম করার, পরিচর্যা পাওয়ার তারও অধিকার আছে। শার্লি আজ সোমার ঘাড়টাও ম্যাসেজ করে দিলো, যেহেতু হাতে সময় ছিল তার, আর এই সাতসকালে ভিড়ও ছিল না দোকানে। ভীষণ ভালো লাগছে সোমার এখন। শার্লির পাওনা টাকার সঙ্গে আজ বাড়তি দশটি ডলার দিলো সোমা টিপ্‌স হিসেবে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, রোদটা বেশ কড়া হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ক্যারলের সঙ্গে খেতে যেতে এখনো এক ঘণ্টার বেশি বাকি। গাড়ির সানভাইজরের গায়ে আটকানো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে নিজেরই ভালো লাগছে সোমার। গালে, কপালে, থুতনিতে হাত দিয়ে নিজের ত্বকের মসৃণতায় তৃপ্ত হয় সোমা। বড়দি সব সময় বলে, সোমা নাকি মায়ের মতো সুঠাম ও কোমল ত্বক পেয়েছে। চুলে রং করছি আর খানিকটা আগা কেটে ফেলায় চুলগুলো আর আগের মতো পাতলা দেখাচ্ছে না। হাতে পুরো একটি ঘণ্টা। আজকের দিনের প্রতিটি মুহূর্ত খুব মূল্যবান মনে হচ্ছে সোমার। এ সময়টি ঘরে ফিরে গিয়ে আবার এখানে এসে শুধু শুধু অপচয় করে কী লাভ যেহেতু অলিভ গার্ডেন রেস্টুরেন্টটি এ-পাড়াতেই? সোমার হঠাৎ মনে পড়ে ডেভিড অনেক দিন বলেছে তার গ্যালারিটি একবার দেখে যেতে। তার নিজের এবং সংগৃহীত অন্য অনেকের বেশ কিছু নতুন পেইন্টিং এসেছে। ডেভিড সোমার প্রাক্তন সহকর্মী। যদিও ডেভিডের গ্যালারি খোলা থাকে বেলা দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত, যেহেতু গ্যালারির দোতলাতেই সে থাকে, এখন গেলেও সোমাকে গ্যালারি ঘুরিয়ে দেখাতে ডেভিডের অসুবিধা হবে না। এ কথা ডেভিডই বলেছে তাকে। সোমা ঠিক করে ফেলে, ডেভিডকে ফোন না করেই যাবে। হঠাৎ করে গিয়ে তাকে চমকে দেবে। আজ থেকে ছয়-সাত বছর আগে একটা কাণ্ডই করেছিল ডেভিড। সে-কথা মনে করে পরে ওরা দুজনেই প্রচুর হেসেছে। কিন্তু সে রাতে তখন সেটা ঠিক হাসির ব্যাপার ছিল না। সেই সময় প্রায় প্রতিদিন তেরো-চৌদ্দ ঘণ্টা করে কাজ করতে হচ্ছিল সোমার, ডেভিড ও ক্রিস্টির সেই ম্যাজেনাল হেলথ প্রজেক্টে। এক রাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেভিডের কী হলো। কাজ করতে করতে হঠাৎ সোমাকে বলে বসল, তার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সেই মুহূর্তে। রয়েছে সোমার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ বা চাওয়া। হয়তো খুবই সামান্য — হয়তো বিশাল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার জন্যে এটা জানানো বিশেষ জরুরি। সোমা সাহস দিলেই কেবল তা জানাবে ডেভিড। সোমা একটু চমকায়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চায় ডেভিড কী ভাবছে। ক্রিস্টি ততক্ষণে চলে গেছে বাড়ি। কেবল ডেভিড আর সোমা কাজ করছে তখন। ডেভিড খানিকক্ষণ দ্বিধার পর জানায়, সোমার খোলা চুলে একবার শুধু ডেভিড তার হাতখানা রাখতে চায়। ডেভিডের বয়স অন্তত দশ বছর কম সোমার চেয়ে। করপোরেট জগতে আর্থিক হিসাব-নিকাশের কাজ করলেও ডেভিড মূলত একজন শিল্পী। ছবি আঁকে সে। সোমা এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর 'অফ কোর্স' বলে হেসে ডেভিডের ডান হাতখানা তুলে নিজের মাথার ওপর চুলে রেখে বলে, 'কী? হলো, এবার?' ডেভিড শুধু একবার আলতোভাবে সোমার একগুচ্ছ চুল মুঠো করে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'অনেক ধন্যবাদ'। সোমা বোঝে, ডেভিডের এ সাময়িক আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তির জন্যে এই সামান্য ছোঁয়াটি বড় জরুরি ছিল। কিন্তু এরপর বেশ কিছুদিন সে খোলা চুলে অফিসে আসেনি আর। এর বছরখানেক পরেই অবশ্য ডেভিড হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে নিজের স্টুডিওতে ছবি আঁকা নিয়ে মেতে থাকা শুরু করে। ওর স্টুডিও সেট করার সময় সোমা যতটা সম্ভব সাহায্য করেছে। স্থানীয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে, ওয়েব সাইট ডিজাইন করা, জায়গা নির্বাচন, সব ব্যাপারেই সঙ্গে ছিল সোমা। ডেভিডের এক সম্পদশালী কাকা হঠাৎ সে সময়ে মারা যাওয়ায় ডেভিড আকস্মিকভাবেই একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়েছিল, যা দিয়ে তার বহুদিনের শখের এ গ্যালারি শুরু করতে পেরেছিল সে।

ঘরেই ছিল ডেভিড। দরজা খুলে সোমাকে দেখে তো অবাক!

'সোমা? তুমি?' পায়জামা আর গেঞ্জি পরা ডেভিড দরজায় দাঁড়িয়ে।

'এ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, দেখে যাই, তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি। তোমার কী খবর? তোমার স্বামী?'

'ভালো। সব ভালো।' সোমা হাসে।

ডেভিড কিন্তু সোমাকে ঘরে যেতে আহ্বান করে না। ঘরের ভেতর মানুষের নড়াচড়ার ছায়া, টুংটাং বাসনের শব্দ। সোমা বোঝে অসময়ে এসে পড়েছে সে। ডেভিডের গ্যালারি দেখার উপযুক্ত সময় এটা নয়।

'আমার আজ হাতে একটুও সময় নেই। এক জায়গায় যাচ্ছি। আরেকদিন আসব তোমার স্টুডিও দেখতে। ইট ওয়াজ নাইস সিয়িং ইউ ডেভিড।'

সোমা বেরিয়ে আসে ওখান থেকে। শূন্যস্থান পূর্ণ হতে সময় লাগে না, এটা কে না জানে? তবু ফোন না করে এভাবে হঠাৎ করে চলে আসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছে সোমার। অলিভ গার্ডেনে যেতে এখনো প্রায় চল্লিশ মিনিট বাকি। ড্রাইভ করতে করতে রাস্তার দু'পাশের দোকানপাট দেখে সোমা। এ অঞ্চলে কেউ হাঁটে না রাস্তায়। কোনো ফুটপাতও নেই রাস্তার দু'পাশে। বড় শহর থেকে এ শহরতলিতে এসে প্রথম প্রথম তাই কেমন অন্য রকম লাগত সবকিছু। এখন অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে। সোমা একটি কসমেটিক্সের দোকানে ঢোকে। মুখে ক্রিম আর ঠোঁটে কখনো কখনো লিপস্টিক ছাড়া অন্য কোনো প্রসাধন নেয় না সোমা। তবে তার একটা বড় দুর্বলতা আছে, সেটা সুগন্ধির প্রতি। অবিনাশও জানে সে কথা। তাই গিফট বলতে সে বরাবরই সোমার জন্যে পছন্দমতো পারফিউমই কিনে দেয়। কিন্তু ইদানীং অফিসের কাজ আর নিজের পোশাক আশাক নিয়ে সে এতই ব্যস্ত, সোমার জন্যে কোনো পারফিউম গত এক বছরেও কেনার সময় হয়নি। অথচ নিজের জুতোর সঙ্গে প্যান্টের সঙ্গে মোজাটা পর্যন্ত ম্যাচ করে পরে আজকাল অফিসে যায় অবিনাশ। এতটা সচেতন, এতটা পরিপাটি পোশাকে-আশাকে আগে কখনো ছিল না সে। সোমা দেখেশুনে নিজের জন্যে তার প্রিয় পারফিউম অপিয়ামই কিনল একটা। তার আগে অবশ্য বেশ কয়েকটা স্যাম্পল দেখল, যদি নতুন কিছু বাজারে এসে থাকে, যা হঠাৎ করে ভালো লেগে যেতে পারে। তেমন কিছু মনে ধরল না। অলিভ গার্ডেনে ঢুকতে গিয়ে লম্বা ড্রাইভওয়ের দুপাশে চোখ পড়ে হঠাৎ মনটা আনন্দে ভরে যায় সোমার। ড্রাইভওয়ের দুপাশে সারি সারি যে ক্র্যাব-অ্যাপল আর ডগউডের গাছ, সেখান থেকে পিচঢালা বাঁধানো রাস্তায় পড়া সহস্র সহস্র ফুলের পাপড়ি ক্রমাগত গাড়ির চলাচলের ফলে মধ্য রাস্তা থেকে সব দু'পাশে সরে এসে দুটি লম্বা গোলাপি লাইন তৈরি করেছে। পিচঢালা পথটি যেখানে ঘাসে মিশেছে সেই সীমানা বরাবর সেই লম্বা রেখা। মনে হচ্ছে, কোনো শিল্পী যেন সবুজ ঘাস আর কালো ড্রাইভওয়ের মাঝখানটিতে ব্রাশ দিয়ে কয়েক ইঞ্চি প্রশস্ত একটা গোলাপি রেখা এঁকে দিয়েছে। এত মসৃণ, এত নিটোল এই রেখা! কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে এই গোলাপি ফুলের সরল রেখাটিকে। ক্যারল আজ জন্মদিন বলে বেশ সেজেগুজে এসেছে। বেগুনি সাদা জংলি ছাপা সিল্কের একটি ড্রেস পরেছে ক্যারল। গলায় বেগুনি রঙের একটি স্কার্ফ। কানে, গলায়, হাতে মুক্তোর গয়না। বেশ দেখাচ্ছে আজ ক্যারলকে। বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে তার। সোমার দেওয়া রুপোর গয়নাগুলো দারুণ পছন্দ করল ক্যারল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তো খুলে রুপো পরল। খেতে খেতে হঠাৎ দূরের টেবিলে সিন্ডিকে দেখতে পেল সোমা। একসময় সিন্ডি সোমার প্রতিবেশী ছিল। কয়েক বছর আগে বাড়ি কিনে সাফার্ন চলে গেছে। যোগাযোগটা কমে গেছে ইদানীং। ক্যারলকে 'এক্সকিউজ মি' বলে সিন্ডির টেবিলে গিয়ে তাকে অবাক করে দেয় সোমা। সিন্ডি তার প্রতিবেশী লিন্ডাকে নিয়ে খেতে এসেছে। ডিভোর্সড সিন্ডি আর বিয়ে করেনি। সোমাকে তার নতুন সেলুলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন নম্বর দেয় সিন্ডি। তার সেই বখাটে ছেলে ক্লিফ এখন অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। এ বছর হাইস্কুল শেষ করছে। শুনে খুব খুশি হয় সোমা। সিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে আসে সে। অলিভ গার্ডেন থেকে যখন বেরিয়ে আসে সোমা, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। এখনো হাতে অর্ধেক দিন সময়। একটু একটু করে আকাশে মেঘ জমছে। সন্ধ্যায় নাকি খানিকটা বৃষ্টি হতে পারে। এখনো চারদিক দেখে বৃষ্টির কোনো আভাস পাওয়া যায় না, ওই উড়ো উড়ো বিচ্ছিন্ন কিছু সাদা মেঘ ছাড়া। সোমা ন্যানুয়েট মলে গাড়ি পার্ক করে, ১১/এ বাসের জন্যে অপেক্ষা করে। সময় যখন আছে, নিউইয়র্ক শহরে স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালে গিয়ে আজ দেখে আসবে সেলিমাকে। সোমা শুনেছে সেলিমা ভালো নেই। বাঁচবে না। আজকাল বেশ ঘনঘনই যেতে হচ্ছে তাকে হাসপাতালে। ১১/এ বাসের জন্য দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হলো না, যদিও টাইমটেবল জানা ছিল না তার। ড্রাইভার সিটে হ্যারিকে দেখে খুশি হয় সোমা। হ্যারি নিজেও বহুদিন পর সোমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়। জানতে চায়, শহরে যাওয়া আজকাল একেবারে ছেড়েই দিয়েছে কি না সোমা। ডাইনের একেবারে সামনের সিটটিতে বসে সোমা। যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নিতে নিতে ও টিকিট দিতে দিতে সোমার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে হ্যারি। সোমা জানায়, হ্যারির ওজন বেশ খানিকটা কমেছে। শুনে খুশি হয় হ্যারি। বলে, 'চেষ্টা করছি, আরো খানিকটা কমাতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ।' বাস চলছে হাইওয়ে ধরে। পাশে সমান্তরালভাবে চলে যাওয়া হাঁটা পথে বেশ কয়েকটা নারী-পুরুষ এই দুপুরের রোদেও সাইকেল চালাচ্ছে। কয়েকজন জগিংও করছে। সোমা বোঝে, আজকাল মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যসচেতন হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ায়, চলাফেরায়, জীবনযাত্রায়। এটা ভালো লক্ষণ। জীবন ধারণের এ রকম গুণগত পরিবর্তনই তো এক প্রজন্মকে আগের প্রজন্ম থেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল থেকে সাবওয়েতে করে স্লোন ক্যাটারিংয়ে যখন পৌঁছল সোমা, তখন দুটো চল্লিশ বাজে। ভিজিটিং আওয়ার এটা নয়। কিন্তু সেলিমার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে এ কথা সেলিমা নিজেই বলেছে সোমাকে। অসময়ে আসায় অসুবিধা হবে না। দূর থেকে আসায় এ বিশেষ খাতির। সেলিমাকে দেখে মনে হয় না ক্যান্সার রোগী। মাথার চুল পড়ে যাওয়ায় পরচুলা পরে থাকে সেলিমা। না জানলে সেটাও বোঝার উপায় নেই। এছাড়া শরীরে জরার কোনো লক্ষণ নেই। বিছানায় বসে বসে টিভি দেখছিল সেলিমা। খুব খুশি হয় সোমাকে দেখে। জানায়, আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করছে সে। যদিও ডাক্তার বলে দিয়েছে, তার রোগমুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে যতটা সম্ভব সেলিমাকে ভালো রাখার চেষ্টা করবে ডাক্তাররা। সোমা থাকতে থাকতেই সেলিমার স্বামী আরশাদ এসে ঢোকে ঘরে। সেলিমার চাইতে বরং তাকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি অসুস্থ ও মনমরা মনে হয় সোমার। সোমা এসেছে দেখে খুব খুশি হয় আরশাদ। জানায়, সেলিমা প্রতিদিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করে। সোমার হঠাৎ খুব অপরাধবোধ হয়। এ কাজটি আরো আগে করা উচিত ছিল। সেলিমাকে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাওয়া বড়ই দরকার ছিল, যা সে করেনি বা করতে পারেনি নানা ঝামেলায়। শিগগিরই আবার আসবে কথা দিয়ে বেরিয়ে আসে সোমা। স্লোন ক্যাটারিংয়ের সামনে পাবলিক স্কুলের যে চৌকো বাঁধানো খেলার জায়গাটি ছিল, সেখানে এখন পার্ক। কয়েকটি মা স্ট্রলারে করে বাচ্চা নিয়ে এসে বসে আছে সেখানে। একটি মা, তিন চার বছরের এক অস্থির মেয়েকে কী বলে বলে শান্ত করার চেষ্টা করছে। মেয়েটি হাত-পা নাচিয়ে, চেঁচামেচি করে কীসের জন্যে যেন ভীষণ বায়না করছে। কী আশ্চর্য ধৈর্য মায়ের। এর পরও আস্তে আস্তে অনবরত কী যেন বলে যাচ্ছে কন্যাকে শান্ত করার জন্যে। সোমা মনে করার চেষ্টা করে এই অপরিসীম ধৈর্য তার নিজের ছিল কি না, তার সন্তানরা যখন ছোট ছিল।

ফেরার পথে লেক্সিংটন সাবওয়ে স্টেশনের মাঝখানের খোলা জায়গাটিতে একটা ছোট্ট জটলা দেখতে পায় সোমা। সেই পরিচিত অন্ধ লোকটি গিটার বাজিয়ে গান করছে। আর লোকেরা গোল করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনছে। কেউ কেউ খুচরা পয়সা, এক-দুই ডলার দিচ্ছে সামনে বিছানো চাদরটির ওপর। সোমাও দাঁড়িয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ একমনে শোনে অন্ধ শিল্পীর মুখে হ্যারি নিলসনের সেই বিখ্যাত গান, আই ক্যান্ট লিভ উইদাউট ইউ। একটি ডলার দিয়ে সোমা সেখান থেকে চলে আসে সাবওয়ের কাছে। এই লোকটি আগে একসময় সিক্সটি এইট স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনের মুখে বসে গান করত। শহরে যখন ছিল, কতবার দেখেছে সোমা। স্থান পরিবর্তন করে ভালোই করেছে সে। এখানে অনেক বেশি ট্রেন আসে। লোক-সমাগমও বেশি।

সাবওয়েতে এখন ভিড় হতে শুরু করেছে। একটু পরই রাশ আওয়ারে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই ঘরে ফেরার নেশায় ব্যস্ত হয়ে উঠবে। সোমা দাঁড়িয়ে আছে ওপরের সমান্তরাল রডটি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে। একটি চাইনিজ চেহারার লোক তার ব্রিফকেসটি একবার মেঝেতে দু'পায়ের মাঝখানে, একবার ডান হাতে ওপরে উঁচু করে ধরে নিজে কোনো মতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। পাশে ঘন বাদামি চুলের এক অল্পবয়সী যুবক এত ভিড়ের ভেতরও ভাঁজ করে একটি পেপারব্যাকের বই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো রোমান্টিক অথবা রহস্য উপন্যাস। ডানদিকের সিটে বসা কালো এক মহিলার কোলে বসে বছর দু-তিনেকের একটি ছেলে ছোট্ট পটেটো চিপসের এক প্যাকেট থেকে একটি একটি করে চিপস বের করে মুখে পুরছে। সোমা অবাক হয়ে লক্ষ করে, বাচ্চাটি এত সাবধানী যে এক টুকরো চিপসও মুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে পড়ছে না। পোর্ট অথরিটি স্টেশনে এসে এবার আর ১১/এ নয়, ৪৭ নম্বর এক্সপ্রেস বাসে উঠে পড়ল সোমা। ন্যানুয়েট মলে নেমে দেখে পার্কিংলটে এখন দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি গাড়ি। মোটামুটি মনে থাকলেও, ঠিক কোথায় গাড়িটা পার্ক করেছিল আজ দেখে রাখেনি সোমা। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এক জায়গায় এসে গাড়ির চাবির কী প্যাডে চাপ দেয়। খানিকটা দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দুটো একবার জ্বলে নিভে যায়, সেই সঙ্গে অল্প হর্ন। সোমা দ্রুত তার গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দেয়। প্রযুক্তি কত সুবিধেই না করেছে। এভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ না থাকলে কতক্ষণ না জানি গাড়ি খুঁজে বেড়াতে হতো আজ। প্যালিসেডস পার্কওয়ে ধরে উত্তরে যাওয়ার কথা সোমার। সেদিকেই তার বাড়ি। কিন্তু আজ অন্যদিনের মতো নয়। তাই উত্তরে না গিয়ে প্যালিসেডসের দক্ষিণের দিকে যেতে শুরু করল সোমা। ওদিকে হাডসনের ধার ঘেঁষে সুন্দর লুকআউট আছে, সেখানে গাড়ি থামিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যাবে আজ। প্রথম লুকআউটটাতেই থামে সোমা। গাড়ি বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। হাওয়ায় কী রকম শিরশির একটা শব্দ আছে। ঘন গাছে অল্প অল্প পাতা দেখা দিয়েছে। হালকা হলদে সবুজ রঙের সব পাতা। হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে ওগুলো। সোমা হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। এ জায়গাটি নদী থেকে অনেক উঁচুতে। বড় বড় পাথর বসানো ধারটিতে। তারপরে আছে স্টিলের বেড়া। সোমা একটা বড় পাথরের ওপারে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির বাড়িঘর, গাছপালা দেখে। হাডসনের ওপর দিয়ে কয়েকটা স্পিডবোট চলে গেল। একটা মালবাহী জাহাজ আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। একজন সার্ফিংও করছে এরই মধ্যে। সোমার হঠাৎ মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। লৌহজংয়ের কথা। নদীর ধারে বিকেলবেলা বাবার হাত ধরে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেত সোমা। বিশেষ করে গোয়ালন্দগামী বিশাল বিশাল স্টিমারগুলো দেখতে বড় ভালো লাগত তার। কত রকম লোকজন দেখা যেত সেখানে গেলে। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। কারো ভীষণ তাড়া, কেউ বা আস্তেধীরে নামছে, বা উঠছে স্টিমারে। কারো মাথায়, ঘাড়ে বোঁচকা, পোঁটলা, কারো হাতে ব্যাগ, স্যুটকেস। সে এক অভিনব দৃশ্য।

সোমা লক্ষ করে, সে ছাড়াও এ লুকআউটে আরো এক জোড়া তরুণ-তরুণী আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডান পাশটাতে। ওদের লাল রঙের হোন্ডা একর্ডটি পার্ক করা সোমার ঠিক পেছনেই। নদীর ধার ঘেঁষে লম্বা স্ট্যান্ডের ওপর বাইনোকুলারগুলো সারি সারি দাঁড় করানো। আস্তে আস্তে একটি বাইনোকুলারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল সোমা। ব্যাগ থেকে একটা কোয়ার্টার বের করে বাইনোকুলারের নির্ধারিত ছিদ্রের ভেতর দিতেই একটা যান্ত্রিক আওয়াজ বেরোল। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ধরতেই বাইনোকুলারের মাথাটা ডান থেকে বাঁ দিকে অনায়াসে ঘুরতে শুরু করল। কখনো কোনো জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থির রেখে, কখনো বাইনোকুলারটি ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সোমা নদীর ওপারের গাছপালা, বসতি দেখতে থাকে। শিশুর মতো উত্তেজনা বোধ করে সে নিজের মধ্যে। একটি আট-দশ বগির ছোট্ট ট্রেন নদীর ধার দিয়ে উত্তরে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ম্যানহাটান থেকে দৈনিক কম্যুটার যাত্রীদের ঘরে পৌছে দিচ্ছে এ ট্রেন, ওয়েস্টচেস্টারের বিভিন্ন ছোট ছোট শহর বা গ্রামে। হঠাৎ এক ফোঁটা জল এসে পড়ল সোমার মাথায়। হাত দিয়ে তা পরীক্ষা করতে না করতেই আরো কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়ল হাতে, পায়ে, মুখে। দেখতে দেখতে একটু একটু করে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। ওপাশের ছেলেমেয়ে দুটো দ্রুত দৌড়ে তাদের গাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট দিলো না ওরা। ভেতরেই বসে রইল। সোমা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। হাডসনের দিকে মুখ করে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো। একটি একটি করে নদীর ওপারে ওয়েস্টচেস্টারের আলোগুলো জ্বলে উঠল। ল্যাম্পপোস্ট থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া আলো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সোমার গায়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকল।

নদীর উলটোদিকে আবার তাকায় সোমা। ওদিকের জায়গাটা পাহাড়ি। ফলে মনে হচ্ছে, আলোর কণাগুলো সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেছে আকাশে। অল্প অন্ধকারে সোমা দাঁড়িয়েই থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাডসন দেখে, আলো দেখে। বৃষ্টির ছিটা ছিটা জল আস্তে আস্তে তার সর্বাঙ্গ নাইয়ে দিতে থাকে। সোমা নড়ে না। এ দৃশ্য দেখে এই মুহূর্তে যা তাকে সবচেয়ে আচ্ছন্ন করে রাখার কথা ছিল, সেই ছ-সাত বছর আগের এক গ্রীষ্মে সুইজারল্যান্ডের লেক লুসার্নের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা পাহাড় আর জলাশয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য কিন্তু একবার মাত্র মনে উঁকি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। সোমার কেবল মনে পড়তে থাকে, অনেক রাতে লঞ্চে অথবা বড় নৌকায় করে বাড়ি ফেরার পথে ধলেশ্বরীর জলের সেই অনবরত ছলাৎ ছলাৎ অথবা ছপছপ শব্দের কথা। সেই সঙ্গে চোখে ভাসতে থাকে বিস্তীর্ণ নদীতে ভাসমান অসংখ্য জেলে নৌকা আর পাড়ের বাড়িঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট রাশি রাশি আলোর কণা, যা ক্রমাগত ঘুরে বেড়ায় অথবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিকষ কালো অন্ধকারে। নদীর দিকে মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সোমা।

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর সঙ্গে নারীর বন্ধুতা

নারীতে-নারীতে সখ্য : প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে

ইদানীং বেশ কয়েকজন অভিবাসী (প্রধানত উত্তর আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে) নারীর কিংবা তাঁদের কন্যাদের, অথবা যাঁরা স্বদেশে বসেই লেখেন অথচ যাঁদের মাতৃভাষা মূলত ইংরেজি নয় তেমন কিছু নারীর, ইংরেজি ভাষায় লিখিত উপন্যাস জগৎজুড়ে নাম করেছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন : (মূল ভারত) অনিতা দেশাই, কিরণ দেশাই, থ্রিটি উম্রিগর, অরুন্ধতী রায়, চিত্রা ব্যানার্জি দেবাকরুনি, ঝুম্পা লাহিড়ী, অনিতা রাও বাদামি, অমূল্য মাল্লাদি, ভারতী মুখার্জি; (মূল বাংলাদেশ) মনিকা আলী; (মূল হাইতি) এডউইজ ডান্টিক্যাট (Edwidge Danticat); (মূল নাইজেরিয়া) চিমামন্ডা এনগোজি আদিচি (Chimamanda Ngozi Adichie); (মূল চীন) এমি ট্যান। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বুকার পুরস্কার থেকে শুরু করে পুলিৎজার পুরস্কার পর্যন্ত অসংখ্য আরাধ্য পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন।

আজ আমি এরকম দুজন লেখকের দুটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করব, যে-দুখানি উপন্যাস প্রকাশলগ্নে বছরের সেরা উপন্যাসগুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত হয়েছিল আমেরিকায়। বাণিজ্যিক দিক থেকেও খুবই সফল এ-দুটি গ্রন্থ। এর একটির লেখক ভারত থেকে এসে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী থ্রিটি উম্রিগর, অন্যটির রচয়িতা হাইতি থেকে আমেরিকায় বসতি গড়তে আসা এডউইজ ডান্টিক্যাট। উপন্যাস দুটির নাম যথাক্রমে *The Space Between Us* (২০০৭) ও *The Farming of Bones* (১৯৯৯)। এত গ্রন্থের ভেতর এই বিশেষ দুটি উপন্যাস বেছে নেওয়ার কারণ, এ দুই উপন্যাসের ভেতর অন্তর্নিহিত একটি মিল রয়েছে, দুটোরই গভীরে সূক্ষ্ম একটি ঐকতান আছে। সমাজের ভিন্ন স্তর থেকে আসা দুটি অনাত্মীয় নারীর ভেতর একই ধরনের মানবিক বন্ধন রচনা, তাদের এই খাঁটি, অনাবিল সম্পর্কের গভীরতা আর সেই সঙ্গে সৃষ্ট অনভিপ্রেত কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিবারিক জটিলতা কিংবা রাষ্ট্রীয় টানাপড়েনের ঘটনা নিয়েই মূল কাহিনি রচিত। সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুই প্রান্তের দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর মধ্যে প্রকৃত টান ও বন্ধুতার জোয়ারে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ভেসে যাবে গতানুগতিক জীবনের বহু ক্ষুদ্রতা, বাছবিচার, বৈষম্য। কিন্তু আসলেই কি তাদের পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরতা দিয়ে সমস্ত ভিন্নতা, শ্রেণিবিভেদ পাশ কাটাতে, অগ্রাহ্য করতে সমর্থ হয় এই দুই জোড়া অসম-বিত্তের নারী?

বই দুখানির ভেতর কেন্দ্রীয় দুটি নারী চরিত্র ও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ভেতর এতটা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দুটো বইয়ে বর্ণিত ঘটনা, পরিপার্শ্ব, চরিত্র, কাল এবং সংস্কৃতি — সবই একেবারে আলাদা। দুটি উপন্যাসেই দেখা যায়, বহুদিন ধরে একই গৃহস্থালিতে পাশাপাশি থাকার কারণে সমাজের অসম অবস্থান থেকে উঠে আসা দুই অনাত্মীয় নারীর মধ্যে এক ধরনের সখ্যের, ভালোবাসার, আস্থার ও নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আবার সেই সঙ্গে এই মানবিক সম্পর্ককে ঘিরে দৃশ্যমান হয় নানারকম দ্বন্দ্ব, জটিলতা। আশপাশের অন্যান্য চরিত্রের অনুপ্রবেশ এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাপরম্পরায় বিভিন্ন রকমভাবে সম্পর্কের দোলাচলের আভাসও পাওয়া যায়।

থ্রিটি উম্রিগরের উপন্যাসে বম্বের উচ্চ-মধ্যবিত্ত এক পার্সি পরিবারের গৃহকর্ত্রী সেরা। আর ভিমা হলো সেরার বাড়িতে বিশ বছরের বেশিকাল ধরে ঘরের কাজ করে আসা অত্যন্ত বিশ্বস্ত পরিচারিকা, যে সারাদিন ধরে সেরার ঘরকন্নার কাজ ও তার সেবা করার পর সন্ধ্যায় নিজ গৃহে বস্তিতে ফিরে যায়, যেখানে মাতাপিতাহীন তার চোখের মণি নাতনি মায়া একা ঘরে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। মায়া ভিমার একমাত্র কন্যার একটি মাত্র সন্তান। মায়ার মা-বাবা দুজনেই এইডস রোগে মারা গেছে প্রায় একই সময়ে ভিমার চোখের সামনে। বহুদিন থেকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন মেয়ে এবং তার স্বামীর মারাত্মক অসুখের খবরটা পেয়েছিল ভিমা অতি অকস্মাৎ ওদের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে, এবং বহুদূরের সেই বিশেষভাবে নির্মিত এইডসের হাসপাতালে গিয়ে শেষ দেখাটিই কেবল দেখতে পেয়েছিল সে। সেই হাসপাতালে ভিমার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা, অতি অসময়ে মেয়ে ও জামাইয়ের প্রায় একই সঙ্গে করুণ মৃত্যু এবং তাদের সৎকারের ঘটনার বর্ণনা এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

সেরার বাড়িতে বছরের পর বছর কাজ করতে করতে অতি ধীরে ধীরে ভিমার সঙ্গে এই আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল সেরার, যদিও নিজের সামাজিক অবস্থান ও আভিজাত্যের প্রতি সজাগ সেরা ও তার স্বামী কখনো ভিমাকে তাদের সঙ্গে একই সোফায় বসে টেলিভিশন দেখতে অথবা একই মগে চা পান করতে দেয় না। যে-সোফা প্রতিদিন নিজের হাতে পরিষ্কার করে ভিমা, যে-গ্লাস নিজের হাতে ধোয়, সে-সোফায় বসা বা সেই গ্লাসে জল খাওয়ার অধিকার নেই তার। তাই তো এই গ্রন্থের পরিচয়পর্বে বলা হয়েছে —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'Thrity Umrigar's extraordinary novel demonstrates how the lives of the rich and poor intrinsically connected yet vastly removed from each other, and how the strong bonds of womanhood are eternally opposed by the divisions of class and culture.' এসব বাহ্যিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও সেরা আর ভিমার পারস্পরিক নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততা তুলনাহীন। এছাড়া একে অন্যের ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যাপারে এতটাই অবগত, সম্পৃক্ত ও উদ্বিগ্ন যে, এই আপাতবৈষম্য বা বিভাজনকে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক রীতি বা সংস্কারের ধারাবাহিকতার রেশ বলেই মনে হয়। প্রকৃত অর্থে ভিমার প্রতি আচরণে অন্তত সেরার পক্ষ থেকে অন্য কোনোরকম অবহেলা, বৈষম্য বা তাচ্ছিল্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। মায়ার কলেজে পড়ার খরচ বা তার মা-বাবার চিকিৎসার জন্যে সেরা ভিমাকে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করে। তা সত্ত্বেও বাড়ির আরেক সদস্য আধুনিক বিদুষী তরুণী দিনাজ, সেরার একমাত্র কন্যা, যে বর্তমানে সন্তানসম্ভবা, স্বামী ভিরাফসহ যে এই বাড়িতেই থাকে, ভিমার প্রতি এই বাড়ির কিছু কিছু আচরণ মোটেই পছন্দ করে না। এত বছর একসঙ্গে একই বাড়িতে কাটিয়ে দেওয়ার পরও ভিমাকে পরিবারের অন্য আরেক সদস্যের মতো মেনে না নিয়ে তাকে কাজের লোক হিসেবে গণ্য করা, তার প্রতি কোনোরকম বৈষম্য, ভিন্ন ব্যবহার বা আচরণ, যেমন : নির্দিষ্ট একটি গ্লাসে জল খেতে দেওয়া, মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় দিনাজের কাছে। দিনাজ মায়ের কাছে তার এই মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। শুনে তার মা যা বলে তাতে মনে হয় এবং কথাটিতে সত্যতাও অনেকটা রয়েছে হয়তো, ভিমার সঙ্গে এতটুকু পার্থক্য বজায় না রাখলে সেরার স্বামী সেটা কিছুতেই মেনে নিত না।

দীর্ঘদিন এই বাড়িতে থাকতে থাকতে ভিমা নিজেও অতি নীরবে এবং নিভৃতে অনেক কিছুই দেখে আসছে। ভিমা দেখতে পায়, কী ঘটে চলেছে এই আপাত সুখী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারটির অভ্যন্তরে। সেরার মতো ব্যক্তিত্বশালী উচ্চশিক্ষিত নারীকেও লোকচক্ষুর আড়ালে কীভাবে এক আত্মম্ভরী, অত্যাচারী, জটিল মানসিকতার স্বামীর দ্বারা মানসিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে মাঝেমধ্যেই। যতদিন তার স্বামী বেঁচে ছিল, কখনো এর থেকে রেহাই পায়নি সে। কতদিন গেছে, সেরার ক্ষতস্থানে অথবা আঘাতে নীল হয়ে যাওয়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নিজের হাতে মালিশ করে দিয়েছে ভিমা।

আর ওদিকে নিজের ঘরেও ভিমার ইদানীং বড়ই অশান্তি নাতনি মায়াকে নিয়ে, যে-মেয়েটি পড়াশোনা করে তার মা বা দিদিমার থেকে ভিন্ন এবং উন্নত এক জীবনের অধিকারী হবে বলে স্বপ্ন দেখত ভিমা। বড় শখ করে কলেজে পাঠিয়েছিল তাকে পড়াশোনা করার জন্য। কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় তার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার ঘটনাটি ইদানীং ভিমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে, আঘাত করেছে। সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে ভিমা মায়ার তরফ থেকে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের জন্য দায়ী পুরুষটির পরিচয় আগাগোড়া গোপন করে যাওয়ার ব্যাপারটায়। তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছে সে ওই অজানা ব্যক্তিটিকে আড়াল করতে মায়ার মতো মেয়ের জলজ্যান্ত মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাটি। সেরা বরাবরের মতো এই দুঃসময়েও ভিমা ও মায়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মায়ার জন্য এই মুহূর্তে একমাত্র খোলা পথ, গর্ভপাতের ব্যবস্থা করতে চাইলে কৃতজ্ঞতার বদলে সেরার প্রতি মায়ার অকস্মাৎ অত্যন্ত দুর্বিনীত ব্যবহার, দুর্বোধ্য কথাবার্তা এবং কঠিন ও নিষ্ঠুর মন্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে ভিমা। এই রহস্যের জাল ছিঁড়ে সত্য বেরিয়ে এলে দেখা যায়, তা এতখানিই কুৎসিত ও অপ্রত্যাশিত যে, ভিমা কোনোমতেই সেটা মেনে নিতে পারে না। সেরার সহজ-সরল গর্ভবতী কন্যা দিনাজের অনাগত সন্তানের পিতাই যে মায়ার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জন্যেও দায়ী, আর সেটা যে ঘটেছে সেরার অসুস্থ শাশুড়ির বাসায়, যেখানে মায়া তার দেখাশোনা করতে যেত মাঝেমধ্যে, এ-সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে ভিমা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। সেরা বা তার কন্যাকে কিছু না জানিয়ে সোজা আসল অপরাধীর মুখোমুখি হয়, যে তার নাতনিকে প্রতারণা করেছে চরমভাবে। সেরার অপমানিত মেয়েজামাই ভিরাফ তখন মরিয়া হয়ে মনে মনে ভিমার ওপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়ে। এত বছর ধরে যে-বাড়িতে এমন গভীর আস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত ভিমা, সেখানেও তাকে মিথ্যা টাকা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পিছপা হয় না ভিরাফ। এই বিশাল অগ্নিপরীক্ষার সময় সেরা তার এতদিনকার পরিচিত ও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন না করে অতি বাস্তববাদী এবং সংসারী একজন মানুষের মতো আচরণ করে। ভিমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টার বদলে সেরা তার সঙ্গে এতদিনের সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে। সব জেনেশুনেবুঝেও আসল সত্যকে — ন্যায়কে অস্বীকার করে বসে সেরা। ভিমার বেতন পরিশোধ করে তাকে তার গৃহস্থালির চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এমনকি ভিমাকে তার বাড়ি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিতাড়িত করে দিতেও দ্বিধা করে না সেরা। পারিবারিক সম্মান বাঁচানো ও নিজের এবং কন্যার ঘর সামলানো এতটাই বেশি জরুরি ও বড় হয়ে দেখা দেয় সেরার কাছে যে, এত বছর ধরে তিলতিল করে গড়ে ওঠা নিঃস্বার্থ মানবিক একটি সম্পর্ককে এক মুহূর্তে ছিন্ন করে দিতেও বাধে না তার। ভিমা যেন আসলেই সেরার বাড়িতে নিছক কাজের মেয়ে বই কিছু নয়, যারা প্রতিনিয়ত এ-ধরনের অপবাদ মাথায় নিয়েই গৃহস্থালির কাজ করে যায়। সেরার বাড়িতে দুই দশকের বেশি সময় ধরে প্রতিদিন গৃহকর্ম করার পর, আজ সকল বাঁধন ছিঁড়ে, একগাদা কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে একাকী রাস্তায় বেরিয়ে আসে ভিমা। পড়ন্ত বেলায় বম্বের ইন্ডিয়ান গেটের অদূরে সমুদ্রের জলে নামতে নামতে ভিমা তার গোটা জীবনের চেহারাটি ওলটপালট করে দেখে। স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, সেরার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের বন্ধুতা এবং অতি করুণভাবে তার পরিসমাপ্তি, কন্যা ও জামাইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসময়ে মৃত্যু, মায়ার ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবনা তার মন ছুঁয়ে যায়।

থ্রিটি উম্রিগরের ইংরেজি সহজ, সরল, সুখপাঠ্য। চরিত্র চিত্রণে, বিশেষ করে চরিত্রের জটিলতা সৃষ্টিতে এবং সম্পর্কের মোড় ঘোরাতে অসীম মুনশিয়ানার পরিচয় দেন থ্রিটি। বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে যেভাবে পরতে পরতে এবং ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে মূল কাহিনি, চিত্রিত হয়েছে তার চরিত্রগুলো আর তাদের ব্যাপ্তি, তাতে সন্দেহ নেই থ্রিটি উম্রিগর একালের একজন অতি দক্ষ ও শক্তিশালী লেখক। তিনি নিজে পার্সি পরিবার থেকে আসার কারণে সে-সমাজের চলাফেরা, দৈনন্দিন জীবন ও মূল্যবোধ অতি বাস্তবতার সঙ্গে আঁকতে সমর্থ হয়েছেন এ-গ্রন্থে। চলনে-বলনে-পোশাকে-পার্টিতে পশ্চিমি ধারার সঙ্গে যত মিলই থাকুক, বম্বের উচ্চবিত্ত পার্সি সম্প্রদায়ের, প্রাচ্যের কুসংস্কার ও পারিবারিক রীতিনীতি ব্যাপকভাবেই উপস্থিত সেখানে। যেমন, বিয়ের অব্যবহিত পরে একসঙ্গে বাস করার কারণে শাশুড়ি-পুত্রবধূর মধ্যে বিদ্যমান অম্লমধুর সম্পর্ক ও বিস্তর টানাপড়েন, মাসিকের সময় শাশুড়ির নির্দেশে পুত্রবধূর রান্নাঘরে বা প্রার্থনাঘরে যেতে বা ঘরকন্নার কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে, এমনকি, গুরুজনের সান্নিধ্যে আসতেও বারণের রীতি গতানুগতিক উপমহাদেশীয় নিয়ম-নিষেধ ও সংস্কৃতিরই অংশ। এ-গ্রন্থে উম্রিগর সেরা ও ভিমার প্রতি এত বেশি নজর দিয়েছেন যে, উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদের জন্যে এ-গ্রন্থে যথেষ্ট জায়গা ছিল না। বইটির কাহিনি যে খুব সম্ভবত সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে লেখা, তার বড় প্রমাণ বইখানি তিনি উৎসর্গ করেছেন 'সত্যিকারের ভিমাকে এবং তার মতো হাজারো নারীকে' (For the real Bhima and the millions like her)। গ্রন্থটির পেছনের পৃষ্ঠায় বহুপ্রশংসিত মন্তব্যের ভেতর *Washington Post*-এর উদ্ধৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'The life of the privileged is harshly measured against the life of the powerless, but empathy and compassoin are evoked by both strong women, each of whom is forced to make a separate choice. Umrigar is a skilled storyteller, and her memorable characters will live on for a long time.'

ডান্টিক্যাটের উপন্যাসেও অসম সামাজিক অবস্থান থেকে উঠে আসা দুই নারীর সখ্যের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। আমাবেলের জন্ম হাইতিতে। পৃথিবীর ভেতর আর এ-ধরনের কোনো দ্বীপ আছে কি না জানি না, কিন্তু ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের (আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের নিচের দিকে) ভেতর যে-দ্বীপটিতে হাইতি অবস্থিত, তার আরেকটা বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে অন্য একটি দেশ — ডোমিনিকান রিপাবলিক। একই দ্বীপ দুটি ভিন্ন স্বাধীন দেশে বিভক্ত — বড়ই বিচিত্র। শুধু তা-ই নয়, এই দুদেশের আর্থিক অবস্থা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষার মান, সাদা-কালো মানুষের আনুপাতিক হার, শিল্পায়ন — সবকিছুতেই আকাশ-পাতাল ফারাক। হাইতি, পৃথিবীর দরিদ্রতম কয়েকটি দেশের একটি, যার অধিবাসীরা মূলত কালো। ডোমিনিকান রিপাবলিকের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো, বিশেষ করে চিনি রফতানি ও পর্যটন ব্যবসার সাফল্যের জন্যে। এখানে কালো লোক থাকলেও সাদা লোকের আনুপাতিক হার বেশি। শিল্প-কারখানা থাকায় লোকজনের চাকরি ও জীবনযাত্রার মান অনেকটাই উঁচুতে। পাশাপাশি দুটি দেশের ভেতর যদি ভিন্ন পর্যায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে থাকে, তাহলে বরাবর যা হয়, হওয়া স্বাভাবিক, এখানেও তা-ই ঘটেছে। হাইতি থেকে ক্রমাগত মানুষ চোরাপথে ডোমিনিকান রিপাবলিকে ঢুকে পড়ছে। মানুষের এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা — উন্নত বা অপেক্ষাকৃত ভালো জীবনযাপনের জন্যে দেশান্তরী হওয়ার বাসনা কখনো থেমে থাকে না, যতক্ষণ না প্রতিটি দেশে সকল মানুষের জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা মেটাবার ও সহজভাবে বিচরণের ক্ষেত্র রচিত হয়। ফলে হাইতি থেকে ক্রমাগত মানুষ আসছে ডোমিনিকান রিপাবলিকে। এখানে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়ে তারা বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত খুব অল্প বেতনে আখক্ষেতে দিনমজুরের কাজ করে জীবন কাটায়। এসব ভেসে বেড়ানো পরদেশি শ্রমিকের প্রতি মিশ্র অনুভূতি সাধারণ ডোমিনিকান রিপাবলিকের জনগণের। সস্তায় শ্রম বিক্রি করে বলে এরা বড় জোতদারদের খুব সুবিধে করে। ফলে হাইতির এই অভিবাসী শ্রমিকরা এদেশের জন্যে বেশ উপকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বাঞ্ছিত বা আমন্ত্রিত নয়। অর্থনৈতিক স্বার্থে তাদের সহ্য করা হয়, কিন্তু তাদের বিশ্বাস করে না কেউ। এরা প্রায় সকলেই তপ্ত রোদে আখক্ষেতে দীর্ঘ দিবস ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করে। ফসল তোলার মৌসুমে বিশাল বিশাল ক্ষেত থেকে শক্ত এবং লম্বা লম্বা আখ ও আখের ধারালো পাতা কাঁচি-ছুরি দিয়ে কাটতে কাটতে তাদের হাত-পা কাটাছেঁড়া হয়ে যায়। এটাকে স্থানীয় ভাষায় 'farming of bones' বলা হয়। আমাবেলের প্রেমিক তেমনি হাত-পা ছেঁড়া খসখসে ত্বকের এক আখক্ষেতের তরুণ শ্রমিক, সিবাস্তিন।

আমাবেলের বয়স তখন সবে আট। থাকে মা-বাবার সঙ্গে হাইতিতে। সে-সময়ে, একদিন হাইতি থেকে, অন্য অনেক হাইশিয়ান জনগণের মতো, সীমান্তের স্রোতস্বিনী নদী পার হয়ে লুকিয়ে ডোমিনিকান রিপাবলিকে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে আমাবেলের পরিবার। কিন্তু তা করতে গিয়ে আট বছরের কন্যার চোখের সামনে তার মা-বাবা দুজনই নদীর জলে ডুবে মারা যায়। আমাবেলের পিতা প্রথমে কন্যাকে মাথায় করে নদী পার করে তাকে এপারের তীরে বসিয়ে রেখে আবার ওপারে গিয়ে স্ত্রীকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে নদী পার হওয়ার সময় দুজনই তাদের শিশুসন্তানের চোখের সামনে স্রোতে ভেসে চলে যায় গহিন জলের তলায়। স্থানীয় লোকজন পরে এই কৃষ্ণাঙ্গ শিশু আমাবেলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ডোমিনিকান রিপাবলিকের যে-ধনাঢ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারে সে বড় হয়, সেই বাড়ির একমাত্র কন্যাটিও প্রায় আমাবেলেরই বয়সী। যেহেতু আমাবেল এ-বাড়িতে আশ্রিত, বড় হওয়ার পর অন্য আরো কয়েকজন আশ্রিতের মতো সেও গৃহের কাজের সহকারী হয়ে ওঠে — সে-হিসেবে সে এই বাড়ির পরিচারিকাই। তবে অন্য পরিচারিকাদের তুলনায় আমাবেলের অবস্থান কিছুটা স্বতন্ত্র। সে মূলত চা বা কফির সরঞ্জাম একত্রিত করে বাড়ির সকলকে নিজের হাতে চা পরিবেশন করে সকালে এবং বিকেলে। মনিব পরিবারের কাছে বেড়াতে আসা অতিথিদেরও আপ্যায়ন করে আমাবেল। এছাড়া তার নিজের বয়সী বাড়ির আদুরে মেয়েটির টুকটাক আবদার রক্ষা করে অথবা তার সঙ্গে খেলে কিংবা তাকে সঙ্গ দিয়ে সময় কাটায়। এভাবে আস্তে আস্তে এ-বাড়ির কন্যাটির সঙ্গে তার নিবিড় একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেটা আশ্রিতা আর আশ্রয়দাতার সম্পর্ক নয়। এ-গ্রন্থের পুরো কাহিনিটিই যেহেতু আমাবেলের মুখ দিয়ে বর্ণিত, গৃহকর্তার মেয়েটিকে আগাগোড়া সে সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়া বলেই উল্লেখ করে গেছে, যদিও দেখা যায়, বহু বছর একই বাড়িতে পাশাপাশি বড় হওয়ায় তাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক সখ্য জন্মেছিল, সেখানে অনায়াসে আমাবেল ভ্যালেন্সিয়াকে নাম ধরে ডাকতে পারত। কিন্তু আমাবেল কখনো নিজের অবস্থানের কথা ভুলে যায় না এবং ভুলেও ভ্যালেন্সিয়াকে নাম ধরে সম্বোধন করে না। অন্যের কাছে তার মনিবকন্যার কথার উদ্ধৃতি দিতে, অথবা নিজের মনে মনে তার কথা চিন্তা করার সময়েও সবসময়েই সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়া বলেই ডাকে বা ভাবে সে। মনিব-গৃহপরিচারিকার সম্পর্কের ব্যাপারে আমাবেল যতই সজাগ ও সতর্ক থাকুক না কেন, দেখা যায় সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধানের বেড়া ভেঙে বাড়ির এই দুই অল্পবয়সী মেয়ের মধ্যে একসময় গড়ে উঠেছে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা। বিশেষ করে, ভ্যালেন্সিয়ার তরফ থেকে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ কখনো চোখে পড়ে না।

এক সামরিক অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হয় ভ্যালেন্সিয়ার। বাবার বাড়িতেই থাকে সে। ভ্যালেন্সিয়ার প্রথম সন্তান যখন জন্ম নেবে, ভ্যালেন্সিয়ার বাবা ডাক্তার ডাকতে যান; কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই ভ্যালেন্সিয়ার যমজ শিশুর, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের, জন্ম হয়ে যায় আমাবেলের হাতে। এটাই আমাবেলের জীবনে প্রথম স্বহস্তে প্রসব করানো। কিন্তু সে জানে, তার মা যখন বেঁচেছিলেন, এ-কাজ বহুবার করেছেন তিনি। যমজ বাচ্চা প্রসবের বেশ কিছুক্ষণ পরে পারিবারিক ডাক্তার জাভিয়ার আসেন বাড়িতে এবং ভ্যালেন্সিয়াকে পরীক্ষা করেন। দেখেন, সবকিছুই ঠিকঠাকমতো করা হয়েছে। ডাক্তার জানতে চান, আমাবেল নিয়মিত দাইয়ের কাজ করে আসছে কি না। জবাবে আমাবেল জানায়, এটাই তার প্রথম অভিজ্ঞতা। তবে তার মা-বাবা, যারা হাইতিতে বিভিন্ন গাছের লতাপাতা দিয়ে কবিরাজি করতেন, মাঝেমধ্যে দরকার হলে প্রসবও করাতেন তারা। এখানে ডান্টিক্যাট ভ্যালেন্সিয়ার যমজ সন্তানের জন্মকে হয়তো খানিকটা প্রতীকীরূপেও ব্যবহার করেছেন। কেননা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার জাভিয়ার একটি দার্শনিক মন্তব্য করেন যমজ সন্তান সম্পর্কে। তিনি বলেন, 'Many of us start out as twins in the belly and do away with the other.'

ভ্যালেন্সিয়া আমাবেলকে তার খাটের ওপর উঠে এসে বসতে বলে তার পাশে। কথামতো তা করলে, ভ্যালেন্সিয়া তার এক নবজাতককে আমাবেলের কোলে তুলে দিয়ে তাকে বলে তার স্তন্য পান করানোর জন্য। আমাবেল প্রথমে ইতস্তত করলেও মনিবকন্যার কথা শোনে এবং তা-ই করে। এই আচরণের মধ্য দিয়ে ভ্যালেন্সিয়া প্রকাশ করে, আমাবেলকে কত আপন, কত কাছের এবং কতটা সমগোত্রীয় বলে মনে করে সে। তার হাতে আজ তার সন্তানদের জন্ম হওয়ায় আমাবেলকে আরো আপন, আরো নিকটের মনে হতে থাকে তার — নির্ভরতাও বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে।

অথচ ভ্যালেন্সিয়ার সামরিক অফিসার স্বামীর মনোভাব একই রকম উদার নয় মোটেই। যে-দিন সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়ার যমজ সন্তানের জন্ম হয়, সে-রাতেই সিবাস্তিনসহ তার দুই বন্ধু যখন রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, একটি ট্রাক অতি দ্রুতগতিতে এসে তাদের একজনকে ধাক্কা দিয়ে অনেক উঁচু থেকে নদীতে ফেলে দিয়ে মেরে চলে যায়। যে মারা যায় সে স্থানীয় হাইশিয়ান অভিবাসীদের আধ্যাত্মিক নেতা কঙ্গোর একমাত্র পুত্র জোয়েল। আর যে সেই ট্রাক চালাচ্ছিল তখন সে আর কেউ নয়, সিনিয়র পিকো, সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়ার স্বামী, নতুন পিতা, যে তার কর্মক্ষেত্রে যমজ সন্তানের জন্মের খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে অতিদ্রুত গাড়ি চালিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসছিল। একজন নিরপরাধ মানুষকে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে খুন করার জন্যে সিনিয়র পিকোর কোনোরকম শাস্তি হয় না বা তার ভেতর কোনো আত্মগ্লানি বা মনোবিকারও লক্ষ করা যায় না। অথচ ভ্যালেন্সিয়ার পিতার মনে অত্যন্ত গভীরভাবে দাগ কাটে এ-ঘটনা। তার নিজের কোনো পুত্র নেই; পুত্র জন্ম দিতে গিয়েই তাঁর স্ত্রী মারা যান। তিনি স্থির করেন, যেভাবেই হোক কঙ্গোর সঙ্গে দেখা করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে তার ক্ষমা চাইবেন এবং এ-ব্যাপারে আমাবেলের সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনি। এদিকে জন্মের অব্যবহিত পরেই ভ্যালেন্সিয়ার পুত্রটি ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ করে মারা যায়। তার স্বামী সিনিয়র পিকো যখন সিনিয়রার ইচ্ছা পূরণে মৃত পুত্রটিকে ভ্যালেন্সিয়ার মা ও ভাইয়ের (যে-ভাইয়ের জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু হয়) কবরের পাশে কবর দিতে নিয়ে যায়, ভ্যালেন্সিয়া তাদের আখক্ষেতের সকল শ্রমিককে বাড়িতে ডাকে কফি খাওয়ার জন্যে। মৃত পুত্রের স্মরণে কিছু একটা করার, ভালো কোনো কাজ করার বাসনা জেগেছিল তার মনে। আমাবেলের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালে কেউ কেউ আসে, যারা আখক্ষেতে কাজে যায়নি সেদিন। সিনিয়রার আদেশে আমাবেল তাদের সকলকে সিনিয়রার অতি প্রিয় লাল অর্কিডের প্যাটার্নের দামি ইউরোপিয়ান চীনামাটির চায়ের কাপে করে কফি ও চা পরিবেশন করে। কিন্তু জেনারেল পিকো, সিনিয়রার স্বামী, ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে এ-কথা শোনার পর, রাগান্বিত হয়ে সেই চীনামাটির পুরো সেটটি বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি একটি করে সব কাপ ও অন্যান্য পাত্র পাথরের ওপর গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভেঙে ফেলে। হাইতি থেকে বেআইনিভাবে ঢুকে-পড়া আখক্ষেতের দিনমজুর এই সাধারণ শ্রমিকরা তার বাড়িতে এসে তাদের নিজেদের পছন্দের পাত্রে কফি খেয়ে যাবে — এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না জেনারেল পিকোর পক্ষে। তার স্ত্রী যতই তা চেয়ে থাকুক না কেন, শ্রেণীবিভেদকে এত সহজে মুছে ফেলার মানুষ সিনিয়র পিকো নন। সেরার বাড়িতে ভিমার আলাদা গ্লাসে জল খাওয়ার রীতির বা বাধ্যবাধকতার কথা কি মনে করিয়ে দেয় এ-ঘটনা?

হাইতি যত দরিদ্র দেশই হোক, এর সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি। আর তাই দেখা যায়, অতি অনায়াসে আমাবেলের ঘরে প্রায় রাতেই ঘুমুতে চলে আসে তার প্রেমিক হাইতি থেকে আসা আখক্ষেতের শ্রমিক সিবাস্তিন। আমাবেলের গায়েপিঠে আদর করতে করতে সিবাস্তিন তার কাছে হাইতির গল্প বলে, সেখানকার রূপকথা, লোককথা, নানান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা, সেখানকার লোকাচার, বিশ্বাস, নিয়মকানুন, পার্বণের সব বিস্তৃত বিবরণ দেয় সে। আমাবেলের কাছে তার ছোটবেলার কথা শুনতে চায় সিবাস্তিন। তার মা-বাবার কথা প্রতিরাতেই জিজ্ঞেস করে। সিবাস্তিন আমাবেলের মধ্যে হাইতির স্মৃতি উস্কে দেয়, হাইতির প্রতি আমাবেলের মানসিক টান জাগিয়ে রাখতে চায়। তারা দুজনেই স্বপ্ন দেখে, ফসল কাটার মৌসুমটা শেষ হলেই এবার তারা বিয়ে করে হাইতিতে নিজের ভূমিতে ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করবে। আর্থিক যত দারিদ্র্যই থাক না কেন, হাইতিসহ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের লোকজন অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মতোই জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শারীরিক সম্পর্ক গড়ার আগে বিবাহের পূর্বশর্তের কড়াকড়ি এ-সংস্কৃতিতে নেই। তাই অতি সহজেই সকলে মেনে নেয় আমাবেলের সঙ্গে একই বাড়িতে কাজ করে যে প্রৌঢ় দম্পতি তাদের জীবনাচরণকেও। এই দম্পতি বিবাহিত নয়, কিন্তু বহু বছর ধরে তারা একত্রে বসবাস করছে। পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক তারা। সবসময় একে অন্যকে my man বা my woman বলে পরিচয় দেয়। একই রকমভাবে আমাবেলের ঘরে প্রায় সময়েই রাত কাটায় তার প্রেমিক সিবাস্তিন। আমাবেলকেও কখনো কখনো দেখা যায়, গভীর রাতে একা একা আখক্ষেতের পাশ দিয়ে তার প্রেমিকের বাসায় যেতে। এ নিয়ে সমাজে কোনো কথা ওঠে না।

কিন্তু এর মধ্যে অকস্মাৎ সমস্ত দেশজুড়ে চরম জাতীয়তাবাদীদের মদদে 'হাইতির অভিবাসী হটাও' আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সময়টা ১৯৩৭ সাল। দেশের সামরিক বাহিনী এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সামরিক প্রধান জেনারেল রাফায়েল ত্রুহিয়োর (যিনি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানও হয়েছিলেন) স্বপ্ন ছিল, ডোমিনিকান রিপাবলিকের জনগণের রক্তের পবিত্রতা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এই ভূখণ্ডকে হাইতির নাগরিকশূন্য করে তোলা। সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়ার স্বামী জেনারেল পিকোও অত্যন্ত সুবিধাবাদী এবং চরম জাতীয়তাবাদী এক লোক। সে উচ্চাভিলাষীও বটে। একদিন এই দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। সামরিক প্রধানের বদান্যতা পাওয়ার জন্যে এবং দ্রুত প্রমোশনের আশায় স্বয়ং সামরিক প্রধান রাফায়েলের একখানা পোর্ট্রেট পর্যন্ত নিজের বসার ঘরে ঝুলিয়ে রাখে সে। হাইতির অভিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারে অকস্মাৎ উন্মাদ হয়ে ওঠে গোটা দেশ। রাতারাতি সমস্ত কিছু, সম্পূর্ণ পরিবেশ বদলে যায়। রাজনৈতিক গ্রেফতার, নির্বিচারে হত্যা, অত্যাচার, বর্ডার দিয়ে জোর করে লোকজনকে হাইতিতে প্রেরণ ইত্যাদি নারকীয় কর্মে মেতে ওঠে একদল ডোমিনিকানবাসী — প্রধানত সামরিক বাহিনী। এরই ভেতর স্থানীয় কিছু সহমর্মী ও হৃদয়বান মানুষ হাইতির এসব ভেসে বেড়ানো অসহায়, নিরপরাধ গরিব মানুষের বিপদের দিনে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসেন। কথা ছিল, অতি গোপনে একটি বিশেষ চ্যাপেলে সিবাস্তিন, তার বোন মিমিসহ বেশ কয়েকজন এবং আমাবেল এসে জড়ো হবে। গির্জার যাজক নিজে এবং স্থানীয় ডাক্তার জাভিয়ার, যিনি সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়াদের পারিবারিক ডাক্তার, সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন হাইতির এসব লোককে নিরাপদে বর্ডার পার করে দেওয়ার জন্যে। সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়া সেদিন একটু অসুস্থ বোধ করছিল। তার জামার পেছনের দিকে রক্তের ছাপ চোখ এড়ায় না আমাবেলের। সন্তান প্রসবের পর যথেষ্ট বিশ্রাম না নিতে পারায় আবার রক্তপাত শুরু হয়েছিল সিনিয়রার। আমাবেলের একটি হাত পরম নির্ভরতায় শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছিল ভ্যালেন্সিয়া। তার ধারণা, আমাবেলের মতো করে তার দেখাশোনা আর কেউ করতে পারবে না। কিন্তু চলে যাওয়ার সময় হয়ে আসায় জোর করে ভ্যালেন্সিয়ার অতি আস্থার সঙ্গে ধরে রাখা তার হাতখানি আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে ওষুধ আনার নাম করে আমাবেল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেই চ্যাপেলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছার আগেই জানতে পারে, এক সামরিক বাহিনী এসে ট্রাকে করে চ্যাপেল থেকে সকলকে বন্দি করে নিয়ে গেছে, যাদের মধ্যে সেই ডাক্তার, গির্জার যাজক, সিবাস্তিন ও তার ভগ্নি মিমিও ছিল। তাদের কোনো হদিস জানা যায় না। আমাবেল দেখে, রাস্তায় এক সামরিক বাহিনীর ট্রাকের ভেতর হাইতির শ্রমিকদের টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বর্ডারের দিকে ইউনিফর্ম পরা সামরিক অফিসারেরা এবং এ-কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বয়ং সিনিয়র পিকো।

প্রেমিকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু বাধা, কষ্ট, পদে পদে অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে গিয়ে পথে দেখা একদল হাইতির লোকজনের সঙ্গে বর্ডার পার হয়ে অবশেষে তার নিজের জন্মভূমি হাইতিতে ফিরে আসে আমাবেল। শুরু থেকেই তার পথের সাথী হয় ইভস নামে এক যুবক, যে সিবাস্তিনের পূর্বপরিচিত — তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেতে যেতেও সিবাস্তিনের খোঁজ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা। ইভস ও আমাবেল একই সঙ্গে বর্ডার পার হয়। বাঁচার প্রয়োজনে এবং দীর্ঘদিন একত্রে চড়াই-উতরাই পার হয়ে যেতে যেতে এক ধরনের নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাবেল ও ইভসের ভেতর। হাইতিতে ফিরে গিয়ে নিজের কেউ না থাকায় ইভসের পৈতৃক বাড়িতে তার পরিবারের সঙ্গে গিয়ে ওঠে আমাবেল। সেখানে সে পরিচিত হয় ইভসের প্রেমিকা হিসেবে। স্বভাবতই ইভসের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোয় আমাবেল। কিন্তু সিবাস্তিনকে ভুলতে পারে না কিছুতেই। তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। জানা ও সম্ভাব্য সকল স্থানে তার খোঁজ করে আমাবেল। সীমান্ত অঞ্চল অতিক্রম করে আবার ডোমিনিকান রিপাবলিকে ঢুকেও প্রেমিকের খোঁজ নেয়। একেকজন একেক রকম কথা বলে। কিন্তু সত্য বোধহয় এটাই যে, সিবাস্তিনকে হত্যা করা হয়েছে, কেননা এক খ্রিস্টান যাজকের কাছে সে পুনরায় জানতে পারে, সিবাস্তিনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মিলিটারি ট্রাকে করে এবং পরে শোনা গেছে অন্যদের সঙ্গে তাকেও খুন করা হয়েছে, কেননা সিবাস্তিন একজন নেতা গোছের হাইশিয়ান বলে পূর্বপরিচিত ছিল। হাইতির লোকদের বিরুদ্ধে এ-অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞে সিনিয়রা ভ্যালেন্সিয়ার স্বামী জেনারেল পিকো এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে *Farming of Bones* বইয়ের এ-শিরোনামটি দেখা যায় দ্ব্যর্থবোধক। এই নাম কেবল হাইতি থেকে বেআইনিভাবে ঢুকে-পড়া দিনমজুরদের আখক্ষেতে দীর্ঘ সময় ধরে প্রখর রোদ আর গরমের ভেতর লম্বা লম্বা হাড়ের মতো শক্ত আখ কাটা ও পাতা পরিষ্কার করার কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কথাই বোঝায় না, ১৯৩৭ সালের বিশেষ এক সময়ে, জরুরি অবস্থায় হাইতির লোকজনকে বেছে বেছে দলে দলে হত্যা করা, গুম করা, গণকবর দেওয়া এবং নিপীড়ন করে হাত-পা ভেঙে বর্ডারের ওপারে নিক্ষেপ করাও এ শিরোনামকে ধারণ করে আছে বলে আমার বিশ্বাস। বছরের পর বছর পাশাপাশি বাস করার পর, কাজ করার পরও ডোমিনিকান সামরিক বাহিনী যে-ধরনের জেনোসাইড করেছিল হাইতির অভিবাসী নিরস্ত্র, নিরীহ, হতদরিদ্র শ্রমিকদের ওপর, যেভাবে তাদের নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল তারা, তা ১৯৭১-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইংরেজিতে লেখা *Farming of Bones*-এর ভাষা সরল, কাব্যময়। তরতর করে গোটা বইটি পড়ে ফেলা যায়। বইটি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা মুশকিল। আমাবেলের বয়ানে লেখা উপন্যাসটিতে একটি পরিচ্ছেদ পরপর (সাধারণত বেজোড় সংখ্যার পরিচ্ছেদগুলোতে) একেকটি গোটা পরিচ্ছেদ রয়েছে, যেখানে আমাবেল হয় তার ছোটবেলায় দেখা হাইতির কোনো পার্বণ, আচার-আচরণ বা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে অথবা তার মা-বাবার স্মৃতি রোমন্থন করছে, কিংবা স্বপ্ন দেখছে, হয় অতীতের — মা-বাবার নদীতে ডুবে যাওয়ার সেই ভয়ংকর দৃশ্যকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন, অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যতের — সিবাস্তিনকে নিয়ে অনাগত সুখের দিনের রোমান্টিক সব স্বপ্ন। ডান্টিক্যাট একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে সেসব স্মৃতি রোমন্থন বা স্বপ্নের পরিচ্ছেদগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক ফন্ট এবং মোটা কালি (bold) ব্যবহার করে সেগুলোকে চলমান কাহিনী বা বর্তমান ঘটনার পরিচ্ছেদগুলো থেকে পৃথক করেছেন।

Space Between Us ও *The Farming of Bones* গ্রন্থের ভেতর যে-সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তা শুধু গৃহকর্ত্রী আর গৃহপরিচারিকার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সখ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দুটো পুস্তকেই বাড়ির অল্পবয়সী মেয়ে দুটোকে, দিনাজ ও ভ্যালেন্সিয়াকে, দেখা যায় অত্যন্ত সহজ-সরল মনের সাদাসিধে ব্যক্তি হিসেবে। দুজনেই বাড়ির একমাত্র কন্যা এবং বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও স্বামীসহ থাকে বাবার বাড়িতেই। মানুষে মানুষে বৈষম্যে-বিভেদে পূর্ণ অবিশ্বাসী, অত্যন্ত উদার ও মুক্তমনের মানুষ এই দুই নারী। কিন্তু তাদের স্বামী দুটি ঠিক বিপরীত চরিত্রের। দুটি গ্রন্থেই তারা একরকম ভিলেনের ভূমিকা পালন করে। *Space Between Us* ও *The Farming of Bones*-এ যথাক্রমে ভিরাফ আর সিনিয়র পিকোর চরিত্র মানবিক বন্ধন, পারস্পরিক আস্থা ও সহমর্মিতার পরিপন্থী। তারা দুজনেই অত্যন্ত স্বার্থপর, আত্মম্ভরী, অবিবেচক ও নিষ্ঠুর। তাদের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ তাদের আশেপাশের অনেকের মর্মবেদনা ও সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুটি গ্রন্থেই দেখা যায়, নারীর সমস্যা ও যাতনা নারীই বেশি ভালো করে বুঝতে পারে, সমাজের যে-অবস্থানেই তারা থাকুক না কেন, কিংবা শিক্ষাগত ও অর্জিত গুণাবলির যতই পার্থক্য থেকে থাকুক তাদের ভেতর। দুটি গ্রন্থেরই একেবারে শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, হতাশাপীড়িত সমাজের নিচের তলার দুই নারী সর্বস্ব হারিয়ে শান্তির অন্বেষণে ধীরে ধীরে তাদের বৃহ পরিচিত এবং আত্মার সঙ্গে গাঁথা স্রোতস্বীলা জলাশয়ে নেমে পড়ে, যে জলধারা দুটি তাদের অস্তিত্বের মতোই সদা বহমান, যা কালের সাক্ষী হয়ে বহুকাল ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। *The Farming of Bones* উপন্যাসের শেষে আমাবেল দুই দেশের মাঝখানে সীমান্তের সেই খরস্রোতা নদীর তীরে এসে দাঁড়ায়। মা-বাবা ও সিবাস্তিয়ানের কথা মনে পড়ে তার। আস্তে আস্তে সে তার পরিধেয় সব কাপড়চোপড় একে একে পরতের পর পরত খুলে খুলে পাড়ে রেখে দিয়ে একেবারে নগ্ন হয়ে নদীর জলের ওপর পিঠ দিয়ে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। অক্টোবরে নদীর জল কিছুটা উষ্ণ। আমাবেল এই পরিচিত জলধারা থেকে এক নরম, শান্ত আলিঙ্গনের স্বপ্ন দেখে। স্রোতের টানে সে ভেসে যায়, তাকে টেনে নিতে চায় সেই একই নদী, যেখানে একদিন ডুবে গিয়েছিল তার মা-বাবা তার শিশু-চোখের সামনে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ডুবতে ডুবতেও তার মা প্রাণপণে তার একখানা হাত শূন্যে তুলে কী যেন বলতে চেয়েছিল আমাবেলকে। মা কি চেয়েছিল সেও তাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ুক জলে, নাকি তাকে বাঁচতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিল মা? আমাবেল জানে না। সে শুয়ে থাকে নদীর বুকে চিৎ হয়ে। পিঠের নিচে নদীর তলায় পড়ে থাকা অসংখ্য পাথরকুচি আমাবেলের নরম ত্বকে অনবরত সংঘর্ষ করতে থাকে।

১. পুস্তকের নাম : *The Space Between Us*
লেখকের নাম : Thriti Umrigar
প্রকাশক : Harper Paper Perennial, New York
প্রথম প্রকাশকাল : First Edition published in 2007

২. পুস্তকের নাম : *The Farming of Bones*
লেখকের নাম : Edwidge Danticat
প্রকাশক এবং প্রথম প্রকাশকাল : Penguin Books, USA; First Edition published 1999.

লেখক পরিচিতি

থ্রিটি উম্রিগর : জন্ম মুম্বাইয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে পিএইচডি। বর্তমানে আমেরিকার ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যের কেইস ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বহু বছর ধরে *ওয়াশিংটন পোস্ট*সহ বিভিন্ন খবরের কাগজে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম *Bombay Times*. *The Space Between Us* তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Nieman Fellowship পান। ওহাইয়োর ক্লিভল্যান্ড শহরে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করছেন। তাঁর আরো কয়েকটি গ্রন্থের ভেতর *Weight of Heaven, The World We Found, If Today be Sweet* উল্লেখযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসার রং নীল, ভালোবাসার রং গোলাপি

সময়ের ব্যাপারে সচেতনতা খুব টনটনে লিন্ডার। একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়েই বলা চলে। এটা জানা ছিল বলেই ভোর পাঁচটায় রওনা হবার কথা থাকলেও অনেক আগেই তৈরি হয়ে বসেছিল ধারা। ডেভিড জেগে যেতে পারে ভেবে চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে অন্ধকারেই বাথরুমে গিয়েছিল। দাঁত ব্রাশ করে, পোশাক বদলে, মুখে সামান্য নিভিয়া ক্রিম মেখে, চুলগুলো আঁচড়ে পেছনে একটা বড় ক্লিপে আটকে নিয়েছিল। আলো ছাড়া নিঃশব্দে চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধে হয় না তার এ-বাড়িতে; যদিও এটা তার নিজের বাড়ি নয়। কিন্তু গত তিন বছরে এখানে বহু রাত, বহু দিন কাটিয়েছে সে। ফলে যেদিকেই যাক-না কেন, তার সম্ভবপর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গেই সে পরিচিত এখানে। কোথায় মেঝেটা সামান্য উঁচুনিচু, কোথায় সিঁড়ি, কোথায় ভারী চাইনিজ কার্পেটের প্রান্ত শেষ হয়ে হার্ড-উড ফ্লোর শুরু হয়েছে, কোথায় বাথরুমের টাইলের উচ্চতা হলওয়ের মেঝে থেকে সামান্য অসমান, দোতলায় বেডরুমে যাবার পথে সিঁড়ির রেলিংয়ের পেছনে কোথায় একটা পেরেক দেওয়ালের ওপরে খানিকটা বেরিয়ে আছে, সব-ই জানা আছে তার।

মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্তও নিজের ভিন্ন একখানা থাকার জায়গা ছিল ধারার। ওই অ্যাপার্টমেন্টটা ছাড়ার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। ডেভিডের পীড়াপীড়িতেই মাস তিনেক আগে ওটা ছেড়ে দিয়েছে, যেটা সত্যি বলতে কী বেশিরভাগ সময়েই অব্যবহৃত থাকত। শুধু শুধু মাস শেষে এতগুলো খরচ — বাসাভাড়া, ইলেক্ট্রিক বিল, গ্যাস বিল, ইন্টারনেট-ক্যাবল-টেলিফোনের খরচ দেবার কোনো মানে হয় না, বুঝিয়েছিল ডেভিড। আর তাছাড়া, ডেভিড আভাস দিয়েছিল, কিছুদিনের ভেতর এমনিতেই তো তারা এক বাড়িতে একসঙ্গে বসবাস শুরু করবে দুই পরিবার আর সমাজের পূর্ণ স্বীকৃতি নিয়েই। তাহলে সামান্য সময়ের জন্যে এই দ্বিধার কোনো মানে হয়? কোনো কোনো দিন বেশ রাগ করেই ডেভিড অভিযোগ করত, এত তাড়াহুড়া করে ধারার পছন্দমতো এই বিশাল বাড়িটা এই মুহূর্তে ডেভিড কখনো কিনত না সে যদি বুঝতে পারত ধারা এখানে এসে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত ধারা রাজি হয়েছিল। কিন্তু আজ তার মনে হচ্ছে, নিজের বাসা ছেড়ে দেওয়াটা তার মস্তবড় একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। ওই অ্যাপার্টমেন্টটা থাকলে আজকে এভাবে রাত্রি শেষ হবার আগেই — অন্ধকারে — লিন্ডার গাড়িতে চড়ে পনেরশো মাইল দূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়ি দিতে হতো না তার।

আবছা অন্ধকারে বসার ঘরের সামনের জানালার পর্দা সামান্য ফাঁক করে ধারা দেখে, লিন্ডার সাদা টয়োটা কেম্রি ঠিকই পার্ক করা রয়েছে বাঁ পাশের বাড়ির সামনে, রাস্তার ঠিক ডান ধারে, একেবারে পাশ ঘেঁষে। ইচ্ছে করেই এ বাড়ির সামনে পার্ক করেনি সে। লিন্ডা জানে ডেভিড তার গাড়ি খুব ভালো করেই চেনে। যদি কোনো কারণে ঘুম ভেঙে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে ফেলে তাকে। লিন্ডাকে জিজ্ঞেস করলে কী বলবে সে? কেন এই ভোররাতে এসে বসেছিল তাদের বাসার সামনে গাড়ি পার্ক করে? হেডলাইটটাও তাই ইচ্ছে করেই নিবিয়ে রেখেছে সে। লিন্ডার নারীপ্রীতি আবার বন্ধু মহলে এতটাই প্রকাশিত ও প্রচারিত যে, কোনো কোনো পুরুষমানুষ, এমনকি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও কেউ কেউ, তাদের সঙ্গিনীদের সাধ্যমতো দূরে রাখার চেষ্টা করে লিন্ডার কাছ থেকে। তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে লিন্ডা হাসে। এমন শক্ত সমর্থ জোয়ান তরুণগুলো কি না পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, একশ বিশ পাউন্ডের লিকলিকে এই নারী দেহটাকে এত ভয় করে, প্রতিযোগী মনে করে! ডেভিড জেগে গিয়ে তাকে সত্যি সত্যি এখানে আবিষ্কার করলে, মহা মুশকিলে পড়া যাবে। লিন্ডার কোনোরকম ইচ্ছে নেই এই সাতসকালে এই বাড়িতে বিশাল এক হৈচৈ বাধিয়ে দেবার। ধারার তো আরো নেই। যত দ্রুত, যত নিঃশব্দে এই প্রস্থান সম্ভব, ততই তার জন্যে সেটা মঙ্গলকর ও সহনীয় হবে, সে নিশ্চিত। কাল রাতে সে-কথা বুঝিয়ে বলেছিল লিন্ডাকে।

ধারা হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে পাঁচটা বাজতে তখনো দশ মিনিট বাকি। বাইরে একটু একটু আলো ফুটতে শুরু করেছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। দু-একটা পাখির কিচিরমিচিরও শোনা যাচ্ছে এখন। রাস্তার ওপাশে লাইট পোস্টটার আলোটা আজ একটু বেশি তীব্র মনে হচ্ছে। ধারা ভাবে, আরো কতক্ষণ আগে থেকে এসে তার জন্যে বাইরে এভাবে অপেক্ষা করছে লিন্ডা, কে জানে? সব ব্যাপারেই লিন্ডা একটু বেশি সিরিয়াস, একটু বেশি আন্তরিক ও সাবধানী। ডেভিডের মতো নয়। ডেভিডের কাছে জগৎ ও জীবনের সবকিছুই কেমন যেন এক মজা, একটা দারুণ থ্রিল, একটা বিশেষ ধরনের খেলা। বিমানবন্দরে প্লেন ধরতে কখনো ডেভিড এক ঘণ্টা আগে গিয়ে অপেক্ষা করবে না সেখানে। সবসময় দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে প্লেনে উঠবে। কখনো কখনো মিস্‌ও করেছে প্লেন এভাবে। অতি অনায়াসে ডেভিড উত্তেজিত হতে পারে, পারে আবার অতি সহজেই সব ভুলে যেতে। জীবনের প্রতিটি ঘটনা এক একটা বিচ্ছিন্ন অধ্যায় তার কাছে। ধারাবাহিকতার ধার খুব একটা ধারে না সে। কিন্তু লিন্ডার কাছে, ধারার কাছেও বটে, জীবনটা হচ্ছে গিয়ে ছোটবড় সবকিছুই একত্রে গ্রন্থিত একটানা মূল্যবান একখানা মালা, যার একটি পাপড়ি খসে গেলে বাকি মালাটি সুতোর ভেতর কেমন আলগা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অবহেলা নয়, পরম যত্নে, নিঃশর্তভাবে সেগুলোর সবটাই পাহারা দিয়ে চলে তারা — যা বা যেটুকুই রয়েছে তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব সন্তর্পণে বাঁদিকের ক্লজেটটা (ডান দিকেরটা কেবল ডেভিডের কাপড়জামায় ঠাসা), খুলে সুতির সুতোয় বোনা পাতলা একখানা বাদামি রঙের সোয়েটার কাঁধে নিয়ে নিল ধারা। গাড়ির ভেতরে এয়ারকন্ডিশনার চললে মাঝে মাঝে গায়ে বাড়তি কিছু না থাকলে বড় ঠাণ্ডা লাগে তার। তা নইলে ক'দিন ধরে যে-পরিমাণ গরম পড়েছে এখানে। সোয়েটার পরার কথা ভাবাই যায় না। ধারা জানে, যেসব অঞ্চলের ওপর দিয়ে তারা আজ ড্রাইভ করে যাবে, সেসব জায়গায় এখানকার চাইতে আরো গরম, আরো আর্দ্রতা রয়েছে এখন। যদিও টেক্সাসের এই দিকটা, নিউ মেক্সিকোর যে কোনাটা ছুঁয়ে যেতে হবে তাদের, সেটুকু, আর এরিজোনার উষ্ণতাটা শুকনো ধরনের গরম বলেই পরিচিত, যা দরদর করে ঘামায় না লোকজনকে, যে রকমটি মায়ামি বা নিউ অরলিয়েন্সে দেখা যায়। কিন্তু এবারে ওদিকটার হিউমিডিটিও কেন জানি বিরক্তিকরভাবে বেশি, এই সম্পূর্ণ এলাকা জুড়েই। বছরের এই সময়টায় এদেশের মধ্য-দক্ষিণের আবহাওয়া, ধারার কাছে, তার মা-বাবার ফেলে আসা আদি বাড়ির চারপাশের প্রচণ্ড উষ্ণ আবহাওয়ার চাইতেও অস্বস্তিকর মনে হয়। মা-বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় মাত্র দু'বারই কেবল এই গরমের সময় তাদের দেশে গিয়েছিল ধারা। অসহ্য ভ্যাপসা গরম আর মশার কামড়ে ওই বেড়ানো দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল তার কাছে।

অতি নরম করে পা ফেলে ফেলে শোবার ঘরে ফিরে আসে ধারা। ব্যাগ খুলে চাবির রিংয়ে ভরা গুচ্ছখানিক চাবি থেকে এ-বাড়ির দুই দরজার দুটো চাবি আর ডেভিডের গাড়ির ডুপ্লিকেট চাবিখানা খুলে নাইট টেবিলের ওপর রাখে, আস্তে, কোনোরকম ধাতব শব্দ না করে। তারপরে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালায় আরেকবার। হাতব্যাগ খুলে ভেতর থেকে তার লম্বাটে লাল রঙের ওয়ালেটটা বের করে। ওয়ালেটের ভেতর রাখা ক্রেডিট কার্ড, নানান রকমের ইন্স্যুরেন্স কার্ড, আইডেন্টিটি কার্ড একটি একটি করে দেখে। ২৪ ঘণ্টা-খোলা-জিমের মেম্বারশিপ-কার্ডটির ঠিক পরেই চোখে পড়ে ডেভিডের পাবলিক লাইব্রেরির কার্ডখানা, যেটা অনেক দিন থেকেই ধারার কাছে রয়ে গেছে। ওয়ালেটের পেছন দিকটাতে যেখানে ভাঁজ না করে ডলারের নোটগুলো লম্বা করে শুইয়ে রাখা হয়, সেখানে কয়েকটা দশ বিশ এক ডলারের নোটের পেছনে দেখা গেল ডেভিডের অ্যালার্জির ওষুধের একটি প্রেসক্রিপশনও রয়ে গেছে, মাত্র এক মাস আগের লেখা, তার মানে এখনো ব্যবহারযোগ্য। আগের ওষুধ তখনো বেশ কিছু রয়ে গেছে বলে এটা সঙ্গে সঙ্গে আনা হয়নি। ডেভিড আবার সব সময়েই ওষুধটোষুধ ঠিক সময় কিনতে ভুলে যায়। ফলে ওটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল ধারা। এ-সপ্তাহেই ওটি ফার্মেসিতে নিয়ে যাবার কথা ছিল তার। আস্তে আস্তে আবার বেডরুমে ঢুকে লাইব্রেরির কার্ড ও প্রেসক্রিপশনটা চাবিগুলোর নিচে চাপা দিয়ে রাখে। তারপর বাঁ হাতের কব্জি থেকে তার বার্থস্টোন সেফ্যাইয়ার বসানো প্রশস্ত সোনার ব্রেসলেটটা খুলে রাখে একই জায়গায়, লাইব্রেরির কার্ডটার ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে। এটি ছিল গত বছরে ডেভিডের কাছ থেকে পাওয়া তার জন্মদিনের উপহার।

পরিত্যক্ত বিছানার দিকে তাকিয়ে ধারা দেখে, যেদিকটাতে সে শুয়েছিল, সেদিকটাতে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে গায়ে দেবার চাদরখানা। বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াহুড়োয় বাথরুমে চলে যাবার সময় ওটা ঠিক করে রাখার কথা মনে আসেনি তার। এখন আস্তে করে ওটা তুলে নিয়ে দ্রুত ভাঁজ করে রেখে দেয় বিছানার নিচের দিকটাতে — পায়ের কাছে, যেখানে সাধারণত থাকে অব্যবহৃত অবস্থায়। এই বিছানায়, এই দিকটায় এই বালিশের ঢাকনির ওপরেই শক্ত হয়ে গেঁথে ছিল ডায়মন্ড বসানো সেই কানের দুলটি। মিশেলের গ্র্যান্ডমার দেওয়া দুর্লভ ডিজাইনের সোনার ওপর হীরা আর রুবি বসানো অনন্য কানের দুলজোড়ার একটি। পরশু রাতে বেড-কভার সরিয়ে বিছানায় শুতে যাবার সময় ওটা চোখে পড়ে ধারার। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে ওটা চিনে ফেলে। কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে হয়নি তার। কেননা দুলটা হারিয়ে গেছে টের পাবার পর থেকে সেদিন সারা বিকেল-সন্ধ্যা-রাত একনাগাড়ে মিশেল তার ওই চরম খোয়া যাবার গল্পই অনর্গল বলে যাচ্ছিল একে একে সকল অতিথিকে। মিশেলের জন্মদিন উপলক্ষে সবাই এসেছিল। বিকেল থেকে শুরু করে সেই সন্ধ্যায়, মানে পরশু সন্ধ্যায়, তাদের প্রিয় রেস্টুরেন্ট 'অলিভ গার্ডেনে' তারা সকলে মিলিত হয়েছিল। আসেনি অথবা আসতে পারেনি কেবল ডেভিড। আগেই জানিয়েছিল অফিসের কাজে আটকা থাকবে সেই সন্ধ্যায়। উপস্থিত বন্ধুদের সকলেই লেগে গিয়েছিল দুল খুঁজতে। মিশেলের অন্য কানে লাগানো না-হারানো একমাত্র দুলটিকে প্রত্যেকেই একবার করে দেখে নিচ্ছিল, নমুনা হিসেবে, খুঁজতে শুরু করার আগে। দু'জন বন্ধু গিয়ে মিশেলের গাড়িটির ভেতর ও রেস্টুরেন্টে ঢোকার পথটিও ভালো করে খুঁজে এলো। রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ একাধিকবার এসে মিশেলকে তাদের আন্তরিক সমবেদনা জানায়। কথা দেয়, সবাই চলে গেলে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করার আগে পুরো দোকানটা যখন ঝাড় দেওয়া হবে, আজ ম্যানেজার নিজে সঙ্গে থাকবেন ময়লা বেছে ফেলার সময়টাতে। ঘণ্টাদুয়েক খোঁজাখুঁজির পরেও কেউ যখন ওটার সন্ধান পেল না, তখন মিশেলের বন্ধুরা তাকে বোঝালো, হয়তো ঘরেই রয়ে গেছে, হয়তো বেরোবার সময় অন্যটি পরতে ভুলে গিয়েছিল। শুকনো হাসি ঠোঁটে ধরে রেখে মিশেল জানিয়েছিল, সেটার সম্ভাবনা খুবই কম, কেননা আজ দুপুরের আগেই এগুলো পরেছে সে, বিকেলে রেস্টুরেন্টে আসার সময় নয়। আর পরবার পর, বেরোবার আগে আয়নায় নিজেকে দেখার সময়, যতদূর মনে পড়ে, দুটো দুলই ছিল কানে। কেননা এই দুলজোড়া তাকে কেমন মানায় সেটা দেখার জন্যেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল মিশেল। তবু সে কথা দেয়, ঘরে ফিরে অবশ্যই একবার ভালো করে খোঁজ করে দেখবে।

প্রশস্ত বিছানার অন্য পাশে এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে ডেভিড। ধারা জানে, বিশেষ অঘটন না ঘটলে সকাল আটটায় অ্যালার্ম বাজার আগে এ ঘুম ভাঙবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। বালিশের ওপর থেকে ডেভিডের মাথাটা খানিকটা নেমে এসেছে বিছানার ওপর। ডানদিকে কাত হয়ে শুয়ে পা দুটো ভেঙে যথেষ্ট সংকুচিত করে প্রায় বুকের কাছে টেনে এনে 'ফিটাল পজিশন'-এ আরাম করে ঘুমুচ্ছে ডেভিড। এভাবেই সে ঘুমোয়। তা ঘুমোক। যাবার আগে ওকে কোনো কিছু বলে, লিখে বা আভাস দিয়ে যাচ্ছে না ধারা। নাটক করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই তার। আর সে জন্যেই, এত সব কিছুর পরেও, পরপর দু'রাত এই বাড়িতে থেকে গেছে, এই বিছানাতেই ঘুমিয়েছে সে। চলে যাবার আগে ডেভিডকে ধারণা দিতে চেয়েছে ধারা, সবকিছু স্বাভাবিক আছে।

ঘটনাটি কী, প্রথমে ঠিক বুঝতে না পারলেও, পরে ধীরে ধীরে দুয়ে দুয়ে চার করে ডেভিড ঠিকই ধরতে পারবে। বুঝতে পারবে, ধারা চলে গেছে — আর কখনো ফিরে আসবে না, যদিও ধারার জামাকাপড়, জুতো, প্রসাধনসামগ্রী থেকে শুরু করে তার যাবতীয় বই, ছবির অ্যালবাম, গানের সরঞ্জাম, রান্নাঘরের সামগ্রী, এমনকি তার অতিপ্রিয় কাঠের ডেস্ক আর তার সঙ্গে ম্যাচ করা কাঠের চেয়ারখানা, সবই পড়ে থাকছে এই বাড়িতেই। এসব কোনো কিছুই এখান থেকে নিয়ে যাবার কোনো আগ্রহ বা পরিকল্পনা নেই ধারার। ডেভিডের কাছে এগুলো বোঝা মনে হলে একদিন, যে-কোনো মঙ্গলবারে, ইচ্ছে করলে সব ধরে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে পারে। কোনো অসুবিধে নেই। শুধু ধারার ২০০৪ সালের হোন্ডা একর্ড গাড়িখানা, যা ব্রেকের অসুবিধার জন্যে বর্তমানে গ্যারেজে রয়েছে, তার একটি চাবি সে লিন্ডার কাছে রেখে যাচ্ছে। যেহেতু প্রতিমাসেই একবার করে লিন্ডা ফিনিক্স যায়, যেখানে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যারলের বাস, কোনো একসময় সে ধারার গাড়িটি ড্রাইভ করে সেখানে নিয়ে যাবে। ফেরার সময় ওকে প্লেনের একটি ওয়ানওয়ে টিকিট কেটে দেবে ধারা। এরকমই কথা হয়ে আছে।

'তোর দুলটি কেউ খুঁজে পেলে তাকে কী দিবি, তার জন্যে কী করবি মিশেল?' গতকাল বিকেলেই মিশেলকে জিজ্ঞেস করেছিল ধারা। মিশেল ভেবেছিল এমনি কথার কথা বলছে ধারা। ঠাট্টা করছে হয়তো একটা দুলের জন্যে মিশেল এতটা শোকাতুর হয়ে পড়েছে বলে। তবু দুলটির কথা মনে পড়ায় মনটা আবার নতুন করে খারাপ হয়ে যায় তার।

'ওই দুলজোড়া আমার ভারি পছন্দের। অনেক ইমোশন জড়ানো রয়েছে। জানিস্ তো, মাকে না দিয়ে গ্র্যান্ডমা, মানে আমার বাবার মা, ওই দুটো আমাকে দিয়েছিল। যদি সত্যি সত্যি কেউ ওটা খুঁজে পেয়ে আমাকে দেয়, সে হবে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আর তাকে কিছু দেবার কথা বলছিস্? সে যা চায়, তাই-ই দেব, যদি সাধ্যে কুলোয়...।'

'না, এত কিছু করার কোনো দরকার নেই। শুধু একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোকে।'

বলতে বলতে কাগজে মোড়া ওর প্রিয় কানের দুলটি বাঁ হাতের মুঠি থেকে বের করে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে তুলে ধরে ওর চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে নাচাতে থাকে ধারা। মুহূর্তের জন্যে মিশেলের চোখের তারা দুটো চকচক করে জ্বলে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে যায়। ধারার হাতে দুলটি দেখে বিস্মিত, হতবাক মিশেল প্রথমে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও পরে কী ভেবে তার অতি কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি ছোঁবার জন্যে হাতটা পর্যন্ত বাড়ায় না আর।

'একটা প্রতিজ্ঞার কথা বলছিলাম তোকে। সেটা হলো, কোথায় এটা পাওয়া গেল, সে কথা কক্ষনো, কোনোদিন আমায় জিজ্ঞেস করতে পারবি না। আর তুই নিজে জানলে বা বুঝলেও সেটা আর কাউকে কখনো বলিস না। ব্যস। এটুকুই। এটাই আমার ইচ্ছা। নির্দেশ। মিনতি। এটুকুই আমার জন্যে করতে পারিস তুই।'

প্রায় অলৌকিকভাবে ধারার হাতে তার হারিয়ে যাওয়া গয়নাটি দেখে খুশিতে লাফিয়ে ওঠার পরিবর্তে কেমন যেন স্তব্ধ, নির্জীব, মনমরা হয়ে পড়ে মিশেল। কোনো কথা না বলে মাটির দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে সে। ডান পায়ের স্যান্ডেলের মাথাটা দিয়ে ঘষে ঘষে মাটিতে ক্রমাগত আঁকিবুঁকি করে। ধারার দিকে চোখ তুলে কিছুতেই চাইতে পারছে না সে। আর ধারা? কিছুই যেন হয়নি তেমনি ভঙ্গিতে মিশেলের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, 'কী! খুশি তো?'

ফ্যাকাসে সাদা ঠোঁটে হাসতে চেষ্টা করে মিশেল। তারপর খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট স্বরে, জিজ্ঞেস করে, 'ও জানে? দেখেছে ওটা?'

'কে? ডেভিড? নাঃ! ও কিচ্ছু জানে না। দেখেওনি। আমি ওকে কিছু বলিনি। এবার শান্তি তো?'

দুলটি মিশেলের হাতে তুলে দিয়ে ধারা আর দেরি করে না। সে বোঝে, তার আর করার কিছু নেই। প্রাকৃতিক নিয়মে, স্বাভাবিকভাবেই চলবে বাকি সবকিছু। ধারার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। এবার শুধু তার নিজের ফেরার পালা।

খাটের ওপাশে প্রায় পাঁচ ফুট দূরে দরজার পাশে মেঝেতে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত ডেভিডকে একবার ভালো করে দেখে ধারা। চুলগুলো অবিন্যস্তভাবে কপালের ওপর এসে পড়েছে। মুখটা সামান্য ফাঁক করা। ওর ধবধবে ফর্সা ডান বাহুখানার ওপরের দিকটাতে টকটকে লাল রঙের আঁচড়ের মতো, সামান্য উঁচুনিচু, কয়েকটি লম্বা দাগ। বোঝা যায়, এগুলো সদ্য বা সামান্য কিছু আগেই হয়েছে। ঘুমের মধ্যে একসময় চাদরের ভাঁজের সঙ্গে ঘষা খাওয়ার জন্যেই হয়তো। নিজের বাদামি বাহুর দিকে তাকিয়ে ধারা ভাবে, সাদা চামড়াতেই কেবল এমন ঘটে। কই, তার নিজের শরীরে কখনো এমনটি দেখেনি তো। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে ডেভিড। ইদানীং, প্রায় মাসখানেক ধরে, তার অফিসের কাজের চাপ হঠাৎ করে এত বেড়ে যাওয়ায়, প্রায় রাতেই ঘরে ফিরতে দেরি হয় ডেভিডের। তাকে ভালো করে দেখার — তার পাশে বসে দুটো কথা বলারও সুযোগ হয় না ধারার। আজ যাবার আগে তাই বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে ভালোভাবে দেখে নিচ্ছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেডরুম থেকে বেরোবার মুখে পা থেকে স্যান্ডেল জোড়া খুলে হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বেইজমেন্টের সিঁড়ির দিকে এগোয় ধারা। নিচে যাবার এই সিঁড়িটাতে কার্পেট নেই। কাঠের সিঁড়ি। সাবধানে না নামলে প্রতিটি পদক্ষেপে খট খট আওয়াজ ওঠে, যা স্পষ্ট শোনা যায় ওপরের তলায়। মাঝারি আকারের গোছানো স্যুটকেসটা বেইজমেন্টের দরজার পাশে ক্লজেটের ভেতরে আগে থেকেই রাখা ছিল। ভেতর থেকে পেছনের দরজার ল্যাচটা লক করে স্যুটকেস আর পার্সটা হাতে নিয়ে ধারা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। বাড়ির পেছনে তিন দিকে কাঠের বেড়া দেওয়া বিশাল ব্যাক-ইয়ার্ড। ইয়ার্ডের শেষ মাথায় এক ধারে ধারার নিজের হাতে লাগানো সবজি বাগান। আরেক ধারে বিভিন্ন রঙের গোলাপের সমাহার। এই গোলাপগাছগুলো ওরা দুজনে মিলেই লাগিয়েছে। নানান সময়ে, বিশেষ বিশেষ দিনে, অথবা কোনো বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে একেকটি গাছ লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে কিছু গোলাপ হলুদ, লাল, আর সাদা রঙের হলেও বেশির ভাগই বিভিন্ন শেডের গোলাপি রঙের — খুব হালকা, যেটাকে প্রায় অফ হোয়াইট বলা চলে সেখান থেকে শুরু করে অত্যন্ত গাঢ় গোলাপি, প্রায় বেগুনির কাছাকাছি পর্যন্ত। ধারা ভাবে, এই গোলাপি রং থেকেই ফুলটির নামকরণ 'গোলাপ' হয়েছে কি না। অথবা ঠিক উল্টোটি? মানে, গোলাপ ফুলের সবচাইতে বেশি কমন যে রংটি সেটি থেকেই সম্ভবত গোলাপি রঙের সূচনা। কিন্তু গোলাপি রঙের সঙ্গে নারী কবে থেকে যুক্ত হলো? কেমন করেই-বা হলো? ধারা জানে না, যেমন জানে না নীল কী করে ছেলেদের রং হয়ে গেল। বাগান থেকে চোখ ফিরিয়ে ডানদিকে পা বাড়ায় ধারা। বাড়ির সামনে বাঁ ধারের লম্বা ড্রাইভওয়ে ধরে সামনের রাস্তার দিকে যেতে শুরু করে সে। তাকে বেরোতে দেখে লিন্ডা গাড়িটা আরেকটু সামনে এগিয়ে এনে ড্রাইভওয়ের ঠিক সামনে পার্ক করে গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। সাদা টি-শার্ট আর খাকি শর্টসের সঙ্গে কেড্‌স্ জুতো পরিহিত ছোট ছোট চুলের, পেটানো শরীরের লিন্ডাকে দেখে কেমন ছেলে-ছেলে মনে হয়। ধারার হাত থেকে প্রায় জোর করে স্যুটকেসটা নিয়ে গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে ভেতরে রেখে দেয় লিন্ডা। তারপর প্যাসেঞ্জার সাইডের দরোজাটা খুলে ধরে দাঁড়ায় ধারার অপেক্ষায়। কোনো কথা না বলে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে ধারা। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় লিন্ডা। ধারা একবারের জন্যেও পেছনে বা পাশ ফিরে পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে তাকায় না আর। গাড়ি চলতে শুরু করে। এক হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে অন্য হাতে দুই সিটের মাঝখানের গর্ত করা ট্রে থেকে স্টারবাক কফির মাঝারি সাইজের একটা উষ্ণ কাপ ধারার হাতে তুলে দেয় লিন্ডা। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল এত ভোরে ডেভিডকে না জাগিয়ে কফি তৈরি করে তা খেয়ে আসার সুযোগ হবে না ধারার। যেতে যেতে মাঝে মাঝে ড্রাইভার সিটের বাঁ দিকে কাপ হোল্ডারে রাখা অন্য কাপটি থেকে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে নিজেও কফি পান করে লিন্ডা। তবে গরম কফি নয়। এই সাতসকালেও আইস-কফিই খাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে। যেমন বরাবর খায়। ধারা কফি খেতে খেতে টের পায়, তার একেবারে ঠিক পছন্দমতো এবং পরিমাণমতো মিষ্টি আর দুধ মেশানো হয়েছে কফিতে। সে মনে করতে পারে না, তার পছন্দ বা পরিমাণের কথা লিন্ডাকে কখনো সরাসরি বলেছে সে, অথবা এর আগে কফি শপে গিয়ে তারা কখনো একত্রে বসে কফি খেয়েছে। হয়তো অন্যকে বা অন্যের কাছে বলা তার পছন্দের কথা কোনোদিন কোনোভাবে শুনে থাকবে সে, অথবা কাউকে জিজ্ঞেস করেই হয়তো জেনে নিয়েছে। তার প্রতি লিন্ডার এই বিশেষ খেয়াল বা মনোযোগের কথা ভেবে মনটা হঠাৎ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে ধারার। সত্যি বলতে কী, লিন্ডা কিন্তু ধারার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন নয়। মাত্র মাস ছয়েক আগে তার সঙ্গে ধারার পরিচয় হয়েছে, এক কমন বন্ধুর মারফত। ওর সঙ্গ, রাজনৈতিক বিশ্বাস, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অবস্থান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা, নিরাভরণ জীবনযাত্রা ভালোই লাগে ধারার। গত ক'দিনে আরো বেশি কাছাকাছি চলে এসেছে তারা।

লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে নিউ অরলিয়েন্স শহর থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সেতু লেক পণ্ঠাট্রেন পার হয়ে তাদের গন্তব্য এরিজোনার ফিনিক্স শহরে যেতে পনেরশো মাইল ড্রাইভ করতে হবে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই যেতে হবে ইন্টারস্টেট-১০ দিয়ে। এই ইন্টারস্টেট-১০ হাইওয়েটি দেশের দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে সোজা পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে, একেবারে ফ্লোরিডা থেকে সোজা ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত। মাঝখানে অ্যালাবামা, মিসিসিপি, লুইজিয়ানা, নিউ মেক্সিকো, এরিজোনা। ফিনিক্স শহরটা এখান থেকে ঠিক পশ্চিমে, তবে খানিকটা উত্তরেও বটে। ওখানে যাবার পথে লুইজিয়ানা আর এরিজোনা অঙ্গরাজ্যের মাঝখানে পড়ে রয়েছে বিশাল টেক্সাস, দেখতে অনেকটা ভারতের মতো, জায়গার পরিমাপে এদেশের সবচেয়ে বড় স্টেট। তাড়া না করে আস্তে ধীরে স্বাভাবিকভাবে গেলে পনেরশো মাইল ড্রাইভ করে যেতে লাগতো তাদের পুরো তিনদিন। কিন্তু ওরা ঠিক করেছে দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে ড্রাইভ করবে যেহেতু, তিনদিনের জায়গায় দু'দিনেই পৌঁছে যেতে পারবে। এক রাত কেবল হোটেলে বা মোটেলে কোথাও থেকে যাবে খানিকটা বিশ্রামের জন্যে। টেক্সাসের এরিজোনা যাবার আগে সামান্য একটুর জন্যে নিউ মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলেও ঢুকতে হবে তাদের। ফেরার পথে লিন্ডা পুরো পথটা একাই ড্রাইভ করে আসবে স্থির করেছিল। কিন্তু তার বন্ধু ও জীবনসঙ্গী ক্যারল এতটা পথ লিন্ডাকে একা আসতে দিতে চায় না। ফলে সে উইকএন্ডের সঙ্গে আরো দুদিন ছুটি নিয়ে নিজেই চলে আসবে লিন্ডার সঙ্গে। ওরা দুজনেই আবার বিচে যেতে খুব পছন্দ করে। নিউ অরলিয়েন্সের আশেপাশে অনেক বিচ। গ্রীষ্ম শেষ হবার আগে কিছু সময় বিচে কাটাবার ইচ্ছা তাদের। তারপর ক্যারল ফিনিক্স ফিরে যাবে প্লেনে। একা। এরকমই পরিকল্পনা।

ইন্টারস্টেট ধরে গাড়ি চালিয়ে গেলে দু'দিকে দেখার মতো কিছুই থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। মাইলের পর মাইল ধু-ধু পড়ে থাকে একঘেয়ে অসীম ভূমিখণ্ড, যাকে তৃণভূমিই বলা চলে। তাই লিন্ডা ইন্টারস্টেট ছেড়ে মাঝে মাঝেই স্থানীয় ছোট ছোট হাইওয়ে ধরে চলতে শুরু করে। রাস্তাঘাট ফাঁকা বলে ছোট হাইওয়ে হলেও যথেষ্ট দ্রুত অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম স্পিড লিমিটের থেকেও পাঁচ মাইল বেশি বেগে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়, অতি সহজেই। আর স্পিড লিমিটের পাঁচ মাইলের মধ্যে থাকলে সাধারণত পুলিশ ধরে না। ফলে ইন্টারস্টেট হাইওয়ের চাইতে খানিকটা ধীরে গেলেও যেহেতু কাউন্টি বা স্টেট হাইওয়ে ধরে গেলে রাস্তার পরিমাণ কিছু কম হয়, শেষমেশ দুটো পথের মধ্যে সময়ের তারতম্য খুব একটা ঘটে না।

দক্ষিণের এসব অঞ্চল এত সবুজ, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এত মনোরম যে, ইচ্ছা করলে লিন্ডা দিনের পর দিন এসব জলজ অঞ্চলে বিভিন্ন রকম রংবেরঙের পশুপাখির সঙ্গে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। আর সেটা করতে পারলে শহর বা মানুষ, কিছুই মিস করবে না সে। ক্যারল পাশে থাকলে ভালো হয়। না হলেও ফোনে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেই কয়েকদিন এই নির্জনে একাই কাটিয়ে দিতে পারে লিন্ডা। হাইওয়ের দুই ধারে মাইলের পর মাইল ঘন বন। প্রায় প্রতিটি বনের ভেতর কয়েক ফুট জলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বিশাল গাছগুলোর মাথার ওপর ছাতার মতো ছড়ানো রাশি রাশি পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে ছিটকানো লম্বা লম্বা সূর্যের রশ্মি। নিচের টলটলে জলের ভেতর গাছের প্রতিবিম্ব পড়ে কিছুটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জলার ধারে হাইওয়ের পাশে লম্বা লম্বা আখপাতার মতো ঘাস আর তাদের মাথার ওপরে ঘাসফুলের মতো, বৃদ্ধ নারীর নরম কেশরাশির মতো, রাজসিংহাসনের পাশে মানুষে-টানা ঝালরের মতো সাদা সাদা ফুলের অজস্র সম্ভার। গাছপালা ও ডোবানালাসহ দক্ষিণাঞ্চলের এই জলজ অঞ্চল এখানে মার্সিল্যান্ড বলে পরিচিত। এইসব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ, কুমির, মাছ, গিরগিটি, কচ্ছপসহ বহু প্রাণীর প্রাকৃতিক বসবাস। এখান থেকেই ধরা হয় চিংড়ি মাছের মতো স্থানীয় এক ধরনের জনপ্রিয় মাছ, যাকে এরা ক্রে ফিশ বলে জানে। গাড়ি চালাতে চালাতেই দুদিকের এই অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে লিন্ডা। কিন্তু ধারা কিছুই দেখে না। কোনোদিকে তাকায় না সে। সিটের পেছনে মাথা আর পিঠ এলিয়ে দিয়ে সোজা সামনের দিকে মুখ করে এমনভাবে বসে আছে সে, যেন এক প্রস্তরমূর্তি। একটুও নড়ছে না। কিছু বলছেও না লিন্ডাকে। একবার তার দিকে ঝুঁকে লিন্ডা বোঝার চেষ্টা করে ও ঘুমুচ্ছে না এভাবেই ঠায় বসে আছে। ভালো করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে লিন্ডা নিশ্চিত হয়, না, ওর ডাগর চোখ দুটো পরিপূর্ণ খোলা। ধারা জেগেই আছে।

'কিছু বলবে লিন্ডা?' লিন্ডার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করে ধারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, বলছিলাম — কাল রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুমোওনি। পারলে একটু ঘুমিয়ে নাও এখন। পরে আবার ড্রাইভ করতে হতে পারে।'

'ও নিয়ে ভেবো না। আমি ঠিক আছি। তুমি ক্লান্ত হলে বলো আমায়। ড্রাইভ করব।'

যেটুকু পথ তারা যাবে, এক রাত ঘুমিয়ে নেবার পর, সেই সম্পূর্ণ পথটা একাই অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারে লিন্ডা।

আর ওটাই করবে সে। ও নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। লিন্ডা ভাবছে কেবল ধারার কথাই। ধারার এই সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বড় বেশি তীব্র হয়ে বিঁধেছে ওর মনে। ওকে একটু সুস্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে হতো। কিন্তু কীভাবে, ঠিক বুঝতে পারছে না লিন্ডা।

ধারার মতো সহজ সরল আদুরে মেয়ের পক্ষে এত বড় প্রতারণা মেনে নেওয়া, ধারণ করা, কঠিন। তাও আবার একেবারে নীরবে, নিঃশব্দে। লিন্ডার খুব অস্বস্তি লাগে। সারাক্ষণ এত হাসিখুশি স্বভাবের মেয়েটা এমন চুপ করে পাশে বসে থাকলে ভালো লাগে কারো? ওকে একটু চাঙ্গা করার লক্ষ্যে লিন্ডা গান চালিয়ে দেয় সিডিতে। সে শুনেছে, কোনো অজানা কারণে, ছাব্বিশ বছর বয়সের ধারা, তার জন্মের আগের কিছু কিছু গান, অর্থাৎ ষাট আর সত্তরের দশকের পপ-মিউজিক বড় পছন্দ করে। তাই তো লিন্ডা গতকাল জন ডেনভারের একটা সিডি কিনে এনেছে ধারাকে ওটা গাড়িতে শোনাবে বলে। চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসেছিল ধারা। হঠাৎ করে জন ডেনভারের ভরাট গলায় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই বিখ্যাত গান 'Annie's Song' বেজে ওঠে লিন্ডার গাড়ির চারপাশ থেকে চারটি দারুণ শব্দের স্পিকারে, যে গানের শুরুটা এরকম : 'You fill up my senses/like a night in the forest/like the mountains in springtime/like a walk in the rain/like a storm in the desert/like a sleepy blue ocean.'

'তুমি কী করে জানলে এ গান আমার পছন্দ?' অভিভূত ধারার ব্যাকুল প্রশ্ন।

'আচ্ছা ধারা, তুমি কি আমার বন্ধু নও? তাহলে বন্ধু কী চায়, কী পছন্দ করে, এ সামান্য তথ্যটুকু জানতে হবে না আমাকে?'

জন ডেনভার তখনো গেয়ে চলেছেন, 'কাম, লেট মি লাভ ইউ, লেট মি গিভ মাই লাইফ টু ইউ।'

ধারার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। নস্টালজিয়ায়। সে জানায়, ছোটবেলায় এসব গান শুনে শুনে বড় হয়েছে সে। আর সে জন্যেই এগুলো ভালোবাসতে শিখেছে ধারা। জন ডেনভার নাকি ধারার মায়ের খুব প্রিয় শিল্পী ছিলেন। প্লেন ক্র্যাশে যখন জন ডেনভার অসময়ে মারা যান, ধারার মা নাকি অনবরত কেঁদেছে দু'দিন ধরে।

আমার মায়ের মতে, গানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর মেলোডি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাট-সত্তরের দশকের বাংলা গানেও নাকি এরকমই মেলোডি ছিল, যা এখন হারিয়ে গেছে।

আমার মা এখনো ইংরেজি-বাংলা দুটোতেই ঐ সময়কার গানই কেবল শোনে। ছোটবেলা থেকে এসব গান অনবরত শুনতে শুনতে এগুলো এত পরিচিত হয়ে গেছে যে, ধারার কানে বেশ লাগে শুনতে। 'বুঝেছ তো লিন্ডা! ভালোমন্দের বিচার এটা নয়। এসব ব্যাপারে জাজমেন্টাল হওয়া যায় না। I simply grew up with these songs, that's all' — হাসে ধারা।

'আচ্ছা, তোমার গাড়িতে এই সিডি এলো কেমন করে? তুমি তো জন ডেনভারের ভক্ত নও!' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে ধারা। সত্যি কথা বলাটা সহজ হলেও তা বলতে কেমন সংকোচ হয় লিন্ডার। সরাসরি মিথ্যা বলা এড়াতে লিন্ডা বলে, 'জন ডেনভার পছন্দ করে এমন একজন আমার এ গাড়িতে উঠেছিল। তারই জন্যে রাখা এটা।'

এরপর অনেকক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে কোনো কথা না বলে গান শুনতে শুনতে চুপচাপ চলতে থাকে তারা। একে একে 'Sunshine on my shoulder makes me happy', 'Country road, take me home'ও শোনা হয়ে যায়। হঠাৎ একসময় ব্যাগের ভেতরে ধারার সেলুলার ফোন বেজে ওঠে। যেন শুনতে পায়নি এমনি ভঙ্গিতে ডাইনে-বাঁয়ে মৃদু মাথা দুলিয়ে একমনে গান শুনতে থাকে ধারা। ফোন ধরে না।

'তোমার টেলিফোন।' বলে লিন্ডা।

'শুনেছি' বলে এতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ব্যাগ খুলতে শুরু করে ধারা। ততক্ষণে টেলিফোনের রিং বন্ধ হয়ে গেছে। মিসড্ কলে নম্বরটা দেখে একবার। সে ঠিকই জানত, ডেভিডই ফোন করেছিল। না পেয়ে মেসেজ রেখেছে, কিন্তু তা শোনার আগ্রহ বোধ করছে না ধারা।

ফোনটা ব্যাগের পাশের পকেটটিতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে টুং করে একটা শব্দ হলো। তার মানে একটা টেক্সট মেসেজও এসেছে। ভিউ বাটন টিপে ধারা দেখে ডেভিড তাকে করজোড়ে ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ করছে। ডেভিড লিখেছে, সে সমস্ত কিছুই তাকে অকপটে খুলে বলবে, তার জীবনের বৃহত্তম ভুল বা বোকামির কথাটিও। শুনে ধারা নিশ্চয় ক্ষমা করবে তাকে। ধারা ছাড়া সে জীবন ধারণের কথা ভাবতে পারে না। ইত্যাদি।

এতক্ষণে ধারার ঠোঁটে অদ্ভুত এক মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, যেন এই মুহূর্তে হাসির বদলে বিদ্রূপের মতোই মনে হয় লিন্ডার কাছে। এর পর থেকে একটু পরপরই ধারার টেলিফোন বাজতে থাকে। সে ধরে না। একসময় এই একটানা ক্রিং ক্রিং শব্দ আর ধারার এই টেলিফোন না ধরার খেলা অসহ্য লাগে লিন্ডার। গলা উঁচু না করে দৃঢ়কণ্ঠে লিন্ডা বলে, 'যদি ঠিক করেই থাকো ফোন ধরবে না, তাহলে ওটা আপাতত বন্ধ করে রাখো। এই একটানা ক্রিং ক্রিং শব্দে আমার কিন্তু মাথা ধরে যাচ্ছে। তাছাড়া তোমার টেলিফোনের চার্জেরও বারোটা বাজছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বন্ধ করে দেয় ধারা।

আরো খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাবার পর ধারা বলে, 'জানো, একদিন আমার বাবা আমায় বলেছিল, আমার মায়ের গায়ের রং ফর্সা ছিল না বলে বাবাকে তার নিজের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মাকে বিয়ে করতে হয়েছিল। বিয়ের আগে তাদের প্রেম ছিল পাক্কা চার বছর। এই দীর্ঘ সময় তারা অপেক্ষা করেছিল শুধু এই আশায় যে দুপক্ষের মা-বাবাই তাদের মেনে নেবে। কিন্তু আমার বাবার মা-বাবার বেলায় সেটা ঘটেনি। যাই হোক, যেটা বলার জন্যে এত কথার অবতারণা, সেটা হলো, আমার বাবা নিজের মুখে আমায় বলেছে, বিয়ের আগে আমার মাকে একটিবার চুমো পর্যন্ত খায়নি বাবা। অথচ কত জায়গায় একত্রে বেড়াতে গেছে তারা, কত শত ঘণ্টা একত্রে নিরালায় বসে গল্প করেছে, বই পড়েছে। কতরকম সুযোগ ছিল তাদের। তুমি ভাবতে পারো লিন্ডা সেই মা-বাবার সন্তান আমি পুরো দুটি বছর বিয়ে না করে এক পুরুষের সঙ্গে একত্রে বাস করে এলাম, তার ঘরে? তার বিছানায়? অথচ...।' কথা শেষ না করে ধারা তার টেলিফোনটা আবার অন্ করে।

পাঁচটা মিস্ড্ কল। চারটা টেক্সট মেসেজ। একটি বাদে বাকি সবই ডেভিডের কাছ থেকে। মোবাইলটা আবার বন্ধ করে দেয় ধারা কোনো মেসেজ না দেখে বা না শুনেই।

ধারা কয়েকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও লিন্ডা তাকে ড্রাইভ করতে দেয় না। বলে, 'তুমি একটু চোখ বোজ। ঘুমুতে চেষ্টা করো। অনেক ধকল গেছে গত দুদিন। দরকার হলে আমি বলব তোমায়।'

পরিকল্পনামতো ডালাস-ফোর্টওয়ার্থের কাছাকাছি কোথাও রাত্তিরটা কাটাবার কথা ছিল তাদের। কিন্তু গ্রীষ্মের এই সময় দিন এত বড় হয়ে যাওয়ায় আর আজ লাঞ্চ এত দেরি করে খাওয়ায় ডালাস ছাড়িয়েও বেশ কিছুক্ষণ ড্রাইভ করে লিন্ডা। ধারার তো মনে হয় খিদের বোধই আর নেই। দুপুরের পরে অবশেষে যখন লিন্ডার সত্যি সত্যিই যথেষ্ট খিদে লেগেছিল, এই কান্ট্রি রোডে কোনো ফাস্ট ফুড বা রেস্টুরেন্ট, কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না আর। যা দু-একটা চোখে পড়ছিল সেগুলোও লাঞ্চের স্বাভাবিক সময়ের পরে বন্ধ হয়ে গেছে। কাছাকাছি ডেইলিসহ কোনো গ্যাসস্টেশনও চোখে পড়ে না। ফলে একসময় বাধ্য হয়ে তারা একটি বারে এসে গাড়ি থামায়। বারটির নাম 'থার্স্টি'। এখানে থামার আরেক কারণ, ধারার জলত্যাগের ভীষণ তাড়া ছিল সে সময়। সেটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা বহুক্ষণ কোথাও না থেমে গাড়ি চালাচ্ছিল তারা। বাইরে লাল আর নীল লাইটের আলোয় 'OPEN' শব্দটা লেখা রয়েছে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে একটু থমকে যায় ওরা। জানালাবিহীন ঘরটির ভেতরে স্বল্প অন্ধকারে অল্প পাওয়ারের দুটি ঝুলন্ত বাল্বের আলোর নিচে বসে বিয়ার, জিন-টনিক বা হুইস্কি জাতীয় কিছু খাচ্ছিল কাউবয়বেশী বেশ কয়েকজন লোক। বলা বাহুল্য, সকলেই পুরুষ। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে অল্পবয়সী রোগাপাতলা একটি ছেলে। বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হবে না। দরজার কাছ থেকে ভেতরের দিকে উঁকি দিয়ে এ দৃশ্য দেখার পর একবার ওরা ভাবে বেরিয়ে আসে। পরে কী মনে করে লিন্ডা অভয় দেয় ধারাকে। ধারার ডান হাতের কব্জিটা নিজের বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে একত্রে ভেতরে ঢোকে তারা। ধারাকে বাথরুমের দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে লিন্ডা পেটানো কাঠের গোলাকার টেবিলটিতে গিয়ে বসে। বসেই বুঝতে পারে অর্ডার করতে হবে কাউন্টারে গিয়ে, কেননা এখানে টেবিলে সার্ভ করার জন্যে কোনো ওয়েটার নেই এই সময়ে। লিন্ডা তার বুক পর্যন্ত উঁচু কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনের জন্যে দুটো টুনা-মেল্ট স্যান্ডউইচ ও দুই বোতল লেমোনেড অর্ডার করে দাম দিয়ে ফিরে আসে। ততক্ষণে ধারা বাথরুম থেকে বেরোলে লিন্ডা ঢোকে সেখানে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে লিন্ডা দেখে, বিশাল লম্বাচওড়া এক লোক, এক হাতে একটি বিয়ারের বোতল, অন্য হাতে তার বাদামি হ্যাটটি নিয়ে ধারার টেবিলের ওপরে বাঁ কনুইয়ে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। আর বেচারা ধারা ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। বারবার করে কেবল লিন্ডার আশায় বাথরুমের দরোজার দিকে তাকাচ্ছে সে। লিন্ডা দ্রুত তাদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। কোনো কথা না বলে উপবিষ্ট ধারার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে সে তার দুই কাঁধের ওপর তার নিজের দুই হাত রেখে ধারার মাথার ওপর একটা আলতো চুমো খায়।

তারপর গোঁফওয়ালা হৃষ্টপুষ্ট সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মে আই হেল্প ইউ?'

লোকটি একটু অস্বস্তিতে পড়ে।

'না, মানে —। মনে হলো, বাইরে থেকে আসা মানুষ।'

চেয়ারে বসে পড়ে লিন্ডা হাসে, 'হ্যাঁ, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। খুব খিদে লেগেছে। যদি কিছু মনে না করেন আমরা এখন একটু খাব।'

নিয়মিত জিমে শরীরচর্চা করা, বিশেষ করে ওয়েট লিফট করা, পেটানো দেহ লিন্ডার। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, নারী নয়, মেদহীন সুস্থ-সক্রিয় পেশির এক তরুণ। টেবিলের ওপর রাখা পটেটো চিপস আর লম্বা দুই টুকরো শসার পিকল্সহ স্যান্ডউইচের একখানা প্লেট ও একটি লেমোনেড ধারার দিকে এগিয়ে দিয়ে বাকিটা নিজের জন্যে কাছে টেনে নেয় লিন্ডা।

লোকটি তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে।

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও Honey. আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে এখনো।' লোকটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ধারাকে উদ্দেশ করে লিন্ডা বলে।

খুব মনোযোগ দিয়ে লিন্ডার কথা শোনে সেই লম্বা লোকটি। তারপর একবার লিন্ডার পোশাক-আশাক, চেহারা, আরেকবার ধারার সামান্য অবনত দৃষ্টি আর শান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে টেবিল ছেড়ে ফিরে যায় তার কাউন্টারের পরিত্যক্ত উঁচু টুলটির দিকে। সেখানে বসে থাকা তার দোস্তদের মধ্যে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ তখন খকখক করে হেসে ওঠে। এখানে বসে পেছনের দিকে না তাকিয়েই তা টের পায় ধারা ও লিন্ডা।

সন্ধে প্রায় সাড়ে আটটার দিকে টেক্সাসের লাবাক শহরের কাছাকাছি পৌঁছোয় তারা। হাইওয়ের পাশেই মেরিয়ট হোটেলে গিয়ে চেক-ইনের লাইনে দাঁড়ায়। এই সময় লিন্ডা ও ধারার মধ্যে রুম রিজার্ভেশন নিয়ে কিঞ্চিৎ মতবিরোধ দেখা দেয়। ধারার ইচ্ছা দুটি ভিন্ন রুম নেওয়া। কারণ হিসেবে সে বলে, যেহেতু দুজনেই যথেষ্ট ক্লান্ত এবং দুজনেরই রাতে যথেষ্ট বিশ্রাম ও ভালো ঘুম দরকার, একা ঘরের এই নিভৃতির হয়তো প্রয়োজন আছে আজ। একটি রাতের ব্যাপারই তো, বাড়তি খরচ তেমন কিছু হবে না। অন্যদিকে লিন্ডা একেবারেই চায় না, আজ রাতে একা ঘরে থাকে ধারা। সে প্রতিশ্রুতি দেয়, ধারার সঙ্গে আজ রাতে বেশি গল্প করবে না লিন্ডা। সে নিজেও যথেষ্ট ক্লান্ত। তারা তাড়াতাড়ি খেয়েই শুয়ে পড়বে, যাতে ভোরবেলা উঠেই সতেজ বেরিয়ে যেতে পারে। ধারার গালে ডান হাতের ভাঁজ করা তর্জনীটি স্পর্শ করে মৃদু টোকা দিয়ে লিন্ডা বলে, 'তাছাড়া, আমি তো কোনো অপরিচিত পুরুষমানুষ নই। তোর মতোই আর একটি মেয়ে। আর তুই তো জানিস আমার বান্ধবী আমার অপেক্ষায় বসে আছে ফিনিক্সে। আমাকে তোর কীসের ভয়?' ধারার অন্যতম দ্বিধার কারণটা এত সহজে স্পষ্ট করে বলে ফেলবে লিন্ডা এটা একবারও ভাবতে পারেনি সে। ধরা পড়ে যাওয়ায় হো হো করে একটু বোকার মতোই হেসে ফেলে ধারা। হাসতে হাসতেই বলে, 'তুমি না! বড্ড বানাতে পার গল্প। আমি কি সে কথা ভেবেছি নাকি?'

অবশেষে দুটি কুইন সাইজের বিছানাসহ একখানা বড় রুমই ভাড়া নিল তারা। লাউঞ্জে দাঁড়িয়েই ফিনিক্সে ক্যারলের কাছে ফোন করে লিন্ডা। সারাদিনে এই প্রথম ফোন। লিন্ডা জানায়, তারা ভালোভাবে লাবাক এসে পৌঁছেছে, কোনো অসুবিধে হয়নি। এখানকার মেরিয়টের ৯৪৫ নম্বর রুমে আছে তারা। কিছুক্ষণের ভেতরই লিন্ডাসহ হয়তো খেতে বেরোবে সে। কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পরই রওনা হবে আবার। তার আগে ফোন করবে লিন্ডা। ফোন রাখার আগে যথাযথভাবে আমেরিকান কায়দায় 'I love you' বলতে ভোলে না। ওপার থেকেও নিশ্চয়ই একই বাক্য শুনেছে লিন্ডা, ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার আগের দিন পর্যন্ত যার কোনো ব্যত্যয় ঘটে না এই সংস্কৃতিতে। ডেভিডকে অবশ্য ধারা আগেই সাবধান করে দিয়েছিল তার নিজের বেলায় প্রতিক্ষেত্রে তোতাপাখির মতো একই বাক্যাবলির পুনরাবৃত্তি নাও ঘটতে পারে। ডেভিড তাই কিছু মনে করত না। আসলে তারা দুজনেই লোকসম্মুখে পারস্পরিক ভালোবাসা প্রদর্শনে খুব সহজ ছিল না, ধারার এ ব্যাপারে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে বলেই হয়তো।

রুমে ঢুকেই স্যুটকেস, ব্যাগ আর স্যান্ডেল যেটা যেদিকে পারে ছুড়ে মেরে কোনোমতে দরজার সামনের বিছানার ওপরেই চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে ধারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটা কী হচ্ছে? এটা কী হচ্ছে? আরে, সারাদিন ড্রাইভ করলাম আমি। আর সে কি না টায়ার্ড!' বলে ছুটে আসে লিন্ডা। কোনো কথা না বলে মৃতের মতো চুপ করে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে ধারা। আর ওদিকে গাড়ির সব জিনিসপত্র একা একা ঘরে ঢোকাতে ঢোকাতে অনবরত বকবক করতে থাকে লিন্ডা।

'অন্তত বেড-কভারটা তুলে নাও। কে জানে আমাদের আগে কতজন ব্যবহার করেছে এটা, কতদিন ধোয়া হয় না, তাই-বা কে জানে!'

লিন্ডা ধারাকে ঠেলতে ঠেলতে বিছানার এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর পায়ের নিচ থেকে বেড-কভারটা টেনেহিঁচড়ে বের করে মাটিতে ফেলে দেয়।

'এইবার, এইবার এখানে এসো।' ধবধবে বালিশ দুটো দুই হাতের মাঝখানে রেখে থাবড়ে থাবড়ে ফুলিয়ে তারপর বিছানার মাঝখানে ওপরের দিকে রেখে ধারাকে এসে ওখানে আরাম করে শুতে বলে লিন্ডা। ততক্ষণে ধারা বালিশবিহীন অবস্থায় বিছানার এক ধারে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে টেলিফোন খুলে সব মেসেজ শুনতে ও পড়তে শুরু করেছে।

'ভাবতে পার একজন মানুষ বারো ঘণ্টায় একান্নবার কল করেছে, চোদ্দটি ভয়েস মেইল রেখেছে, সাতাশটি টেক্সট মেসেজ করেছে?' অবাক হয়ে লিন্ডাকে প্রশ্ন করে ধারা।

'খুব পারি। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হতাম না। শোন মেয়ে।' লিন্ডার গলার স্বর ও বলার ভঙ্গি শুনে মনে হয়, সে যেন তার সমবয়সী নয়, যেন মা, না হলেও মাসি — অর্থাৎ যেন আরেক প্রজন্মের নারী। নড়েচড়ে জোড়াসন কেটে খাটের মাঝখানে এসে বসে লিন্ডা। তারপর খুব ধীরে ধীরে প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে দিয়ে বলে, 'পুরুষমাত্রই তার জীবনসঙ্গী ছাড়াও অন্য কোনো নারীর সঙ্গ ভোগ করতে পছন্দ করে। এটা সাধারণত তারা করেই থাকে। যদি না করে কেউ, হয় সে দুর্বল — ভীতু, মনের ইচ্ছা প্রয়োগ করার সাহস নেই। তা না হলে জানবে, চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়েছে। এটা জেনেশুনে-বুঝেই পুরুষের সঙ্গে প্রেম করো।'

'প্রেম তো পুরুষের সঙ্গেই করব। মেয়ের সঙ্গে তো আর করব না। কিন্তু আমার মনে হয় না, তোমার কথাগুলো আক্ষরিকভাবেই সত্য। অথবা সবার জন্যে প্রযোজ্য। সকলেরই কি আর একরকম হয়?' হাসার চেষ্টা করে ধারা।

'হয়তো নয়। হয়তো তাই। আমি কক্ষনো বলি না আমার ভুল হতে পারে না। কিন্তু বারে বারে এরকমটাই ঘটতে দেখেছি বলে ওদের আর অন্যরকম ভাবতে পারি না। পুরুষের প্রেমের ধরনই বোধহয় এটা। ওরা জয় করতে খুব ভালোবাসে। আর সেটা একজনকে নয়। যত তারা জয় করতে পারে তত তাদের শক্তি, তত তাদের ফুর্তি। আর পুরুষমাত্রই শক্তি প্রদর্শন করতে খুব ভালোবাসে।'

বলেই লিন্ডা চুপ করে। খানিকটা অনুতপ্তও হয়। বোঝে, ধারার মনের ভেতর ক্ষতটা এখনো বড্ড কাঁচা — যথেষ্ট তাজা। রক্ত ঝরছে সেখানে। এসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ওকে বলার সময় এটা নয়। কয়েকদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল তার। আর এদিকে ধারারও হঠাৎ খেয়াল হয়, সে যে-কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে নয়, লিন্ডা নামের এক নারী-প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছে। ওর প্রাক্তন অভিজ্ঞতা কী, ওর মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলোর রকম ও পরিবর্তনগুলো কীভাবে ঘটেছে, ওর সামগ্রিক জীবনযাত্রার ধরন ও চেহারা কোনোকিছুই ভালোমতো এখনো জানে না ধারা। কী বলতে কী বলে হয়তো না বুঝেশুনে ইতোমধ্যেই আঘাতও দিয়ে দিয়েছে ওকে।

লিন্ডা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মেঝেতে নেমে বলে, 'চটপট একটা শাওয়ার নিয়ে আসি। টিভিটা চালিয়ে যাচ্ছি। খবর হচ্ছে। ইচ্ছে করলে চ্যানেল বদলে নিও।' রিমোটটা ধারার হাতের কাছে বিছানার ওপর রেখে লিন্ডা শাওয়ার নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

ও বাথরুমে চলে গেলে আবার টেলিফোনের মেসেজগুলো শুনতে শুরু করে ধারা। যেখানে শোনা শেষ করেছিল, তার ঠিক পর থেকে। এরপর থেকে বাকি মেসেজগুলোর সবগুলোই এসেছে ডেভিডের কাছ থেকেই :

'তুমি ছাড়া আমার সত্যি সত্যি আর কেউ নেই। বিশ্বাস করো, পরশুর ওই ঘটনাটা ছিল একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। এর কোনো গুরুত্ব নেই আমার কাছে। ওটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, মস্তবড় বোকামি। এই একটিবার, মাত্র একবার, তুমি আমায় ক্ষমা করে দিতে পার না?'

'বিশ্বাস করো, তোমার কোনো মেয়েবন্ধু, অথবা আমার কোনো নারী-সহপাঠী বা সহকর্মী বা আর কেউ, কোনোকিছু আমার কাছে আজ আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি আমার মা বা ছোট বোনটিও তোমার মতো আমার জীবনে আর আবশ্যিক নয়। একমাত্র তুমি ছাড়া আমি আর কোনোকিছুর জন্যে কেয়ার করি না। এটা এখন আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি। আমাকে তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এবার ধারা প্রতিটি ভয়েস মেইল খুলে একটু একটু শুনেই ছেড়ে দিয়ে দিয়ে একেবারে শেষ ভয়েস মেইলটাতে চলে যায়। ফোনের ভেতর এখন স্পষ্ট কাঁদছে ডেভিড। ধরা গলায় কোনোমতে বলে, 'তুমি শুধু একবার বলো, আমায় কী করতে হবে, কী করলে তুমি আমায় ক্ষমা করে আবার গ্রহণ করবে। আমি কী করতে পারি, যাতে তুমি আবার ফিরে আসবে আমার কাছে।'

মাথায় বড় তোয়ালে পেঁচিয়ে ব্রা ও পেন্টিবিহীন স্যামন রঙের রাতের শোবার পোশাকে, অর্থাৎ কেবল সুতির পায়জামা আর টপ্‌সে, লিন্ডা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। দেখে, উপুড় হয়ে বিছানার ওপরে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ধারা। তা কাঁদুক। কেঁদে মনটা খালি করে নিক মেয়েটা। আচমকা খুব বেশি আঘাত পেয়েছে সে। জীবনের প্রথম আঘাত তো। খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাসের মূল ভেঙে পড়েছে। কষ্ট তা হবেই। এতক্ষণ না কাঁদায় লিন্ডা বরং চিন্তিত ছিল। কাঁদাটাই ওর জন্যে স্বাভাবিক এ সময়। ও কাঁদুক।

ধারাকে তাই কিছু জিজ্ঞেস না করেই লিন্ডা টেলিফোনে রুম সার্ভিসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকে রাতের খাবার ঘরেই দিয়ে যেতে বলে। ধারার যা অবস্থা, মনে হয় না, বাইরে আর বেরোতে চাইবে আজ রাতে। চুলটা আঁচড়ে হাতে-পায়ে-মুখে সামান্য ময়েশ্চারাইজার লোশন মেখে লিন্ডা ধারার বিছানায় এসে ওর মাথার কাছে বসে। এক মুহূর্তে কী যেন ভাবে। তারপর আস্তে করে সে তার ডান হাতখানি রাখে ধারার মাথার ওপর। ধারা একটুও নড়ে না, বিছানায় উপুড় করা মুখমণ্ডলও তুলে ধরে না। লিন্ডা কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে ধারার চুলে বিলি কাটতে শুরু করে। ধারা আগের মতোই কেঁদে চলেছে একনাগাড়ে। একটু পর লিন্ডা একখানি মোটা চিরুনি বের করে আনে ব্যাগ থেকে। ক্লিপ থেকে ধারার চুলগুলো খুলে আস্তে আস্তে তার সমস্ত কালো কুচকুচে, লম্বা চুলগুলো নরম করে আস্তে আস্তে আঁচড়ে দিতে থাকে। ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়াবার পর সমস্ত চুলগুলোকে তিন ভাগ করে মাঝখানে একটা মোটা বেণি করে দেয়। তারপর লম্বা বেণিটা ডান হাতের সবগুলো আঙুল দিয়ে জড়িয়ে খানিকটা মুচড়ে একটু উঁচু করে মাথার পেছনের দিকে ঠিক মাঝখানে একটা আলগা খোঁপা বাঁধে। এখন শাওয়ার নিলেও চুল ভিজবে না। লিন্ডা এবার তার দু'হাত দিয়ে ধারার ঘাড়ে, কাঁধে ও মেরুদণ্ডে আস্তে আস্তে ভালো করে ম্যাসাজ করে দিতে থাকে। একবার শুধু মুখে বলে, 'তুই হয়তো জানিস না, আমি কিন্তু ম্যাসাজ দেবার জন্যে পুরোপুরি সার্টিফায়েড। এর জন্যে রীতিমতো স্কুলে গেছি, ট্রেনিং নিয়েছি। বোর্ড পরীক্ষা পাস করে লাইসেন্স নিতে হয়েছে। কিছুদিন কাজও করেছি। ইচ্ছা করলে আমি এখনো আমার এই স্কিল নিয়ে পার্টটাইম বা ফুলটাইম কাজ করতে পারি। জানিস সেটা? মন্দ রোজগার নয় কিন্তু।'

ধারার বেশ লাগছে এই ম্যাসাজ, অন্য এক নারীর কাছ থেকে এই আলতো, নরম, স্নেহের স্পর্শ খুব উপভোগ করছে সে। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর আর কোনো নারী কখনো এত কাছাকাছি আসেনি তার। এমনকি তার মা-ও নয়। সমস্ত শরীরটা কেমন যেন আরামে, স্বস্তিতে, প্রশান্তিতে নেতিয়ে পড়তে চায়। চোখ বুঁজে আসে। এত ভালো লাগছে তার। এত শান্তি! কান্না থামিয়ে চোখ বন্ধ করে এই ভালোলাগাটুকু, আরেকটা মানুষের ঘনিষ্ঠ উষ্ণ স্পর্শের এই অনুভূতিটুকু শেষ বিন্দু পর্যন্ত গ্রহণ করতে, প্রায় আকণ্ঠ পান করতে চায় ধারা। লিন্ডাও যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধারাকে আবার স্বাভাবিক ও সুস্থ করে তুলতেই হবে তাকে। ধারার দুই কাঁধে দুই হাত রেখে শোয়া অবস্থাতেই ওকে আস্তে করে উল্টে দেয় লিন্ডা। এখন বিছানায় পিঠ দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ধারা। লিন্ডা তার মাথা, কপাল, গলা, থুতনি, কানের পেছন, হাত, বাহু, হাতের প্রতিটি আঙুল, পায়ের আঙুল, দু'আঙুলের মাঝখানের জায়গা, পায়ের পাতা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ লম্বা পা জোড়া, হাঁটু, এমনকি উরু পর্যন্ত, সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে ম্যাসাজ করে দেয়। একসময় লিন্ডা বলে, 'তোর একেবারে সময় হয়ে এসেছে তাই না রে?'

'মানে?' ধারা ঠিক বুঝতে পারে না।

'মানে তোর পিরিয়ডের সময় হয়ে এসেছে, তাই বলছিলাম।'

ধারা রীতিমতো হতবাক। এখনো শরীরে কোনো চিহ্ন নেই তার। কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাই জানে কথাটা সত্য। যে-কোনো মুহূর্তে সেটা ঘটতে পারে। কেননা, ক্যালেন্ডারের তারিখ তাই বলে। সে ভীষণ অবাক হয়।

'কিন্তু কেমন করে তুমি বলতে পারলে ওটা?'

লিন্ডা হাসে, 'দুর পাগলি। আমিও তো তোর মতোই একটি মেয়ে, ভুলে গেলি? বুঝব না কেন? তোর চেয়ে না হয় বয়সে দু-এক বছরের বড়, তাই বলে এটা বলতে পারব না? আর কিছু নয় রে। আসলে, তোর প্রিয় পারফিউমের গন্ধ ছাপিয়েও তোর শরীরের আসল তাজা গন্ধটা, তোর natural odor-টা টের পেয়েছি আমি। তাছাড়া তোর তৈলাক্ত চুলের অবস্থা, তোর শরীরের চামড়ার ওপর গড়ে ওঠা আলগা এই উজ্জ্বল নম্রতা, আমার স্পর্শে তোর এমন করে গলে যাওয়া — এ সবই আমায় জানিয়ে দিয়েছে যে তোকে দর্শন দিতে এই এলো বলে সে। আর তুই নিজেও তো সেটা ভালো করেই জানিস, তাই না কি?' কথাটা শেষ করে ধারার স্তন জোড়ার ওপর, প্রায় স্তনাগ্রেই বলা চলে, অতি হালকা ও আলগাভাবে তার নিজের দুটো হাতের সামনের দিকে সোজা করা আঙুলগুলো দিয়ে সামান্য একটু চাপ দিয়ে লিন্ডা বলে, 'এগুলো নিশ্চয় আগের চেয়ে যথেষ্ট ফার্ম হয়েছে এখন, তাই নয় কি? একটু ব্যথা-ব্যথাও করছে। এ সময় তা-ই হয়। কাল বিকেলে তোকে হাগ্ করার সময়েই সেটা টের পেয়েছিলাম।' কথাটা শেষ করেই বিদ্যুতের বেগে লিন্ডা তার হাতদুটো ধারার বুকের ওপর থেকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বলে, 'তুই কিন্তু ভাবিস না, তোর দুরবস্থার সুযোগ নিচ্ছি আমি। কক্ষনো সেটা করব না। শুধু বলছিলাম — এটা মনে রাখবি, আমাদের চাইতে আমাদের নিজেদের শরীর, আমাদের শরীরের চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধা আর কেউ বেশি ভালো করে জানে না, বা বুঝতে পারে না। আজ তোর দ্বিতীয় লেসন হলো, পুরুষ নিজের যৌনতা, নিজের যৌনসুখ নিয়ে যতটা সিরিয়াস আর যত্নবান, সে ব্যাপারে তাদের যত লক্ষ্য, যত আগ্রহ, তাদের পার্টনারের ব্যাপারে তারা ততটা নয়। তাদের এই স্বভাব বা সীমাবদ্ধতার কথাটা মনে রাখলে ওদের প্রেম নিয়ে তোর কষ্ট, অনুশোচনা কম হবে। আমি অবশ্য জানি না পুরুষদের এই attitude সবটাই অর্জিত নাকি কিছুটা প্রাকৃতিক ব্যাপারও রয়েছে। ওই দুষ্টু হরমোনগুলোর কথা বলছি আর কি! কি, মনে থাকবে তো?'

ধারা ডানদিকে সামান্য ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। কথাটার মধ্যে কিছুটা অন্তত সত্যতা যে রয়েছে সে তো ধারা নিজেও জানে।

বালিশখানা এবার ওপরের থেকে টেনে এনে বিছানার মাঝামাঝি রেখে সেখানে ধারাকে সোজা শুয়ে পড়তে বলে লিন্ডা। 'তুই চুপ করে শুধু চোখ বুঁজে শুয়ে আরাম কর, রিলাক্স কর। বাকি সব আমি দেখব। আমি জানি, তোর হাত-পা চিবোচ্ছে। মাথা ধরেছে। তলপেটে ব্যথা করছে। খিদে লাগছে না। বমি বমি ভাব। তুই কেবল একটুখানি অপেক্ষা কর। আমি আরেকবার খুব ভালো করে তোর শরীরের বাকি মাংসপেশিগুলো, নার্ভগুলো, যেগুলো এখনো যথেষ্ট টেন্স, এখনো একেবারে শক্ত হয়ে গুটলি পাকিয়ে আছে, ওগুলো কেবল ডলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডলে রিলাক্স করে দেব। কোনোরকম ওষুধ বা মালিশ মাখাব না। কেবল এই দশটি আঙুল দিয়ে সব জট ছাড়িয়ে দেব যেমন করে চিরুনি দিয়ে তোর চুলের জট খুলে দিলাম এই মাত্র।' বলেই ছড়ানো আঙুলসহ তার বিশাল হাত দুটি সম্পূর্ণ খুলে মাথার ওপরে উঁচু করে ধরে দেখায় ধারাকে।

এর পর সত্যি সত্যি ঘণ্টাখানেক ধরে ধারার সমস্ত শরীর — মাথা, কপাল, ঘাড়, কাঁধ, পিঠ, মেরুদণ্ড, হাত, পা, পায়ের পাতা, পায়ের তলা, হাত-পায়ের আঙুল, হাতের তালু, বাহু, এমনকি কোমর, নিতম্ব, পেট ও তলপেট আবার নতুন করে অতি কোমলভাবে, অতি যত্নের সঙ্গে, কিন্তু খুব সাবধানে, একটু একটু করে ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করে দেয় লিন্ডা। প্রচণ্ড আরামে চোখ বুজে আসে ধারার।

ধারা শুনতে পায়, দু-হাত দিয়ে অতি সতর্কতাসহকারে ধারার শরীর ম্যাসাজ করতে করতে লিন্ডা একটা গল্প বলতে শুরু করেছে। গল্পটা তার মায়ের কাছে শোনা। লিন্ডার মায়ের জীবন-আহরিত সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা এটি। লিন্ডার মা ক্রিস্টিন যখন তাঁর প্রথম সন্তান অর্থাৎ লিন্ডাকে জন্ম দিতে হাসপাতালে যান, আর লেবার রুমে যখন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন, হঠাৎ টের পান তাঁর নিজের ডাক্তার, যাঁর সঙ্গে গত নয় মাস ধরে তাঁর জানাশোনা — যিনি প্রতিমাসে তাকে যত্নসহকারে দেখেছেন, স্বপ্ন দেখিয়েছেন ভবিষ্যতের, নতুন জীবনের, মাতৃত্বজনিত সুখ আর আনন্দের, আজি — এই শেষ মুহূর্তেও, লেবার রুমে উপস্থিত। তাঁর সেদিন হাসপাতালে ডিউটি করার কথা ছিল না। ফলে তাঁকে সেখানে পেয়ে ক্রিস্টিন তো মহাখুশি। মনে মনে অনেক ভরসা পান তিনি তাঁর পরিচিত ডাক্তারকে আশাতিরিক্তভাবে লেবার রুমে দেখতে পেয়ে। কিন্তু লক্ষ করেন, অন্য আরো আসন্নপ্রসবাদের উপস্থিতিতে তাঁর ডাক্তার আজ তাঁর সঙ্গে একটা কথাও বলছেন না। প্রথমাবধিই কেমন এক দূরত্ব বজায় রাখছেন — অদ্ভুত এক ব্যবহার করছেন। সব দেখে ক্রিস্টিনের মনে হয় না তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন। কেবল ঘড়ি দেখে দেখে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে অন্যান্য আসন্নপ্রসবাদের কাছে যেমন যান, তেমনি তাঁর কাছেও তিনি আসেন। আর কোনোরকম কথা না বলে (যেভাবে আগে তার চেম্বারে গেলে পরীক্ষা করার আগে প্রতিবার সতর্ক করে দিয়ে বলতেন, সরি, আমার হাত এখন আপনার শরীর স্পর্শ করবে, একটু ঠাণ্ডা বোধ করতে পারেন) তাঁর মুখের দিকে পর্যন্ত না তাকিয়ে শুধু গ্লাভস্ পরা তাঁর ডান হাতের দুটো আঙুল তিনি তাঁর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সারভিক্সটা যথেষ্ট খুলেছে কি না দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে সারভিক্সের উন্মুক্ত দরজা কত সেন্টিমিটার খুলল তা তার সহকর্মীকে লিপিবদ্ধ করার জন্যে জোরে জোরে উচ্চারণ করেন। আর বাকি সম্পূর্ণ সময়টা তিনি ঘরের অন্য প্রান্তে বসে অন্যান্য স্টাফ মেম্বারদের সঙ্গে বিভিন্ন মজার মজার কথা বলে হাসিঠাট্টা করতে থাকেন। তাদের উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা, হালকা জোক আর হাসির দমক একটা পর্যায়ে ক্রিস্টিন আর সইতে না পেরে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, 'আপনারা দয়া করে একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামবেন, বা একটু আস্তে হাসবেন, কথা বলবেন?' তাঁর চিৎকার শুনে ক্রিস্টিনের সেই ডাক্তার নিজে ছুটে এসেছিলেন। ক্রিস্টিন তখন সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি আমার ডাক্তার। একটি শিশুর জন্মরহস্যের সকল খুঁটিনাটি, জন্মনালির প্রসারণ-সংকোচনের যত মেকানিক্স সব কিছু হয়তো আপনার নখদর্পণে, প্রসবের প্রতিটি পর্যায় আপনার জানা — অতি পরিচিত, সবই মুখস্থ আপনার। কিন্তু ডাক্তার, আপনি আরো একশ বছর প্র্যাকটিস করলেও কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারবেন না, কোনোভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন না, আসলেই কী সাংঘাতিক পরিমাণ কষ্টের ভেতর দিয়ে, কী ভয়াবহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে একটি নারীকে — সে আমি আর ওই বেডের ওই অল্পবয়সী মেয়েটি যে-ই হোক — যেতে হচ্ছে এই মুহূর্তে। কিন্তু মজার কথা কি জানেন? আপনার বা আপনার পুরুষ সহকর্মীদের কোনো সহানুভূতি না থাকলেও, আপনারা আমাদের কষ্ট একেবারে বুঝতে না পারলেও, আমাদের যন্ত্রণা ঠিকই বুঝতে পেরেছে আপনাদের ওই নিরক্ষর স্প্যানিশ কাজের মেয়েটা, যে এইমাত্র বেরিয়ে গেল এ-ঘর থেকে। সে আমার অবস্থা দেখে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। আমরা কেউ কারো কথা বুঝি না। ফলে সে কিছু বলতে পারেনি আমায়। কিন্তু চোখ বন্ধ করে ওর নিজের ভাষায় নিজের মতো করে আমার জন্যে প্রার্থনা করেছে সে বিড় বিড় করে চোখ বন্ধ করে। তারপর আমার মাথায় ক'বার হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। আমি নিজের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখলাম। অথচ কী আশ্চর্য জানেন, আজকের আগে এই মেয়েটিকে জীবনে কখনো কোথাও দেখিনি আমি। কিন্তু সে যেহেতু একজন নারী, একজন মা, সে ঠিকই উপলব্ধি করেছিল আমার কষ্টটা।' এরপর ক্রিস্টিন আর কখনো পুরুষ অবস্টেট্রিসিয়ানের কাছে যাননি, যদিও লিন্ডার পর আরো তিন-তিনটি সন্তান প্রসব করেছেন তিনি।

ম্যাসাজের সঙ্গে গল্প শুনতে শুনতে, আরামে, আয়েশে, ভালো লাগায় প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে ধারা। তার সমস্ত শরীরটা সম্পূর্ণ ভারহীন মুক্ত মনে হয়। মনে হয় যেন সম্পূর্ণ অবয়বহীন আবরণহীন এক হালকা পালকের মতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে সে। আসলে সেই মুহূর্তে দুচোখ ভারী হয়ে প্রচণ্ড ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছিল ধারা।

কিন্তু তাকে এই অসময়ে বাইরের পোশাকে, অভুক্ত অবস্থায় ঘুমুতে দিতে পারে না লিন্ডা।

'ধারা! এই ধারা! প্লিজ ওঠ। এবার স্নানটা সেরে ধোয়া নরম কোনো সুতি কাপড় পর। ভালো লাগবে। খাবারও চলে আসছে এখুনি। তোর জন্যে আস্ত ব্ল্যাকেন্ড ক্যাটফিশ অর্ডার করেছি। আমি তো মাছ তেমন খাই না তুই জানিস। আমার জন্যে রোস্ট চিকেনের সঙ্গে এঞ্জেল নুডলস অর্ডার দিয়েছি। ইচ্ছে করলে আমার চিকেনও খানিকটা খেতে পারিস তুই। দুপুরের সেই টুনা-মেল্ট এখনো আমার পেটে যথেষ্ট সক্রিয়। খুব খিদে পায়নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ মেলে তাকায় ধারা। সত্যি সত্যিই কি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল?

কেমন মনে হচ্ছিল, সে যেন তার সেই আজন্ম পরিচিত ফিনিক্সের সেই স্প্লিট লেভেল বিশাল বাড়িটাতেই শুয়ে আছে। আর তার মা তাকে ডাকছে ভাত খাওয়ার জন্যে উঠতে। চোখ খুলে মুখের সামনে উপুড় করা লিন্ডার উদ্বিগ্ন মুখখানা দেখে তার সবই মনে পড়ে যায় — কিন্তু সবার আগে মনে পড়ে মায়ের মুখখানা। ঘণ্টাখানেক ধরে যত্নের সঙ্গে প্রতিটি মাংসপেশি ম্যাসাজ করে দেওয়া — লিন্ডার মায়ের প্রথম-সন্তান জন্ম দেবার সময়ে হাসপাতালের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা — সবই। ধারার শরীরটা কেমন ফুরফুরে, হালকা লাগছে এখন। খুব রিলাক্সড্ মনে হচ্ছে। লিন্ডার কানের কাছে গিয়ে আস্তে করে একটি ধন্যবাদ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ধারা। স্নান করতে যাবার আগে স্যুটকেস খুলে রাতে পরার জন্যে জবা ফুলের ছাপ দেওয়া সুতির তৈরি ঢিলেঢালা একটি নাইটি বেছে বের করে। বাথরুমে যেতে গিয়ে দরোজার কাছ থেকে দৌড়ে আবার ফিরে আসে। ফিরে আসে সোজা লিন্ডার কাছে। লিন্ডার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা জানা নেই ধারার। অনুভূতি প্রকাশে বরাবরই মুখচোরা সে। তবু আজ দুই বাহু দিয়ে লিন্ডার গলা জড়িয়ে ধরে তার শুকনো ঠোঁট জোড়ায় নিজের ঠোঁটদুটো আলতোভাবে স্পর্শ করে একবার। খুব আস্তে করে আরেকবার তাকে ধন্যবাদ জানায় তার সমস্ত অবসাদ, ক্লান্তি দূর করে দেবার জন্যে। এখন এত ভারমুক্ত লাগছে তার, চোখ বুজে আসছে ঘুমে। ভাবতে অবাক লাগে, যে মেয়েটিকে ছয় মাস আগেও চিনত না ধারা, হঠাৎ কত আপন হয়ে গেছে আজ — আর তার সবটাই ঘটেছে লিন্ডার নিজের গুণে। লিন্ডাকে দ্রুত একটা হাগ দিয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়ায় ধারা। ধারার অন্য মেয়েবন্ধুদের থেকে লিন্ডা যতই ভিন্ন প্রকৃতির হোক না কেন, ওকে নিয়ে আর কোনো দ্বিধা, সংকোচ, ভয় বা সন্দেহ নেই তার। এমনকি এক ঘরে রাত কাটাতেও নয়। বাথরুমে যেতে যেতে ধারা বলে, 'বডড খিদে পেয়েছে। স্নান করে এসেই যেন দেখি খাবার চলে এসেছে টেবিলে।'

লিন্ডা খুবই খুশি হয় শুনে, ধারার খিদে লেগেছে। দুপুরে তো প্রায় জোর করে তাকে খাওয়াবার জন্যে গাড়ি থামানো হয়েছিল 'থার্স্টি' নামের সেই অভিনব বারটিতে। সে এক অভিজ্ঞতা বটে। কিন্তু তখন প্রায় কিছুই খায়নি সে। দুজনের জন্যে খাবার সাজাবার জায়গা করতে টেবিল থেকে কাগজপত্র, কলম, টেলিফোনের বইসহ দৈনিক সংবাদপত্র সবকিছুই একদিকে সরিয়ে পরিষ্কার করে নেয় লিন্ডা। কেবল ঘন সবুজ পাতাসহ পার্পল রঙের তাজা অর্কিডের ছোট্ট ফুলদানিটা রেখে দেয় টেবিলের ঠিক মাঝখানেই। ওটা সরায় না।

শুনতে পায়, বাথরুম থেকে ভেসে আসছে অনবরত জল পতনের শব্দ। বুঝতে পারে, উষ্ণ জলে সাবান মেখে খুব ভালো করে স্নান করে নিচ্ছে ধারা। এত লম্বা পথে একটানা এতক্ষণ ধরে চলতে গিয়ে নিশ্চয় বহু ধূলিকণা, ময়লা, ঘাম জমেছিল শরীরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী ও পরিবেশ

পরিবেশ, প্রকৃতি ও নারী

আজকের জগতের অন্যতম বড় সমস্যা পরিবেশ দূষণ, মানুষেরই অবিবেচনা, স্বার্থপরতা ও অকর্মের ফল। দিনের পর দিন পরিবেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ও যত্নবান না হওয়ায় জল, স্থল, অন্তরীক্ষে বিভিন্ন রকম অবাঞ্ছিত কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় বর্জ্য ও আবর্জনার স্তূপ ক্রমাগত জমা হয়ে চলেছে। সামুদ্রিক বন্দরগুলোর আশপাশের জলে শিল্পকারখানা-নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণের প্রভাবে শুধু ক্যান্সার, ত্বক ও যকৃতের ব্যাধি বা এই জাতীয় মারাত্মক অসুখেরই সৃষ্টি হচ্ছে না, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও গতিও রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। জিনের বহুবিধ রূপান্তর ঘটাচ্ছে এইসব দূষিত জল, বায়ু, মাটি। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষ মাছের পেটে ডিম দেখা যাচ্ছে, অথচ নারী মাছ হয়ে পড়ছে বন্ধ্যা। কয়লার খনিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে পুরুষদের বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ও গতি কমে যাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের কারণে শূন্যে ওজোন স্তরের মাত্রা ক্রমেই নিচের দিকে যাচ্ছে। বাতাসে তুলনামূলকভাবে অক্সিজেনের পরিমাণ নেমে গিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ যাচ্ছে বেড়ে। ধীরে ধীরে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে পড়ার জন্যে মেরু অঞ্চলে মাত্রাতিরিক্ত বরফ গলে গিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর সভ্যতা-বিরোধী, পরিবেশ-বিনাশী, মানুষের জীবন ও সহায়সম্পত্তিতে সমূহ ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসা 'যুদ্ধ' বাধিয়ে আজো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে কিছু মানুষ ও তাদের করায়ত্ত রাষ্ট্র। আর এই ধরনের সকল কাজে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতেই পুরুষের অবদান নারীর তুলনায় অনেক বেশি। প্রায় সিংহভাগ দায়িত্বই পুরুষের, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। প্রতিটি বিষয় ভিন্ন ভিন্নভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই বিশেষ ঘটনাগুলোতে সত্যিকারভাবেই নারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতিবাচক ভূমিকা, নারীর সরাসরি হাত খুব কমই রয়েছে। বরং প্রকৃতির মতো নারীও ক্রমাগত পুরুষের আত্মতৃপ্তির জন্যে অতিরিক্তভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। ফলে নারী নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে এক ধরনের সখ্য খুঁজে পায়, সহমর্মিতা জাগে নারীর পরিবেশের প্রতি এই ক্রুদ্ধ, নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে। পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি নারী ধীরে ধীরে আরো সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। আর তাই ইদানীং পুরুষের এই দূরদৃষ্টিহীনতা ও স্বার্থপরতার শিকার নারী 'ইকোফেমিনিজম' বলে জগৎজোড়া একটি জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। নারী মুক্তির সঙ্গে পরিবেশ মুক্তিকে একত্র করে এই আন্দোলন।

যেহেতু সমাজের সবচেয়ে মৌলিক ইউনিট অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও একক পরিবারের খাদ্য, জ্বালানি ও জল — এই তিনটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যবহার ও বণ্টন নারীর হাত দিয়েই প্রধানত সম্পন্ন হয়, স্বাভাবিকভাবেই এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের দেখাশোনা ও সঠিকভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব আস্তে আস্তে তুলে নিতে চাইছে নারী নিজের হাতে। সংসারের, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গলের জন্যে সদা উন্মুখ নারী কখনো প্রাকৃতিক সম্পদ অতিরিক্ত পরিমাণে তুলে নিয়ে খরচ করবে না। নিজের সংসারে যেমন অপচয় রোধ করে সে, তেমনি প্রকৃতির কাছ থেকেও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যা বা যতটুকু দরকার ততটুকুই নেয় কেবল। সেটুকু থেকেও প্রয়োজনের বাইরে উদ্বৃত্ত যতটুকু থাকে, সবই আবার ফিরিয়ে দেয় প্রকৃতির কোলে এর চিরস্থায়িত্বের জন্যে — চক্রাকারে আবার ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত হয়ে ফিরে আসার প্রত্যাশায়। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি নারীর এই সচেতনতা ও মায়া এ-কারণেও জরুরি। কেননা খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ অথবা সন্ত্রাসের বড় ও প্রধান শিকার নারী নিজে এবং তার শিশুসন্তান।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সর্বকালে সব দেশেই সাধারণত নারীরা এগিয়ে আসে সর্বাগ্রে। কোনো জটিল সমস্যা বা মতানৈক্যের সমাধানের উপায় হিসেবে একজন মানুষ অস্ত্র নিয়ে আরেকজন মানুষকে খুন করার কথা, অর্থাৎ নিজের হাতে যুদ্ধ করার কথা, অধিকাংশ নারীই চিন্তা করতে পারে না। তারা শান্তিপ্রিয়, সন্ত্রাসবিরোধী, যুদ্ধে বিমুখ। মানুষের জীবন, শিশুদের ভবিষ্যৎ, নারীর যৌননিরাপত্তা ও পরিবেশের নির্মলতার জন্যে যুদ্ধ ও এইসব ভয়াবহ যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র ও সরঞ্জাম বিশাল হুমকিস্বরূপ। আমরা তাই শুনে অবাক হই না, আলফ্রেড নোবেল শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের ধারণা বা প্রণোদনা পেয়েছিলেন তাঁর অস্ট্রিয়ান বন্ধু বনাম সাময়িক গৃহপরিচর্যাকারী ব্যারোনেস বার্থা সাটনারের কাছ থেকে। বার্থা সাটনারই প্রথম নারী, যিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯০৩ সালে। গত ১১২ বছরে (১৯০১-২০১২) বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো চোদ্দজন নারী শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন। অন্য সকল নোবেলের বিষয়ের ভেতর শান্তিতেই সবচেয়ে বেশি পুরস্কার লাভ করেন নারীরা। সম্প্রতি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী জীবিত নারীরা মিলে 'Nobel Women's Initiative' নামে একটি সংস্থা তৈরি করে জগৎজুড়ে এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। এর প্রধান লক্ষ্য হলো ন্যায় ও সমতার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন করছেন। সেই সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায়ও সচেষ্ট থাকছেন। এই আন্দোলনের মূল কথা — কোথাও কোনো শারীরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, লৈঙ্গিক বা পরিবেশগত হুমকি বা আগ্রাসন থাকবে না। নারীর বিরুদ্ধে তো নয়ই, অন্য কোনো মানুষের বিরুদ্ধেও নয়। প্রকৃতি বা পরিবেশের বিরুদ্ধেও নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত

এমন আজব ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি। গত বিশ বছর ধরে এই জনপদে কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এও কি সম্ভব? কিন্তু যতদূর খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঘটনাটা সত্য। একদল জনসংখ্যাবিশারদ ও বিজ্ঞানী এসেছেন অনুসন্ধানে। না, জন্মের হার কম নয় এ সম্প্রদায়ের। বরং জাতীয় গড় হারের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশিই। সেটা অবশ্য অনুমেয় কারণেই। কেননা অশিক্ষিত, সভ্যতার সঙ্গে অসম্পৃক্ত এই জনগোষ্ঠী জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক সকল পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নয়। কিন্তু তাহলে শুধুই কেন পুত্রসন্তান? এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। শোনা যায়, প্রথম প্রথম উৎফুল্লই ছিল জনগণ রোজগেরেদের পুনঃপুন আবির্ভাবে। একেকটি ছেলে তো নয়, বাবার সঙ্গে কাঠ কাটার জোগানদার। কাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বাক্স, আসবাব বানানোর কারিগর। একটা সময় ছিল সবাই প্রত্যাশা করত, একরকম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত একটি পুত্রসন্তানের জন্য। কিন্তু তারপর, যখন দেখা গেল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এখানে আর একটিও কন্যাসন্তান জন্ম নিচ্ছে না, তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এই চন্দনকর সম্প্রদায় এর আগে কখনো নিজেদের সমাজ ছেড়ে বাইরে ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেনি। এখন তারা রীতিমতো উদ্বিগ্ন, সম্পূর্ণ চন্দনকর গোষ্ঠীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কি না। কার অভিশাপ লাগল? কী দোষে এমন সর্বনাশা পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দনকরেরা? একেকজন একেক কথা বলে। কার কথা বিশ্বাস করবে লোকে? তবে সবাই একটি ব্যাপারে একমত। মানব-ইতিহাসে কোথাও কখনো যা দেখা যায়নি, তাই ঘটছে গত দুদশক ধরে এই সমাজে। এখানে আর কোনো কন্যাসন্তান জন্ম নিচ্ছে না। এছাড়া আরো কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনও লক্ষ করা যাচ্ছে এই নারীকুলে। বিষয়টা ভাবার মতো, একটু তলিয়ে দেখা যাক কী হয়েছিল এখানে।

পটভূমি

জায়গাটা দেশের দক্ষিণাঞ্চলে। সুন্দরবনের বদ্ধ জলাভূমির পশ্চিম পার্শ্বে। চন্দনকর সম্প্রদায়ের একচেটিয়া বসতি এখানে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দেড়শোর মতো পরিবার। ওরা দেখতে বেঁটেখাটো, ফর্সা, চ্যাপটা, চোখগুলো ফোলা ফোলা। অনেকটা চীনদেশীয় লোকদের মতো। মেয়েদের পরনে লুঙ্গি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় লম্বা পোশাক। ওপরে ছোট হাতার ব্লাউজ। ছেলেদের গায়ে মালকোঁচা দেওয়া চার হাত কাপড়। আর ঘাড়ের ওপর একখানা গামছা। এখানে একসময় প্রচুর চন্দন কাঠ ছিল। চন্দনকরদের পেশাই ছিল চন্দন কাঠ দিয়ে নানান রকম নকশার ঘর সাজানোর জিনিস তৈরি করা। চন্দন ঘষে রূপচর্চার উপকরণ ও সুগন্ধি বানানো। এখন চন্দন কাঠের পরিমাণ কমে গেছে। কিন্তু তাদের জীবিকা বদলায়নি। এখানকার লোক এখনো আগের পেশাতেই রয়েছে। চন্দনের বদলে যোগ হয়েছে সেগুন, শাল, কাঁঠাল আর কড়ই। কাঠ সংগ্রহ আর কাঠের ছোটখাটো আসবাব ও টুকিটাকি ঘর সাজানোর উপকরণ তৈরি করেই সময় কাটে তাদের। এসব হাতে তৈরি জিনিস নিয়ে যাওয়ার জন্য শহর থেকে লোক আসে মাঝে মাঝে। লবণ, তেল, কেরোসিনের বিনিময়ে কিনে নিয়ে যায় সেসব পণ্য। মেয়েরা কাঠের কাজ ছাড়াও ক্ষেতের কাজ করে। শিশুদের রয়েছে এক বিশেষ স্থান এ সম্প্রদায়ের ভেতর। শাসন করার জন্য বাচ্চাকে মারধর করা বা ধমক দিয়ে ভয় দেখানোর কথা ভাবতেও পারে না এরা। শিশু মানে স্বর্গীয় এক বস্তু। সব নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ, শাসন থেকে মুক্ত তারা। প্রকৃতির কোলে অতি আদরে বড় হয়। একজনের সন্তান অন্য দশজনেও দেখাশোনা করে। শিশু মানে সুন্দর, মঙ্গল ও সৌভাগ্যের প্রতীক। শিশুদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বয়স্করা। সামাজিক সকল আচার-আচরণে মা-বাবা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে শিশুরাও অংশগ্রহণ করে। একটি শিশুর জন্মলগ্নের জন্য গোটা সম্প্রদায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। ঢাক বাজিয়ে, ঘণ্টা পিটিয়ে, গান গেয়ে শিশুর আগমনকে স্বাগত জানায় পড়শিরা। এখানে পুরুষ-নারী উভয়ে সংসারের কাজে, সন্তান প্রতিপালনে ও উপার্জনে অংশগ্রহণ করে। তবে দৈনন্দিন জীবনে বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলো পুরুষরাই বেশি করে। মেয়েরা সেসব কাজেরই প্রাধান্য দেয়, যে কাজ প্রচুর মনোযোগ ও সমন্বয় দাবি করে।

মা মায়াবতী, চম্পা দাসী ও বহিরাগত দস্যু

এমনি করে সবকিছু ঠিকঠাক নিয়মমাফিকই চলছিল চন্দনকরদের। এখানে কয়েকশো বছরের বসতি তাদের। একসময় চাঁদনি খাল আর কুসুমদিঘির স্বচ্ছ জলে সাঁতার কেটে, শাপলা তুলে সমস্ত জলরাশি তোলপাড় করে বেড়াত একরাশ চপল কিশোরী। ঘুঙুর বাজিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ছুটে বেড়াত চঞ্চল বালিকারা। অথচ আজ সারা গাঁয়ে না আছে কোনো অল্পবয়সী তরুণী, না কিশোরী। শিশু কন্যাসন্তান পর্যন্ত নয়। মা মায়াবতী এখানে সবচেয়ে বড় দেবতা বলে পরিচিত। সকলেই তার পূজা করে। বিরাট মন্দির আছে মায়াবতীর। চন্দনকরদের সকলের ধারণা, বহিরাগতদের পাশবিক আচরণে ভয়ানক ক্রুদ্ধ মা মায়াবতী। তাঁকে তুষ্ট করতে না পারলে এ অঞ্চলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেন হলো মায়াবতীর এতখানি গোসা? অনেকে অনেক কথা বলে। তবে যে-কথন লোকমুখে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তা হলো চম্পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাসীর ওপর অমানবিক অত্যাচারে মা মায়াবতী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। ঘটনাটা প্রথম ঘটে উনিশশো একাত্তরে। চকরাবকরা জংলি পোশাক পরে একদল লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল একদিন এই অঞ্চলে। এখানকার সমস্ত শান্তি, নিভৃতি ও শৃঙ্খলা ভেঙে ওরা বন্দুকের প্রচণ্ড আওয়াজ তুলেছিল। পাখিগুলো সব ডানা ঝাপটে বন থেকে উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ভয়ে। ভয় পেয়েছিল চম্পা দাসীও। তখন তার আর কত বয়স? বারো কি তেরো। চম্পার রূপ, লাবণ্য, দীর্ঘ কেশরাশি আর মুক্তোর মতো দাঁতের খিলখিল হাসি দেখে এই বিদেশি লোকগুলো মাতাল হয়ে উঠেছিল। স্নানরতা মেয়েটিকে কুসুমদিঘি থেকে তুলে নিয়ে মায়াবতী মন্দিরের ভেতর আটকে রেখেছিল পুরো দুটো দিন। ওরা চলে যাওয়ার পর থেকেই চম্পা আর কথা বলে না। নির্লিপ্ত চেয়ে থাকে সে। হাসে না। কাঁদে না। রাতে ঘুমোয় না পর্যন্ত। এভাবেই কেটে গেল পুরো চারটি বছর। কয়েক বছর পরে আবার উঠল ঝড়। এবার বিদেশি নয়, চন্দনকরদের শহুরে দেশবাসীই, যাদের কথা চন্দনকররা স্পষ্ট বুঝতে পারে অথচ যারা তাদের কথা বোঝে না, এসে চড়াও হলো আবার। এবার চম্পা দাসী আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ষোড়শী রূপসী চম্পাকে এবারও রেহাই দিল না ওরা। এর আগে চারটি বছর ছিল সে মায়াবতী মন্দিরেই অন্তরীণ। এটা তার স্বেচ্ছানির্বাসন। একাত্তরের পর মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন অনেক চেষ্টা করেও ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি চম্পাকে। সে সারা দিন বসে বসে মায়াবতীর পূজা করে। মায়াবতীর ভোগের জন্যে ব্রতচারিণীদের আনা কলা, আম, পেয়ারা, সাগুদানা খেয়ে দিনের পর দিন বেঁচে থাকে চম্পা দাসী। এবার দস্যু শহরবাসীর নজর কিন্তু শুধু একটি নারীতেই সীমাবদ্ধ রইল না। এক রাতে বিশাল মশাল জ্বালিয়ে, বাজি ও পটকা পুড়িয়ে সম্পূর্ণ গ্রাম তছনছ করে গেল ওরা। চন্দনকরদের প্রতিটি কিশোরী ও যুবতীকে ধর্ষণ করল লাঠিসোঁটা হাতে একদল সবল পুরুষ।

এরপরও সময় থেমে থাকল না। এ কালো রাতও আর দশটা স্বাভাবিক রাতের মতোই শেষ হলো। অন্ধকার কাটল। সূর্যও উঠল যথাসময়ে। পাখি ডাকল। চাঁদনি খাল আর কুসুমদিঘিতে লাল শাপলা ফুল এতটুকুও বিবর্ণ হলো না। গাছের সবুজ আভা, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বৃষ্টির শীতলতা, দখিনা হাওয়ার শিরশির আওয়াজ সব অবিকল তেমনি রইল। কোথাও কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, একটা মারাত্মক, একটা ভয়ানক পরিবর্তন শুরু হলো চন্দনকর অঞ্চলের নারীকুলে। হঠাৎ করে অল্পবয়সী, গর্ভধারণে সমর্থ সব কিশোরী, তরুণী ও প্রৌঢ়ার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল। বিরাট বিরাট টাক দেখা দিতে লাগল কারো কারো মাথায়। কারো গালে গজালো একটু একটু দাড়ি। কারো স্তন বুকের সঙ্গে লেপটে যেতে শুরু করল। গলা মোটা হয়ে এলো সকলেরই। কিন্তু তারপরও শারীরিকভাবে তারা কেমন করে জানি নারীই রয়ে গেল। অর্থাৎ কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না তাদের জৈবিক কোনো ভূমিকা পালনেই।

অন্য ব্যতিক্রমটি ঠিক তখন থেকেই দৃশ্যমান। এই অঞ্চলে — চন্দনকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায়ের ভেতর তখন থেকেই আর কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে না। চম্পা দাসীর মুখভরা এখন দাড়ি। অন্য মেয়েদের মতো সে দাড়ি কামায় না। ফলে তার একদা পেলব গাল ও থুতনিতে এখন ছোট ছোট কালো দাড়ি। সেই সঙ্গে কোমর পর্যন্ত লম্বা কুচকুচে কোঁকড়ানো নরম চুল। দ্বিতীয় দফায় গণধর্ষণের পর চম্পা দাসী এখন শুধু কথা বলা থেকেই বিরত নয়, পারতপক্ষে চোখ খুলেও তাকায় না। নিমীলিত বা অর্ধনিমীলিত চোখে সে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়িয়ে মায়াবতীর ধ্যান করে সর্বক্ষণ। বিজ্ঞানী, এনজিওকর্মী, সমাজসেবী, প্রশাসনের কর্মকর্তা অনেকেই বহুবার করে এসেছেন এখানে। চম্পা দাসীকে প্রচুর সাধ্যসাধনা, অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও সে মুখ খোলেনি। কারো কথা বা প্রশ্ন তার বোধগম্য কি না তাও বোঝা যায় না। চন্দনকরের আপামর জনসমাজ আজ উদ্বিগ্ন। তাদের একসময়কার অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সুশ্রী, সুগঠিত নারীদের এমন পুরুষালি রূপ তাদের আহত করছে, ব্যথিত করছে। কিন্তু তার চেয়েও তারা বেশি চিন্তাগ্রস্ত এই সম্প্রদায়ের সমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। কন্যাশিশু জন্ম না নিলে কেমন করে চলবে? অথচ গত বিশ-বাইশ বছর কোনো মেয়ে জন্মেনি এ-অঞ্চলে। এখানকার কিশোর ও তরুণরা তাই ছটফট করছে। নারীসঙ্গবিহীন একাকী অশান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। কী হবে এ জনগোষ্ঠীর? কে বলে দেবে তাদের?

AMARBOI.COM

মায়াবতীর পুরোহিতের বক্তব্য

পুরোহিতের বয়স কমপক্ষে নব্বই। চন্দনকর সমাজে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে পরিচিত। জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন পুরোহিত। ঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প কোনো কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু গত বিশ-বাইশ বছর ধরে — তাই-বা বলি কেন — গত সাতাশ বছরে তিনি যা দেখেছেন, যা ঘটে গেল এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে, তা কখনো দেখবেন ভাবেননি। সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরেছেন বৃদ্ধ পুরোহিতকে। চন্দনকর সম্প্রদায় কী ভাবছে, তার নিজের কী ব্যাখ্যা এই ঘটনার, এর থেকে পরিত্রাণেরই বা কী উপায়? পুরোহিতের বক্তব্য একটাই। মা মায়াবতী অসম্ভব মনঃক্ষুণ্ন। আহত। ব্যথিত। তিনি তখনই আবার সবকিছু ক্ষমা করে দিতে পারবেন, আবার কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করবে এ মাটিতে, যদি সেইসব নরপশু — আসল অপরাধী এসে মায়াবতীর কাছে, চন্দনকর মেয়েদের কাছে, বিশেষ করে চম্পা দাসীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা ভিক্ষা করে।

বিজ্ঞানী ও জনসংখ্যা বিশারদদের সংবাদ সম্মেলন

সাংবাদিকরা অনেকক্ষণ ধরে জড়ো হয়ে আছেন এখানে। অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। বিজ্ঞানী ও জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা কী ব্যাখ্যা দেবেন এ ঘটনার? বেশ কিছু এনজিওকর্মী, সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবীও উপস্থিত। আন্তর্জাতিক এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষক দলটি কী তথ্য উন্মোচন করে সকলেই কৌতূহলী আজ তা জানার জন্যে। একে একে মঞ্চে এসে বসেন গবেষকবৃন্দ। না, চূড়ান্তভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি তাঁরা। এটি নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ঘটনা। প্রাণিকুলের অন্যান্য প্রজাতির ভেতর নানান কারণে কিছু কিছু স্বভাবগত ও চেহারাগত বৈচিত্র্য ও বিচ্যুতি দেখা গেলেও মনুষ্য প্রজাতির ভেতর ঠিক এমনতর ঘটনার উল্লেখ নেই ইতিহাসে। তবে জীবজগতের বিভিন্ন উদাহরণ থেকে বিজ্ঞানীরা এই সংবাদ সম্মেলনে কিছু তথ্য পরিবেশন করলেন, যা থেকে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। নিচে সেগুলো বর্ণিত হলো :

১. যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গত বছর আবিষ্কার করেছেন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সমুদ্রে 'রেসি' বলে একরকম মাছ বাস করে। এদের মধ্যে যাদের মাথার রং নীল, তারা খুব সাহসী। যোদ্ধা প্রকৃতির পুরুষ মাছ এরা। এ-প্রজাতির মেয়ে মাছ, শিশু মাছ অর্থাৎ পোনা ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুরুষ মাছদের (যাদের মাথার রং হলুদ) রক্ষক এই নীলমুখো মাছেরা। সর্বক্ষণ তাদের পাহারা দেয়, নিরাপত্তা দেয় অন্যান্য মাছ ও সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণীর হামলা থেকে। কোনো কারণে এই নীল রঙের পুরুষ মাছের অপ্রতুলতা দেখা গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু হলুদ রঙের পুরুষ মাছ ও মেয়ে মাছ আস্তে আস্তে তাদের মুখ ও মাথার রং বদলিয়ে নীলমুখো জাঁদরেল এবং সাহসী ওই পুরুষ মাছগুলোর মতোই হয়ে যায়। তারপর যখন অথবা যদি ওই আগের নীল মাছগুলো আবার ফিরে আসে, তাহলে এই রূপান্তরিত মাছগুলো আস্তে আস্তে পুনরায় স্ববর্ণ ধারণ করে আবার নিজের নিজের ভূমিকায় ফিরে যায়। এসবই ঘটে মস্তিষ্ক থেকে একরকম হরমোন নির্গত হওয়ার কারণে। জননেন্দ্রিয়ের হরমোনের কারণে নয়।

২. ইংল্যান্ডের উপকূলবর্তী বন্দরে ও নিউইয়র্কের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর বর্জ্য-দূষিত সামুদ্রিক জলে বসবাসরত মাছদের অদ্ভুত সব পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এদের পুরুষ মাছের পেটে ডিম দেখা যাচ্ছে। তাদের শরীরের হরমোনও মেয়ে মাছের মতো। আবার ওদিকে মেয়ে মাছদের ডিমপাড়ার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

৩. ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষিত, কর্মক্ষেত্রে সফল ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের অনেকের মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের চেহারায় অন্যান্য পুরুষালি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন কারো কারো মুখে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, কারো গলা মোটা হয়ে এসেছে। মধ্যবয়সী নারী, যারা উঁচু ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারণের কাজে নিয়োজিত তাদের ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন বিশেষভাবে নজরে পড়ছে।

৪. রাসায়নিক শিল্পকারখানায় কর্মরত নষ্ট পরিবেশের শিকার অনেক নারীর আপনাআপনি গর্ভপাত হয়ে যায়। এমনকি এ-ধরনের পরিবেশে কাজ করে যেসব পুরুষ, তাদেরও প্রজনন-ক্ষমতায়, বিশেষ করে বীর্যের গুণগত মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করা গেছে।

৫. অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান এবং কিছু কিছু ওষুধ গ্রহণ পুরুষের প্রজনন-ক্ষমতা হ্রাস করে দিচ্ছে — তাদের শুক্রাণুর গতি ও মান কমিয়ে দিচ্ছে।

৬. কয়লাখনিতে কর্মরত গর্ভবতী নারীদের বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে দেখা গেছে।

৭. পরিবেশ নির্মল না থাকায় অতিথি পাখিরা আগের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় আর আসছে না। শীতের মৌসুমে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌসুমি পাখি আসার আগে পর্যবেক্ষক পাখিদের একটা ছোট দল সাধারণত আসে পরিকল্পিত স্থান দর্শনার্থে। এরা এসে পরীক্ষা করে যায় পরিবেশ আসলেই যথেষ্ট অনুকূল রয়েছে কি না। জল, বায়ু ও মাটির যথার্থ পরিবেশ নেই বলে পর্যবেক্ষক পাখিরা সংবাদ দেওয়ার কারণেই অতিথি পাখিরা আর আগের মতো দল বেঁধে আসছে না এখানে। ভবিষ্যতে হয়তো একেবারেই আসবে না।

৮. পরিবেশ, খাদ্য, ওষুধ, সূর্যের রশ্মি, বয়স, সংক্রামক রোগ, রাসায়নিক দ্রব্য, তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী আঘাত বা ক্ষত প্রাণীর 'জিন' বা ডিএনএতে কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। নানান রকম ক্যান্সার হতে পারে এই মিউটেশনের কারণে। মৃত্যুও হতে পারে। এমনকি এগুলো মস্তিষ্কের কার্যাবলি, স্মরণশক্তি বা সৃষ্টিশীলতায় প্রভাব ফেলতে পারে। কোনো কোনো প্রাণী যৌনক্ষমতা অথবা প্রজননক্ষমতাও হারাতে পারে এর জন্য।

এরকম বেশ কিছু তথ্য দেওয়ার পর বিজ্ঞানীরা যেটা পরিশেষে বলেন তা অনেকটা এরকম। চন্দনকরদের নারীদের মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে সেটা সঠিকভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর সেটা হলো এই চন্দনকর নারীরা একটা বিরাট আঘাত পেয়েছে — হয়তো শারীরিক ও মানসিক দুভাবেই। তাদের জিনে স্থায়ী কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না কেউ বলতে পারে না। এটুকুই বলা চলে, নারীরা এখানে নিশ্চিন্ত বোধ করছে না। তাদের বসবাসের জন্য যে সুষ্ঠু পরিবেশ ও অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে সে ব্যাপারটিতে নিশ্চয়তা পেলে আবার হয়তো তারা আগের রূপ ফিরে পেত। নারীশিশু জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় শারীরিক উপকরণ ও পরিবেশও তৈরি হবে তখন।

উপসংহার

বিজ্ঞানী, গবেষকদল ফিরে গেছেন আজ বিকেলে তাঁদের পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। কিছু কিছু এনজিওকর্মী, বিদেশি পর্যবেক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এখনো রয়ে গেছেন চন্দনকরে এত কিছুর পরেও। রহস্যটার জট পুরোপুরি খুলল না তাদের কাছে। এখানকার মেয়েদের নিশ্চিন্ত করার জন্যে কী করতে পারেন তাঁরা, কেউ ভেবে পান না। মায়াবতীর পুরোহিত বারবার বলছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়াবতী দেবী ও চম্পা দাসীর কাছে অপরাধীরা এসে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেই কেবল এ পাপ ঘুচতে পারে। কেমন করে তা সম্ভব হবে তারা জানে না।

পরের দিন সকালে শহরে ফিরে যাওয়ার কথা। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে এক সাংবাদিক ও আরেক বিদেশি পর্যবেক্ষক এসেছে মায়াবতীর মন্দিরে। গভীর রাত। মন্দিরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছে তারা। সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে। চারদিক নিস্তব্ধ। মন্দিরের ঠিক সামনে একটা ঝোপের পাশে চুপ করে বসে থাকে তারা দুজন। চুপচাপ কেটে যায় ঘণ্টা দেড়েক। রাত তখন ঠিক বারোটা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারদিক। একটু একটু ফুরফুরে হাওয়া। বাবলা গাছের ঝিরঝিরে পাতাগুলো সরসর করে নড়ছে। হঠাৎ ওরা লক্ষ করে মায়াবতীর মন্দিরের ভেতর থেকে লম্বা সাদা পোশাকপরা একটি দীর্ঘাঙ্গী নারী বেরিয়ে আসছে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ তার। কোমর পর্যন্ত কালো চুল। দোহারা চেহারা। সে মন্দিরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। তার পায়ে ঘুঙুর। রিনঝিন শব্দ আসছে পা ফেলার তালে তালে। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছে। ওরা দুজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আস্তে আস্তে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। বারান্দার কাছাকাছি আসতে খুব কাছে থেকে দেখতে পায় নারীটিকে। পরমা সুন্দরী রমণী। কিন্তু হঠাৎ তাদের দেখতে পেয়ে মন্দিরের পেছন দিকে কোথায় মূর্তিটি মিলিয়ে গেল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পেছনের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু দেখতে পায় না। কালবিলম্ব না করে ওরা মন্দিরের সামনের দিকে চলে আসে আবার। কোথায় গেল সেই শুভ্রবসনা নারী? সিঁড়ি ও বারান্দা ভেঙে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। খোলা দরজা। মন্দিরের ভেতর বিশাল মায়াবতীর মূর্তি। কমলা পোশাক পরিহিতা মায়াবতী বসে আছেন সাদা রঙের বিরাট এক বাঘের ওপর। মূর্তির দু'পাশে দুটো প্রদীপ জ্বলছে। আর বাঁ-পাশে ধ্যানরতা উপবিষ্টা সুন্দরী চম্পা দাসী। তার পরনে ফকফকে সাদা পোশাক। চক্ষু নিমীলিত। গালে খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি। কোমর পর্যন্ত খোলা কালো চুল। বিদেশি পর্যবেক্ষক অত্যন্ত বিচলিত। চম্পা দাসীর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বাঙালি সাংবাদিককে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, 'আমি দিব্যি করে বলছি, বারান্দায় হেঁটে চলা ওই মহিলার গালে একটুও দাড়ি ছিল না। কী মসৃণ ফর্সা তার গাল দুটো! চুলগুলো কিন্তু ঠিক এমনি — এতখানিই লম্বা ছিল। তুমি বিশ্বাস করো। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। খুব ভালো করে দেখেছি।'

উত্তেজিত সঙ্গীকে শান্ত করতে চায় বাঙালি সাংবাদিক। বলে, 'আমি জানি, আমি নিজেও তা দেখেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর আত্মহত্যা

আত্মহনন সমস্যার সমাধান নয়

বাংলাদেশে ১৪ থেকে ১৭ বছরের মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। এই বিশেষ ধরনের মৃত্যুর হার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশি। কিন্তু আমেরিকার মতো দেশে কিশোর-কিশোরীর ভেতর আত্মহত্যাজনিত মোট মৃত্যুর শতকরা ৮০টিই ঘটে ছেলেদের ভেতর। অর্থাৎ মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যা মোট সংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। বাংলাদেশের চিত্র ঠিক তার উল্টো। একটি জরিপে দেখা গেছে, এক বছরে প্রায় ২২০০ কিশোর-কিশোরী আত্মহনন করেছে বাংলাদেশে। মানে গড়ে প্রতিদিনে ছয়জন। কিন্তু এই ছয়জনের ভেতর চারজনই নারী।

অন্যান্য বয়সী মানুষের চেয়ে উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের (কিশোর-কিশোরী) মধ্যে প্রায় প্রতি সমাজেই আত্মহত্যার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে বয়ঃসন্ধিক্ষণের সেই পরিচিত শারীরিক ও মানসিক জটিলতা। এই সময় ছেলেমেয়েদের চালচলনে, কথাবার্তায় একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে — অধিকাংশের বেলাতেই। ভাবালুতা ও অন্ধ আবেগ যুক্তিকে আচ্ছাদিত করে রাখে বলে এ সময় কল্পনা ও বাস্তব জগতের ভেতর চলে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব। না শিশু-না পরিণতবয়স্ক, এই উঠতি বয়সী নরনারীদের মধ্যে হরমোনের উচ্চতর প্রবাহে দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সেই সঙ্গে সহজে পোষ মানতে না চাওয়া দৈহিক শিহরণ ও পুলক, উত্তেজনা ও চাহিদা মাঝে মাঝে দিশেহারা করে তোলে প্রাক-তরুণ নরনারীকে। ভেতরের ও বাহ্যিক বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপও বোধ করতে শুরু করে তারা প্রচণ্ডভাবে। সমবয়সী বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রাকৃতিক কারণে দুর্বার আকর্ষণ বোধ করা এবং সেই সঙ্গে অকস্মাৎ পরিবার ও সমাজ-আরোপিত বহু বাধানিষেধের মুখোমুখি হওয়া এবং সেসব সহজভাবে মেনে নেওয়া বা ধৈর্যসহকারে মোকাবিলা

AMARBOI.COM

করা খুব সোজা কথা বা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া এই সময় তারা থাকে অতি ভাবপ্রবণ এবং চিন্তায়-অনুভূতিতে, অবসর যাপনে একধরনের আত্মমুখী ও একাকী। না পারে তারা শিশু বালক-বালিকাদের সঙ্গে খেলা করতে, না পারে বড়দের সঙ্গে বসে সমানতালে আড্ডা দিতে বা প্রাণ খুলে নিজের সমস্যার কথা বলতে। ফলে প্রিয়জনদের সঙ্গেও দূরত্ব বাড়তে থাকে। মনের ভেতরে কী ভাবনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে তাদের, কী বা কে অনবরত করে চলেছে তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ অথবা স্বপ্নচারী, প্রায় সময়েই তা জানা যায় না, কেননা বলতে দ্বিধা-সংকোচ হয়। পারিবারিক আবেষ্টন ও আমাদের গোটা সমাজ অতটা উদার বা খোলামেলা নয়, যাতে সব কথা ও চিন্তা ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। তার ওপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো ইদানীং যুক্ত হয়েছে বখাটে ছেলেদের প্রবল দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব। স্কুলে বা বান্ধবীর বাড়িতে যাবার সময় মেয়েদের পিছে পিছে অনুরাগী ছেলেদের নিঃশব্দে এবং নির্দোষভাবে অনুসরণ করা, অথবা দূরে লাইটপোস্ট বা চায়ের দোকান থেকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকা, কখনোসখনো প্রেমপত্র লেখা, বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো, কবিতা রচনা করা, এসব স্বাভাবিক ও নিষ্পাপ কর্ম সর্বকালেই ঘটেছে আমাদের দেশে, যেখানে সুস্থ এবং সহজভাবে অল্পবয়সী নারী-পুরুষের মেলামেশা করার, কথাবার্তা আদান-প্রদান করার সুযোগ প্রায় নেই বা থাকলেও তা খুবই অপ্রতুল। কিন্তু ইদানীং যা হচ্ছে, সেটা দুরাচার বললেও কম বলা হবে, সেটা রীতিমতো হিংস্রতা, ভীতিপ্রদর্শন, অপমানজনক, ব্ল্যাকমেইলিং। মাস্তানদের স্বঘোষিত সতর্কবার্তা ও সহিংসতা। অবশেষে পরিবারের সম্মান বাঁচাতে, মা-বাবা, ভাইবোনকে পরম যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা ও বিব্রতকর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দিতে আর নিজে এই বখাটে ছেলের হাত থেকে নিস্তার পেতে অসহায় সাধারণ পরিবারের অবুঝ মেয়েটি বিষ পান করে বা গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু এটা করে নিজের একটা সম্ভাবনাময় জীবনই শুধু বিনাশ করে না সে, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে অপরাধীকেও বাঁচিয়ে দেয়। এভাবে স্বেচ্ছায় নিজ প্রাণের সমাপ্তি টেনে সে পরিবারের এবং দেশের অর্থনৈতিক অপচয়ও ঘটায়। তাকে ষোলো-সতেরো বছর ধরে একটু একটু করে বড় করে তুলতে, তার শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে যে পরিমাণ খরচ হয়েছে পরিবারের এবং রাষ্ট্রের, তা তার শ্রমবাজারে ঢোকার আগেই অপসৃত হয়ে যাবার কারণে পুরোটাই যায় লোকসানে। তবে নিরাসক্তভাবে জীবনকে, জীবনের মূল্যকে নিছক টাকা-পয়সা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সেটা সম্ভবও নয়। বিশেষ করে মানবিক বিচারে এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনাতে। তবে এটা মনে রাখতেই হবে, স্বেচ্ছামৃত্যু কোনো সমস্যার সমাধান ডেকে আনে না। সমস্যার মোকাবিলাতে নিজের সাহসের অভাব এবং ভীরু মনোভাবই প্রকাশ করে মাত্র। সেই সঙ্গে সকল সম্ভাবনার দুয়ার চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু শুধু কি অল্পবয়সী মেয়েরাই নিজের হাতে নিজের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে? পূর্ণ যুবতী নারীও মাঝে মাঝে কিশোরীদের মতো হৃদয়ঘটিত কোনো ব্যাপার নিয়ে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করে। এসবের পেছনে সাধারণত থাকে অল্পবয়সী নারীদের প্রেমিকের সঙ্গে মিলতে যেতে পারিবারিক আপত্তি বা তার সঙ্গে প্রেমিকের বিয়েতে কোনো পক্ষের অভিভাবকের বাধা কিংবা তার নিজস্ব ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিবারের উদ্যোগে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করা। এছাড়া, নারীটির প্রেমিকের অন্য কাউকে বিয়ে করা বা অন্যত্র মন দেওয়াও যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হয়, যা কোনো কোনো মেয়েকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে।

দাম্পত্য কলহ ও অশান্তি, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ বা বিবাহবহির্ভূত প্রেম, নানা কারণে শ্বশুরবাড়িতে অবহেলা, অবমূল্যায়ন, স্বামী অথবা শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-ভাশুর বা দেবরের অভদ্র ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতা, এরকম অনেক কারণ নারীকে প্রলুব্ধ করে এই অসফল জীবন সাঙ্গ করে দিতে — কখনো কখনো এমন মানসিক অবস্থাতেই একাধিক সন্তানসহ চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মা। অথবা প্রাণপ্রিয় সন্তানদের নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে খাবারের সঙ্গে বিষ খেয়ে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ে মা ও সন্তান। কিন্তু তাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান কি হচ্ছে? দোষী ব্যক্তির সাজার জন্যেও তো তার বেঁচে থাকার দরকার ছিল।

যৌতুকের জন্যে চাপ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন আরেকটি বড় কারণ অল্প বয়সী গৃহবধূদের আত্মহননের জন্যে। এটা কেবল দরিদ্র ঘরেই ঘটে না, অর্থকরী স্বামীর ঘরেও অহরহ ঘটে থাকে।

আরেকটি কারণ হলো, কোনো প্রতারক প্রেমিকের ছলনার শিকার হয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সৃষ্ট নারীর মানসিক অবসাদ, অপরাধবোধ, অপমান, বঞ্চনা, বিষাদ ও ক্রোধ, যা তাকে সাময়িকভাবে বিচারবোধ হারিয়ে ফেলতে ও আত্মহননে প্ররোচিত করতে সাহায্য করে।

আর্থিক অনটন, পাওনাদারদের হুমকি ও তাগাদা, নিত্যদিনের দারিদ্র্য, সন্তানের সামান্য চাহিদা বা শখ মেটাতে অপারগতা, উচ্চ সুদে নেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক কর্জের কিস্তি পরিশোধ করার অক্ষমতাও কোনো কোনো সময় নারীকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়।

পড়াশোনা করতে গিয়ে পরীক্ষায় অসফলতা অথবা অতি দরকারি একটি চাকরির জন্যে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে, ছোটাছুটি করেও শেষ পর্যন্ত চাকরি জোগাড় করতে না পারা যে হতাশার জন্ম দেয়, তার থেকেও কখনো কখনো আত্মহত্যা করে তরুণ-তরুণীরা।

একাকিত্ব, বন্ধুহীনতা, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সদ্ভাবের ঘাটতি, বিচ্ছিন্নতাবোধ একজন নারীর মনে এই ধারণার জন্ম দিতেই পারে যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার জীবন অর্থময় নয় এবং এইভাবে জীবন প্রলম্বিত করার কোনো মানে হয় না।

বিবাহিতা নারীদের আরেকটি মনোবেদনা ও আত্মহননের কারণ হতে পারে তার সন্তানহীনতা বা বন্ধ্যাত্ব (যা তার স্বামীর জন্যেও হতে পারে; কিন্তু লোকেরা না জেনে, না বুঝে নারীটিকেই কেবল দায়ী করে, দোষারোপ করে), অথবা পুত্রসন্তান লাভে ব্যর্থতা। যদিও এই ব্যাপারটা শিক্ষিত, শহুরে মানুষের মধ্যে কমই প্রভাব ফেলে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অথবা শহরে নিম্নবিত্ত পরিবারে এখনো এই সমস্যা ব্যাপক আকারেই উপস্থিত, যদিও বিজ্ঞান অনুযায়ী সন্তানের লিঙ্গ সৃষ্টি বা নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই।

কোনো দীর্ঘস্থায়ী অসুখ বা এমন রোগ যা নিরাময়যোগ্য নয়, কিন্তু যার উপসর্গগুলো প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে, পারস্পরিক সম্পর্কের মান খাটো করে, সেই সব শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য কোনো কোনো সময় জীবনের সমাপ্তি ডেকে আনতে উৎসাহ দেয় কোনো কোনো নারীকে।

তবে সমস্যা যা-ই থাক, আর যত বড়ই তা হোক, আত্মহনন এই ধরনের কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। নারী যদি তার দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মাথা সোজা করে চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির রেখে সোজা, সটান হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে, অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে তার দরকার একটি বা দুটি সত্যিকারের ব্যক্তিগত বন্ধু, যাদের সঙ্গে জীবনের সকল সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। সেই সঙ্গে একান্ত নিজের জন্যে, নিজের ভালোলাগার জন্যে কিছু করা দরকার। মেয়েদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা, বড় সমস্যা, তারা সংসারের সকলের প্রয়োজন মেটাতে এত ব্যস্ত, এত জড়িয়ে থাকে যে, নিজের জন্যে, নিজের ভালোলাগা বা একান্তে সময় কাটাবার জন্যে কিছু করে না, কোনো সময় রাখে না। প্রতিটি নারীর দরকার নিজের ভালোলাগার, আনন্দ পাবার জন্যে কিছু খুঁজে নিয়ে নিয়মিত তার চর্চা করা। সেটা বইপড়া, প্রিয় গান শোনা, ছবি দেখা, নিজে গুনগুন করে গান গাওয়া বা গান শেখা থাকলে যথার্থভাবে তার রেয়াজ করা, গলা সাধা, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, ফুল বা ফসলের বাগান করা, সেলাই করা, ভ্রমণ করা, কোনো জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করা, রোজগার না থাকলে কোনো কাজ করে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করা, এরকম অনেক কিছুই হতে পারে, যা জীবনটাকে অর্থবহ করে তোলে। মোট কথা, সংসারের, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজ বাঁধাধরা নিয়মে সম্পন্ন করে যাওয়া ছাড়াও এক টুকরো নিজস্ব সময় তার থাকা দরকার একান্তভাবে নিজের জন্যে। নিজের বাঁচার আনন্দেই নিজে বেঁচে থাকব আমরা। প্রয়োজনে 'একলা চল রে'-র নীতির সাধনা করেই। তবু আত্মহনন, আত্মধিক্কার, আত্মঅবমাননা নয়। কিছুতেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে মুখোশবিহীন

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, 'এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখো, এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে', আমি তখুনি ঠিক করে ফেললাম আমায় আর কখনো দেখবে না।

কাল দুপুরে তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে সদ্য আমার গোপন ঘরটিতে ঢুকে স্নানের জন্যে তৈরি হচ্ছি। সারা দিনরাত্রির এই একটু সময়ই নিজের মতো করে পাই। পাশের দেয়ালে সারি সারি সব মুখোশ টাঙানো। সবই আমার, যখনই যেটা দরকার পরি।

ছেলের জন্যে করা ডান পাশের সাদা চুলের মোটা রেখা সদ্য ধুয়েছি জলে।

স্বামীকে খুশি করতে যে ত্রিনয়নী খয়েরি টিপ পরি তাও মুছে ফেলেছি।

বাবার জন্যে কানে ঝোলানো তারার মাকড়ি খুলে রেখেছি ততক্ষণে।

রোগীদের জন্যে নেওয়া স্টেথিস্কোপ আর চশমাও আর নেই।

আর তখনই তুমি ঘরে ঢুকলে।

তোমার দেওয়া লাল গোলাপটি তখনো আমার চুলে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তুমি সেদিকে তাকালে। আমাকে বড় ভালো লাগল তোমার। খুব চেনা, খুব আপন মনে হলো। তুমি আমায় সম্পূর্ণভাবে দখল করতে চাইলে। অবশ্য তখনো জানো না কেন আজ এত বেশি পরিচিত, এত কাছাকাছি মনে হচ্ছে আমাকে। আমি জানি। কারণ যে চোখজোড়া দেখে তুমি অভ্যস্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ ছিল আমার চোখ গতকাল।

কেননা চোখের তারা থেকে একে একে খুলে নিয়েছি তখন —

সবুজ চাকতি যা আমাকে পরম সহিষ্ণু করে স্বামীর কাছে,

লাল চাকতি যা ছেলের কাছে আমার দুরন্ত সঙ্গ লোভনীয় করে,

বাদামি চাকতি যা রোগীকে পরম নিশ্চয়তা ও নির্ভরতা দেয়,

সোনালি চাকতি যা আমার বাবার কাছে আজো আদরের দুলালী করে রাখে।

আমি কেবল চোখ থেকে গোলাপি চাকতিটা খুলতে যাব, যার ভেতর দিয়ে তোমাকে দেখি বলে আমার সে চোখ, সে দৃষ্টি তোমার চেনা, যে চোখে তুমি কামনার আগুন দেখো, ঠিক তখনই তুমি এলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার এ সময় আসার কথা ছিল না।

একটু আগেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তবু তুমি এলে। বড় অসময়ে।

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, 'এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখো, এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে', আমি তখুনি ঠিক করে ফেললাম আমায় আর কখনো দেখবে না।

গতকাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে সরাসরি এ সাজঘরটাতে ঢুকেছিলাম। ভেবেছিলাম স্নান করার আগে তোমার পরিচিত মুখোশটি খুলে ছেলের চেনা মুখোশটি পরে একবার ওর ঘরে যাব। সেটা করলে ভালোই হতো। কিন্তু সে সুযোগ আমায় দাওনি। বড় তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলে। তুমি এভাবে হঠাৎ চলে আসতে পার, এটা কখনো ভাবিনি। তবে তুমি যে এমন নিজস্ব করে আমায় চাইলে, সেটা শুধু ওই মুখোশের জন্যই নয়। ও মুখোশে তো আমাকে আগেও কতবার দেখেছ। সত্যি বলতে কী, আমার কেবল ওই মুখটাই তো তোমার চেনা। তবু কেন গতকাল এমন করে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করলে? এত বড় স্বার্থপরের মতো?

কারণ, আমার পুত্রের জন্যে ধারণকৃত শব্দ করে হাসি বন্ধ করেছিলাম তখন।

স্বামীর মন ভোলাতে গালের দুপাশে টোলও ফেলিনি সে সময়।

রোগীর অবস্থা নিরূপণে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানো স্থগিত ছিল বিলক্ষণ।

বাবার পরিচিত নাক ও ঠোঁট কোঁচকানো সেই হাসির ভঙ্গিটিও ছিল নির্বাপিত।

অথচ তোমার পছন্দমতো ঠোঁটের লাল লিপস্টিক তখনো ছিল স্মিত হাসিতে আবদ্ধ।

তোমার ভালো লাগল আমাকে।

কারণ সেই মুহূর্তে তুমি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব ছিল না সেখানে। আমাকে একলা করে পেতে চাইলে। নিরাভরণ হতে হতে আমি তখন কেবল স্নান করতে যাচ্ছিলাম।

আমার এ-ঘরটির অস্তিত্ব কেউ জানত না। এই এত বড় বাড়ির ভেতর আট ফুট বাই ছয় ফুটের এই যে গোপন ছোট্ট ঘরটি, এটিই ছিল দুনিয়ায় আমার একমাত্র সম্পদ, একমাত্র অর্জন। এই বিশ্বসংসারে এছাড়া আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। নিত্যব্যবহার্য হাতব্যাগটিও আমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই। এই ঘরে শুধু মুখোশ, পোশাক, রং, প্রসাধন আর দৈনন্দিন ব্যবহারের রকমারি সামগ্রী দেখতে বা বদলাতেই আসি না, প্রতিদিন এ ঘরটিতে এসে কিছুক্ষণের জন্যে আমি গা থেকে সব রং ধুয়ে ফেলি। সমস্ত গহনা, মুখোশ, আর পোশাক খুলে কিছুক্ষণ নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ নগ্ন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি। চুপচাপ ভাবি। ছোট জানালাটা ধরে বাইরের দিকে তাকাই। পাখির ডানা ঝাপটানো শুনি। ফাল্গুনীর হাওয়ায় কান পাতি। নীল আকাশ, সাদা মেঘ আর পাশের বাড়ির ফুলের রঙের বৈচিত্র্য আমায় মুগ্ধ করে। আমি চুপচাপ বসে থাকি। সে সময়টায় আমার চারদিকে আর কেউ থাকে না।

না তুমি।

না স্বামী।

না পুত্র।

না পিতা।

না রোগী।

ছয় ফুট বাই আট ফুটের এই ঘরটাতে সাড়ে পাঁচ ফুটের আমি ছাড়া আর কারো জায়গা হয় না। তারপর আমি একসময় এত বিশাল, এত শক্তিশালী, এত বড় হয়ে উঠি যে, আমাকে ধরে রাখার জন্যে আর যথেষ্ট বড় মনে হয় না ঘরটিকে। আর তখন, ওই অর্জিত শক্তি আর সাহস নিয়ে নিজের খুশিমতো কোনো একটা মুখোশ চাপিয়ে প্রবল তেজের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি পৃথিবীর মুখোমুখি হতে।

আমার এ ঘরে, এ নিজস্ব ভুবনে কারো প্রবেশাধিকার নেই। তুমি সেটা জানতে না। আর তাই সব নিয়ম ভেঙে অর্বাচীনের মতো সটান আমার নিভৃত কক্ষে ঢুকে পড়লে। এর আগে আর কেউ এটা করেনি।

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, 'এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখো, এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে', আমি চমকে গেলাম তোমার স্পর্ধা দেখে। তোমার স্বার্থপরতায় ক্ষুণ্ন হলাম। আর তখুনি ঠিক করে ফেললাম, আমায় আর কখনো দেখবে না।

এখন আমার চোখের সামনে কেবল পাঁচটি মুখোশ। দেয়ালে ঝুলছে চারটি। আর তোমার জন্যে তৈরি পঞ্চম মুখোশটি যা এতক্ষণ পরে ছিলাম, সেটা এখন আমার হাতে। সবার আগে তোমার মুখোশটাই ভাঙছি আমি। আমার হাতের চাপে গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে ভেঙে পড়ছে তোমার পরিচিত, অতি প্রিয় চোখের পালক। বাঁকানো সরু ভুরু, ঈষৎ গোলাপি কপোল। লাল টিপ, কানের পাশে গালের ওধারে ছোট ছোট লম্বা চুলের গোছা আস্তে আস্তে ঝরে পড়ল মাটিতে। তারপর নিলাম বাবার জন্যে তুলে রাখা মুখোশটি। ওটা ভাঙতে অসুবিধা হয়নি। অনেকদিন ব্যবহার করেছি বলে বেশ জীর্ণ হয়েই ছিল। গায়ের রংটাই ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিল একটু, চামড়াটা ঝুরঝুর।

ছেলের জন্যে কপালে ভাঁজ পড়া স্কুলশিক্ষিকার মতো প্রশান্ত অবয়বের মুখোশটি ভাঙতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। আহা ছেলে আমার মাকে না হয় একটু বয়সীই দেখতে চেয়েছিল। তাই বলে মাতৃহারা হতে তো চায়নি কখনো।

রোগীদের জন্যে যে মুখোশখানা পরি, সেটাতেই বেশিরভাগ লোক চেনে আমায়। চুলগুলো টেনে আঁচড়ে পেছনের দিকে খোঁপা করা, চশমা চোখে ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার মুখোশটি শব্দ করে ভাঙলাম এইমাত্র। বাকি রইল শুধু স্বামীর জন্যে ব্যবহৃত মুখোশখানা। বাড়িতে এটাই পরে থাকি বেশিরভাগ সময়। ওটার গালে কপালে এখনো মাছ রান্নার গন্ধ লেগে আছে। আমি হাত থেকে ফেলে দিলাম ওটা। চোখের সামনে সহস্র টুকরোয় ভেঙে গেল মুখোশটা।

আমি এখন পরিপূর্ণ মুক্ত। আর কোনো মুখোশ নেই।

কিছুক্ষণ পর বেলা দশটার ট্রেনটা চলে যাবে এ-পথ ধরে। ট্রেনের নিচে থেঁতলে থাকা মাংসপিণ্ডকে ঘিরে লোক জমবে। পুলিশ আসবে লাশ শনাক্ত করতে। সকলে যখন হিমশিম খাবে, তুমি হঠাৎ আমার পরনের শাড়িটি দেখে চেঁচিয়ে উঠবে। এ শাড়ি যে নিজে ডিজাইন করে তাঁতি ডাকিয়ে তৈরি করিয়েছিলে তুমি। এর দ্বিতীয়টির তো অস্তিত্ব নেই কোথাও। আমাকে দেখে চিনতে না পারলেও আমার পোশাক তোমাকে ঠিকই বুঝিয়ে দেবে আমি চলে গেছি।

বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠবেন তার দেওয়া ডান হাতের সোনার বালাটি দেখে।

সমুদ্রসৈকতের শৌখিন দোকান থেকে কেনা ছেলের ঝিনুকের কানের দুল তখনো থাকবে কি? অন্তত একটি কানে? না হলেও অন্তত তার দেওয়া পুঁতির মালার অবশিষ্ট কয়েকটি পুঁতি নিশ্চয়ই তখনো থাকবে গলায়।

কাপড় সরিয়ে বাঁ হাঁটুর ওপর কালো জন্মদাগটি দেখে স্বামীর চিনতে কষ্ট হবে না আমাকে। ওটা যদি থেঁতলেও যায়, ডান ঘাড়ের নিচে পিঠের ওপর বড় জড়ুলটা ঠিকই থাকবে। ওটা তুমিও দেখেছ। কতবার। দেখলে চিনতে। কোনো অসুবিধা হতো না। কিন্তু লোকসম্মুখে ও কথা স্বীকার করতে পারবে না। আর তাছাড়া আমি মৃত হলেও কেউ তোমাকে সেটা দেখাবে না।

কিন্তু আমার মুখটা যদি কোনো কারণে অবিকৃত থেকে যায়! যদি চলন্ত ট্রেনের গতি যথেষ্ট তীব্র না হয় অথবা আমার আত্মনিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার শরীরটাকে এক টুকরো মাংসপিণ্ড বানাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কিন্তু ও মুখ দেখে তোমরা কেউ আমার চিনবে না।

অথচ ওটাই ছিলাম আমি, যাকে কেউ কখনো দেখোনি তোমরা।

তুমি রাগ করো না লক্ষ্মীটি। সত্যি বলছি, এই ছোটাছুটি আমি আর করতে পারছিলাম না। এরকম ঘন ঘন মুখোশ আর পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে আর সাত রকম রং মাখতে আর মুছতে আমি আসলেই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর তখুনি আমার নিভৃত ঘরটিতে এসে তুমি হানা দিলে।

আমি ভয় পেলাম।

তুমি যখন বললে, 'এই তোমার আসল রূপ। চেয়ে দেখো, এটাই তুমি। আমার ছায়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার চোখে? তুমি শুধু আমার। আর সব মিথ্যে', আমি তখুনি ঠিক করে ফেললাম, তুমি আমায় আর কখনো দেখবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপন করেছি বপন বাতাসে

মীরা আমার ভাগনি। অর্থাৎ আমার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরার একমাত্র কন্যা। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে সে একবার এখানে, আমাদের বাড়িতে এসেছিল। এদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যাবার ইচ্ছা কতখানি ছিল তার জানি না। তবে এতদূরে অকস্মাৎ এভাবে ছুটে আসা, সেটা যে ওখান থেকে কোনো কারণে পালাবার জন্যেই, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? কার কাছ থেকে পালাচ্ছিল সে?

এই ঘটনার মাত্র কয়েক মাস আগেই খবর পেয়েছিলাম, হঠাৎ করে এমএ ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়েই মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়ে এক উঠতি ব্যান্ড মিউজিশিয়ানকে বিয়ে করে বসেছে মীরা। আর বিয়ের পর সংসার চালাবার জন্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণকালীন একটি চাকরিও নিতে হয়েছে তাকে। যার ফলে পড়াশোনার পাটে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছে, পরে নিজের মুখে সে কথা স্বীকারও করেছে সে। ছোটবেলা থেকেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে কাজ করে ফেলার অভ্যেস তার। ওর মামা সুদীপের মতে, সে অত্যন্ত 'অস্থির চিত্তের' মেয়ে। স্বভাবে-আচরণে যথেষ্ট স্বাধীনচেতা ও জেদি। ওর কথা বলা, চলাফেরা দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, ওর আত্মবিশ্বাস বুঝি প্রবল। কিন্তু আসলে মীরা খুবই নাজুক প্রকৃতির এবং নিজের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে তার প্রচুর আস্থাহীনতা।

দু-চার বছরে একবার করে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় আর কখনোসখনো দেশে গেলে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা-সাক্ষাৎ — বড়জোর একবেলা একসঙ্গে আহার গ্রহণ, এমনতর ক্বচিৎ যোগাযোগ বা ক্ষীণ সুতায় বাঁধা আত্মীয়তার সম্পর্ক যার সঙ্গে, তার কাছ থেকে এতদূরে বসে হঠাৎ এ-ধরনের একখানা চিঠি পেলে বিস্মিত হতে হয় বৈকি। আমরাও তাই অবাক হয়েছিলাম, মীরার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সেই চিঠি পেয়ে :

'ছোট মামা/মামি,

আগামী মাসের অর্থাৎ জুনের বিশ তারিখে নিউইয়র্ক আসছি। ভিসা হয়ে গেছে। তোমাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে আছে। বিরক্ত হলে চলবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না কিন্তু। দেখা হলে সব কথা হবে। ফ্লাইটের সময়সূচি জানিয়ে শিগগিরই টেলিগ্রাম করছি।

মীরা।'

বিমানবন্দরে ওকে একা দেখতে পেয়ে প্রথমে হোঁচট খেলেও খুব অবাক হইনি আমরা। কেননা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের পক্ষে এদেশে আসার জন্যে অস্থায়ী ভিসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে আজকাল। মীরার ব্যান্ড মিউজিশিয়ান বর হয়তো ভিসা পায়নি। মীরা পেয়েছিল, কেননা বছর চারেক আগে একটি নামকরা নৃত্যদলের সঙ্গে চারটি দেশে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করতে বেরিয়েছিল সে। সেই সময় তিনদিনের জন্যে লস অ্যাঞ্জেলেসেও এসেছিল তারা। এদেশের ন্যায্য ভিসা পেয়েও স্বেচ্ছায় যারা স্বদেশে ফিরে যায়, সাধারণত তাদের দ্বিতীয়বার ভিসা পেতে আর অসুবিধে হয় না। মীরারও হয়নি। তবু আমাদের মনে খটকা থেকেই যায়। নববিবাহিত মীরা স্বামীকে নিয়ে বেড়াতে এলে অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু যে বেড়ানো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও ঐচ্ছিক, তা এই সময় একা একা করে কেউ? বিশেষ করে এত দূরে? সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো ওদের?

না, নেই। বিয়ে করার পরপরই বুঝতে পেরেছিল মীরা, বিরাট ভুল করে ফেলেছে। কথাটা মীরা নিজেই বলেছিল আমাদের। সঞ্জারের নিজের রচিত গানের কলি, তার বাদ্যযন্ত্র যেমন গিটার, বাঁশি, ড্রাম আর বিভিন্ন নেশার সামগ্রীর মতো মীরাও তার জীবনে আনন্দের-উত্তেজনার আরেকটি প্রিয় উপকরণ মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। তবে সময় বা নজর সে যতটুকুই দিক না কেন স্ত্রীকে, তার এই বিশেষ অর্জন ও সম্পদকে নিয়ে সে কিন্তু বেজায় খুশি। প্রকৃতই গর্বিত। একে সযত্নে আগলে রাখতে, তার এই প্রাপ্তির মালিকানা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখা নিশ্চিন্ত করতে, প্রায় নির্লজ্জের মতোই সবার সামনে মীরার কাছে বাড়াবাড়ি কিছু দাবি করে বসতে, তার ওপর অধিকার বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সে মোটেই সংকুচিত নয়, বরং বেশ উৎসাহীই। কিন্তু সঞ্জারের এই সর্বগ্রাসী ভালোবাসা বা দখলদারিত্বে দম বন্ধ হবার অবস্থা মীরার। নিঃশ্বাস নেবার মতো চারপাশে এক ফোঁটা খোলা জায়গা, এতটুকুন মুক্ত বাতাস খুঁজে পায় না সে। আস্তে আস্তে ঘর আর কাজের বাইরে পৃথিবীর সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ হবার উপক্রম হয় তার। সমস্ত বিশ্বচরাচর সংকুচিত হয়ে আসে। আর তখনই সে মনে মনে স্থির করে ফেলে, এবার পালাতে হবে। সঞ্জার যদি সুস্থ হতো, তাকে আইনসম্মতভাবে ছেড়ে দিয়ে তারা দুজনেই যে যার জীবনে আবার ফিরে যেতে পারত। কিন্তু সে সুস্থ নয়, অত্যন্ত বেশি পসেসিভ, আগ্রাসী, রাগী। কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হলে খ্যাপা কুকুরের মতো, উন্মাদের মতো ব্যবহার করে সঞ্জার। কোনো যুক্তি বা শোভনতার ধার ধারে না। মীরাকে সে কিছুতেই হারাতে রাজি হবে না। ফলে সঞ্জারকে কিছু না জানিয়ে নিজে নিজেই আমেরিকায় পালিয়ে আসার পথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজতে শুরু করে মীরা। আর ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ছটফট করতে থাকে।

জীবনে মাত্র একবার, একদিনের জন্যেই ডিজনিল্যান্ডে যাবার সুযোগ হয়েছিল মীরার। কিন্তু সেখানকার সিন্ডারেলা ক্যাসেল, বিশাল আকারের মিকি ও মিনি মাউস, সেই সঙ্গে নানান ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ও রাইডের স্মৃতি এই বয়সেও তাকে অসীম আনন্দ দেয়। কয়েক মিনিটের ভেতর স্নো হোয়াইট ও লিটল ডর্ফের দেশে ঘুরে আসার সেই অভিজ্ঞতা তাকে উজ্জীবিত করে। ডিজনিল্যান্ড অনবরত পিছু টানে মীরাকে। এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির অপেক্ষায়, বাঁচার আশায়, রূপকথার দেশ আমেরিকা তাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করতে থাকে। অত্যন্ত প্রবলভাবে। আর আশ্চর্য, জীবনের এমনি এক জটিল ও দুর্যোগপূর্ণ সময়েই একদিন অফিস থেকে ঘরে ফেরার পথে বাসে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রির শেষ বর্ষের ছাত্র মানসের। বয়সে মীরার চাইতে বছরখানেকের ছোটই হবে হয়তো মানস। কিন্তু দেখা হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়।

মাত্র গত রাতেই এখানে এসে পৌঁছেছে মীরা। সকালে ওর মামা কাজে বেরিয়ে যাবার পর আমিও আস্তে আস্তে তৈরি হতে শুরু করি অফিসে যাবার জন্যে। তার ফাঁকে ফাঁকে চা খেতে খেতে মীরার সঙ্গে টুকটাক কথা বলি। প্রধানত দেশের আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে, কে কেমন আছে, কোথায় আছে, কী করছে, এই ধরনের মামুলি সব কথাবার্তা। আর ঠিক তখনই মীরা তার পার্সের চেইন খুলে একটা পাতলা নীল রঙের খাম বের করে। খামের ভেতরে হাত গলিয়ে একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি টেনে বের করে এনে আমার চোখের সামনে কফি টেবিলের ওপর রাখে। আমি তাকাই। মীরার ঠোঁটে দুষ্টুমিভরা হাসি। চোখদুটো যেন নাচছে। উত্তেজনায়। দেখি কফি টেবিলের ওপর, চশমা পরিহিত, এক মাথা ঘন কালো চুল আর সরু গোঁফের এক সুশ্রী যুবকের ছবি চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

'জামাইয়ের ছবি বুঝি?'

'না, তোমাদের হবু জামাইয়ের। ওর নাম মানস। মানস চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি শেষ করছে। বায়োকেমিস্ট্রিতে। মা, বাবা, তুমি, তোমরা সকলে বরাবর যেমন পাত্র চাইতে আমার জন্যে, ঠিক তেমনই পাত্র মানস। খুব শান্ত, বুদ্ধিমান, ভদ্র। ভীষণ ভালো ছাত্র। তোমাদের দারুণ পছন্দ হবে।'

এত সহজে, এত নির্বিকারভাবে কথাগুলো বলে মীরা, মনে হয় ও যেন কুমারী, জীবনে সদ্য — প্রথমবারের মতো যেন পুরুষ মানুষ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে। ওর অত্যন্ত সাবলীল, স্বাভাবিক মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, ও হয়তো ভুলেই গেছে সঞ্চারের কথা। মীরা যে এখনো অন্য আরেকজনের সঙ্গে পূর্ণ বিবাহিতা, সেই বাস্তবতা হয়তো তার মনে কোথাও দাগ কেটে বসে নেই। আমার মুখ থেকে তাই অতি সহজেই প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে, 'আর সঞ্চার! ওর কী হবে? তোরা তো এখনো বিবাহিত, তাই না কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদ্য চান করে আসা মীরা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আরো একটু ভালো করে বসে। তারপর তার লম্বা ভেজা চুলগুলো একত্র করে সামনের দিকে টেনে এনে ডান হাতের কড়ে আঙুলের ধারটি দিয়ে জোরে এক বাড়ি মারে, যাতে বাড়তি জল ঝরে যায়। এভাবে চুল ঝাড়তে ঝাড়তেই মীরা বলে, 'এখানে চলে যখন এসেছি, ভাবছি এবার ওকে ছেড়ে দেব।'

একটু থেমে বলে, 'ডাকেই ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আর এদিকে মানসও খুব চেষ্টা করছে এখানে চলে আসার। গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়তে আসবে।'

'বাঃ! এরই মধ্যে তোর সব প্ল্যানই ঠিক করা হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু একটু বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে না কি?'

সুদীপও একই কথা বলে। তাড়াহুড়ো করে একবার যে ভুল করেছে, একই ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন আবার করতে না হয় মীরাকে। ডিভোর্স করা অবশ্যম্ভাবী হলে করুক ডিভোর্স। কিন্তু এই মুহূর্তেই নতুন কোনো সম্পর্কে, বিশেষ করে বিয়েতে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। ভাগনিকে পরিষ্কার তার মনোভাব জানিয়ে দেয় সুদীপ। বলে, 'ধীরে, বৎস, ধীরে।' সুদীপ মনে করে, যথেষ্ট সময় নেওয়া দরকার মীরার। ততদিনে এখানে নিজেকে খানিকটা গড়ে নেবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভাগনির বিক্ষিপ্ত মনটাকে কিছুটা প্রশমিত করার জন্যে, তার বর্তমান চিন্তাচেতনাকে খানিকটা ভিন্ন খাতে বইয়ে দেবার জন্যে, মামা তাকে স্থানীয় কমিউনিটি কলেজে দুটো কোর্সে ভর্তি করিয়ে দেন। একটি কম্পিউটার সায়েন্সে, অন্যটি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক এপ্রিসিয়েশনে। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে, সামনের সেমিস্টার থেকে ওর ভিসা পাল্টে ছাত্র ভিসা করিয়ে নেবার ইচ্ছা রয়েছে সুদীপের।

মীরা নিয়মিত ক্লাসে যায়, পরীক্ষায় ভালো ফল এনে দেখিয়ে মামাকে খুশি করে। এছাড়া উইকএন্ডে দুটো বাঙালি বাচ্চাকে কত্থক নাচ শিখিয়ে নিজের হাতখরচটাও জোগাড় করার ব্যবস্থা করে ফেলে সে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই। কিন্তু একটা কথা তার মামা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না। আর সেটা হলো, মীরা যা-ই করুক, যেখানেই থাকুক, দিনরাত সে জপ করে চলেছে মানসেরই নাম। তারই কথা ভাবছে সে অনুক্ষণ। বিভিন্ন রকম স্বপ্ন দেখে চলেছে তাকে নিয়ে। মানসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে মীরার। অপেক্ষা করে আছে কবে সে আসবে এদেশে। পড়তে। এবং ঘর-পালানো অবরুদ্ধ মীরাকে তার অতীতের সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত করে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে মানস তার সেই বিশাল, উন্মুক্ত আর সম্ভ্রান্ত সাম্রাজ্যে।

আর এদিকে, লক্ষ করি, এখানে আসার পর থেকেই মীরার রোগা পাতলা শরীরে একটু একটু করে মেদ-মাংস জমতে শুরু করেছে। আমেরিকার আলো, বাতাস, খাবার শরীরে লাগলে প্রথম প্রথম ওজন একটু বাড়ে প্রায় সকলেরই। তাই খুব অবাক হই না। মাস দু'-একের ভেতরই ওই বাড়তি মেদ আর মাংসপেশি মীরার শরীরের ঠিকঠাক জায়গায় লেগে গিয়ে ওকে আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনীয়, আরো লাবণ্যময় করে তোলে। সবসহ সাত-আট পাউন্ড ওজন বেড়েছে মীরার। এখন তাকে অনেক সুস্থ দেখায় — ভালো দেখায় — প্রশান্ত দেখায়। ঠাট্টা করে আমি বলি, 'বুঝলি তো, এ-সবই এখানকার হরমোন দেওয়া মুরগির গুণ।' কিন্তু মীরার ওজন বাড়া থেমে থাকে না তাতে। একটু একটু করে আরো মেদ ও মাংস জড়ো হতে শুরু করে তার শরীরে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে যায় যে, এক বিকেলে মীরা আমাদের জন্যে চা করে নিয়ে এলে ওর দিকে ভালো করে তাকিয়ে সুদীপ বলে ওঠে, 'তুই একটু ডায়েট আর এক্সারসাইজ করিস তো মীরা। বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছিস।'

আমি সভয়ে লক্ষ করি, আমার মতো মীরারও ছোটখাটো একখানা ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে, যেটা এ বয়সে বড্ড বেমানান। ওকে কথাটা বলতেই মীরা জানায়, আসলে এখানকার খাবারের জন্যে এরকম হচ্ছে না। এটা ওর বহু বছরের সমস্যা। মাসিক ঠিকমতো হয় না তার। যখনই এরকম অনিয়ম হয় পিরিয়ডের, তখনই হাত, পা, পেট ফুলে ওঠে। শুনে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। যেখানে ওর স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে বলে প্রথম দিকে আমরা বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, এখন দেখছি এটা একটা ব্যারাম ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু ওর হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই, আর এখানে চিকিৎসা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, আমি আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে তার কাছ থেকে ওষুধের কিছু ফ্রি স্যাম্পল এনে খেতে দিই মীরাকে। কিন্তু কোনো সুফল আসে না তাতে। অতঃপর বাধ্য হয়ে একদিন নিয়ে যাই তাকে আমার নিজের গাইনোকোলজিস্টের কাছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময়েই সমস্যাটার ধরন বুঝিয়ে বলি। এই ডাক্তার ভদ্রমহিলার জন্ম ও বেড়ে ওঠা পোল্যান্ডে। পূর্ব-ইউরোপিয়ানদের আদি সংস্কৃতি বজায় রেখে বেশ চাঁছাছোলাভাবে পরিষ্কার করে কথা বলেন তিনি। এদেশের অন্য মানুষদের মতো কথায় মধু মেশাতে শেখেননি, যদিও বহু বছর ধরেই এখানে প্র্যাকটিস করছেন।

দীর্ঘক্ষণ মীরাকে পরীক্ষা করার পর তিনি তাকে পরীক্ষা-ঘরে রেখেই আমাকে 'জরুরি তলব' করে বসেন একান্তে — তাঁর নিজের অফিসে।

'আপনি কি জানতেন মীরা বিবাহিতা?' ডাক্তার কোরি সরাসরি আমায় প্রশ্ন করেন। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই, 'জানতাম'।

'মীরা তার মেডিকেল হিস্ট্রির ফর্মে সমস্যা হিসেবে লিখেছে অনিয়মিত পিরিয়ড। আপনি নিজেও আমাকে তাই বলেছিলেন। এছাড়া মেডিকেল হিস্ট্রি ফর্মে সে নিজেকে অবিবাহিত বলেও উল্লেখ করেছে। এখন অবশ্য অন্য কথা বলছে। সে যাই হোক। আমার কাছে সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। ও বিবাহিত না অবিবাহিত, সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার।'

আমি হাসি। বলি, 'ওটা আসলে কোনো বিয়েই নয় ড. কোরি। তাছাড়া, সেটা ভেঙেও যাচ্ছে শিগগিরই।'

'সেটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু —'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার আসল বোমাটা ছুড়লেন ডাক্তার।

'কিন্তু, আপনি কি জানেন, মীরা প্রায় সাড়ে সাত মাসের প্রেগন্যান্ট।'

'কী বলছেন?' আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি।

'এই মাত্র বাচ্চাটির হার্ট-বিট শুনে এলাম। স্ট্রং হেলদি হার্ট-বিট। প্রথমে তো আপনাদের কথা শুনে আল্ট্রাসনোতে ওর পেটে টিউমার খুঁজতে চেষ্টা করছিলাম আমি। দেখি, কোথায় টিউমার? দিব্যি সুস্থ একটি কন্যাসন্তান ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনিউটিক ফ্লুইডে।'

'এ কী বলছেন আপনি?' নিজের কানে যা শুনছি, সবই কেমন অবিশ্বাস্য, অবাস্তব মনে হচ্ছে। মাথাটা আক্ষরিক অর্থেই ঝিমঝিম করছে।

'সত্যি তাই। কেমন করে দুজন নারী বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও এতদিন ধরে আপনারা ব্যাপারটা একদম বুঝতে পারলেন না! অবাক কাণ্ডই বটে। তবে আমার ধারণা, আপনার ভাগনি ঠিকই টের পেয়েছিল। হয়তো আশা করেছিল মিসক্যারেজ-ট্যারেজ হয়ে যাবে।'

নিজেকে বড় বোকা বোকা লাগছে আমার। দু-দুটি সন্তানের জননী হয়ে কী করে এমন একটি ব্যাপার ধরতে, এমনকি সন্দেহ করতেও পারলাম না আমি? চোখের সামনে, এতদিনেও? হঠাৎ মনে পড়ে, না বুঝেশুনে মীরার মাসিক নিয়মিত করার প্রচেষ্টায় তাকে আমার ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসা সেই ওষুধ খাওয়াবার কথা। কোনো ক্ষতি করে ফেললাম না তো শিশুটার? ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে, ওষুধের নাম ও ডোজ শুনে ডাক্তার হেসে আমায় আশ্বাস দেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাতে। বরং মিসক্যারেজ ঠেকাতে এই ওষুধই কখনো কখনো কোনো কোনো গর্ভবতীকে দেওয়া হয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

আমার হাত-পা ততক্ষণে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। মীরা আসলেই কবে থেকে প্রেগন্যান্ট, সন্তানটি কার, কেন সে এ-ব্যাপারে একটি কথাও বলেনি আমাকে, ডাক্তারের কাছে আসার মুহূর্তেও নয়, এসব কোনো কিছুই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না আমি। মীরা কি ভেবেছিল তার ইচ্ছার জোরে একটি তরতাজা, পূর্ণ প্রাণ তার শরীর থেকে আপনাআপনি অদৃশ্য হয়ে যাবে? ডাক্তার তার সহকর্মীকে দিয়ে এক কাপ গরম কালো কফি এনে খাওয়ান আমায়। বলেন, 'মেয়েটা খুব ভেঙে পড়েছে। বলছে, তার জীবনের সমস্ত আশা, সকল পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। সব শেষ হয়ে যাবে। অ্যাবরশন করাবার জন্যে আমার হাতে-পায়ে ধরে সে কী কান্না! বলে, আপনি আমাকে বাঁচান। কিন্তু এত অ্যাডভান্স স্টেজে অ্যাবরশন তো আর সম্ভব নয়। কোনোমতেই নয়। বুঝতেই তো পারছেন।'

হ্যাঁ, বুঝতে নিশ্চয় পারছি। এ সময় — এত দেরিতে গর্ভপাত করা যায় না। মা-শিশু কারো জন্যেই সেটা মঙ্গলকর বা নিরাপদ নয়। ডাক্তারের জন্যেও সেটা ঝুঁকিপূর্ণ, সম্পূর্ণ বেআইনি — প্রায় মানুষ খুন করার শামিল। মীরা যদি কয়েক মাস আগেও এ-ধরনের কোনো সম্ভাবনার কথা একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ করত! প্রাথমিক পর্যায়ে গর্ভপাতে তেমন ঝুঁকি নেই। তাছাড়া তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মা বানাবার কোনো বাসনাই আমার হতো না। কিন্তু এখন — আজকে ঘরে ফিরে গিয়ে সুদীপকে কী বলব আমি, তাই ভাবছি। এ-ধরনের ঘটনা কেবল কল্প-কাহিনীতেই শোনা যায়। বাস্তবে কখনো ঘটেছে বলে মনে হয় না।

ফেরার পথে রাস্তায় গাড়িতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। জানালা দিয়ে দুজনেই বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। বৃষ্টি-ভেজা পরিচিত শহরের আবছা অন্ধকার রাস্তায় হেডলাইটের অনুজ্জ্বল আলো ফেলতে ফেলতে আমাদের গাড়িটা দ্রুত ছুটে চলে সামনের দিকে। আমরা চুপচাপ বসে থাকি পেছনের সিটে।

বাড়ির খুব কাছাকাছি যখন এসে গেছি, খুব নিচু গলায় মীরা জানতে চায়, 'মামাকে কী বলবে?'

'অন্য কিছু বলার তো আর এখন উপায় নেই মীরা। ঘরে আয়। দেখি, কী করা যায়।'

একটু থেমে প্রশ্নটা, সেই অবধারিত জিজ্ঞাসা, আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে আমার মুখ থেকে, 'বাচ্চাটি কার মীরা? ঠিক করে বল। সঞ্চারের, না মানসের?'

'কী বলছ মামি? অবশ্যই সঞ্চারের। বিশ্বাস করো, আমি ঠিক জানি কবে, কেমন করে এটা ঘটল। ওকে সেদিনই বলতে গেছিলাম, আমি চলে যাচ্ছি আমেরিকা। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারিনি। মাঝখান থেকে...'

আমার ডান হাতের ভেতর সাদা কাগজ দিয়ে গোল করে মোড়া ওর আল্ট্রাসনোগ্রামের প্লেটটা আস্তে, অতি আস্তে, টেনে নিজের কাছে নিয়ে নেয় মীরা। আমার কেন জানি মনে হয়, মীরা বোঝাতে চায়, ওটা ওর নিজস্ব সম্পদ। আমার সঙ্গে এই আল্ট্রাসনোগ্রামের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে ওটা ওর কাছে থাকাই স্বাভাবিক।

আমি মনে মনে হিসেব করে দেখি, মুক্তির আশায় মীরা যখন দেশ থেকে এখানে ছুটে এসেছিল, তখন সে না জানলেও মাস দুয়েকের মতো অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সে বুঝতে পারেনি, যার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এত দূরে পালিয়ে আসছিল সে, তারই দেহজ জীবকোষ তখন ভ্রূণ হয়ে দ্রুত বেড়ে উঠছিল তার নিজের শরীরের অভ্যন্তরে।

সব শুনে সুদীপ একেবারে স্তম্ভিত। ফাঁকা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। একটু হয়তো লজ্জাও পায়, নিজের পরিবারের অনভিপ্রেত এসব ঘটনার কথা ভেবে। স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় সুদীপ বলে ওঠে, 'কী কেলেঙ্কারি বল দেখি! এখুনি টিকিট কাটা দরকার। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। যতসব! কী যে সব ঘটছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে!'

আমি থামতে বলি ওকে। 'আস্তে কথা বলো। আজ রাতটা যেতে দাও। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমুক। কাল এ নিয়ে কথা বলা যাবে। আর তুমি এখন ওকে কিছু বলতে যেও না। খুব আপসেট আছে।'

সুদীপ আমার কথা শোনে। আর কথা না বাড়িয়ে সোজা শুতে চলে যায়।

আমি বড় এক গ্লাসে করে চিনি দেওয়া গরম দুধ এনে দিই মীরাকে। সে এখানকার ঠাণ্ডা দুধ একদম পছন্দ করে না। এ সময়টায় প্রতিদিন বেশি করে দুধ খাওয়া জরুরি। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী চেহারা হয়েছে মীরার। মেয়েটির বিধ্বস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, যদি পারতাম কোনোমতে ওকে ওই মহাদুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে! আমার আয়ত্তে তেমন কিছু যদি সত্যি থাকত!

পরদিন অফিসে যাব না এটা স্থির করেই আমি বেশি রাত করে ঘুমুতে যাই। সকালে জেগে দেখি, আমার আগেই উঠে পড়েছে মীরা। গতকাল ওর ওজন বৃদ্ধি ও পেট মোটা হয়ে যাবার কারণটা ধরা পড়ে যাবার জন্যেই কি না জানি না, আজ যেন ওকে সত্যি সত্যি আরো টইটম্বুর, আর যথার্থই গর্ভবতী মনে হচ্ছে।

'সঞ্চারকে ফোন করবি?'

'না। আমি কাল রাতেই মানসকে ফোন করে সব বলেছি। ইউনিভার্সিটি অব পেনসেলভ্যানিয়া থেকে ওকে আই টুয়েন্টি পাঠিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ভিসা হয়ে যাবে। সেপ্টেম্বরেই পড়তে আসবে ফিলাডেলফিয়ায়। এখান থেকে কতদূর ফিলাডেলফিয়া, মামি?'

'কাছেই। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ। তা সব শুনে মানসের প্রতিক্রিয়া কী? কী বলল সে?'

মীরা একটুখানির জন্যে চুপ করে থাকে। তারপর বলে, একটু ভেবে দেখতে চায়, কালকের মধ্যে ফোন করবে।

'কাল পর্যন্ত তুই এভাবে বসে বসে অপেক্ষা করবি?'

'করব। ওকে যে সত্যি সত্যিই আমি ভালোবাসি মামি। আমার এই অবস্থা রাতারাতি সবকিছুই কি পাল্টে দিতে পারে? বল, পারে? নাকি, চাইলেই সব ভুলে যাওয়া যায়? তাছাড়া —'

'তাছাড়া?'

'তাছাড়া ওকে আমি চিনি মামি। আমার এমন দুঃসময়ে ও কিছুতেই পারবে না মুখ ফিরিয়ে নিতে।'

'কিন্তু তাহলে তক্ষণই, তোর কাছে সব শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে-কথা কেন বলতে পারল না সে? কেন সময় চাইল? তুই কি আসলেই ছেলেমানুষ মীরা? খাঁটি আবেগের সম্পর্কই যদি হয়, এত ভাবাভাবির কী থাকতে পারে সেখানে?'

'জানি না। তবে আমি অপেক্ষা করব। দেখো, সমস্ত প্ল্যান ঠিকঠাক করে ও আমায় কালই ফোন করবে।'

যতদূর জানি, মানস আর কোনোদিনই ফোন করেনি মীরাকে। আর অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোভাবেও যোগাযোগ করেনি। লোকমুখে পরে শুনেছি, সে এদেশে, ফিলাডেলফিয়ায় এসেছিল, যথাসময়েই। আর সম্ভবত এখানেই থেকে গেছে। মীরার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি তার।

তিনদিন পরে আমার সেই পোলিশ গাইনোকোলজিস্ট ড. কোরি ফোন করে একটা সংবাদ জানান আমায়।

'একটি পথ কিন্তু মীরার জন্যে এখনো খোলা আছে, যা তুমিও জানো। আর সেটা হলো, মীরা যদি তার সন্তানকে এডপশন করতে দিতে চায়। একটি সুস্থ সন্তানের জন্যে এখানে অনেক দম্পতিই অপেক্ষা করছে। খুশিমনে তারা হাসপাতালের সব খরচ দিয়ে দিতে রাজি হবে। এমনকি মায়ের জন্যে কিছু হাতখরচও। তবে, আগে থেকে কোনো ব্যবস্থা না করলেও শিশুর জন্মের পরে হাসপাতালকে জানালেও চলে। এজেন্সির লোকেরা এসে হাসপাতাল থেকেই মহা আনন্দে শিশুটিকে নিয়ে যাবে। এটা করলে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তান বড় করার দায়িত্ব আর নিতে হবে না এখন।' সবশেষে ডাক্তার আমাকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'এ সবই বলছি তোমায়, যদি মীরা সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে না চায়, তাহলেই —'

মীরার কাছে ডাক্তারের দেওয়া বিকল্প প্রস্তাব উচ্চারণ করতে আমার জিহ্বা নড়তে চায় না। দুই সন্তানকে তিল তিল করে বড় করে মাত্র কিছুদিন আগে কলেজে পাঠিয়েছি। কেমন করে কথাটা পাড়ি আমি, যেখানে এই ব্যাপারে মীরার মনোভাব কিছুই জানা নেই আমার! নিজের সন্তানকে চোখে দেখার পরে তাকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়, আমি বুঝি। আমার এক ক্যাথলিক সহকর্মী আছে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় শিশুপুত্রকে জন্ম দেওয়ার পর মা-বাবার চাপে বাচ্চাটিকে এডপশনে দিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু এরপর থেকে সারা জীবন, আজকে পর্যন্ত, বিরতিহীনভাবে সে কেবল তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুই বাহু বাচ্চা কোলে করার ভঙ্গিতে একটির ওপর আরেকটি লম্বালম্বিভাবে রেখে, মৃদু দোলাতে দোলাতে অশ্রু-সজল সেই ক্যাথলিক-কন্যা ধরা গলায় আমাকে একদিন বলেছিল, 'আমি ওকে জীবনে একটিবার মাত্র কোলে করে বুকের কাছে চেপে ধরার সুযোগ পেয়েছিলাম। একটি মাত্র চুমো খেয়েছিলাম। আমার কাছ থেকে নিয়ে যদি যাবে, ওকে দেখতে, ধরতে, কোলে করতে আমায় দিল কেন ওরা?'

মীরাকে কথাটা তবু বলতেই হয়। বলতে হয়, কেননা মানসের কঠিন নীরবতায় তার পৃথিবীটা ইতোমধ্যেই অনেক ছোট হয়ে আসছিল। মীরার সামনে বাকি জীবনের উন্মুক্ত পথগুলো আস্তে আস্তে একটি একটি করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাই ডাক্তার কোরির প্রস্তাবটা তাকে জানাই, কেননা, এটি শ্রেষ্ঠ উপায় বা বাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত যদি না-ও হয়, একটি বিকল্প ব্যবস্থা তো বটে।

কিন্তু ডাক্তার কোরির প্রস্তাব শুনে মীরা শুকনো ঠোঁটে হাসে। এ ব্যাপারটা নিয়ে গুরুত্বসহকারে কিছু ভাবার লক্ষণ দেখা যায় না তার মধ্যে। অথবা হয়তো ওর মনে হয়েছে, ওরকম ভাবনা বা সিদ্ধান্তের জন্যে ইতোমধ্যেই সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার হয়ে গেছে। মীরা বলে, 'মামাকে বলো আমার টিকিটটা কেটে দিতে। আমি কথা দিচ্ছি, এই টিকিটের টাকাটা যে করে হোক তোমাদের পরে দিয়ে দেব। আমার কাছে এ মুহূর্তে যে টাকা রয়েছে, তা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। হাসপাতালের খরচ তো ঢাকাতেও কম নয়!'

'তুই দেশে ফিরে যাবি তাহলে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়? মায়ের কাছে?'

মীরা আবার হাসে।

'না, সঞ্চারের কাছে। ওকে কাল রাতে ফোন করেছিলাম। সব বললাম। শুনে, মনে হলো, দারুণ খুশি সে। বলেছে, আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। বিমানবন্দরে আসবে। বাবা হবার জন্যেও নাকি খুব উদগ্রীব।'

এর এক সপ্তাহের মাথায় মীরাকে বিমানবন্দরে দিয়ে আসি আমরা। এখান থেকে দেশে ফিরে যাবার সময় কত মানুষ কত কিছু বেছে বেছে নিয়ে যায় সঙ্গে। কিন্তু মীরা যাবার সময় অন্য কিছু নয়, কেবল প্লাস্টিকের বড় একটি কোকের বোতলে করে রান্নাঘরের ট্যাপ থেকে নিজের হাতে এক বোতল ঠাণ্ডা জল নিয়ে গেল। 'এখানকার জলটা বড় স্বাদের।' মহা পরিতৃপ্তিতে ঢকঢক করে প্রতিদিন নিউইয়র্কের ট্যাপের জল খেতে খেতে মীরা বলত, 'তোমাদের জলটা বড় ভালো মামি। দেশে যদি কখনো ফিরে যাই, এই জলটা খুব মিস করব।'

মীরার অনুরোধে তার মা-বাবাকে তার শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে কিছুই জানাই না আমরা। সে নিজেই সব বলবে, কথা দিয়েছে। সুদীপ কেবল তার ছোড়দিকে টেলিগ্রামে লেখে, 'বিশেষ কারণে আগামী সপ্তাহেই মীরা হঠাৎ করে দেশে ফিরে যাচ্ছে। ওর স্বামী বিমানবন্দরে আসবে ওকে রিসিভ করতে। মীরা জানাতে বলল, সে ওখানে গিয়ে তোমাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমরা সকলে ভালো আছি।'

এরপর দীর্ঘ চব্বিশ বছর পার হয়ে গেছে।

লোকমুখে শুনেছি, নিজেরাও বেড়াতে গিয়ে কখনো কখনো টের পেয়েছি, ঘরে স্ত্রী-কন্যার সংযোজন সঞ্চারের জীবনযাপনের ধরনে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। এখনো ঘর থেকে বাহিরই তাকে বেশি আকর্ষণ করে। নেশার অভ্যেসটাও আগের তুলনায় বিস্তর বেড়েছে। সংসার চালাবার দায়িত্ব মূলত মীরার কাঁধেই এসে পড়েছে। তার চাকরির টাকায় সবটা কুলোয় না। একমাত্র কন্যা লিপিকে বরাবর পছন্দমতো ভালো ভালো স্কুলে পাঠাবার জন্যে মীরার নাচের স্কুলের মাস্টারিটাই প্রধান ভরসা।

সেদিন, সকালবেলায়, তেইশ বছর বয়সী লিপি তার এমকম পরীক্ষার তৃতীয় দিনে, মায়ের হাতের রাঁধা ইলিশ মাছ দিয়ে গরম গরম ভাত খেয়ে ঘর থেকে বেরোয়, অন্যান্য দিনের মতোই। কিন্তু পরীক্ষা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পরিবর্তে সে সোজা এসে হাজির হয় কোর্টে। সেখানে পূর্বপরিকল্পনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো সে তার বর্তমান প্রেমিক, কবি-যশোপ্রার্থী সমুদ্র নীলকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। সমুদ্র নীল সম্প্রতি লিপি-১, লিপি-২ ও লিপি-৩ এই শিরোনামে পরপর তিনটি কবিতা প্রকাশ করেছে কবিতাপত্রে।

কোর্ট থেকে লিপি আর ঘরে ফেরে না। বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়।

সেদিন ছিল চৈত্র মাসের ষোলো তারিখ।

মধ্য-চৈত্রের উথালপাথাল হাওয়া চারদিকে।

শুকনো মচমচে পাতা ও খড়কুটো অনবরত উড়ে বেড়াচ্ছিল শূন্যে।

প্রবল খরায় গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যেতে চায়।

দুপুর থেকে বিকেল অবধি না খেয়ে মেয়ের অপেক্ষায় রাস্তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মীরা, যেমন থাকে, উৎকণ্ঠায়, অন্যান্য পরীক্ষার দিনেও।

তারপর এক মুখ, দুই মুখ করে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

বাসন্তী হাওয়ার এক ঝাপটায় মীরার ঘরেও একসময়ে এসে প্রবেশ করে সেই খবর।

পাড়ার পরিচিতজনরাই সঙ্গে করে নিয়ে আসে তা।

মীরা নিরুত্তর। কোনো ভাব বা আবেগ প্রকাশিত হয় না তার মুখমণ্ডলে, কর্মে, চলনে।

একসময় সূর্য ডোবে।

দিনের আলো নিভে যায়।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে।

মীরা বাতি জ্বালাতে ভুলে যায়।

অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে সে চৌকির দক্ষিণ কোনায়।

কত সময় এভাবে পার হয়ে যায় মীরা জানে না।

আস্তে আস্তে রাত বাড়ে। হাওয়ার দাপটও।

তখন গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে।

কর্মব্যস্ত দিনের সকল কোলাহল থেমে গেছে অনেকক্ষণ!

একেবারে নিস্তব্ধ চারপাশ। কোথাও টুঁ শব্দটা পর্যন্ত নেই। প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে এই অঞ্চলে।

মীরা ধীরে ধীরে চৌকি ছেড়ে উঠে ঘরের দরোজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

সামনের খোলা বারান্দায়, পরিষ্কার আকাশের নিচে, সহস্র তারা আর আধভাঙা চাঁদের তলায় এসে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে।

অনেক জোরে জোরে হাওয়া বইছে চারদিকে। গাছপালা, বাড়িঘরে ধাক্কা খেয়ে সেই বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ করে কানে তালা লাগিয়ে দিতে চায়।

ঘাড় ভেঙে, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে, সোজা ওপরের দিকে চোখ করে চাঁদ আর নক্ষত্রখচিত আকাশটিকে ভালো করে একবার দেখে মীরা।

বেশ বড় করে একটা নিঃশ্বাস নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর দরোজার পাশে রাখা মাঝারি সাইজের দুটি উপচেপড়া কেরোসিনের টিন নিজের দু'হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে এক-এক করে ঢেলে দেয় সারা শরীরে।

আর তারপর, বিন্দুমাত্র দেরি না করে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরা ছোট্ট বাক্সটির ধারে বার কয়েক ঘষা জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠিটি আলতোভাবে স্পর্শ করিয়ে দেয় তার জবজবে সিক্ত বসনে।

কয়েক মুহূর্তের ভেতর মীরার অন্ধকার ঘরটির চারপাশ আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে।

সোনালি ঔজ্জ্বলতায় ভরে যায় একশ বছরের পুরনো বাড়ি — আর লাগোয়া চওড়া বারান্দা।

পাড়ার সকলে টের পেয়ে যখন ছুটে আসে, কোলাহল বাড়ে, ছোটাছুটি শুরু হয়; কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

বাঁচাবার চেষ্টায় হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয় না তাকে, এমনিভাবে এতখানিই জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল মীরার সর্বাঙ্গ।

সঞ্জার ঘরে ছিল না তখন। কয়েকদিন ধরে তার দলবলসহ কনসার্টের জন্যে রাজধানীর বাইরে অবস্থান করছিল সে, যেমনটি করতে হয় তাকে মাঝে মাঝেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলাশেষে নারী

রজঃনিবৃত্তি

রজঃনিবৃত্তি মেয়েদের জীবনচক্রের দ্বিতীয় অর্ধাংশের অর্থাৎ মধ্য-পর্বের শেষার্ধের একটি অবধারিত পরিণতি। কৈশোরের শুরুতে প্রথমবারের মতো যেদিন যৌনাঙ্গ থেকে প্রত্যাশিত, তবুও কেমন যেন প্রস্তুতিহীন অবস্থায় অকস্মাৎই বলা চলে, অপরিচিত রক্তপাত শুরু হয়, আর হকচকিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়েটি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তাকে তখন আবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাইরের মুক্ত বাতাসে সাবলীলভাবে খেলা করার দিন শেষ হয়ে এসেছে তার। সেদিন থেকেই রাতারাতি হঠাৎ যেন বড় হয়ে যায় সে। পায়ে অদৃশ্য বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় তার। মাসে মাত্র একবার করে কয়েকটি দিনের জন্যে এই রক্তক্ষরণ তার সার্বিক চলাচলের গণ্ডিকে সীমিত করে নিয়ে আসে, চারদিকে সতর্ক পাহারা, কড়াকড়ি ও বিশেষ রীতিনীতির প্রকোপ বেড়ে যায় রাতারাতি। মোট কথা, তার স্বাধীনভাবে, উন্নত শিরে হেঁটে চলে বেড়াবার দিন শেষ হয়ে আসে হঠাৎ করেই। কেননা সেদিন থেকেই মাতৃত্বের ক্ষমতা অর্জন করে নারী, যে ক্ষমতাকে, কৌমার্য রক্ষা করার নামে, রক্তচক্ষু দিয়ে প্রহরীর মতো আগলে রাখতে চায় চারপাশের সকলে — তার শুভাকাঙ্ক্ষীর দল। আর তখন থেকেই সমাজের ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সার্বক্ষণিক সতর্ক দৃষ্টি থাকে তার ওপর, পাছে পা পিছলে যায়, পাছে কেউ তার সুযোগ নেয়, ক্ষতি করে।

এইভাবে তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের জীবনটির অর্ধেক সময়জুড়েই প্রতি মাসে যে রক্তঝরার দিন আসে, অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক একটি প্রক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও যার অস্তিত্বের গোপনীয়তা রক্ষা করা তার জন্যে আশু জরুরি হয়ে পড়ে, যার আনুষঙ্গিক ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে পূর্ণ পরিচিত হয়েই বেড়ে ওঠে সে, এবং অন্তঃসত্ত্বাকালীন নয়টি মাস ব্যতীত প্রতিমাসেই যে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে বহু বছর। কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে বা তার কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়ে তিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এই ক্ষরণ, যা আবার হঠাৎ করেই অথবা ধীরে ধীরে একদিন প্রাকৃতিক নিয়মেই বন্ধ হয়ে যায়। রজস্বলা নারীর রজঃনিবৃত্তি ঘটে সেদিন থেকেই। আর নিয়মিত প্রতিমাসে এই অপ্রিয় দর্শন বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বাচ্ছন্দ্যকর অভিজ্ঞতা শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে নারী জীবনে সূচিত হয় আরো অনেকগুলো পরিবর্তন। শুরু হয় এক নতুন পর্ব। যে স্রাবকে একদিন মনে হতো একটি বাড়তি ঝামেলা, মারাত্মক বাধা, বিশেষ করে বাইরে যাবার বেলায়, তা যখন একসময় সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়ে যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তখন বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যা এবং অস্বস্তিকর উপসর্গের আভাস দেখা দেয় রাতারাতি। এছাড়া, মানসিকভাবেও প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিনে কিছু যেন খুঁজে বেড়ায় নারী। যা ছিল, কিন্তু এখন নেই, যা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে।

রজঃনিবৃত্তি শুধু নারীর প্রজননক্ষমতার সমাপ্তি ঘোষণা করে না, কারো কারো জন্যে এই হরমোনের ঘাটতি বিভিন্ন রকম জটিলতা, প্রতিবন্ধকতা ও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যেরও সৃষ্টি করে। হৃৎপিণ্ডের বিবিধ অসুখ, বহুমূত্র, বাত ও ক্যান্সারসহ অনেক রকম রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এ-সময়। শরীরের যে রাসায়নিক পরিবর্তন, অর্থাৎ নারী-হরমোনের নিয়ত ওঠানামার প্রক্রিয়া থেমে যাওয়া এবং শরীরে নারী হরমোনের পরিমাণ হ্রাস এই রজঃনিবৃত্তির জন্যে দায়ী, তা অনেক সময় বহু ধরনের আনন্দ, ফুর্তি, উল্লাসের উৎসও নিভিয়ে দেয়, যৌনসঙ্গে নিরুৎসাহী করে তোলে কাউকে কাউকে। কারো কারো মন-মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। অন্যের সঙ্গে ব্যবহার বা সম্পর্কও নেতিবাচক অর্থে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে কারো কারো বেলায়। শরীরে জ্বালাপোড়া, হঠাৎ করে গরম বা ঠাণ্ডা লাগা, মাথাধরা, যৌনাঙ্গ শুকিয়ে যাওয়া অথবা যৌনমিলনে তীব্র ব্যথার অনুভূতি বা আনন্দ না পাওয়া, সামান্য কারণে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়া, নিদ্রাহীনতা, অরুচি, অম্বল বা গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি নানাবিধ অসুবিধা দেখা দিতে পারে এই সময়।

কিন্তু জীবনের এই অনিবার্য বিশেষ পর্যায়কে কেউ কেউ আবার অতি সহজেই মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়। নিজেকে অনায়াসে এবং অত্যন্ত সহজভাবে মানিয়ে নেয় তারা নতুন পরিস্থিতিতে। কিন্তু এই শেষোক্ত নারীরাও যারা পর্যায়ক্রমে, সহজভাবে এবং সাহসের সঙ্গে এই পরিবর্তন নিজ শরীরে ধারণ করে, তাদের ক্ষেত্রেও রজঃনিবৃত্তি যে জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বাঁক-পরিবর্তন, সেই ভিন্নতর উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা স্বীকার করার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নেই তাদের।

বয়স বাড়ার কারণে এই সময় কাজ থেকে অবসরগ্রহণ করেন অনেক নারী। কেউ কেউ আবার নতুন করে গৃহবন্দি ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন শারীরিক অসামর্থ্যে, কিংবা মানসিক বা আর্থিক নির্ভরতার কারণে। সব মিলিয়ে এটি নারীর জীবনের ক্রান্তিকালে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে। পুরুষ-শরীরের বার্ধক্যজনিত পরিবর্তন, নারীদেহের পরিবর্তনের মতো তেমন প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, অকস্মাৎও দেখা দেয় না। প্রাত্যহিক জীবনের মান, কাজকর্ম বা উপলব্ধিতেও তা নারীর অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাছাড়া বয়সজনিত কারণে সৃষ্ট পুরুষের শারীরিক অক্ষমতা নিবারণের জন্যে বাজারে রয়েছে অজস্ররকম ওষুধ ও টনিকজাতীয় দ্রব্য। নারীর জন্যে তেমন বিশেষ কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই — থাকলেও তা অত্যন্ত অপ্রতুল তার পুরুষ সঙ্গীটির তুলনায়। মিইয়ে যাওয়া নারী-হরমোন বাইরে থেকে সরবরাহ করে একসময় নারী তার যৌবনকে প্রলম্বিত করে জীবনের গুণগত মান বাড়াবার চেষ্টা করেছে। এতে ওষুধের কোম্পানি ও স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত পেশাদাররা যতখানি লাভবান হয়েছেন, নারী ততটা হননি। কেননা অচিরেই দেখা গেছে কৃত্রিম উপায়ে এই হরমোন সরবরাহ নারী শরীরে নানারকম বিষক্রিয়া ও বিভিন্ন ধরনের অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও এখনো কেউ কেউ শরীরের ভেতর শুকিয়ে যাওয়া হরমোন প্রবাহ তাজা করতে বাইরে থেকে নারী-হরমোন গ্রহণ করে থাকে। অনেক গবেষণাতে দেখা গিয়েছে যে, দীর্ঘকাল ব্যবহারে এর কুফল আপাত সুফলকে অনেক গুণে ছাড়িয়ে যায়।

অধিকাংশ সমাজেই শস্যের জন্মের পর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার কারণে শস্যমাতার মৃত্যুকে প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে ধরে নেওয়া হয়। সন্তানের জন্ম দেওয়া ও তাকে লালন-পালন করে স্বাবলম্বী করে দেবার পর সমাজে ও পরিবারের কাছে নারীর প্রয়োজনীয়তাও তেমনি হ্রাস পায়। সে জন্যেই বাকি জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্যে নারীর নিজেকেই নিজে তৈরি করে নিতে হবে। এই ব্যাপারে পুরুষের বা জীবনসঙ্গীর সহযোগিতা সবসময় নাও মিলতে পারে, কেননা এটা সর্বকালে সর্বত্র স্বীকৃত যে, নারীর যৌবন এবং রূপই পুরুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও আরাধ্য উপকরণ। সময়ের স্বাভাবিক গতিতে সেই দুটি ক্ষীয়মাণ ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু ধীরে ধীরে জীবন থেকে হারিয়ে গেলে অনেক সময়েই নারী হয়ে পড়ে উপেক্ষিত, অবাঞ্ছিত, একাকী। বয়সে অধিক বা সমবয়সী পুরুষ সঙ্গীটি কিংবা দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের সাথী স্বামীটি কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বার্ধক্যকে জীবনে মেনে নিতে পারেন না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বৃদ্ধ হতে প্রায়শই নারাজ পুরুষ। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নারীদেহের উত্তপ্ত তারুণ্য ও সৌন্দর্যের প্রতি থাকে তার বিপুল আকর্ষণ। সেই দুর্লভ সঙ্গ অর্জনের স্বপ্ন, বাসনা বা ফ্যান্টাসি রয়ে যায় তার মনে সারাজীবন। ওদিকে সন্তান, সংসার, নাতি-নাতনি, অসুখবিসুখ ও সংসারের সার্বিক আনন্দ-কষ্ট নিয়ে, অথবা এর ঠিক উলটো প্রান্তে বসে নির্জনে, নিরালায়, নিভৃতে, একাকী বার্ধক্যের মোকাবিলা করে যায় নারী। জীবনের দৈর্ঘ্য প্রলম্বিত হওয়ায় আজ একটি নতুন প্রজন্মকে স্বাবলম্বী করে তুলেই নারীর মৃত্যু ঘটে না। অর্থাৎ রজঃনিবৃত্তির পরেও এখন বহু বছর বেঁচে থাকে নারী। ফলে তার রজঃনিবৃত্তির পরের এই জীবিত সময়টাকে ফলপ্রসূ ও অর্থবহ করে তোলার জন্যে নিজেকে আগে থেকেই প্রস্তুত নিতে শুরু করতে হবে। যে সুকুমার বৃত্তি বা যে ছোটখাটো শখ এতকাল সংসারের নানা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে নারী, এই সময় সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার কথা ভাবতে পারা যায়। দেশ ও সমাজের জন্যে স্বেচ্ছাসেবকমূলক কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলে জীবনের হৃত আনন্দের কিছুটা অন্তত ফিরে পাওয়া সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শারীরিক

ইদানীং রাতে ঘুম কম হয় বাসনার।

প্রথমত, সে-সময়টা অনেক আগেই পার হয়ে গেছে, যখন যেখানে-সেখানে কোনোমতে একটু শুয়ে পড়তে পারলেই ঘুমিয়ে পড়া যেত। স্থানকালের তেমন কোনো বাছবিচার ছিল না। আজকাল সেটা আর ঘটে না। শুধু পরিচিত বিছানা আর রাত্রির গভীরতাই যথেষ্ট নয়, দরকার হয় আরো অনেক কিছুর, এই নিছক একটু ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে। জানালার দুই পর্দার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া বাইরের সামান্য একচিলতে আলো — হোক সে বৈদ্যুতিক অথবা প্রাকৃতিক, অথবা বাথরুম থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়া জলের মৃদু আওয়াজ, কিংবা বাইরের ঘরের টেলিভিশন থেকে এ-ঘরে চুঁইয়ে আসা নিচু লয়ের অস্পষ্ট কথাবার্তা, সবকিছুই এখন ঘুমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিছানায় যাবার পরেও তাই অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে বাসনা।

কোনো কোনো রাতে পিপাসায় প্রবলভাবে গলা শুকিয়ে যায়। উঠে বসে ঢকঢক করে একগাদা জল খায় সে। কখনো হঠাৎ খুব গরম লাগে — রীতিমতো ঘামতে থাকে সর্বাঙ্গ। কখনো আবার ঠিক একই ঋতুতে, এমনকি একই রাতে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, আবার শীতের কাঁপুনিতে সারা গায়ে কাঁথা টেনে দিতে হয়, যখন কি না অন্যরা জানালা খুলে দেয় একটুখানি খোলা হাওয়ার জন্যে। এরকম বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একসময়, গভীর রাতে অথবা হয়তো রাত্রিশেষে অতি ভোরে, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে। ঘুম থেকে উঠতে তাই প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তাতে কী! খুব সকালে ওঠা তার জন্যে তো আর জরুরি নয় কোনোভাবেই। অবসরের বয়স হবার আগেই কাজ থেকে যেহেতু অব্যাহতি নিয়েছে, সকালে ওঠার তাড়াও আর নেই তার। এ-বাড়ির অন্য বাসিন্দাটি তো অবসর নেবার পর থেকে বেলা বারোটার আগে প্রায় কখনোই বিছানা ছেড়ে ওঠে না।

এছাড়া, আরো একটা ব্যাপারও ঘটেছে ইদানীং। যত রাতই হোক না কেন, ঘুম পাওয়া যাকে বলে অর্থাৎ ঘুমে কাতর হয়ে পড়ার ব্যাপারটা আর ঘটে না আজকাল। দুচোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে আসছে ঘুমে, নিজেকে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে শত চেষ্টা সত্ত্বেও, সেসব তো কবেকার কথা — মনে হয় আরেক জন্মে যেন ঘটেছিল। এখন ঘুমটাও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম-কর্তব্যের মতোই আরেকটি বাড়তি দায়িত্ব কেবল। কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরক্তিকরও, কেননা কাজটা আবার নিজের জন্যেই করতে হয় কি না! বাসনা ঘুমুতে যায়, যেতে হয়, কারণ ঘুম প্রয়োজন শরীরের জন্যে, সুস্থতা বজায় রাখার জন্যে, কর্মক্ষম থাকার জন্যে। আর কেবল সে জন্যেই শুতে যাওয়া। বিছানার আর কোনো আকর্ষণ বা আনন্দ নেই আর। সেটা যে কখনো একেবারে ছিল না, একথা হলফ করে বলতে পারবে না, সুবলকথিত 'জমাট-বাঁধা-শীতল' বাসনা নিজেও।

সুবলের কথা অবশ্য আলাদা। ইদানীং প্রায় রাতেই ক্লাবে যায় সে, যেখানে যেতে বাসনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। দু-এক পেগ হুইস্কি আস্বাদনে এখনো যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে সুবলের। তাছাড়া, সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে সযত্নে লালিত ঘন গাছপালা আর মৌসুমি ফুলের বাগান ঘেরা এই পুরনো অভিজাত ক্লাবে, যেখানে আপ্যায়নের কোনো দায়িত্ব নেই, বরং যতক্ষণ থাকা সেখানে, নিজেই হতে থাকে যথেষ্ট পরিমাণে আপ্যায়িত, কয়েকজন পুরনো বন্ধু আর দু'চারজন সুসজ্জিতা বন্ধুপত্নীর সঙ্গ মন্দ লাগে না একেবারে। গ্লাসের উদ্দীপক পানীয়, চারপাশের লোকজনের মধ্যে ফুর্তি-ফুর্তি ভাব, স্বতঃস্ফূর্ত দিলখোলা হালকা পরিবেশ, বিশাল হলঘর ভর্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুরাতন, দুষ্প্রাপ্য আসবাবপত্র ও ঝালর-বাতি, টেবিলে টেবিলে তাজা অর্কিডসহ বিভিন্ন ফুল, পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো বিশাল পিয়ানোতে পরিচিত বাদকের অনুশীলিত আঙুলে বেজে চলা বিটোভেনের সপ্তম সিম্ফোনি এবং সেই সঙ্গে নিচু স্বরে বিভিন্ন বায়বীয় আলোচ্য বিষয়ে মগ্ন সকলকেই দেখা যায় যথেষ্ট প্রাণবন্ত, প্রশান্ত ও হাসিখুশি। প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ সমস্যা, ঘরসংসারের টুকিটাকি খড়কুটোর মতো ভেসে যায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে। খোশ মেজাজে ঘরে ফেরে সুবল।

ফেরার পর ঘুমের সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করে সুবল চুপচাপ বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত পুরনো দিনের ছবি দেখে টেলিভিশনে বা ডিভিডিতে। একই ছবি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কতবার করে যে সে দেখে! ভালো ছবি বারবার করে দেখতে খারাপ লাগে না তার। বিছানায় যাবার তাড়া সে অনুভব করে না, যা এক দশকেরও বেশি হয়ে গেল। তবে কোনো কোনো রাতে একান্তই যদি ছবি দেখতে মন না চায়, অথবা নিচু স্বরে সিডিতে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে আগ্রহ বোধ না করে, কিংবা কোনো বই চোখের সামনে খুলে ধরার ধৈর্যও না থাকে, তখন একটি ঘুমের বড়ি খেয়ে চুপচাপ এসে শুয়ে পড়ে বিছানায়, তার নির্দিষ্ট দিকটাতে, অর্থাৎ খাটের বাঁদিক ঘেঁষে। সারাদিন ধরে প্রায় কিছু না করার একঘেয়েমিতে ক্লান্ত শরীরটায় অবসাদ এসে ভর করতে সময় লাগে না। সুবল ঘুমিয়ে পড়ে। অতি সহজেই। টের পায় না, অনেক আগে শুতে আসা বাসনা তখনো পূর্ণ জাগ্রত — ঘুমের প্রত্যাশায় একটানা ছটফট করে চলেছে।

কখনো কখনো প্রশস্ত বিছানার অন্য প্রান্ত থেকে বাসনার প্রশ্ন, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি', বন্ধ দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ভেসে আসা বাইরের বৃষ্টিপাতের অস্পষ্ট শব্দের মতো, আছড়ে পড়া ধলেশ্বরীর ঢেউয়ের মতো, তারপাশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালীমন্দিরের লাগোয়া আটচালা টিনের প্রকাণ্ড বারোয়ারি হলঘরে প্রতিটি কথার ভৌতিক অনুরণনের মতো, অথবা অবাস্তব-আজগুবি এক স্বপ্নের মতো, অলৌকিক কোনো আওয়াজের মতো কানে প্রবেশ করলেও তখন জবাব দেবার আর অবস্থা থাকে না সুবলের।

'মেয়েটা এখন কেমন আছে, জোড়া দেওয়া সম্পর্ক কি আসলেই আর কোনোদিন স্বাভাবিক হয়, না জোড়া লাগে, ওদের বেলায় শেষ পর্যন্ত কী হলো, একবার জানতেও চাও না কখনো। আচ্ছা বলো তো, মেয়ের সঙ্গে শেষ কবে কথা বলেছ তুমি? মনে করতে পার? আমার হয়েছে মরণ! না পারি ভুলতে। না পারি কিছু করতে। মেয়েটাও এমন হয়েছে। নিজে থেকে যোগাযোগটা করে না পর্যন্ত।'

আফসোস শেষে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে সাবধানে একখানা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বাসনা। ততক্ষণে বিছানার ওপাশ থেকে আসা সুবলের সশব্দ নাকের আওয়াজ সচকিত করে তোলে তাকে। বুঝতে পারে, এতক্ষণ ধরে সে একা একাই কথা বলছিল, যা ইদানীং প্রায়ই করতে হয় তাকে। তার মানে, বাসনার একটা কথাও কানে যায়নি সুবলের, গেলেও তা তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায়নি। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। তবে বাসনার কথা না শোনা বা তাতে মনোযোগ না দেওয়ার জন্যে সবসময় ঘুমিয়েও পড়তে হয় না সুবলকে। টানটান জেগে থেকেও শ্রবণের জন্যে যথেষ্ট উঁচু লয়ে উচ্চারিত বহু কথা — বহু মন্তব্য অগ্রাহ্য করার বিস্ময়কর এক ক্ষমতা রয়েছে তার — বিশেষ করে সুবলের ব্যক্তিগত অপছন্দের অথবা নেতিবাচক কোনো প্রসঙ্গ যখন ওঠে। বাসনা বোঝে, আজ রাতে ঘুম আসতে আরো দেরি হবে তার। অন্য পাশ ফিরে সাদা দেয়ালের দিকে মুখ করে সটান চেয়ে থাকে তাই।

শুয়ে শুয়ে আরো একটি দীর্ঘ রাতের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নেয়। অবশেষে একটি সময় আসে, যখন প্রতীক্ষার পালা শেষ হয়। তার সুদীর্ঘ অপেক্ষা, যা কখনো কখনো অনন্তকাল বলেই মনে হয়, শেষ হতে-হতে সত্যি সত্যি আরো একটি রাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঠাণ্ডা ভোরের হাওয়ায় আস্তে আস্তে চোখ বুজে আসে ঘুমে। বাসনা ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রিশেষে হালকা প্রভাতি আলো, পাখির কিচিরমিচির, মৌসুমি ফুলের গন্ধ আর এলোমেলো মৃদু হাওয়া তখন চতুর্দিকে খেলা করতে শুরু করে। বাসনার কপালের দুই পাশের ছোট ছোট চুল আর জুলফির ভেতর উঁকি দেওয়া সামান্য রুপালি রেখা নরম রোদে সামান্য চিকমিক করে ওঠে। রাতে শোবার জন্যে নিজের হাতে বানানো তার শুভ্র নরম সুতি বসন খোলা জানালা দিয়ে আসা হালকা হাওয়ায় ঈষৎ কাঁপতে থাকে। বাসনা ঘুমোয়। সুবল নিজেও ঘুমের ঘোরে তখনো সম্পূর্ণ অচেতন।

'এই, এদিকে একটু দেখবে?'
'কী দেখব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এসো এদিকে। দেখোই না একবার।'

সুবল ঠিক বুঝতে পারে না, এত রাতে — ঘুমুতে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে, এই সময়, কী এমন জরুরি জিনিস তাকে দেখাতে চাইছে বাসনা। বেড-কভার সরিয়ে দেওয়া ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা তাদের বিশাল বিছানার ওপরে কোনো কিছুই তার চোখে পড়ে না। বালিশে ঠেস দিয়ে, পিঠ সোজা রেখে, পা ছড়িয়ে, আধ-শোয়া অবস্থায় সুবলের দিকে মুখ ফেরানো বাসনার হাতের মধ্যেও কিছু আছে বলে মনে হয় না। দুটো হাতই খোলা। তাহলে? খাটের অন্য প্রান্তে শোয়া সুবলের এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাকে বাসনার পাশে সরে এসে কিছু দেখতে বলছে সে।

বহুদিনের অভ্যেস অনুযায়ী বাসনা ও সুবল আজো একই বিছানায় ঘুমোয়। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল পরস্পরের কাছাকাছি আর আসে না তারা। ঘুমের ঘোরেও, ভুলেও, গায়ে-গায়ে স্পর্শ ঘটে না আর। কার্যকারণ সম্পর্কে বাসনা যদিও নিঃসন্দেহ নয়, তবু তার ধারণা, এর জন্যে অন্তত আংশিকভাবে দায়ী বছর কয়েক আগে কেনা এই প্রশস্ত বিছানাটি। এটা এতটাই চওড়া যে বয়সের ভারে খানিকটা খাটো হয়ে যাওয়া তাদের শীর্ণ শরীর দু'খানা বিছানার দুই পাশে যখন পড়ে থাকে, মাঝখানে রয়ে যায় ধু-ধু মরুভূমির মতো বিস্তর এক ব্যবধান। অসাবধানতা বা স্বপ্নের ঘোরেও পরস্পরের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির কোনো সম্ভাবনা থাকে না এখানে। বড় বিছানা কেনার পরামর্শ ও উদ্যোগটা অবশ্য সুবলেরই। রাতে বারকয়েক বাথরুমে যেতে হয় তাকে। এ বয়সে কোন পুরুষেরই-বা প্রস্টেটের সমস্যা থাকে না! এমনিতেই পাতলা ঘুম বাসনার। তারপর বারবার তাকে যদি সুবলের ওঠানামার জন্যে রাতে জাগতে হয়, ঘুমের আরো ব্যাঘাত ঘটবে, আর তারই জন্যে এ ব্যবস্থা, বলেছিল সে।

এমন একটা সময় ছিল যখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে না শুলে ঘুম আসত না দুজনের, কারোরই। এখন হয়তো সেটা করতে গেলে উল্টোটিই ঘটবে, কে জানে? তবে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে, আলোচনা করে, কিংবা কোনো ঝগড়া-তর্ক বা মান-অভিমানের ফলশ্রুতিতে শোবার এ ব্যবস্থা ঘটেনি। এমনিতেই অতি ধীরে ধীরে তারা একটু একটু করে সরে এসেছে খাটের দুই প্রান্তে, যে যার পাশটায়। এখন তারা একই সময় শুতে পর্যন্ত আসে না আর।

বাসনা তাকে আজ রাতে কী দেখাতে চাইছে জানে না সুবল। তবে এটা সত্য, ঠিক কবে থেকে বিছানায় তাদের দূরত্ব রচিত হয়েছে সেটা মনে করতে না পারলেও সুবল জানে, এই সরে আসা স্থায়ী হবার পেছনেও ছিল এক দেখা — এক বিশেষ দৃশ্য। মারাত্মক সেই দর্শন। চক্ষু বিদীর্ণ করে, দৃষ্টি আহত করে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেই শেষ বিকেলের আলোয় সুবল ভালো করে দেখেছিল তার স্ত্রীকে সেদিন। অনেকদিন পর, এমন গভীরভাবে তাকে দেখার সুযোগ হয়েছিল তার। অসাবধানতায় বাথরুমের দরোজা খোলা রেখেই সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন বাসনা তখন স্নান শেষে কাপড় বদলাবার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিল। আশেপাশে কেউ থাকতে পারে সেটা হয়তো ভাবতেও পারেনি সে, কেননা এক জরুরি কাজে সেই সকালেই শহরের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল সুবলকে। সন্ধ্যার আগে ফেরার কথা ছিল না তার। পাতলা এক পরত মেদের নিচে ঝুলে পড়া চামড়ার বাম বাহুখানা বাড়িয়ে ভেজা তোয়ালেটা দেয়ালের সঙ্গে আঁটানো হোল্ডারে ঝুলিয়ে সেখান থেকে পরার জন্যে শুকনো সায়া ও ব্লাউজ তুলে নিতে চেষ্টা করছিল বাসনা। আর ঠিক তখনই শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সুবল। বাসনা, পরিচয় হবার আগেই যে সুবলের দৃষ্টি কেড়েছিল একদিন, বলতে গেলে যার শরীরই প্রথম আকর্ষণ করেছিল তাকে, ভালোবাসা এসেছিল আরো অনেক পরে, সেদিন অসাবধানতায় উদোম হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুবলের চোখের সামনে। দম বন্ধ করে, স্তব্ধ-শীতল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্য এক বাসনাকে দেখেছিল সুবল সেই বিকেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়কার সেই আঁটোসাঁটো বাঁধনের সুগঠিত শরীরের বাসনার এ কী দশা হয়েছে এখন! কেবল চুপসে পড়া বেলুনের মতো নিম্নমুখী স্তনজোড়াই নয়, তার দুই উরুতে ও পশ্চাৎদেশে আগের সেই মসৃণতা, সেই কুসুম-পেলবতা আর টানটান ধবধবে ফর্সা চামড়া আর অবশিষ্ট নেই। তার পরিবর্তে সেখানে এখন যা প্রধানত দৃশ্যমান, তা হলো তার দেহের সবচাইতে প্রশস্ত ও ভারি হাড়গুলোর একত্র সমাহার, যা শরীরের ভেতর থেকে নির্লজ্জভাবে চামড়া ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে। হাড়ের ওপর বিছানো মেদমাংসহীন কুঁচকানো চামড়াকে তুলনা করা চলে কেবল থিকথিকে কাদাজল-রৌদ্রে শুকিয়ে যাবার পর পলিমাটিতে পড়ে থাকা অসংখ্য ভাঁজের সঙ্গেই। বাসনার ধবধবে ফর্সা, নরম ত্বকের ওপর বাটিকের ছাপা কাপড়ের মতো এখন মাঝে মাঝেই ছড়িয়েছিটিয়ে আছে বয়সের বাদামি ছোপ। সময়ের নিষ্ঠুর সাক্ষী বাসনার এই শরীর কয়েক প্রস্থ বস্ত্রের আড়ালে সবসময় ঢাকা থাকার কারণে রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে সুবল তা অনুভব করলেও এমন স্পষ্টভাবে আর কখনই তা উন্মোচিত হয়নি তার কাছে। তাছাড়া, সুবল জানে, এ ধরনের দৈহিক সকল পরিবর্তনই ঘটে অতি ধীরে— অনেকদিন ধরে, আস্তে আস্তে। প্রাত্যহিক এই বদলানো টের পাবার মতো হয়তো এতটা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ছিল না সুবলের। অথবা তার স্পর্শের অনুভূতিও হয়তো একই রকমভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। তাই বাথরুমে সেদিন বাসনার ওই রূপ দেখে সে চমকে উঠেছিল। একসময়ের দৃষ্টিনন্দন ও শাড়ি উপচেপড়া বাসনার উদ্ভাসিত নিতম্ব আজ চৈত্রের শুকনো পাতার মতো তার পিঠের সঙ্গে একই সরলরেখায় — একেবারে সমান্তরাল হয়ে দণ্ডায়মান। সুবল দেখে, মেদে ভরা ভারি তলপেট সম্পূর্ণ সমতল নিতম্ব নিয়ে এক অপরিচিতা প্রবীণ নারী তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের শারীরিক শৈথিল্যের কথা, তার দৈহিক পরিবর্তনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায় সুবল। সে তখন কেবলই বাসনাকে দেখতে থাকে। আর এই বিশেষ দেখা বা পর্যবেক্ষণই পরবর্তীকালে বাসনাকে আরো ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না দেখার ইচ্ছা পোষণ করতে, তার শারীরিক সান্নিধ্য পাবার ব্যাপারে অনাগ্রহ জন্মাতে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। তবে তাদের শোবার ঘর-সংলগ্ন বাথরুমে সেই বিশেষ দেখার ব্যাপারটি বাসনাকে কখনো জানতে দেয়নি সুবল। চট করে সেদিন সরে গিয়েছিল সেখান থেকে, বাসনা মুখ ঘোরাবার আগেই।

কিন্তু আজ রাতে এ কী দেখাল বাসনা? এসব কী দেখছে সুবল? বাসনার কথামতো কিছু একটা দেখার জন্যে বিছানায় তার পাশে সরে এলে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ না করে বাসনা অনায়াসে কোমরের দড়ির গিট খুলে তার পরনের কাপড় আলগা করে দেয় খানিকটা। তারপর, 'দেখো তো এখানে কী হয়েছে?' বলে নিজের বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে শরীরের পেছন দিকে যে জায়গাটা দেখতে বলে, সেটি তার বাম উরুর একেবারে অগ্রভাগ — অর্থাৎ নিতম্বের শেষ প্রান্ত। এখানে একদিন মেদ ও মাংসে পরিপূর্ণ সুডৌল শোভা — বাসনার শরীরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, নিতম্ব, এসে মিশেছিল ভরাট ও মসৃণ উরুর সঙ্গে। মাংস আর মেদ স্থানচ্যুত অথবা উধাও হয়ে যাবার পর সেখানে এখন সৃষ্টি হয়েছে এক অগভীর গর্ত, যার ভেতর, সুবল লক্ষ করে, গায়ে গা লাগানো অসংখ্য লালচে রঙের ঘামাচির মতো গোটা বাসা বেঁধেছে। এ-দৃশ্য অনায়াসে সুবলের মধ্যে প্রবল বিতৃষ্ণা অথবা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারত। পারত তাকে শামুকের মতো সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলতে। কিন্তু আজ রাতে কেন জানি তা ঘটে না। পরিবর্তে সে তার ডান হাত বাড়িয়ে বাসনার গোটায় ভরা চামড়াটার ওপরে আলতোভাবে হাত বোলাতে থাকে। কেমন যেন খসখসে, এবড়োখেবড়ো — শক্ত হয়ে গেছে চামড়াটা ওখানে। জায়গাটা একটু উত্তপ্তও মনে হয়। সুবল বোঝে, এটা ঘটতে নেহায়েত কম সময় লাগেনি। দ্রুত বাসনাকে দুই হাত দিয়ে বাঁদিকে আরেকটু কাত করিয়ে শুইয়ে তার ডান নিতম্বের নিচের দিকে, উরুর ঠিক ওপরে, অর্থাৎ অন্যদিকের অনুরূপ স্থানটিও পরীক্ষা করে দেখে সুবল। লক্ষ করে, আক্রমিত অংশটি পুরোপুরি সিমেট্রিক্যাল। অর্থাৎ বাম পাশের মতো, তার ডান পাশেরও একই ছোট্ট জায়গায় ঠিক একই রকম খসখসে ছোট ছোট সহস্র গোটা জাতীয় উপসর্গ। বাসনা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে কাপড় টানাটানি করে নিজেকে ঢেকে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুবলের মুখের দিকে না তাকিয়ে, যেন অন্যায় কিছু করে ফেলেছে, এমন ভঙ্গিতে দ্রুত বলে ওঠে 'কী হয়েছে ওখানে, নিজে দেখতে পারি না বলে তোমাকে দেখতে বললাম। অনেকদিন হয়ে গেল কি না। আগে শুধু চুলকাত, এখন একটু একটু ব্যথাও করে। কী হয়েছে, বলো তো, দাদ না একজিমা? কী বিচ্ছিরি, বলো দেখি!' নিজের শারীরিক উপসর্গে সংকোচে বিব্রত বাসনা নিজের ভেতর গুটিয়ে যেতে চায়।

সুবলের বুকের ভেতর প্রচণ্ড আলোড়ন। তার সামনে শায়িত এই অতি পরিচিত শরীরটা এমন অপরিচিত হয়ে গেল কেমন করে? কবে থেকে? এতদিন ধরে এসব ঘটছে, অথচ কিছুই টের পায়নি সুবল। বাসনার চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে না তাকিয়েই সুবল জবাব দেয়, 'ঠিক বুঝতে পারছি না কী হয়েছে। হয়তো ঘামাচি জাতীয় কিছু। যা গরম পড়েছে। তবে কালই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমায়।'

আসলে যে প্রশ্নটি করতে চেয়েছিল সুবল সেটি হলো, 'আমায় আগে বলোনি কেন সোনা?' মুখের কাছে প্রশ্নটি এসেও উচ্চারিত হলো না। তবে সুবলকে বাধা দিতে আসা বাসনার হাত দুটো জোর করে চেপে ধরে ওপরের দিকে মাথার কাছে সরিয়ে দিয়ে সুবল আবার সেই লালচে জায়গা দুটো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে। চোখে পড়ে বাঁ উরুর পেছন দিকে, ঠিক মাঝখানটাতে, সেই পরিচিত কালো তিল। একসময় সুবল বলত বিউটি স্পট। কত শত চুমু খেয়েছে সে এই তিলের ওপর, তার হিসেব নেই। তিলটিকে আকারে এখন সামান্য একটু বড় দেখায়। হয়তো বাসনার উরুর মাংস বা মেদ কিছুটা শুকিয়ে যাওয়ার জন্যেই। এছাড়া ওটা অবিকল তেমনি রয়েছে। নাইট টেবিল থেকে শেড সরিয়ে ল্যাম্পের আলোটা কাছে ধরে আরো ভালো করে তিলটা দেখে সুবল। তারপর দু'পাশে আবার ভালো করে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়, দু'দিকে ঠিক একই জায়গায় একই রকম উপসর্গ। জলে ভরা লাল গোটাগুলো উজ্জ্বল আলোতে চিকমিক করে ওঠে। সুবল আস্তে আস্তে সেগুলোর ওপর হাত বুলোয়। অনেক গরম পড়েছে কিছুদিন ধরে! তার ওপর সারাক্ষণ বসে বসেই তো কাটায় বাসনা। তাও সোফার ওপরে নয়। শক্ত কাঠের আসবাবের ওপর বসা তার বরাবরের অভ্যেস। অথবা জেদ।

'কাল থেকে তুমি আর বসে বসে রাঁধবে না। অন্তত ওই শক্ত কাঠের জলচৌকিতে বসে তো নয়ই। গদি দেওয়া মোড়াটা ব্যবহার করো। তাছাড়া এত বলি, রোজ রোজ তোমার রাঁধার দরকারই-বা কী? পারুল মেয়েটা তো বেশ রাঁধে! ওকে একটু দেখিয়ে দিলেই চলবে, আর, যে চেয়ারটাতে বসে তুমি গান শোন, টিভি দেখো, সেটাতেও আবার গদিটা বসিয়ে নিতে হবে। গদির প্রতি কেন যে এত অ্যালার্জি তোমার? এটা তো স্রেফ অভ্যেসের ব্যাপার। তাই না কি?'

আর যে কথাগুলো উচ্চারণ না করেও বলতে চেয়েছিল সুবল, সেগুলো এরকম। এখন আমাদের কি সেই বয়স আর আছে? যা খুশি তাই কি আর করতে পারি আমরা? শরীরের ভেতর কুশনটুশন সব তো চলে গেছে। হাড়ের সঙ্গে চামড়া যদি ক্রমাগত ঘষা খেতে থাকে, চামড়া বেচারা দুর্বল হয়ে পড়বে বৈকি! এসব গোটা, ফোড়ারা অতি সহজে শরীরে বাসা বাঁধবে তখন।

১% কর্টিসনসহ চুলকানির মলমটা ড্রয়ার থেকে বের করে পরম যত্নে ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে বাসনার দুই নিতম্বের উপদ্রুত এলাকায় ভালো করে মালিশ করে দিতে শুরু করে সুবল। হঠাৎ তার মনে পড়ে, মৌমিতার জন্মের সময় এপিসিস্টমি করতে হয়েছিল বাসনার। কাটাছেঁড়া ও সেলাইর জন্যে জন্মনালির বাইরের নরম জায়গাটায়, যার অবস্থান আজকের উপদ্রুত স্থানটির খুবই কাছাকাছি, বড়ই যন্ত্রণা হতো। তখন সুবল এমনি যত্নসহকারে ক্রিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মাখিয়ে দিত বাসনার ক্ষতস্থলে, প্রতিদিন, দু'বেলা। বার্থ সেন্টারে সন্তান প্রসব করার পুরো অভিজ্ঞতাটি নিজের চোখে দেখার পর সুবলের কেবলই মনে হতো, তাদের সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এককভাবে বাসনা এই যে শারীরিক কষ্ট ভোগ করল, তার একটুও যদি সে উপশম করতে পারত। কোনোভাবে। নিজের হাতে জন্ম-দ্বারে ক্রিম মাখিয়ে সে চেষ্টাই কি করত সুবল?

আজ রাতে কর্টিসন মলম মাখাতে মাখাতে অনেকদিন পর সুবল বাসনার মুখের দিকে ভালো করে তাকায়। দেখে, পূর্ণ দৃষ্টিতে বাসনাও তাকেই দেখছে। এমন করে সে তাকিয়ে রয়েছে, যেন সুবল কোনো অপরিচিত ব্যক্তি, আগে কখনো যাকে দেখেনি সে। সুবল লক্ষ করে, বাসনার চোখ দুটো আগের মতোই উজ্জ্বল, দ্যুতিময়, যেন কথা বলে। ওর পাতলা ঠোঁটে স্মিত হাসি। এক অদ্ভুত প্রসন্নতায় ভরে আছে সারা মুখমণ্ডল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবলের মনে হয়, এই বয়সেও যথেষ্ট লাবণ্যময় বাসনা। কতদিন, ক-তদিন হয়ে গেল বাসনার দিকে এমন করে চেয়ে দেখেনি সুবল। কোথায়, কত দূরে ছিল সে এতদিন? খুব দ্রুত বাসনার ঠোঁটে নরম করে একটা চুমো খায় সে। এ যেন কলেজ-জীবনে সকলকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে প্রেয়সীকে একটা ছোট্ট চুমো খেয়ে ফেলা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এরপর আরেকটি চুমো খায়। তারপর আরো একটি। সুবল এবার বাসনার দুই কাঁধ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পরম আশ্লেষে তাকে কাছে টেনে নিয়ে আশ্লেষে, আদরে অজস্র চুমোতে সারা শরীর ভরিয়ে দেয়। আর বহু-বহুদিন পর আজ রাতে হঠাৎ মনে হয় সুবলের, তার জীবন থেকে ইচ্ছা, কামনা, বাসনা সব একেবারে হারিয়ে যায়নি। সুবল ধীরে ধীরে বাসনার হাঁটুর কাছে জড়ানো তার আধ-খোলা রাতের পোশাকের নিচের অংশটা টেনে খুলে ফেলে। তারপর একটি একটি করে সামনের সবগুলো বোতাম খুলে ওপরের জামাটিও। উজ্জ্বল আলোতে শুভ্র বিছানায় শুয়ে থাকা বসনহীন বাসনাকে একবার ভালো করে দেখে আপাদমস্তক। আজ তাকে দেখতে মোটেও খারাপ লাগে না সুবলের। বিন্দুমাত্র চমকেও ওঠে না সে। বরং নিজের শরীরের অসংখ্য ভাঁজ, পেটের বাড়তি মেদ আর শিথিল মাংসপেশিই আজ রাতে তাকে বেশি বিব্রত করে — পীড়া দেয়। বাসনাকে তার অতি পরিচিত, একান্ত আপন ও যথেষ্ট লোভনীয় মনে হয়। তার ওই কিয়ৎ এলিয়ে পড়া, মাংসালো স্তনযুগল একসময় শুধু সুবলকে নয়, তার কন্যাকেও যথেষ্ট পরিতৃপ্ত করত ব্যস্ত রাখত। অথচ ধীরে ধীরে বাসনার এই দেহাংশ গুরুত্ব হারিয়েছে, সে স্থানে অন্য আরো অনেক কিছুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তাদের। কিন্তু বাসনা সেই বাসনাই রয়ে গেছে, তার সমস্ত সম্পদ, সমস্ত ঘাটতি, সকল দৌর্বল্য, নম্রতা আর কাঠিন্য নিয়ে।

একে একে তাদের দীর্ঘ যৌথ-জীবনের অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে যায় সুবলের। সেই ছাত্রাবস্থায় প্রেমে পড়া থেকে শুরু করে, প্রথম জীবনের এক-রুমের বাসায় কষ্ট করে বসবাসের সেই দিনগুলো, বিদেশে স্বল্পকালীন সময়ে পড়তে যাবার অভিজ্ঞতা, বাসনার শরীরের অভ্যন্তর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নিজের সন্তান মৌমিতার পৃথিবীতে আগমনের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যসহ গোটা জীবনের অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। স্ত্রীর কাছে নিজেকে সমর্পিত করতে মনে মনে তৈরি হয় সুবল। অনেকদিন পর আবার নিজেকে কেমন সতেজ ও স্বাভাবিক একজন পুরুষের মতো বোধ হয় তার। আড়মোড়া ভেঙে যেন জেগে উঠেছে সুবল। নিজের শক্তি ও ক্ষমতা দেখে সে নিজেই বিস্মিত হয়। এতখানি আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, এতখানি তেজ ও ক্ষুধা জমা ছিল তার শরীরে, একেবারে টের পায়নি সুবল। কিন্তু বেশিক্ষণ এই ঋজুতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয় না সে। দীর্ঘ অনভ্যাস অথবা বয়সের স্বাভাবিক নিয়মে 'পুনঃমূষিক ভব' হতে সময় লাগে না। সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে, বাসনার বুকে মুখ রেখে গা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ কেবল শুয়ে থাকে সুবল। খানিকটা সংকোচ, খানিকটা অপরাধবোধ, আবার সেই সঙ্গে কিছুটা স্বস্তি, তৃপ্তি আর কিছুটা আনন্দের মিশ্র অনুভূতিতে চোখ বুজে আসতে চায়। একসময় টের পায়, পরম স্নেহে বাসনার দুটি হাতের সব কটা আঙুল তার মাথায়, চুলে আস্তে আস্তে বিলি করে বেড়াচ্ছে।

বাঁ হাত দিয়ে ঘরের বাতিটি নিবিয়ে দেয় সুবল। অন্ধকার নেমে আসতেই দুজনে একসঙ্গে প্রবলভাবে হেসে ওঠে। সুবলের ডান হাতখানি অনবরত বাসনার শরীরের গোটায় ভরা, জ্বালা ধরা তলদেশে আলতোভাবে ওঠানামা করতে থাকে — একবার ডাইনে, আরেকবার বাঁয়ে। বাসনার শরীরে লেপ্টে থাকা সুবল টের পায় তার প্রতিটি স্পর্শে, প্রতিটি নড়াচড়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে বাসনার সর্বাঙ্গ।

বিছানার অন্য প্রান্তে নিজের জায়গায় ফিরে যাবার ব্যাপারে আজ রাতে আর কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করে না সুবল।

পারস্পরিক শরীরের উষ্ণতায়, প্রশান্তিতে ধীরে ধীরে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের পত্র

অক্টোবর ৪, ১৯৯৮

স্নেহের তাপসী,

জীবন অনিত্য। তার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী এর বিভিন্ন অনুষঙ্গ। মানবিক-পারিবারিক সম্পর্কও তার ব্যতিক্রম নয়। সম্পর্কের আকার-প্রকার, রূপান্তর সম্পর্কে একেবারেই অবগত ছিলাম না, এ-কথা বললে ভুল বলা হবে। এই ছাপ্পান্ন বছরের দীর্ঘ জীবনে কম তো দেখিনি। তবু তমালের আজকের উক্তি আমায় বিস্মিত করেছে। ওর কথায় এটা স্পষ্ট ছিল, আমি সংসারে আর কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারছি না। আমার প্রস্থানই এখন বাঞ্ছনীয়। ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটেনি। এমন যে হবে, তার আভাস প্রথম পেয়েছিলাম বছর তিনেক আগে। আমল দিইনি। বিশেষ পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি, দুর্বল মন সহজ ব্যাখ্যাকেই সবসময় সত্য বলে গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু তারপরও তমাল ও তার স্ত্রী পুনঃপুন আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, আমার উপদেশ, পরামর্শ অথবা নির্দেশ ছাড়া জীবনধারণেই অভ্যস্ত তারা। ওগুলো আর প্রত্যাশিতও নয়। আস্তে আস্তে টের পেয়েছি আরো অনেক কিছুই। আমার তৈরি খাবারের চেয়ে বাইরে থেকে কেনা খাবারই নাতি-নাতনিরা বেশি পছন্দ করে। ওদের চলাফেরা, পড়াশোনার ধরন, কথাবার্তা, খাবারের রকমসকম নিয়ে আমি কথা বললে বউমা পর্যন্ত মুখ ভার করে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করি তাপসী, সকল বয়স্ক লোকের অবস্থাই সংসারে আমার মতো নয়। পাশের বাড়ির বাদলদের পরিবারেও তো একজন বৃদ্ধ রয়েছেন। বাদলের বাবা। কই, তার সঙ্গে তো বাড়ির সকলের এমন মনকষাকষি হয় না! বাদলের বাবা রিটায়ার্ড ব্যাংক অফিসার। প্রবল প্রতাপেই সংসারের সকল সিদ্ধান্তে এখনো পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী তো মারা গেছেন অনেক আগেই। এখনো পরিবারের সকলের নজর তাঁর দিকে। পুত্র-কন্যারা তো বটেই। পুত্রবধূর, নাতি-নাতনিদেরও। বিকেলে বেড়াতে যাওয়ার আগে ছড়ি ও জুতা প্রতিদিন এগিয়ে দেয় তাঁর পুত্রবধূ। ফিরে এলে ফল আর শরবত নিয়ে দরজায় অপেক্ষা করে। তাপসী, বলতে পারিস, আমার বেলায় এমন ঘটল কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের সংসারে খুব কি নাক গলাতে দেখেছিস আমায়? ওদের বন্ধু-বান্ধব, পার্টি, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানোতে ক্বচিৎ কখনো মন্তব্য করেছি হয়তো। বেশিরভাগ সময়েই সব নিঃশর্তভাবে মেনে নিই। নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চাইনি কখনো।

স্বাস্থ্য আমার ভালোই। নিজের দেখাশোনা, চলাফেরায় কারো সাহায্য লাগে না এখন পর্যন্ত। বরং সংসারের প্রাত্যহিক কাজে ওদেরই যথেষ্ট সাহায্য করার চেষ্টা করি। রান্নাবান্না, বাজার, ঘরের জিনিসপত্র দেখে রাখা। আমার দোষটা কোথায় বলতে পারিস? দোষটা বা ঘাটতিটা কি এখানেই যে, আমি সেকালে এতখানি পড়াশোনা করা সত্ত্বেও কখনো রোজগার করিনি। সংসারের আর্থিক সচ্ছলতায় কোনো ভূমিকা ছিল না আমার! কিন্তু তা সত্ত্বেও আবার বিভুর মায়ের মতো আমি ছেলের সংসারে ঘরদোর সাফসুতোর করে সর্বক্ষণ ওসবেই নিজেকে ব্যস্ত ও পরিতৃপ্তও রাখিনি। এর বাইরেও কিছু করার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়েছে, সে সামর্থ্য আমার আছে। তাছাড়া ওই অধিকার তো তমালই দিয়েছিল আমায়! আমার পরামর্শ-উপদেশ ছাড়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত, কোনো পরিকল্পনা নিতে পারত না একদিন। হঠাৎ আমার বিচক্ষণতায় এতটাই আস্থা হারাল কেমন করে ওরা? জানি না তাপসী, কোথা থেকে কী হয়ে গেল। কিন্তু তমাল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে গতকাল, আমার সময় শেষ। বউমাই সংসারের হাল ধরতে প্রস্তুত এখন। কোথায় যাব, কী করব এখনো কিছু ঠিক করিনি। শুধু বুঝি আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এমনভাবে হঠাৎ মূল্যহীন হয়ে পড়ব, বাসি ফুলের মতো ঝরে পড়ব কখনো ভাবিনি। আমার জন্য ভাবিস না। তুই ও অলক ভালো থাকিস। সোনা ও রাজাকে আদর দিস। আজ মনটা খুব বিক্ষিপ্ত বলে অনেক কথাই তোকে লিখে ফেললাম, যা কখনই কারো কাছে প্রকাশ করব ভাবিনি। তবে তুই শুধু আমার সন্তান নস্, ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুই-ই আমার বয়সের সবচেয়ে কাছাকাছি। সবচেয়ে বড় কথা, তুই আমারই মতো একজন নারী। আমার মনে হলো, আজকের দিনে তোকেই কেবল কিছু বলা যায়। শুধু তুই-ই পারবি বুঝতে আমাকে। আমার পরবর্তী পরিকল্পনা যথাসময় জানাব। ভালো থাকিস।

'মা'

অক্টোবর ২১, ১৯৯৮

স্নেহের তুষার,

তোমার চিঠি পেলাম। সেদিন মনটা আমার দারুণ বিপর্যস্ত ছিল। তাপসীকে কী লিখতে কী লিখে ফেলেছি আমার ঠিক মনে নেই। এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। আমি জানি, তাপসী আমার জন্য খুব উদ্বিগ্ন। এত দূরে বিদেশে আছে বলেই হয়তো দুশ্চিন্তাটা ওর প্রবল হয়েছে। কাছে এসে দেখে যাওয়ার যেহেতু উপায় নেই, সেহেতু এখন সাতসতেরো ভাবছে। তুমি ওকে বুঝিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলো, আমিও লিখব। না, তেমন কিছু হয়নি এখানে। জীবনের স্বাভাবিক গতিতেই আমি একদিন টের পেলাম আমার আগের প্রয়োজনীয়তা আর নেই এ-সংসারে। ফলে শুধু জীবনধারণের জন্যে এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে দেখি না। তাই আমি নিজেই মনস্থির করেছি, এখান থেকে চলে যাব। না, তুমি তমালকে ভুল বোঝো না। ও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না। সে খুবই ভদ্র ছেলে। ধীর, স্থির, শান্ত। তোমাদের বড়দাকে আমার চেয়ে কম জানো না তোমরা। বউমাও যথেষ্ট বিচক্ষণ ও সহনশীল। আসলে সিদ্ধান্তটা একেবারেই আমার নিজস্ব। তমালকে তা বলায় সে শুধু বাধা দেয়নি এ পর্যন্ত। না দিয়ে বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে। ওদের ছেলেমেয়ে অনেকটা বড় হয়েছে। তমাল ও বউমা এখন ওদের দিকেই নজর দেবে এবং এটাই স্বাভাবিক। আমি মাঝখানে থেকে কোনো কাজে লাগছি না অথচ ওদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি ঠিকই। এ উপলব্ধি থেকেই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাপসীকে চিঠি দেওয়ার সময় আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলাম। তাই সব কথা গুছিয়ে লিখতে পারিনি, বোঝাতেও নয়। তুমি আমার জন্যে মোটেও ভেবো না। আমি জানি, তোমার ওখানে আমি সবসময়েই যেতে পারি। গিয়ে থাকতেও পারি। গেলে তুমি ও মহুয়া যে খুব খুশি হবে সেটা আমার অজানা নয়। তবু এ মুহূর্তে সে ব্যাপারে তেমন আগ্রহ বোধ করছি না। হয়তো কয়েকদিনের জন্যে বেড়িয়ে আসতে পারি। সিলেটের চা বাগান আমার অন্যতম প্রিয় জায়গা, সে তোমরা সবাই জানো। তেমন প্রয়োজন হলে আমি নিজেই তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। একত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বহু ঝুট-ঝামেলার মধ্য দিয়ে তোমাদের নিয়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার ভালো-মন্দে, সুখে-দুঃখে তোমরা ছাড়া কে-ইবা আছে? আমার কথা না ভেবে এখন তুমি তোমার সংসারের দিকে মনোযোগ দাও। মহুয়াকে প্রতিমাসে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও। ও যেন খাওয়া-দাওয়া করে ঠিকমতো। বেয়ানকে যদি সত্যি সত্যি নভেম্বরে চলে যেতে হয়, ডেলিভারির আগে আমি কিছুদিন গিয়ে থেকে আসব। ভেবো না। বৃষ্টিকে আমার আদর জানিও। সবশেষে আবার তোমাকে জানাই, শুধু শুধু তমালের ওপর রাগ করো না তোমরা। ওকে ভুল বোঝো না। আমার এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই নিজস্ব। তমাল আমাকে কোনোকিছু করতে বাধ্য করছে না।

'মা'

অক্টোবর ২৬, ১৯৯৮

স্নেহের তিসা,

তাপসীকে এর চেয়ে পরিণতমনস্ক আমি ভেবেছিলাম। আমার দুর্ভাবনা দিয়ে তোমাদের সকলকে এমন চঞ্চল করে তুলবে সে, এ-কথা কখনো ভাবিনি। দোষটা হয়তো আমারই। কী জানি কেন, সেদিন হঠাৎ এলোমেলো অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু লিখে ফেলেছিলাম তাপসীকে। তার মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও অনেকটাই ছিল বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তার অসংলগ্নতা, রাসহীন কল্পনা, ভুল ধারণা ও আস্থাহীনতা। এ বয়সে বিশেষ করে মেয়েদের, এমন ঘটে শুনেছি। আমি নিজেও তার শিকার হয়ে পড়ব ভাবিনি। আমার এই অস্থিরতা তাপসীকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ও বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে তাই ভুল করেছে। তোমরা কিছু মনে করো না। অমন উতলা হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি।

আমি তুষারকেও জানিয়েছি। তোমাকেও বলছি, এখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই। অসম্মানের সঙ্গেও থাকছি না। তমাল ও বউমা আমার জন্যে যথেষ্ট করছে। যেমন করেছে বরাবর। কখনো অবহেলা করে না। ওরা কিছুই বলেনি আমায়। আমিই এটা ঠিক করেছি। করেছি, কেননা টের পেয়েছি আগের মতো এ সংসারে আমার উপস্থিতি আর জরুরি নয়। কথাটা তমালকে জানাতে সে বরং কিছুটা উষ্মা প্রকাশই করেছে। তবে শেষ পর্যন্ত আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। যা নিজে নিজেই করব ভেবেছিলাম, তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি ও সমর্থন পুত্রের কাছে পেয়ে যাওয়ার পর আবার কেমন যেন এক অবসন্নতা, অর্থহীনতায় ডুবে গেলাম। গভীর একটা কষ্ট, একটা বেদনা আমাকে গ্রাস করল। তারই কিছুটা আভাস হয়তো পেয়েছিল তাপসী আমার সেই চিঠিতে। এ জন্য আমি দুঃখিত। তাপসী বা তোমাদের কাউকে চিন্তিত করে তুলতে আমি চাইনি। তোমাদের মনোবেদনার-দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছি বলে আমার খুবই খারাপ লাগছে। আমি এখনো দিনক্ষণ কিছু স্থির করিনি। বউমা অবশ্য লোকনিন্দাকে খুব বড় করে দেখছে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি কী বলবে তা নিয়ে অযথা তার দুর্ভাবনা। আমি তাকে বলেছি, এসব তুচ্ছ ও বাহ্যিক ব্যাপারকে শুধু শুধু বড় করে দেখছ। লোকের কথায় কী আসে যায়? আর জগৎ-সংসারে পুত্রের ঘর থেকে প্রৌঢ়া মায়ের প্রস্থান কি এই প্রথম ঘটল, যে লোকে অবাক হবে? আসলে কথা সেটা নয়। কথা হলো, এ স্বাভাবিক পরিণতির দায়দায়িত্ব বহন করার সাহস বা সামর্থ্য ওদের নেই। সকলেই নিজেকে উদার ও দরদি বলে ভাবতে পছন্দ করে, আমি তাতে কোনো দোষ দেখি না। প্রকৃত অর্থেই এর জন্য ওরা কতটুকুই বা দায়ী!

এখন অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমি তোমার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব মোটেও সমর্থন করতে পারছি না। ছেলেপুলে, ঘরসংসার শুরু করতে দেরি হচ্ছে বলেই তুমি এ রকম ভাবছ জানিয়েছ। এটা মেনে নেওয়া একটু কষ্টকর। তোমার চার বছর বিয়ে হয়েছে। পড়াশোনা শেষ করেছ তারও আগে। ছেলেপুলে হওয়ার অবশ্যই সময় হয়েছে তোমার। তুমি যদি মনে করো তোমার বর্তমান পেশা, কাজের ধরন এবং কর্মস্থলে দীর্ঘ সময় ব্যয় ইত্যাদি ঘরসংসার, সন্তান ধারণ-পালনের অনুপযোগী, তাহলে কাজের ধরন পাল্টাও। অন্য রকম চাকরি খোঁজ। কিন্তু আমি চাই না তুমি জীবিকার কথা না ভেবে পুরোপুরি স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়। মেয়েদের কর্মজীবনের প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু অর্থোপার্জনের জন্যেই নয়, যদিও সেটাই মুখ্য কারণ। এর ভেতর দিয়েই তুমি বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে, যে সম্পর্ক তোমার স্বামীর পরিচয় দিয়ে নির্ধারিত নয়, যা আমার মতো নারীরা পারেনি গড়তে। সংসার ও পরিবার ছাড়া তাই আমাদের আর কোথাও তাকানোর উপায় নেই। যাওয়ার উপায় নেই। কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে সংসারের ভেতরে নিজের কর্তৃত্ব, নিজের অধিকার, নিজের গুরুত্ব ও সম্মান তুমি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। বিশ্বাস করো, সেটা স্থায়ী হবে তুমি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করার পরও। তুমি যে একদিন এ সংসারের আর্থিক দায়িত্ব আংশিকভাবে হলেও গ্রহণ করেছিলে, এ কথা এ দায়িত্ব থেকে তুমি অব্যাহতি নেওয়ার পরও লোকে ভুলে যাবে না। কিন্তু অন্যদিকে তা না করে তোমার জীবন, যৌবন, পরিশ্রম, মেধা, মনোযোগ সব দিয়ে সংসারটিকে তিলে তিলে গড়ে তুললেও একদিন দেখবে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তুমি এ ভুল কখনো করো না। আমার বিশেষ অনুরোধ।

তোমার বাবা অকালে মারা গেলেও অর্থকষ্টে তোমরা কখনো ভোগনি। তিনি যথেষ্ট রেখে যেতে পেরেছিলেন। আমার সৌভাগ্য, তোমার মামার বিচক্ষণতা ও উপদেশে তা দিয়ে তোমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে তেমন বেগ পেতে হয়নি আমার। তবু তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর চাকরি করার কথা খুব গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা চারজনই যথেষ্ট ছোট তখন। সকলেই স্কুলে পড়। দাদার পরামর্শে তোমাদের দেখাশোনা করার অসুবিধা হবে ভেবে চাকরি করার সংকল্প ত্যাগ করেছিলাম। আজ মনে হয় জীবনের একটা মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত ছিল সেটা।

যাই হোক, আমার জন্য ভেবো না। আজ হোক কাল হোক, আমি এখান থেকে চলে যাব। বড়জোর এ শীত পর্যন্ত আছি। তবে তোমার ভয় নেই। তমাল, বউমা বা বাচ্চাদের সঙ্গে রাগ করে আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাব না। কোথায় যাব বা কী করব এখনো ঠিক করিনি। সময়মতো তোমাদের সকলকে জানাব। তুমি আমার কনিষ্ঠা সন্তান। মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়ার সময় এখনো আসেনি তোমার। নিজে আগে মা হও, মায়ের দায়িত্ব পালন করো। তারপর বুড়ো মায়ের দেখাশোনা করবে। সত্যি বলতে কী, তোমার এখন হেসেখেলে বেড়িয়ে সুন্দর সময় কাটানোর দিন। অন্য কারো জন্য অন্য কিছু ভেবে এ বিশেষ সময়টা নষ্ট করো না। তবে তোমার এই ইচ্ছা ও আন্তরিকতা আমায় অনেক আনন্দিত ও গর্বিত করেছে। তোমার আমন্ত্রণ মনে থাকবে। তোমরা সকলে ভালো থেকো। সুজয়কে আমার স্নেহাশিস জানিও।

'মা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসেম্বর ৬, ১৯৯৮

স্নেহের তমাল

কাল ভোরের ট্রেনে আমি চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছি। তোমরা সকলেই এ কথা জানো। চিঠি লিখে সে সংবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল না। তবু যে কারণে লিখছি।

তুমিও হয়তো ভাবছ তোমাদের সঙ্গে অভিমান করে এত বছর পর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আসলে তা নয়। তুমি যেমন সেদিন দুঃখ প্রকাশ করে স্বীকার করেছ, আমি নিজেও তেমনি জানি, ছেলের জীবনে মায়ের প্রয়োজন কখনো শেষ হয় না। উত্তেজনার বশে আমরা অনেক কথাই বলে ফেলি, যা আসলে আমরা বলতে চাই না বা সতত মনে ধারণ করি না। তোমার কথায় সেই মুহূর্তে তাই আহত হলেও, ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম তোমায়। তাই ওসব কথা মনে রাখিনি। সেটাই যদি রাখব তাহলে তো দু'মাস আগেই চলে যেতাম এ বাড়ি ছেড়ে। ওই ঘটনার পর, তোমার ওই কথা শোনার পরপরই। এ ব্যাপারে তোমার অনুতাপ করার তাই কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমি আসলে অনেক সময় নিয়ে, অনেক ভেবেচিন্তেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হুট করে নয়। তাই মুমু, সকাল আর দীপ এসে কাল যখন আমায় ঘিরে ধরল, জানতে চাইল কেন আমি চলে যাচ্ছি? বলল, কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না ওরা, তখন বাধ্য হয়ে ওদের বোঝাতে হলো আমায়। আমি ছোটবেলার তোমার সেই প্রিয় বিদেশি রূপকথার 'ব্যাম্বি'র গল্প শোনালাম। মা ছাড়া একদিন পৃথিবীতে আর কিছুই জানত না ছোট্ট হরিণছানা ব্যাম্বি। তারপর একটু একটু করে বড় হতে হতে বাইরের সুন্দর ও অসুন্দরের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করল ব্যাম্বি। একদিন তার জীবনেও এলো প্রেম — নতুন সাথী। শিকারির গুলিতে মৃত্যুপথযাত্রী মা বিপন্ন, অসহায় ব্যাম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এটাই জীবন। আমাকে ফেলে রেখে আরো অনেক পথ পার হতে হবে তোমাকে। তোমার সঙ্গে থাকবে এখন একটি তরুণ প্রাণ। আরো নতুন নতুন হরিণশিশু জন্ম নেবে তোমাদের কাছ থেকে। তমাল, আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বোঝে। অনেক পরিণত ওরা। ওরা ঠিকই বুঝতে পারল আমার কথা। আমাকে থেকে যাওয়ার জন্যে আর জোরাজুরি করেনি ওরা।

একটা কথা তোমাদের বলা হয়নি। কল্যাণীকে আমি আমার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি। আশা করি তোমরা কিছু মনে করবে না। এতটুকু বয়সে ওকে আমি নিজে ওর মায়ের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম। এ বাড়িতেই কাজ করে খেয়েপরে বড় হয়েছে। ওর জন্য তোমাদের, বিশেষ করে বউমার যে লোকলজ্জা হয়েছে, তার গ্লানি আমিও অনুভব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুঃসময়ে, তোমাদের মতো, মেয়েটির দিক থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিতে আমি পারছি না। জুলাই মাসে কক্সবাজারে বেড়াতে যাওয়ার সময় কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে আর কল্যাণীকে বাড়িতে রেখে যেতে সাহস করলে না তোমরা। কতবার তোমাকে বলেছিলাম, এ সুরক্ষিত ফ্ল্যাটে কোনো ভয় নেই। আমরা দুজন দিব্যি থাকতে পারব। তবু তোমরা আমাদের দেখাশোনা, বাজারঘাটের জন্য রেখে গেলে একজন। যাকে রেখে গেলে সে তোমার কতখানি বিশ্বাসভাজন ছিল জানি না, তবে কল্যাণীর প্রতি সুবিচার সে করেনি। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের গরিব কুমারী একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে খুব বেশি বীরত্বের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে সে যদি পূর্বপরিচিত ও বিশ্বস্ত পারিবারিক বন্ধু হয়ে থাকে। স্বীকার করি কোনো কিছু বুঝতে না পেরে পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে অকস্মাৎ এ সত্য আবিষ্কারে বউমা সেদিন কী সংকটে, কী লজ্জায় পড়েছিল। কিন্তু তারপরেও তো কথা থাকে তমাল। এমন ঘটনা আমরা না চাইলেও ঘটে কখনো কখনো। ঘটেছে চিরকাল। এক্ষেত্রে যখন তা ঘটেছে, আমি সে সময় এ বাড়িতেই ছিলাম। তোমরা এ জন্য আমাকেও কম দায়ী করোনি। তোমাদের সব অভিযোগই মেনে নিলাম। তারপরও আমি বলব, দুটি নারী-পুরুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী, তখন জগতের সহস্র সতর্ক দৃষ্টিও তাদের পাহারা দিয়ে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে। টের পেলে অন্তত কল্যাণীর কথা ভেবেও আমি ওকে নিরুৎসাহিত করতাম। জানি, এ জন্য তোমাদের মানসিক ভোগান্তিও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু এই গরিব মেয়েটিকে যে তুমি তার কৃতকর্মের জন্য তাড়িয়ে দিচ্ছ, আরেকজন যে এ ঘটনার জন্য ওর সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি দায়ী, তাকে কী করলে তুমি? এখনো তো দিব্যি বুক ফুলিয়ে তোমার চোখের সামনে সোজা টানটান হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে সমস্ত লজ্জা, গ্লানি আর অপরাধের ভার আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে। ওর বিরুদ্ধে কিছু করলে না তো তুমি! কেন করলে না? ওকে তাড়ালে অফিসের সব লোকজন জেনে যাবে — তোমার মর্যাদাহানি হবে এই ভয়ে তো? যাই বলো, তোমার এ মনোভাবকে আমি ঠিক মানতে পারলাম না। আমার সন্তান হয়ে এতটা জড়তা, এতটা শঙ্কা তোমার থাকা উচিত ছিল না।

কল্যাণীকে ওর এই মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় বৃদ্ধা হতদরিদ্র মায়ের কাছে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া কোনো মানবিক কাজ বলে আমি মনে করি না। তাই ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। অন্তত একটি ঝামেলা থেকে তোমাদের রেহাই দিয়ে গেলাম। ওকে বিদায় করার বিড়ম্বনা আর পোহাতে হবে না তোমাদের। এর মধ্যে অবশ্য আমার কিঞ্চিৎ স্বার্থও কাজ করছে। পরিচিত সবকিছু ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও কল্যাণীই হয়তো নতুন জায়গার সঙ্গে পুরনোর যোগসূত্র ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। তাছাড়া আমার জন্য মেয়েটির কোথায় যেন একটা দুর্বলতা রয়েছে। হ্যাঁ, দিদির ওখানেই উঠব। হাসপাতালে ওর কোয়ার্টারে আমাদের দুজনেরই জায়গা হবে জানিয়েছে দিদি। সামনের বছরের শেষে রিটায়ার করবে ও। সে পর্যন্ত ওখানেই থাকব আমরা। কল্যাণী এই দুই বৃদ্ধার শুধু সাহায্যকারীই হবে না, সঙ্গীও হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ভালোই থাকব দেখো। তোমার বাবার পেনশনের টাকা ক'টিতেই চলে যাবে বাকি জীবন কোনোমতে। এখন আমার অফুরন্ত সময় — একদম হাত-পা ঝাড়া। যদি তেমন কোনো কাজ জোটে এ বয়সে, করতে আপত্তিও নেই আমার। কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর এ ব্যাপারে আরেকটু গভীরভাবে ভেবে দেখব। খোঁজ করব।

এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, বুঝতে পারছিলাম বহুদিন থেকেই। তুমি শুধু শুধুই মন খারাপ করছ। তোমার সেই কথার জন্যে কিছুই হয়নি। আমি প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি গত তিন বছর থেকেই। তবে আজ কল্যাণীকে তাড়িয়ে দিচ্ছ বলে এ নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে ওকে নিয়ে সরে পড়া আমার জন্য অনেক সহজ হয়েছে। একটা কথা জেনে রেখো, আমার নীরব নির্গমনের পথকে তুমি তোমার এ সিদ্ধান্ত দিয়ে অনেকটাই সহনীয় করে দিলে। ভালোই হলো। তোমাদেরও আর লোকচক্ষুর কাছে হেয়প্রতিপন্ন হতে হবে না। বুড়ো বয়সে মানুষের ভীমরতি হয়, তোমার মায়েরও হয়তো হয়েছে। এক চরিত্রহীন কাজের মেয়ের প্রতি অন্ধস্নেহে জেদ করে তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তোমাদের ঘনিষ্ঠজনেরা একটু দুঃখ পেলেও যারা আমাকে জানে, এ সংবাদ শুনে খুব অবাক হবে না। অবুঝ, জেদি ও আবেগপ্রবণ বলে আমার দুর্নাম তো রয়েছেই চারদিকে। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে সময় লাগবে না। তোমরা সকলে ভালো থেকো।

'মা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~